এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

অরিয়েন্টালিজম

ভূমিকা ও ভাষান্তর

ফয়েজ আলম



অরিয়েন্টালিজম এমন এক রচনা যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক চিন্তার প্রেক্ষিত ও অভিমুখ চিরতরে পাল্টে দিয়েছে। অন্যদিকে, তার স্রষ্টাকে পরিণত করেছে কিংবদন্তিতুল্য মানুষে। পশ্চিমের আধিপত্যবাদী জ্ঞান ও সংস্কৃতি যখন সারা পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তখন *অরিয়েন্টালিজম* এক ধীরগতির বিস্ফোরণ, যা আক্রান্ত করেছে সেই আধিপত্যের মূল প্রক্রিয়া ও কৌশলসমূহকে। ইউরোপ ও আমেরিকান শক্তি প্রাচ্যের ওপর সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে প্রাচ্যের মানুষের মন, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক স্বভাবের ওপরও আধিপত্য করেছে, নিজেদের ইচ্ছেমত রূপান্তরিত, বিকৃত ও পরিবর্তন করেছে তাদের মনোজগৎ ও বাইরের ইমেজকে তা জানার জন্যে *অরিয়েন্টালিজম*-এর বিকল্প নেই।



এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে, ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে এক এপিসকোপ্যালিয়ান খ্রিস্টান পরিবারে। ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর উদ্বাস্তর নিয়তি মেনে কিশোর বয়সে পরিবারের সাথে মিশরে পাড়ি জমান। কিছুকাল কায়রোর ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ওখানে মাউন্ট হারমান স্কুল, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পাঠ শেষে ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ওখানেই আজীবন ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্য পড়িয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইংল্যান্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসরের দায়িত্ব পালন করেন।

ফিলিস্তিনী মুক্তি আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সাঈদ। ১৯৭৭ সালে প্রবাসী ফিলিস্তিন পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রায় ১৪ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তিসংক্রান্ত মতবিরোধে পদত্যাগ করেন তিনি। এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের পিতা সাঈদ প্রায় এক যুগ ধরে ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছিলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এই মহান মানুষটি।

এ ড ও য়া র্ড ড ব্লি উ সা ঈ দ

অরিয়েন্টালিজম

ভূমিকা ও ভাষান্তর

ফয়েজ আলম

সংবেদ

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাইদ
অরিয়েন্টালিজম
ORIENTALISM শিরোনামে পেঙ্গুইন বুক, ইংল্যান্ড কর্তৃক
প্রকাশিত ১৯৯৫ সালের ইংরেজি সংস্করণ থেকে অনূদিত

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৫

প্রথম সংবেদ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক
পারভেজ হোসেন
সংবেদ, ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
পেঙ্গুইন বুক, ইংল্যান্ড কর্তৃক
প্রকাশিত ১৯৯৫ সালের ইংরেজি সংস্করণ অবলম্বনে
মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রণ
সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন, ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০

মূল্য : পাঁচশত টাকা

ISBN 978-984-8892-71-8

একমাত্র পরিবেশক
উত্তরণ, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭, ৭১১৯৪৬৩

ভারতে পরিবেশক
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, বি-৯, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ORIENTALISM by Edward W Said. Translated by Fayez Alam. Published by: Parvez Hossain in February 2015. Sangbed, 85/1, Fakirerpool, Dhaka-1000. Cover Design by Mustafiz Karigar. Price: Tk. 500.00

পরিভাষা তালিকা

Anthropocentric	-	নৃতত্ত্বকেন্দ্রিক
Area Studies	-	অঞ্চলবিদ্যা
Authority	-	কর্তৃত্ব
Civil Society	-	নাগরিক সমাজ
Discourse	-	ডিসকোর্স
Dogmatic	-	মতান্ধ/ভাবান্ধ
Elaboration	-	বিশদায়ন
Eurocentric	-	ইউরোপকেন্দ্রিক
Hegemony	-	সাংস্কৃতিক আধিপত্য
Intertextual	-	আন্তঃরচনা
Iconoclast	-	মূর্তি-বিনাশী
Latent Orientalism	-	প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতত্ত্ব
Laxicography	-	অভিধানবিদ্যা
Narrative	-	বয়ান
Orientalism	-	প্রাচ্যতত্ত্ব
Orientalist	-	প্রাচ্যতাত্ত্বিক
Orientalization	-	প্রাচ্যায়ন
Political Society	-.	রাজনৈতিক সমাজ
Representation	-	প্রতিনিধিত্ব
Scholarship	-	পাণ্ডিত্য
Scholary	-	পণ্ডিতি
Stereotype	-	ছাঁচ
Steretyping	-	ছাঁচঢালাইকরণ
Text	-	রচনা
Textual	-	কেতাবি
Unlearning	-	বি-শিক্ষণ

সূচি

পরিমার্জিত সংবেদ-সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় এক দশক আগে বেরিয়েছিলো *অরিয়েন্টালিজম*-এর বাংলা ভাষান্তর। বইটি বের হওয়ার পর পাঠক মহল থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়, যা আমার ধারণাতেও ছিলো না। তখন থেকেই এর একটি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু বিচিত্র কারণে এতদিন তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এবার *অরিয়েন্টালিজম*-এর পরিমার্জিত সংবেদ সংস্করণ বেরুচ্ছে দেখে ভালো লাগছে। এজন্য সংবেদের কর্ণধার পারভেজ হোসেনকে কৃতজ্ঞতা।

অরিয়েন্টালিজম-এর বাংলা ভাষান্তর বের হওয়ার পর অনেকে নানা উপলক্ষে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ সম্ভাব্য পরিমার্জিত সংস্করণের ব্যাপারে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। এ সুযোগে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

ফয়েজ আলম

ঢাকা, ১৯শে মাঘ, ১৪২১ সাল

অনুবাদের ভূমিকা

গত শতকের অস্থির, দ্রুত পরিবর্তনমুখী বুদ্ধিবৃত্তিক আবহে এডওয়ার্ড সাঈদ ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদদের একজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষত ষাট ও সত্তরের দশকে সব ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কাছে আনত অসম্ভব একটা মানববিশ্বে সাঈদের আবির্ভাব প্রচণ্ড আলোড়নের মতো, যা নাড়িয়ে দেয় পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও দমনের দীর্ঘ, স্থিতিশীল আয়োজন–উন্নত বিশ্বের সাংস্কৃতিক প্রভাবনের সূত্রে অর্জিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মূল ভিত্তির কৃত্রিম গ্রন্থিগুলো খুলে খুলে দেখায় এবং এভাবে অনুন্নত অঞ্চলগুলোর, বিশেষ করে প্রাক্তন উপনিবেশিত দেশসমূহের মানুষদের চিন্তাভঙ্গির দীর্ঘকালীন ঔপনিবেশিক অনুবর্তনের মধ্যে সূচিত করে অবমুক্তি ও বিকাশের তীব্র সম্ভাবনা। সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক হয়েও আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল কর্তৃত্বকেই তিনি চিহ্নিত করেন, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আক্রমণ করেন, তার স্বরূপ উন্মোচন করে দেখান।

সমকালে আধুনিক মনোভাবের ধীর কিন্তু নিশ্চিত বিলুপ্তি এবং নতুন চিন্তাভঙ্গির বিচিত্র উৎসারণে যে প্রশ্নময়তা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অনিশ্চিত অনুসন্ধান শুরু হয়, সাঈদ তার মধ্যে কিছুটা ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করেন; সংস্কৃতি, সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি, আধিপত্য, ক্ষমতা এবং অনুন্নত বিশ্বের মানুষের মনোজগতে তার প্রভাব ও পরিণতি হয়ে ওঠে তার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের বিষয়। এভাবেই তিনি চিহ্নিত করেন প্রাচ্যতত্ত্বের গূঢ় গোপন সংগঠন যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধর্মযাজকের মন্ত্রপাঠ থেকে শুরু করে রুশোর রাজনৈতিক তত্ত্ব কিংবা জেন অস্টিনের উপন্যাস; এর লক্ষ্য হলো, প্রাচ্যের মানুষদের মনোজগৎকে বশে রেখে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও তা অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করা। এ ধরনের আত্মমুখী অন্বেষা আধুনিকতা-উত্তর চিন্তাধারায় সাঈদকে প্রতিষ্ঠিত করে অনন্য অবস্থানে। ঔপনিবেশিক শক্তিসংঘের জটিল কাঠামো ও তার কর্মপ্রক্রিয়া উন্মোচন এবং উত্তর-উপনিবেশকালে ঔপনিবেশিক যুগের সাংস্কৃতিক প্রভাবন ঝেড়ে ফেলার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাঈদের এই বিশ্লেষণই ক্রমে উত্তর-উপনিবেশবাদরূপে সুসংগঠিত ও পরিচিত হয়।

সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে, ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে এক এপিসকোপ্যালিয়ান

খ্রিষ্টান পরিবারে। ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর উদ্বাস্তুর নিয়তি মেনে কিশোর বয়সে পরিবারের সাথে মিসরে পাড়ি জমান। কিছুকাল কায়রোর ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ওখানে মাউন্ট হারমান স্কুল, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পাঠ শেষে ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ওখানেই আজীবন ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্য পড়িয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যান্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসরের দায়িত্বও পালন করেন।

ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সাঈদ। ১৯৭৭ সালে প্রবাসী ফিলিস্তিন পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রায় ১৪ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তিসংক্রান্ত মতবিরোধে পদত্যাগ করেন তিনি। এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তানের পিতা সাঈদ প্রায় এক যুগ ধরে ব্লাড ক্যানসারে ভুগছিলেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বরে ২০০৩ সালে আমেরিকার এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এই মহান মানুষটি।

২

'অরিয়েন্টালিজম' সাঈদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ১৯৭৮ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ত্রিশটির অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই একটিমাত্র গ্রন্থের জন্যও সাঈদ অমর হয়ে থাকবেন। এখন পর্যন্ত এ গ্রন্থটি মানববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার গভীরতর প্রভাব অব্যাহত রেখেছে। এ গ্রন্থে সাঈদ অঙ্গীকার করেন মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোয় ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর রাজনৈতিক, সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক, আর্থিক আধিপত্যের সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি ও প্রতিফলন–প্রাচ্যের ওই অঞ্চলের ওপর পশ্চিমের কর্তৃত্বের আরোপণ, তার উপায় ও ধরনের ইতিহাস রচনার।

ওই কর্তৃত্বের বা আধিপত্যের পেছনে কার্যকর সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্য সাঈদ ব্যবহার করেন 'অরিয়েন্টালিজম' বা 'প্রাচ্যতত্ত্ব' পরিভাষাটি। 'প্রাচ্যতত্ত্ব' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাঈদ বলেন, প্রাচ্য হলো পশ্চিমের জ্ঞানজগতের নির্মাণ; পশ্চিমের কাছে প্রাচ্য ছিল দূর ও অজানা। সেই দূর ও অজানাকে জানার চেষ্টায় প্রাচ্য হয়ে ওঠে পশ্চিমের 'অন্য' বা 'আদার'– পশ্চিমের প্রতিপক্ষ। ফলে পশ্চিম (অর্থাৎ নিজ) হয় ভালো, প্রাচ্য (অন্য) মন্দ। এ 'প্রাচ্য' বাস্তব প্রাচ্য নয়, পশ্চিমের সৃষ্টি মাত্র। পশ্চিম প্রাচ্যে তার উপনিবেশ গড়ার বহু পূর্ব হতেই প্রাচ্যের ইতিহাস, জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, বিশ্বাস সম্পর্কে অজস্র কাল্পনিক ধারণা সৃষ্টি করেছে, প্রচার করেছে, প্রজন্মলগ্নে নিজেরা তা বিশ্বাসও করেছে। সে কল্পনা ও ধারণার মূলে আছে

পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচ্যের নিকৃষ্টতার বোধ। আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুতে এ ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই পশ্চিম প্রাচ্যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়।

পাশ্চাত্যের মানুষেরা উপনিবেশিত প্রাচ্যে এসে বাস্তবতার নিরিখে তাদের সংশোধন না করে বরং তাকেই জোরদার ও পুনরুৎপাদন করে। বাস্তব প্রাচ্যকে তাদের নির্মিত প্রাচ্যরূপেই দেখে, এমনকি বাস্তবের ওপর চাপিয়ে দেয় তাদের কল্পনার প্রাচ্যকে। ফলে এই দূরত্ব আর ঘোচেনি। এভাবে প্রাচ্যকে হেয়করণ, দমন ও শাসন করার সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও মনোভাবই হলো 'প্রাচ্যতত্ত্ব'। পশ্চিমা জ্ঞানজগতে প্রাচ্যতত্ত্ব নামের এ ডিসকোর্সের পরিশোধিত বক্তব্য হলো : *(পৃথিবীতে)...পশ্চিমের মানুষ আছে, আর আছে প্রাচ্যবাসী। প্রথমোক্তরা আধিপত্য করবে। সেই আধিপত্যের শিকার হতে হবে, অবশ্যই, দ্বিতীয়োক্তদের : যা সচরাচর বোঝায় তারা তাদের ভূমি দখল করে নিতে দেবে, তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে, তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ তুলে দেবে কোনো-না-কোনো পশ্চিমা শক্তির হাতে।* ('অরিয়েন্টালিজম', ১৯৯৫, ৩৬)

প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং প্রাচ্যের মানুষদের নিজস্ব শাসনে পরিচালিত হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করে। যেহেতু প্রাচ্য বিনষ্ট, অসভ্য, তাই প্রাচ্যজনকে কথা বলতে দেওয়া যায় না। কারণ, সে নিজেকেও ভালো করে চেনে না, তাকে যতটা চেনে পশ্চিমের লোকেরা। তাই প্রাচ্যের পক্ষে কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ আর প্রাচ্য পরিণত হয় নিকৃষ্ট, নির্বাক, নিষ্ক্রিয় উপনিবেশে। আঠারো শতকের শেষ থেকে প্রাচ্যতত্ত্বের সক্রিয় যাত্রা শুরু হয়। এখনো তা অব্যাহত রয়েছে–যাবতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তিসমেত, ভিন্নরূপে, নব্য সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়ে।

'অরিয়েন্টালিজম'-এ বিন্যস্ত চিন্তাভাবনার পেছনে সাঈদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটু ভূমিকা আছে। তিনি লিখেছেন : *এ রচনায় আমার ব্যক্তিগত বিনিয়োগের বেশির ভাগই এসেছে দুটো ব্রিটিশ উপনিবেশে বেড়ে ওঠা শিশু হিসেবে 'অরিয়েন্টাল' হয়ে ওঠার সচেতনতা থেকে। ওই দুই উপনিবেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে আমার সকল পড়াশোনা পশ্চিমা ধাঁচের। এ সত্ত্বেও কম বয়সের ওই সুগভীর সচেতনতা অক্ষয় রয়ে গেছে। আমার এই অধ্যয়ন অনেক দিক থেকে প্রাচ্য বিষয়রূপী 'আমার' ওপর সেই সংস্কৃতির চিহ্নসমূহের তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস, যে সংস্কৃতির আধিপত্য সকল প্রাচ্যবাসীর জীবনে একটু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ কারণে আমার বেলায় মনোযোগের কেন্দ্র পরিণত হয়েছে ইসলামি প্রাচ্য* ('অরিয়েন্টালিজম', ১৯৯৫, ২৫)।

'অরিয়েন্টালিজম' এমন এক রচনা, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সম্পর্কবিষয়ক চিন্তার প্রেক্ষিত ও অভিমুখ চিরতরে পাল্টে দিয়েছে, অন্যদিকে, তার

স্রষ্টাকে পরিণত করেছে কিংবদন্তিতুল্য মানুষে। পশ্চিমের আধিপত্যবাদী জ্ঞান ও সংস্কৃতি যখন সারা পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন 'অরিয়েন্টালিজম' এক ধীরগতির বিস্ফোরণ, যা আক্রান্ত করেছে সেই আধিপত্যের মূল প্রক্রিয়া ও কৌশলসমূহকে। ইউরোপ ও আমেরিকান শক্তি প্রাচ্যের মানুষের মন, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক স্বভাবের ওপরও আধিপত্য করেছে, নিজেদের ইচ্ছেমতো রূপান্তরিত, বিকৃত ও পরিবর্তন করেছে তাদের মনোজগৎ এবং বাইরের ইমেজকে– তা জানার জন্য 'অরিয়েন্টালিজম'-এর বিকল্প নেই। সাঈদের দৃঢ় যুক্তিসহ বক্তব্য, তীক্ষ্ণ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, ক্ষমতা ও সংস্কৃতির সম্পর্ককে যথাযথভাবে শনাক্তকরণের সক্ষমতা 'অরিয়েন্টালিজম'কে পরিণত করেছে আধিপত্য ও সংস্কৃতির তাত্ত্বিক আলোচনার অনিবার্য আদর্শে।

৩

বিশ শতকে আধিপত্যের রাজনীতির সর্বগ্রাসী ছায়ায় আড়ষ্ট পৃথিবীতে বহুদিকগামী বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেছেন সাঈদ। একাধারে সাহিত্য সমালোচনা, সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, সংগীত, রাজনীতি–এ সমস্ত বিষয়েই লিখেছেন। কুড়িটিরও বেশি প্রকাশিত গ্রন্থে অভিব্যক্ত তাঁর ভাবনায় ক্ষমতা আধিপত্যের নানা দিকের প্রতিভাস মেলে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো : 'জোসেফ কনরাড অ্যান্ড দ্য ফিকশন অব অটোবায়োগ্রাফি'; বিগিনিংস; ইনটেশন অ্যান্ড মেথডস'; 'অরিয়েন্টালিজম'; 'রিঅ্যাকশন অ্যান্ড কাউন্টার রেভ্যুলিউশন ইন দ্য কনটেমপরারি আরব ওয়ার্ল্ড'; 'দ্য কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন'; 'লিটারেচার অ্যান্ড দ্য সোসাইটি'; 'কভারিং ইসলাম'; 'দ্য টেক্সট অ্যান্ড দ্য ক্রিটিক'; 'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'; 'ব্রেইমিং দ্য ভিকটিমস'; 'স্পারিয়াস স্কলারশিপ অ্যান্ড দ্য পালেস্টাইনিয়ান কোশ্চেন'; 'মিউজিক্যাল ইলাবোরেশনস'; 'কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম'; 'দ্য পিলিটিকস অব ডিসপজেশন'; 'দ্য স্ট্রাগল ফর প্যালেস্টাইনিয়ান সেলফ ডিটারমিনেশন'; 'রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল'; 'আউট অব প্লেস'; 'পিস অ্যান্ড ইটস ডিসকোন্টেটস' ও 'ক্রিটিসিজম বিটুইন কালচার অ্যান্ড সিস্টেম'; 'ফ্রম অসলো টু ইরাক অ্যান্ড দ্য রোডম্যাপ' ইত্যাদি। শেষোক্ত বইটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর, ২০০৪ সালে।

'জোসেফ কনরাড অ্যান্ড দ্য ফিকশন অব অটোবায়োগ্রাফি', 'দি ওয়ার্ল্ড', 'দ্য টেক্সট অ্যান্ড দ্য ক্রিটিক' এবং 'মিউজিক্যাল ইলাবোরেশন' ক্ষমতার রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষত সংশ্লিষ্ট নয়। অনেকগুলো সরাসরি ইসরাইলি দখলদারি এবং ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতাসংগ্রামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্যান্য গ্রন্থ এবং নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকারের মূল অভিপ্রায় আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি ও রাজনীতির আন্তরবিন্যাস।

প্রচলিত সাহিত্য সমালোচনার কার্যকারিতা এবং টেক্সটের পরিপ্রেক্ষিত-বিষয়ক প্রশ্নে সাঈদের গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'দি ওয়ার্ল্ড', 'দ্য টেক্সট অ্যান্ড দ্য ক্রিটিক' প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। এতে সাহিত্য সমালোচনায় অন্যতর চিন্তাভঙ্গির প্রস্তাবনা পণ্ডিতদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাঈদের মতে, টেক্সট বা রচনা গণসংশ্লিষ্ট একটি জিনিস। রচনাকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির ছাপ ধারণ করেও প্রচারের পর তা পাঠ, পাঠের অর্থ ও প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। তিনি পশ্চিমের উন্নাসিক টেকচুয়াল সমালোচনারীতির বিরোধিতা করে বলেন, এ হলো টেক্সটের ভেতরের রাজনীতি, আধিপত্য ও দমননীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবকে আলোচনার বাইরে রাখার একটি কৌশল। অতএব, টেক্সটকে পাঠ করতে হবে মানবজীবনের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত করে। গ্রন্থটিতে সুইফট ও কনরাডের ওপর তার নাতিদীর্ঘ আলোচনা লেখকদ্বয়ের সৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে নতুন ধরনের আলোকপাত করেছে। 'দি ওয়ার্ল্ড', 'দ্য টেক্সট অ্যান্ড দ্য ক্রিটিক' প্রচলিত সাহিত্য সমালোচনার রীতিনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, টেক্সটের সাথে মানবজীবনের অবিচ্ছিন্ন বাস্তবতার সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়তা করে। এবং প্রস্তাব করে সমালোচনার অপেক্ষাকৃত পরিপূর্ণ একটি ধরন।

১৯৮০ সালে প্রকাশিত 'দ্য কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন' আমাদের সময়ের সবচেয়ে তীব্র, রক্তক্ষয়ী আন্তর্জাতিক সংঘাতের রাজনীতির ওপর আলোকপাত। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে দেশচ্যুত, রাষ্ট্রচ্যুত ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার জীবন্ত চিত্র এ গ্রন্থটি। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি আজ ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। তাদের দেশ নেই, ভোট নেই, নাগরিক অধিকার নেই। সাঈদ প্রশ্ন রাখেন, এসব ফিলিস্তিনির দায় নেবে কে?

'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই' (১৯৮৬) সাঈদের তীব্র রাজনীতিসচেতন রচনা। মূলভাবগত অর্থে এটা 'দ্য কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন'-এরই বিস্তৃতি। একদিকে ফিলিস্তিন পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অনুপম বিশ্লেষণ, অন্যদিকে, ফিলিস্তিনের ওপর ফটোগ্রাফার জ্যাঁ মোর-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছবি মিলে 'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'কে দিয়েছে সমকালের দালিলিক স্পর্শ। এখানে সাঈদ খুঁজে দেখেছেন সমকালে একজন ফিলিস্তিনি হওয়ার অর্থ কী, একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাকে। সাঈদ বলেন, পশ্চিমে এমন একটি দিনও পার হয় না যেদিন ফিলিস্তিনিরা প্রধান প্রধান সংবাদে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কিন্তু প্রচারমাধ্যম তাদের যে ইমেজ সৃষ্টি করেছে, সাঈদ দেখান, তা খুনি, সন্ত্রাসী, অপহরণকারী অথবা সর্বহারা শরণার্থীর। ফিলিস্তিনিরা আজ পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমের ওই কৃত্রিম, জঘন্য রাজনৈতিক ইমেজে বন্দি।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে ফিলিস্তিনিরা কীভাবে তাদের দেশ হারিয়েছে, ঘরবাড়ি

হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে, সেই মর্মান্তিক বিবরণ দেন সাঈদ। এবং সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে দেখান ফিলিস্তিনিরা প্রবাসী ও উদ্বাস্তু ইমেজ প্রত্যাখ্যান করে এখন নতুন আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করেছে: সে পরিচয় প্রতিরোধের, আত্মত্যাগের, দৃঢ় চৈতন্যের সংগ্রামী এক জাতির, যারা ভবিষ্যতে এক উজ্জ্বল সময়ের স্বপ্ন দেখছে।

'দ্য পলিটিকস অব ডিসপজিশন: দ্য স্ট্রাগল ফর প্যালেস্টাইনিয়ান সেলফ ডিটারমিনেশন' (১৯৯৪) ফিলিস্তিন সমস্যার ওপর লিখিত প্রবন্ধের সংকলন। এতে ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত স্বাধীনতাসংগ্রামের ধারাবিবরণী তুলে ধরেছেন সাঈদ। ১৯৯৪ সালে ইসরাইলের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তিও আলোচনায় এসেছে, যাকে সাঈদ অন্যত্র অভিহিত করেছেন 'শান্তি প্রচেষ্টার সমাপ্তি' হিসেবে।

'কভারিং ইসলাম'-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ সালে। 'অরিয়েন্টালিজম' লিখে সাঈদ প্রাচ্যতাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীবৃত্তে ধস নামিয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন অসংখ্য বুদ্ধিবৃত্তিক শত্রু। 'কভারিং ইসলাম'-এ তিনি পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমের সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রদায়িক রূপটি উন্মোচন করেন। এর ফলে তিনি আর কখনো প্রচারমাধ্যমের সুনজরে আসতে পারেননি। তার ফলাফলও উল্লেখযোগ্য বৈষয়িক ক্ষতির কারণ হয়েছে। আমরা প্রচারমাধ্যমের বদৌলতে প্রায়শই চমস্কি বা দেরিদার বিশাল ছায়ার মুখোমুখি হই, অথচ সাঈদকে অত ভালো করে জানি না, যদিও আমাদের, অর্থাৎ প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর মানুষদের জন্যই নিবেদিত ছিল সাঈদের সারা জীবনের সৃষ্টিশীল তৎপরতা।

যাহোক, 'কভারিং ইসলাম'-এ সাঈদ প্রতিদিনের সংবাদ পরিবেশন, ফিচার, প্রবন্ধ নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার ঘেঁটে দেখান পশ্চিমের প্রচারমাধ্যম দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের খুনি, সন্ত্রাসী, অপহরণকারী হিসেবে চিত্রিত করে আসছে। ফিলিস্তিনি মুসলমানদের স্বাধীনতাসংগ্রামকে অথবা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে আত্মরক্ষার জন্য ইরানের যুদ্ধকৌশলকে ব্যাখ্যা করা হয় সন্ত্রাসী তৎপরতা বলে, কিন্তু আগ্রাসনের নিন্দা করা হয় না। এ হলো প্রচারমাধ্যমের ভাষ্য সৃষ্টির রাজনীতি। সাঈদ আমাদের পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমের এ তৎপরতা ও তার ভাষ্যের রাজনীতি সম্পর্কে সতর্ক করেন।

'রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল' (১৯৯৪) সাঈদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা। সারা পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ যখন তথ্য ব্যবসায় জড়িত অথবা সংশ্লিষ্ট, তখন বুদ্ধিজীবী পরিভাষাটি কী অর্থ বহন করে, কারা বুদ্ধিজীবী, কী তার চারিত্র্য, কী তার দায়িত্ব—এসব প্রশ্নের জবাব সন্ধান করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। এ

প্রসঙ্গে সাঈদ বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে প্রচলিত মতামত তুলে ধরেন। ইতালীয় বামপন্থী এন্টনিও গ্রামসি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ঋণপরামর্শক–সকলকেই বুদ্ধিজীবী বলে অভিহিত করেছেন, যাদের কাজ হলো ক্ষমতামুখী প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের পক্ষে বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজস্ব স্বার্থ অর্জন। অন্যদিকে ফরাসি জুলিয়ান বেন্ডা প্রমুখের সংজ্ঞানুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের সমাজের সংখ্যালঘু, মহৎ হৃদয় মানুষ বলে মনে করা হয়, যার দায়িত্ব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। বুদ্ধিজীবীর পরিচয় প্রসঙ্গে সাঈদ প্রথাগত মতামত এবং বামপন্থী চিন্তাধারার মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেও জুলিয়ান বেন্ডার মতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। সাঈদের মতে, বুদ্ধিজীবীর মেধা, সততা, দায়িত্ববোধ তাকে অন্য মানুষদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। বুদ্ধিজীবী তাই নিঃসঙ্গ মানুষ। *"বুদ্ধিজীবী... পরবাসী, সংখ্যালঘু, অপেশাদার–এমন এক ভাষার অধিকারী, যা ক্ষমতার মুখের ওপর সত্য উচ্চারণ করে"* (রিপ্রেজেন্টেশন..., ১৯৯৬, xviii)। সাঈদ মনে করেন, পরিচ্ছন্ন মানবিক বোধ, অবিচ্ছিন্ন সততা, চিন্তার তীব্রতা এবং সজাগ চৈতন্য–এ হলো বুদ্ধিজীবীর আজন্ম সম্বল। 'রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল' আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ 'ফ্রম অসলো টু ইরাক অ্যান্ড দ্য রোডম্যাপ' (২০০৪)-এ সংকলিত ৪৬টি অসাধারণ নিবন্ধে সাঈদ মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আমেরিকা ও ইসরাইলের তৎপরতা সম্পর্কে এমন সব তথ্য প্রকাশ করেছেন, যেগুলো কোনো দিন মার্কিন প্রচারমাধ্যমের মুখ দেখেনি।

এডওয়ার্ড সাঈদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'একটি কাজের একটি হলো 'কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম' (১৯৯৩)। এ গ্রন্থে সাঈদের চিন্তা প্রথা ও চর্চার সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমের সংস্কৃতির এমন এক দিক উন্মোচিত করে, যার সাথে সম্পর্কিত আধিপত্য, দমন ও ক্ষমতার রাজনীতি। ইউরোপীয় এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমের সংস্কৃতির ইতিহাসের অনেক পেছনেও আধিপত্যবাদী চিন্তাভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

সাঈদ পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদের বীজ শনাক্ত করার জন্য বেছে নেন সংস্কৃতির একটি ক্ষেত্র–সাহিত্য। জেন অস্টিন থেকে সালমান রুশদি, ইয়েটস থেকে প্রচারমাধ্যমের তৎপরতাও তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের আওতায় আসে। 'অরিয়েন্টালিজম'-এ তার পর্যবেক্ষণ সীমিত ছিল মধ্যপ্রাচ্যে।

'কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম'-এ তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করে দেন পৃথিবীর সকল প্রাক্তন উপনিবেশে, যেখানে ঔপনিবেশিক শক্তি কখনো-না-কখনো তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়েছিল। এর মধ্যে আছে আফ্রিকা, পাক-ভারত উপমহাদেশ, দূরপ্রাচ্যের অংশবিশেষ, অস্ট্রেলিয়া, ক্যারিবীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ।

এসব দেশে বসে অথবা তার অভিজ্ঞতা নিয়ে সাম্রাজ্যের গর্বিত নাগরিক সমকালীন লেখকগণ যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাঈদের আলোচনার লক্ষ্য সেই সব সৃষ্টি।

ওই সব সাহিত্যিক রচনায় দুটো বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেন তিনি: প্রথমত, ওগুলোয় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীকে দেখা হয়েছে মানসিকতার একক একটি ছাঁচে। যেমন ওই সব লেখায় পাওয়া যায় 'ভারতীয় মন' 'ক্যারিবীয় নারীচরিত্র' বা 'আফ্রিকান স্বভাব', 'জ্যামাইকান আচরণ' ইত্যাদি পরিভাষা ও ধারণা। এর অর্থ হলো, ওই লেখকের কাছে সকল ভারতীয়'র মন একই রকম, সকল ক্যারিবীয় নারীর চরিত্র এক, আফ্রিকান মানবগোষ্ঠী বুঝি বা যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে স্বভাবের একটিমাত্র আদর্শ নিয়ে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ওই সব লেখকের প্রত্যেকের রচনায় সাম্রাজ্য বিস্তার, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। নমুনা হিসেবে জোসেফ কনরাডের 'হার্ট অব ডার্কনেস'-এর কথা ধরা যায় (ইয়ুথ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ, ১৯০২)। কাহিনির কেন্দ্রে আছে পশ্চিমের সভ্যতার ছোঁয়াবিহীন আফ্রিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল। বক্তা মার্লো যদিও মুখে সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করেন কিন্তু তাঁর মনোভাব ঘুরেফিরে যুক্তির জাল বোনে আফ্রিকার স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধেই। সাঈদ তাই মন্তব্য করেন, কনরাড আমাদের দেখাতে চান (সাদা মানুষ) কুর্দজের লুটের অভিযান, নদীপথে মার্লোর ভ্রমণ এবং গোটা কাহিনিটিই কীভাবে এই একটিমাত্র মূলভাব সমর্থন করে যে, ইউরোপীয়রা দক্ষ হাতে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে (আফ্রিকায়) তা অব্যাহতও রাখবে। (কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম, ১৯৯৩,২৫)।

সাঈদ আরো কয়েক যুগ পেছনে গিয়ে চার্লস ডিকেন্সের 'দুম্বে অ্যান্ড সন্স' (১৯৪৮) থেকেও উদাহরণ দেন। ওই গ্রন্থে দেখা যায়, দুম্বে তার নবজাত সন্তানের জন্য কামনা করছে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যিক আধিপত্য, যা আসলে ঔপনিবেশিক আধিপত্যেরই একটি রূপ (পূর্বোক্ত, ১৩)। একইভাবে সাঈদ ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা চিহ্নিত করেন জর্জ এলিয়ট, রুডইয়ার্ড কিপলিং, জেন অস্টিন, আলবেয়ার ক্যামুসহ অনেকের রচনায়।

চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত 'কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম'-এর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে বিরোধ ও প্রতিরোধাত্মক সংস্কৃতির উত্থান। বিশ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশক থেকেই সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিপরীতে প্রতিরোধাত্মক সাহিত্যের সূচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সকল উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ক্রমে সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস দেখা দেয় সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃ-তত্ত্বসহ মানববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। সূচনাপর্বে

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর লেখকদের মধ্যেও বিপরীত সংস্কৃতির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। ক্রমে বিকশিত হয় প্রতিরোধের তীব্র ভাষা।

এডওয়ার্ড সাঈদের তীক্ষ্ণ-তীব্র চিন্তনভঙ্গি, নিরপেক্ষ ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, ভাষার কৌশলী ব্যবহার 'কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম'কে ধ্রুপদ রচনার মর্যাদা এনে দিয়েছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা ও দমননীতির সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করতে হলে এখন আর 'অরিয়েন্টালিজম' ও 'কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম'কে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে পশ্চিমের উপনিবেশগুলোর বুদ্ধিবৃত্তি, পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাবনের ফলেই আধুনিকতার নেতিবাদী বৃত্তে ঘুরপাক খেয়েছে দীর্ঘদিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্যারিসে প্রথমে কাঠামোবাদী আন্দোলন, পরে উত্তর কাঠামোবাদ নতুন চিন্তাভঙ্গি হিসেবে বিপুল আলোড়ন তোলে। উত্তরাধুনিকতা পাশ্চাত্যের চিন্তাভাবনার ফসল; ওখানেই ষাট, সত্তর ও আশির দশকে এই নতুন চিন্তারীতির বিভিন্ন দিগগামী বিস্তার আমরা লক্ষ করি।

এ সময় ফরাসি চিন্তাবিদ মিশেল ফুকো ইউরোপীয় চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলেন, সন্দেহ প্রকাশ করেন এনলাইটমেন্ট ও পশ্চিমা মানবতাবাদের যথার্থ বিষয়ে। দেরিদা ভাষায় দ্যোতকের খেলার উল্লেখ করে টেক্সটকে প্রায় সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বেচ্ছাচারী অর্থ সঞ্চারের তত্ত্ব দেন; এর ফলে পরিপার্শ্বের রাজনীতি থেকে টেক্সটকে আলাদা করে ফেলার সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

উত্তরাধুনিক চিন্তাভাবনার এই জাগরণকালে পশ্চিমের ওই সব মত ও পথ এড়িয়ে প্রাচ্যের মানুষ এডওয়ার্ড সাঈদ ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সাংস্কৃতিক রূপটি পরীক্ষণে মনোনিবেশ করে সূচিত করেন উত্তর উপনিবেশবাদী ভাবনাপ্রক্রিয়ার। আলজেরিয়ায় ফরাসি উপনিবেশের বিরোধিতা করতে গিয়ে ফ্রান্‌জ ফানো ঔপনিবেশিক শক্তি ও উপনিবেশ সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন আরো আগে, তবে সাঈদের মাধ্যমেই তা তত্ত্বের সুষম গঠন ও প্রয়োজনীয় কৌশল অর্জন করে। উপনিবেশিত মানবগোষ্ঠীর মনোজগত দমন ও আধিপত্যের বিশ্লেষণে তিনি শনাক্ত করেন প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্সকে। 'অরিয়েন্টালিজম' এবং 'কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অনুন্নত বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে যে অভাবনীয় পরিবর্তন সূচিত হয়, তাকে প্রায় পুনর্জাগরণ আখ্যায়িত করা যেতে পারে। আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও ভারতে 'অরিয়েন্টালিজম'-এর চিন্তাসূত্রের অনুষঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজও হয়েছে।

এখন প্রাচ্যতত্ত্ব কেবল প্রাচ্যে পশ্চিমা আধিপত্যের ব্যাখ্যা নয়, তা একটি ভাবনাভঙ্গিও, যা প্রয়োগ করা হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ঔপনিবেশিক ও

সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিশ্লেষণে। যেকোনো সাংস্কৃতিক আধিপত্য/প্রভাবন/বিকৃতি সাঈদের তত্ত্বে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। প্রাচ্যের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোয় উত্তর ঔপনিবেশিক চিন্তাধারাই এখন প্রবল, যা আত্মানুসন্ধানী, ঐতিহ্যমুখী, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভিত্তির খোঁজে অবিরাম প্রশ্নমুখর। পশ্চিমের আধিপত্যে সূচিত ও ব্যাখ্যাত উত্তরাধুনিক ভাবনারীতির অন্য পিঠে এই নতুন দিগন্তের সূচনা সাঈদের এক বিরল অবদান।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ ছিলেন পণ্ডিত, নন্দনতাত্ত্বিক ও সমালোচকের এক বিরল ও মেধাবী সংশ্লেষ। সাংস্কৃতিক আত্মানুসন্ধানে নিয়ত উন্মুখ নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি প্রেরণা ও আদর্শ। সাঈদ পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে গেছেন।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কাছে তিনি কোনো দায় অনুভব করেননি, তাঁর দায় ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক চৈতন্যের নিকট, যা তিনি নিজেই চিহ্নিত করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি দেশগুলোর জনগোষ্ঠীর পক্ষে কথা বলার কারণে তাঁকে কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। তবু মানবতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর ছিল দৃঢ় ও সক্রিয় ভূমিকা। প্রথা ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী, ক্ষমতাবিরোধী এমন সৃষ্টিশীল মানুষের জন্য নোবেল পুরস্কার অপেক্ষা করার কথা নয়। তার প্রয়োজনও ছিল না। এডওয়ার্ড সাঈদ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে গেছেন আমাদের চৈতন্যকে, যেমন বলেছেন এ সময়ের আরেক বেপরোয়া, মেধাবী বুদ্ধিজীবী আব্রাম নোয়াম চমস্কি– "*তিনি (সাঈদ) আমাদের এটি বুঝতে সহায়তা করেন যে আমরা কে, ক্ষমতার দাস না হয়ে নৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে বাঁচার জন্যে আমাদের কী করা উচিত।*"

৪.

১৯৯০ সালে প্রথমবারের মতো 'অরিয়েন্টালিজম' পাঠ করার সুযোগ হয় আমার। তখন সাঈদ আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছেন। তথ্য জড়োকরণ, বিন্যস্ত করা এবং সেগুলো বিশ্লেষণের অসাধারণ ক্ষমতা সাঈদ ও 'অরিয়েন্টালিজম' সম্পর্কে আমাকে বিশেষ আগ্রহী করে তোলে। 'অরিয়েন্টালিজম'-এর ভেতরে প্রবেশ করে এ-সম্পর্কিত অনেক প্রাক ধারণা বদলে যায়। গ্রন্থটিকে আর মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আগ্রাসনের বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ বলে মনে হয় না, আমার কাছে তার তাত্ত্বিক দিকটি আরো গুরুত্বপূর্ণ বলে বোধ হয়, যা প্রয়োগ করা চলে পৃথিবীর যেকোনো সময়ের যেকোনো অঞ্চলে সংঘটিত সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিশ্লেষণে।

দ্বিতীয়ত, সাঈদ বহুকথিত ও প্রচারিত উত্তরাধুনিক অন্যান্য প্রবণতার পাশাপাশি

উত্তর উপনিবেশবাদ ও মিশ্র সংস্কৃতিবাদের ব্যাপক প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দেন এ গ্রন্থে, তার আভাসও আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এ সময় আমাদের সাহিত্যে ইউরোপের সাহিত্য, বিশেষত ইংরেজি ভাষার লেখাজোকা-সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ মর্যাদারও প্রতীক হয়ে ওঠে, যার পেছনে প্রাচ্যতত্ত্বের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এবং তার পরিণামস্বরূপ আমাদের হীনম্মন্যতার বোধ দুর্লক্ষণীয় নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'অরিয়েন্টালিজম'কে বাংলা ভাষার একটি অনিবার্য টেক্সট বলে মনে হয় আমার। তখনই গ্রন্থটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

১৯৯২ সালের প্রথমার্ধে ভূমিকার বড় একটা অংশের অনুবাদ সম্পন্ন হয়। এর পরই তা বন্ধ হয়ে যায়, প্রধানত প্রকাশের সুযোগের অভাবে। এ সময় এবং পরে আরো কয়েকজন বইটির ভূমিকার অংশবিশেষ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে কোনো অজ্ঞাত কারণে আর অগ্রসর হয়নি। কিন্তু আমার মন থেকে পরিকল্পনাটি বাদ পড়ে না।

এর মধ্যে প্রায় এক যুগ ধরে প্রতিবছরই মনে হয়েছে, এবার হয়তো বইটির অনুবাদ বেরোবে, সে ক্ষেত্রে আমার অক্ষমতার দায়মোচন ঘটে। কিন্তু তা হয়নি। গত বছর এক সাহিত্যিক আড্ডায় লেখক ইশরাত ফেরদৌসী (চুন্নু) ও র‍্যামনের স্বত্বাধিকারী সৈয়দ রহমত উল্লাহ (রাজন) 'অরিয়েন্টালিজম'-এর ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ দেখান এবং আমাকে এর অনুবাদ করার অনুরোধ জানান। এ দুজন এবং প্রাবন্ধিক আবদেল মান্নান, তরুণ কথাসাহিত্যিক ফকরুল চৌধুরী, সাহিত্যিক বন্ধু বিধান মিত্র প্রমুখের উৎসাহ-তাগাদায় কাজে হাত দিই। তবু 'অরিয়েন্টালিজম' অনুবাদ শেষ হয়েছে এবং গ্রন্থাকারে বেরোচ্ছে, এটি আমার কাছে এখনো অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার!

অনুবাদে সবচেয়ে বেশি সময় দিতে হয়েছে পরিভাষার পেছনে। বিভিন্ন পরিভাষার সমার্থক শব্দ যে বাংলায় নেই, তাই-ই একমাত্র সমস্যা নয়; এর চেয়ে বড় সমস্যা বহু পরিভাষার সাথে জড়িত ধারণা/মতাদর্শ/অর্থ আমাদের চিন্তাধারায় অচেনা–অদ্ভুতই হয়তো। এর ফলে পরিভাষা তৈরির চেয়ে নতুন ধারণাটি বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করাটাই অনেক সময় বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অরিয়েন্টালিজম' পরিভাষাটির কথাই ধরা যাক। সাঈদ-এ এই শব্দটির ব্যবহার কয়েকমাত্রিক, ভূমিকায় তা স্পষ্ট বলাও আছে। শাব্দিক দিক বিবেচনায় রাখলে এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে নেওয়া উচিত প্রাচ্যবাদকে। শুরুতে আমি তা-ই করি। তখন ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশের তাগিদে এ নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনার সুযোগ পাইনি। পরে উপলব্ধি করি, মার্ক্সবাদ, লেলিনবাদ, মাওবাদ, মৌলবাদ শব্দগুলোর বাদ শব্দাংশ এমন এক রাজনৈতিক মার্কায় চিহ্নিত হয়েছে যে, প্রাচ্যবাদের অর্থবিভ্রান্তির সমূহ ঝুঁকি থেকে যায়। কলকাতায় বার্ণিক রায় লিখেছেন 'প্রাচ্যবিদ্যা'। বাংলায় নানা রকম বিদ্যার ছড়াছড়ি। আমি সাদৃশ্যনির্ভর বিভ্রান্তির আশঙ্কায় এ অনুবাদও গ্রহণ করতে পারিনি। তা ছাড়া 'অরিয়েন্টাল স্টাডিজ' বলে যে বিষয়টি

প্রচলিত রয়েছে, তার অনুবাদ প্রাচ্যবিদ্যা হলে সংগত হয় বলে 'অরিয়েন্টালিজম'-এর জন্য 'প্রাচ্যবিদ্যা' পরিভাষাটির ব্যবহার উচিত নয় মনে হয়। আবার সাঈদ 'অরিয়েন্টালিজম'-এর পারিভাষিক যে আওতা নির্দেশ করেন, তা-ও বিদ্যার সমার্থক বলে মনে হয় না। তিনি তাঁর 'অরিয়েন্টালিজম'কে বলেছেন একটি ডিসকোর্স। তাই 'অরিয়েন্টালিজম' কোনো বাদ বা তন্ত্র, কিংবা বিদ্যা নয়। সব দিক বিবেচনা করে আমি 'প্রাচ্যতত্ত্ব' কথাটি ব্যবহার করেছি এই আশায় যে ইউরোপ ও আমেরিকায় যদি 'অরিয়েন্টালিজম'-এ নতুন অর্থ সঞ্চারিত হয়ে থাকে, তবে বাংলায় 'অরিয়েন্টালিজম'-এর জন্য 'প্রাচ্যতত্ত্ব' কথাটির ব্যবহার পরিচিত করে তুললে সমস্যার স্থায়ী সমাধান অর্জন সম্ভব।

অনুবাদের প্রয়োজনে বহু নতুন পরিভাষা তৈরি করতে হয়েছে, প্রচলিত পরিভাষা ও শব্দের অর্থ প্রসারণের প্রয়াসও আছে। এর পরও কিছু ইংরেজি ও ফরাসি শব্দ অবিকল ব্যবহার করতে হয়েছে। পরবর্তী মুদ্রণে এসব অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছে থাকল। এ ছাড়া অপ্রচলিত বাক্য-কাঠামো ব্যবহার করেছি অনেক, মূল রচনার বাক্‌রীতি অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টায়।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ, জটিল, বিশালাকার তাত্ত্বিক রচনা ভাষান্তরের জন্য যে সময় প্রয়োজন, তা আমি দিতে পারিনি। অনূদিত গ্রন্থের কলেবরের কথা মাথায় থাকায় কয়েকটি অধ্যায়ের বর্ণনামূলক অংশে চাপ প্রয়োগ করে সংকুচিত করার ঝোঁক এড়াতে পারিনি। এ অন্যায় হস্তক্ষেপের জন্য এখন অনুশোচনাই করতে পারি কেবল। বিভিন্ন পরিভাষা, নতুন সাহিত্যিক, নন্দনতাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণাসমূহ যথাযথভাবে বাংলায় সঞ্চারিত করার কাজটিও বিপুল সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। মূল গ্রন্থে দুই হাতে ফরাসি শব্দ এবং ইংরেজি ছাড়াও অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ, পরিভাষা ও বাগ্বিধি ব্যবহার করেছেন লেখক। ওগুলোর উচ্চারণ এবং বাংলায় শুদ্ধ বানানে লেখার জন্য কোনো ফরাসি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ জরুরি ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে তা সম্ভব হয়নি। তাই বাংলায় তাদের উচ্চারণ ও বানান যথাযথ হয়েছে কি না, সে সন্দেহ ঘোচেনি। যোগ করতে পারিনি নির্ঘণ্ট। প্রুফ রিডিংয়ে কয়েকজনের হাত পড়ায় এ বিষয়েও অবিশ্বাস! অবশ্য কত দূর করতে পেরেছি, তা আমার পক্ষে এ মুহূর্তে বোঝা সম্ভব নয়; এ ক্ষেত্রে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ঢাকা : পৌষ ১৪১১ বঙ্গাব্দ

ওরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।
অবশ্যই ওদের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।

দি এইটিনথ ব্রুমেইর অব লুইস বোনাপার্ট

–কার্ল মার্ক্স

পুব হলো উন্নতির এক পেশা

ট্যাঙ্কেড

–বেনজামিন ডিজরাইলি

ভূমিকা

এক

১৯৭৫-৭৬ সালের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধকালীন বৈরুত সফররত জনৈক ফরাসি সাংবাদিক ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরোনো শহর দেখে দুঃখ করে লেখেন, 'একবার মনে হয়েছিল এটি...শ্যাতেব্রোঁ ও নেরভালের প্রাচ্যেরই অংশ।'[১]

জায়গাটা সম্পর্কে তার ধারণা সঠিক, বিশেষত একজন ইউরোপীয়র যতটা সঠিক হওয়া দরকার। প্রাচ্য তো অনেকটা ইউরোপেরই উদ্ভাবন: সেই প্রাচীনকাল থেকে রোমান্স, আশ্চর্য সব প্রাণী, মন উতল করা স্মৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি আর অন্য রকম অভিজ্ঞতার দেশ। এখন তা হারিয়ে যাচ্ছে, এক অর্থে হারিয়ে গেছে; তার দিন শেষ। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় প্রাচ্যবাসীদের নিজস্ব কিছু যে হারিয়ে যেতে বসেছে, এমনকি শ্যাতেব্রোঁ ও নেরভালের যুগেও ওরাই যে এখানে বাস করেছে এবং এখন যে প্রাচ্যের মানুষগুলোই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে, তা হয়তো ফরাসি সাংবাদিকের কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি। একজন ইউরোপীয় পর্যটকের কাছে প্রধান ব্যাপার হলো প্রাচ্য ও তার সমকালীন পরিণতিকে ইউরোপের মনমতো তুলে ধরা। দুটো বিষয়ই ফরাসি সাংবাদিক ও তার পাঠকদের কাছে সুবিধাজনক সম্প্রদায়গত গুরুত্ব বহন করে।

প্রাচ্য সম্পর্কে আমেরিকানদের অনুভূতি ঠিক ওরকম হবে না। তাদের কাছে প্রাচ্যের অনুষঙ্গ, সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে, দূরপ্রাচ্যের (বিশেষত জাপান ও চীনের) সাথে সম্পর্কিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্রাচ্য একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে ইউরোপীয়-পশ্চিমা অভিজ্ঞতায়। সে অভিজ্ঞতার আলোকে চিত্রিত হয়েছে যে প্রাচ্য সেই প্রাচ্যের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনের কৌশলকে আমি বলছি *অরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব*। আমেরিকানদের নেই, তবে *অরিয়েন্টালিজমের* দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে ফরাসি ও ব্রিটিশদের; জার্মান, রুশ, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ইতালীয় ও সুইসরা স্বল্প হলেও সে ঐতিহ্যের অধিকারী।

প্রাচ্য ইউরোপের সংলগ্নই নয় কেবল, তার সবচেয়ে পুরোনো, সবচেয়ে সম্পদময় বড় বড় উপনিবেশের অঞ্চলও বটে। প্রাচ্য ইউরোপের সভ্যতা ও ভাষাসমূহের

উৎসস্থল, তার সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। এবং অন্য (আদার)-এর সবচেয়ে গভীর ও পৌনঃপুনিক চিত্রকল্পও। তা ছাড়া প্রাচ্য আছে বলেই ইউরোপ (বা পশ্চিম)-কে প্রাচ্যের তুলনায় বিপরীত চিত্র, মতাদর্শ, ব্যক্তিত্বে বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও প্রাচ্যের কোনো কিছু নিছক কল্পনা নয়। প্রাচ্য বস্তুনির্ভর ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচ্যতত্ত্ব আলোচনার একটি ধরন হিসেবে সহায়ক প্রতিষ্ঠান, পরিভাষা, পাণ্ডিত্য, চিত্রকল্প, তত্ত্বমালা এমনকি ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র ও রীতির সহায়তায় সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শিকভাবে সেই অংশটিকে বর্ণনা করে এবং প্রতিনিধিত্ব করে।

অন্যদিকে, প্রাচ্য সম্পর্কে আমেরিকানদের উপলব্ধি ততটা গাঢ় নয়, যদিও জাপান, কোরিয়া ও ইন্দোচীনে সাম্প্রতিক মার্কিন অভিযানসমূহ আমাদের মধ্যে আরো সুচিন্তিত ও বাস্তবমুখী 'প্রাচ্য'-সচেতনতা জাগ্রত করা উচিত ছিল। তা ছাড়া নিকট প্রাচ্যে (মধ্যপ্রাচ্যে) আমেরিকার ব্যাপক ভূমিকা প্রাচ্য বিষয়ে আমাদের বিরাট উপলব্ধি দাবি করে।

পাঠকদের পরিষ্কার উপলব্ধি হবে (এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আরো পরিষ্কার হবে) যে, *অরিয়েন্টালিজম* বা প্রাচ্যতত্ত্ব বলতে আমি বেশ কিছু বিষয় বুঝিয়েছি, যেগুলো, আমার মতে, একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে প্রাচ্যতত্ত্বের একাডেমিক সংজ্ঞাটি প্রশ্নাতীতভাবে গৃহীত। এখনো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে এ লেবেলটিই চলছে। যিনি সামগ্রিকভাবে প্রাচ্য সম্পর্কে অথবা এর বিশেষায়িত কোনো অংশ সম্পর্কে শিক্ষা দেন, লেখালেখি করেন বা গবেষণা করেন তিনি– নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী যে-ই হোন না কেন, তিনি অরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যতাত্ত্বিক এবং তিনি যা করছেন তা-ই *অরিয়েন্টালিজম* বা প্রাচ্যতত্ত্ব।

স্বীকার্য যে, *অরিয়েন্টাল স্টাডিজ* (প্রাচ্যবিদ্যা), *এরিয়া স্টাডিজ* (অঞ্চল অধ্যয়ন) পরিভাষাগুলোর তুলনায় প্রাচ্যতত্ত্ব কথাটি ব্যবহারে বিশেষজ্ঞদের আগ্রহ কম। এর দুটো কারণ : এ পরিভাষাটি কিছুটা অস্পষ্ট ও খুব বেশি সামগ্রিক এবং এটা আরেক অর্থে উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের কর্তৃত্বপরায়ণ ইউরোপীয় নির্বাহীদের মনোভাবও বোঝায়। এ সত্ত্বেও 'প্রাচ্য' নিয়ে বইপত্র লেখা হচ্ছে, প্রাচ্যবিষয়ক পণ্ডিতি নিয়ে নতুন বা পুরোনো সাজে তৎপর প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সেমিনার অনুষ্ঠান চলছে। মোট কথা, প্রাচ্যতত্ত্ব আগের মতো করে টিকতে না পারা সত্ত্বেও প্রাচ্য ও প্রাচ্যবিষয়ক অভিসন্দর্ভ ও মতবাদের মধ্য দিয়ে একাডেমিকভাবে তা প্রচলিত রয়েছে।

প্রাচ্যতত্ত্বের একটি সাধারণ অর্থ জড়িয়ে আছে ঐ প্রাতিষ্ঠানিক ধারার সাথে, যার সৌভাগ্য, স্থানান্তর, বিশেষায়ণ ও সঞ্চারণ আমার অধ্যয়নের আংশিক লক্ষ্য। প্রাচ্যতত্ত্ব 'প্রাচ্য' এবং (প্রায় ক্ষেত্রে) 'পাশ্চাত্যে'র মধ্যে তত্ত্ববিদ্যাগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক

পার্থক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক ভাবনারীতি। এভাবে প্রাচ্য ও তার মানুষজন, আচার-প্রথা, মন, নিয়তি ইত্যাদি সম্পর্কে তত্ত্ব, মহাকাব্য, উপন্যাস, সামাজিক বর্ণনা ও রাজনৈতিক বিবরণ রচনার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৌলিক পার্থক্যকে প্রারম্ভ বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, রাজনীতিতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ ও ঔপনিবেশিক প্রশাসকসহ বিশাল এক লেখকগোষ্ঠী। এস্কিলাস বা ভিক্টর হুগো, দান্তে ও কার্ল মার্ক্সকেও এ প্রাচ্যতত্ত্বের আওতায় বিবেচনা করা সম্ভব। এমন ব্যাপক বিস্তার নিয়ে ব্যাখ্যাত একটি বিষয়ে যেসব পদ্ধতিগত সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে ভূমিকার পরবর্তী অংশে।

প্রাচ্যতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক ও কম-বেশি কাল্পনিক অর্থের মধ্যে পারস্পরিক গ্রহণ চলছে নিয়মিত। আঠারো শতকের শেষদিক থেকে সুশৃঙ্খল, হয়তো বিধিবদ্ধভাবেও আদান-প্রদান চলেছে এ দুয়ের মধ্যে। এখানে আমি প্রাচ্যতত্ত্বের তৃতীয় অর্থে উপনীত হচ্ছি যা আগের দুটি সংজ্ঞার তুলনায় অধিকতর ইতিহাসনির্ভর ও বাস্তবমুখী।

মোটামুটি হিসেবে আঠারো শতকের শেষাংশকে প্রারম্ভকাল ধরে প্রাচ্যতত্ত্বকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা যায় প্রাচ্য সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান, প্রাচ্যের মতামত অনুমোদন, প্রাচ্যকে বর্ণনা করা ও শিক্ষা প্রদান, প্রাচ্যকে শান্ত রাখা ও শাসন করার জন্য একীভূত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে; সংক্ষেপে প্রাচ্যের ওপর আধিপত্য করা, প্রাচ্যকে পুনর্গঠিত করা এবং প্রাচ্যের ওপর কর্তৃত্বকরণের পশ্চিমা পদ্ধতিরূপে।

এখানে প্রাচ্যতত্ত্বকে যথাযথভাবে নির্দেশ করতে মিশেল ফুকোর *ডিসকোর্স*-এর ধারণাটি বেশ কার্যোপযোগী বলে মনে হয় আমার। ফুকো তার *আর্কেওলজি অব নলেজ* এবং *ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ* গ্রন্থে ডিসকোর্স নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমার বক্তব্য হলো, প্রাচ্যতত্ত্বকে একটি ডিসকোর্স হিসেবে পরীক্ষা না করলে কারো পক্ষে এরকম বিশাল, পদ্ধতিগত একটি বিষয়কে বোঝা সম্ভব হবে না, যার সাহায্যে উত্তর-আলোকপর্বীয় যুগে ইউরোপীয় সংস্কৃতি রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, সামরিক, ভাবাদর্শিক বৈজ্ঞানিক এবং কাল্পনিকভাবে প্রাচ্যকে পরিচালনা এমনকি পুনঃ উৎপাদন পর্যন্ত করেছে। তা ছাড়া প্রাচ্যতত্ত্ব এমন এক কর্তৃত্বপরায়ণ অবস্থান অর্জন করেছে যে, চিন্তায় ও কর্মে প্রাচ্যতত্ত্বের আরোপিত নিয়ন্ত্রণ মান্য না করে কারো পক্ষে এ বিষয়ে কিছু লেখা, চিন্তা করা বা তৎপরতা পরিচালনা অসম্ভব। মোদ্দা কথা, প্রাচ্যতত্ত্বের কারণে *প্রাচ্য* চিন্তা বা তৎপরতার জন্য মুক্ত বিষয় ছিল না (ও নেই)।

এর অর্থ এই নয় যে, প্রাচ্য সম্পর্কে কী বলতে হবে, তা কেবল প্রাচ্যতত্ত্বই এককভাবে ঠিক করে দেবে। বরং এর অর্থ হলো, প্রাচ্য নামের এই অদ্ভুত বিষয়টা যখনই আলোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়, তখনই তাতে আরোপিত হয় (এবং ফলত জড়িত থেকে যায়) একগুচ্ছ স্বার্থের গোটা একটি নেটওয়ার্ক। কীভাবে তা ঘটে তা

দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। এ ছাড়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতি কীভাবে প্রাচ্যের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে তার বিকল্প, এমনকি, গোপন অহং হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও শক্তি অর্জন করেছে, তা-ও দেখানোর প্রয়াস আছে।

প্রাচ্যে ফরাসি, ব্রিটিশ ভূমিকা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আমেরিকার উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য ইউরোপীয় ও আটলান্টিক শক্তির ভূমিকার মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য আছে। অতএব, প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলার অর্থ হলো সাধারণভাবে (বিশেষভাবে নয় যদিও) একটি ব্রিটিশ ও ফরাসি সাংস্কৃতিক উদ্যোগ বা প্রকল্প সম্পর্কে কথা বলা। সে প্রকল্পটি, মূল পরিকল্পনার মতোই, বেপরোয়াভাবে যে বিরাট বিস্তৃতি গ্রহণ করেছে তাতে আছে সমগ্র ভারত ও লেভান্ত, মূল বাইবেল ও তাতে উল্লেখিত অঞ্চল, মসলা ব্যবসা, ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনী ও প্রশাসকদের দীর্ঘ ঐতিহ্য, ভয়ংকর এক পণ্ডিতসমাজ, অসংখ্য প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ ও প্রাচ্য-কর্মী, প্রাচ্য-বিশারদ অধ্যাপকগোষ্ঠী, একগুচ্ছ প্রাচ্যদেশীয় ধারনার জটিল বিন্যাস (যেমন, প্রাচ্যদেশীয় জাঁকজমক, প্রাচ্যদেশীয় নিষ্ঠুরতা, প্রাচ্যদেশীয় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ইত্যাদি) বহু প্রাচ্য সম্প্রদায়, দর্শন এবং স্থানীয় ইউরোপীয়দের ব্যবহার-উপযোগী করে পরিবর্তিত প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান– তালিকাটি অনিঃশেষ বড় করা যেতে পারে। মূল কথা হলো, ফ্রান্স ও ব্রিটেন এবং প্রাচ্যের এক বিশেষ ধরনের ঘনিষ্ঠতার উপলব্ধি থেকে প্রাচ্যতত্ত্বের উৎপত্তি। এবং উনিশ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত প্রাচ্য বলতে বোঝাত ভারত ও বাইবেলের দেশকে। উনিশ শতকের শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রাচ্য ও প্রাচ্যতত্ত্বের ওপর কর্তৃত্ব করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকানরা নিয়ন্ত্রণ করছে প্রাচ্যকে এবং ব্রিটিশ ও ফরাসিদের মতোই আচরণ করছে প্রাচ্যের সাথে। এই ঘনিষ্ঠতা খুবই উৎপাদনমুখী, যদিও তা বরাবরই প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্যের (ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও আমেরিকার) শক্তিমত্তার আধিক্য প্রদর্শন করেছে। এই ঘনিষ্ঠতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে একগুচ্ছ রচনা– আমি যেগুলোকে বলছি 'প্রাচ্যতাত্ত্বিক'।

এই সঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, প্রচুর গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করা সত্ত্বেও আরো বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে পাঠ-তালিকার বাইরে রাখতে হয়েছে। প্রাচ্যের ওপর লেখা একগাদা রচনার ক্লান্তিকর বিশাল তালিকার ওপর নির্ভরশীল নয় আমার বক্তব্য, কিংবা নির্বাচিত কিছু গ্রন্থ, লেখক ও ধারণা-তত্ত্বের ওপরও নয়, যেগুলো একত্রে প্রাচ্যতত্ত্বের মূলনীতিগুলো রচনা করেছে। আমি বরং নির্ভর করেছি ভিন্ন এক পদ্ধতিগত বিকল্পে, যার মেরুদণ্ড হলো ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ। আমি এ পর্যন্ত তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। এখন সেগুলোই খুঁটিনাটিসহ আলোচনা করতে চাই।

দুই

প্রাচ্য প্রকৃতির কোনো নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি নয়, তা ধরে নিয়ে আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম। এমন নয় যে প্রাচ্য 'এখানে অস্তিত্বশীল', তেমনি পাশ্চাত্যও 'ওখানে অস্তিত্ববান' নয়। ভিকোর একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো, মানুষ নিজেই তার ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং সে যা সৃষ্টি করে, তা-ই সে জানতে পারে ও ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত করতে পারে। এ পর্যবেক্ষণ আমাদের গুরুত্বসহকারে নেওয়া উচিত। ঐতিহাসিক সত্তার কথা বলছি না, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা যেমন– প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মতো স্থানিক, আঞ্চলিক, ভৌগোলিক বিভাজন মানুষের তৈরি। অতএব, 'পশ্চিম' যেমন, তেমনি 'প্রাচ্য'ও একটি ধারণা, যার আছে নিজস্ব চিন্তা, চিত্রকল্প ও পরিভাষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য; এগুলোই পশ্চিমের জন্য এবং পশ্চিমের নিকট প্রাচ্যের বাস্তবতা ও উপস্থিতি নির্মাণ করেছে। এ প্রক্রিয়ায় দুটো ভৌগোলিক সত্তা– প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পরকে সমর্থন করে, কিছুটা প্রতিফলিতও করে।

এ মন্তব্যের পর তার সমর্থনে কিছু যুক্তিযুক্ত বক্তব্যও তুলে ধরা উচিত। আমার প্রথম বক্তব্য হলো : প্রাচ্যকে কেবলই একটা ধারণা বা বাস্তবতার সাথে সম্পর্কবিহীন সৃষ্টি বলে সিদ্ধান্ত টানা ভুল হবে। যখন ডিজরাইলি তার উপন্যাস *ট্র্যাঙ্কেড*-এ লিখেন 'প্রাচ্য উন্নতির একটি পথ', তখন তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তরুণ, প্রাণচঞ্চল পশ্চিমাদের নিকট প্রাচ্যে আগ্রহী হওয়ার ঘটনা প্রবল আবেগের বিষয় বলে মনে হবে। ডিজরাইলিকে ভুলভাবে এমন ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যে, তিনি বলেছেন প্রাচ্য পশ্চিমাদের কাছে স্রেফ পেশা।

প্রাচ্যে কিছু সংস্কৃতি ও জাতি ছিল (এখনো আছে), তাদের জীবনযাপন ও আচার-প্রথার নিষ্ঠুর বাস্তব দিক আছে, যা নিঃসন্দেহে পশ্চিমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেকোনো খারাপ মন্তব্যের চেয়ে খারাপ। এ বাস্তব সত্য সম্পর্কে বর্তমান রচনায় কিছু করার নেই, কেবল চুপচাপ স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া। কিন্তু আমি বর্তমান অধ্যয়নে যেমন দেখেছি, প্রাচ্যতত্ত্বের বাইরের সংগঠন– প্রাচ্য ও প্রাচ্যতত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করে না– প্রধানত প্রাচ্যতত্ত্ব ও প্রাচ্যবিষয়ক ভাব-কল্পনা (যেমন, প্রাচ্য হলো উন্নতির একটা পথ) বজায় রাখে, বাস্তব প্রাচ্যের সাথে সেই ভাব-কল্পনার সংগতি থাকুক আর না-ই থাকুক। আমার যুক্তি হচ্ছে, প্রাচ্য সম্পর্কে ডিজরাইলির মন্তব্য ইঙ্গিত করে ঐ কৃত্রিম আন্তরসংগতির প্রতি, প্রাচ্যবিষয়ক ভাব-কল্পনার প্রতি, যা সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান। এবং তা অবশ্যই কেবল প্রাচ্যের অস্তিত্বের কথা বলে না, যেমন মন্তব্য করেন ওয়ালেস স্টিভেন্স।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হলো ভাবাদর্শ, সংস্কৃতি, ইতিহাস যথার্থ অধ্যয়ন বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয় যদি না তাদের পেছনে কার্যকর শক্তি– আরো সঠিক অর্থে বললে– ক্ষমতার আন্তরবিন্যাসও পরীক্ষা করে দেখা হয়।

যদি বিশ্বাস করতে হয় যে প্রাচ্য কৃত্রিম সৃষ্টি– বা আমি যেমন বলি 'প্রাচ্যায়িত'– এবং কেবল কল্পনা বিস্তারের প্রয়োজনে তা ঘটেছে, তাহলে সে বিশ্বাসে কপটতা থেকে যাবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক ক্ষমতা, আধিপত্য এবং পরিবর্তনশীল মাত্রার জটিল কর্তৃত্বের সম্পর্ক, যা খুবই সঠিকভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে কে. এম. পানিকারের ধ্রুপদ রচনা *এশিয়া অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডমিনেন্স*-এর শিরোনামে।[২]

প্রাচ্য কেবল এ জন্য প্রাচ্যায়িত হয়নি যে এটি আবিষ্কৃতই হয়েছিল উনিশ শতকীয় সাধারণ ইউরোপীয়র বিবেচনায় সম্ভাব্য সকল দিক থেকে *প্রাচ্য* হয়ে ওঠার জন্য, বরং এ জন্যও যে, প্রাচ্যকে প্রাচ্যায়িত করা সম্ভব ছিল– অর্থাৎ প্রাচ্যকে প্রাচ্যায়িত করতে দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফ্লবেয়ারের সাথে জনৈক অভিজাত মিসরীয় বারাঙ্গনার পরিচয় প্রাচ্য নারীদের যে প্রভাবশালী নমুনা তৈরি করে, তার সাথে একমত হওয়ার কিছু নেই। সে নারী নিজের সম্পর্কে কিছুই বলে না, নিজের উপস্থিতি, আবেগ বা ইতিহাস প্রকাশ করে না। ফ্লবেয়ার বিদেশি, তুলনামূলকভাবে বিত্তবান পুরুষ– এসবই আধিপত্যের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, যা তাকে কুচুক হানেমকে দৈহিকভাবে অধিকারে সক্ষম করে। কেবল তা-ই নয়, হানেমের পক্ষে কথা বলার এবং হানেম কোন কোন দিক দিয়ে খাঁটি প্রাচ্য নারী তা পাঠককে জানানোর ক্ষমতাও দেয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কুচুক হানেমের তুলনায় ফ্লবেয়ারের অবস্থান কোনো একক বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়, এটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক শক্তির বিন্যাস এবং তা থেকে সম্ভাবিত প্রাচ্যবিষয়ক ডিসকোর্সের একটি আদর্শ উদাহরণ বলে গণ্য হতে পারে।

এ অবস্থা আমাদের তৃতীয় যুক্তিতে উপনীত করে। কারো এমন ভাবা ঠিক হবে না যে, প্রাচ্যতত্ত্বের সংগঠন একরাশ মিথ্যা ও মিথের সংগঠন, এবং সত্য প্রকাশ করে দিলেই তা উড়ে যাবে। আমি মনে করি, প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যের ওপর ইউরোপীয়-আটলান্টিক ক্ষমতার চিহ্ন হিসেবে অধিকতর মূল্যবান, যতটা না প্রাচ্যবিষয়ক ডিসকোর্স হিসেবে (প্রাচ্যতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক বা পণ্ডিতি রূপ কেবল প্রাচ্যবিষয়ক ডিসকোর্স হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি করে)।

এ সত্ত্বেও প্রাচ্যতত্ত্বের নিশ্ছিদ্র ও নিখুঁত বুননের সামগ্রিক শক্তি, তার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিবিড় সংযোগ এবং টিকে থাকার ভয়ানক সামর্থ্যকে আমাদের অবশ্যই সমীহ করতে হবে, একে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হবে। এমনকি ভাব-কল্পনার একটি প্রক্রিয়া যদি অপরিবর্তিত শিক্ষেয় জ্ঞান হিসেবে (একাডেমি, বইপত্র, সমাবেশ-সম্মেলন, বিশ্ববিদ্যালয়, পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে) ১৮৪০-এর শেষ দিকে আর্নেস্ত রেনানের যুগ থেকে এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহাল থাকতে পারে, তবে তা অবশ্যই একরাশ মিথ্যার চেয়ে ভয়ানক কোনো ব্যাপার। অতএব, প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্য বিষয়ে ইউরোপীয়দের লঘুচিত্তের কল্পনা নয়, বরং তত্ত্ব ও

চর্চার সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি কাঠামো, যার পেছনে রয়েছে প্রজন্মক্রমিক প্রচুর বিনিয়োগ। ক্রমাগত বিনিয়োগ প্রাচ্যতত্ত্বকে প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ারূপে পশ্চিমা চেতনায় প্রাচ্যকে সিঞ্চন করার স্বীকৃত ছাঁকনিতে পরিণত করেছে। সেই একই বিনিয়োগ আবার প্রাচ্যতত্ত্ব থেকে সর্বজনীন সংস্কৃতিতে সংক্রমিত হতে থাকা বক্তব্যসমূহকে বহুগুণ বাড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

গ্রামসি নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে বিশ্লেষক ও ব্যবহার-উপযোগী পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। প্রথমটি গড়ে ওঠে স্বেচ্ছাসেবী (অন্তত যুক্তিশীল ও স্বেচ্ছামূলক) প্রতিষ্ঠান যেমন– স্কুল, পরিবার, সংঘ ইত্যাদি নিয়ে। দ্বিতীয়টি গঠিত রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ (সেনাবাহিনী, পুলিশ, কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র) নিয়ে, রাষ্ট্র-সমাজে যার কাজ আধিপত্য করা। সংস্কৃতি অবশ্যই নাগরিক সমাজে ক্রিয়াশীল দেখা যায়, যেখানে ভাবাদর্শ, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাব কাজ করে– কর্তৃত্বের মাধ্যমে নয়, গ্রামসির ভাষায় সম্মতির ভিত্তিতে। যে সমাজ স্বৈরতান্ত্রিক নয়, তাতে কিছু সাংস্কৃতিক রূপ অন্যগুলোর ওপর পূর্বাধিপত্য করে, যেমন কিছু ভাবাদর্শ অন্যগুলোর তুলনায় অধিকতর প্রভাবশালী হয়। এই সাংস্কৃতিক নেতৃত্বকে গ্রামসি বলেছেন *হেজেমনি*– পশ্চিমের শিল্পায়িত সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন বোঝার জন্য একটা অপরিহার্য ধারণা। এই *হেজেমনি*– বলা যায় ভাবাধিপত্যের ফলাফল প্রাচ্যতত্ত্বকে এমনতর দীর্ঘায়ু ও সামর্থ্য দিয়েছে যা এতক্ষণ আমি আলোচনা করেছি।

যাকে ডেনিস হে বলেছেন, 'ইউরোপের কল্পনা'[৩]– 'ওরা'-ইউরোপীয়র বিপরীতে 'আমরা' ইউরোপীয় হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত হওয়ার যুক্তিবিরহিত প্রবণতা, তা থেকে প্রাচ্যতত্ত্ব খুব একটা দূরে নয়। এবং কার্যত এমন দাবিও করা যায় যে সেগুলোই ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রধান উপাদান যা সেই সংস্কৃতিকে ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরে আধিপত্যকারী করে তুলেছে– সেটি হল সকল অ-ইউরোপীয় মানুষ ও সংস্কৃতির তুলনায় ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। আরো কথা আছে, প্রাচ্যের ওপর ইউরোপের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ধারণা প্রাচ্যের ওপর ইউরোপের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ধারণা প্রাচ্যের পশ্চাদপদতার তুলনায় ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপুন দাবি করছে এবং এমন সম্ভাবনাকেও সচরাচর নাকচ করে দিচ্ছে যে, অধিকতর স্বাধীন বা সন্দেহবাতিক কোনো চিন্তাবিদ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন।

প্রাচ্যতত্ত্ব তার কৌশলের প্রয়োজনে বরাবর ঐ নিয়ন্ত্রণযোগ্য শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। এ পরিস্থিতি পশ্চিমাদের সুবিধাজনক অবস্থান নষ্ট না করেই প্রাচ্যের সাথে তাদের সম্পর্কিত করে একগুচ্ছ সম্ভাব্য সম্পর্কে। রেনেসাঁর শেষ দিক থেকে এখন পর্যন্ত ইউরোপের অসাধারণ উত্থানের কালে কেনই বা ভিন্ন কিছু হবে? বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, মিশনারি, ব্যবসায়ী, সৈনিক– সবাই প্রাচ্যে গিয়ে হাজির হয়েছে

অথবা প্রাচ্যের কথা ভেবেছে। কারণ, চাইলেই সে ওখানে যেতে পারত, ঐ অঞ্চলটির কথা চিন্তা করতে পারত, প্রাচ্যের তরফ থেকে কোনো বাধা ছাড়াই। আঠারো শতকের শেষ থেকে এ যাবৎ 'প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞান' শিরোনামে এবং প্রাচ্যের ওপর পশ্চিমের সাংস্কৃতিক-আধিপত্যের ছায়ায় জটিল এক *প্রাচ্য*-এর উদ্ভব হয়। সে *প্রাচ্য* একাডেমিতে অধ্যয়ন, জাদুঘরে প্রদর্শন ও ঔপনিবেশিক কার্যালয়ে পুনর্গঠনের যোগ্য, মানবজাতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নৃতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণবাদী ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপাত্তরূপে ব্যবহার্য, এবং সমাজবিদ্যা ও অর্থনীতির উন্নয়নতত্ত্ব, বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বা জাতীয় কিংবা ধর্মীয় চরিত্র বিশ্লেষণে নমুনারূপে ব্যবহারের উপযোগী।

তা ছাড়া কোন জিনিসটি প্রাচ্যদেশীয়, তা যাচাই করার কল্পনানির্ভর পদ্ধতিটি বিশেষভাবে এক সার্বভৌম পশ্চিমা চৈতন্যের ওপর নির্ভরশীল। এ পশ্চিমা চৈতন্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রমুখী প্রাধান্য থেকে জন্ম নিয়েছে *প্রাচ্য*-জগৎ : প্রথম দিকে কে বা কী প্রাচ্যদেশীয় সে সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা থেকে, অতঃপর একগুচ্ছ খুঁটিনাটি যুক্তি অনুসারে– যেসব যুক্তি সাম্রাজ্যবাদী বাস্তবতা দ্বারাই শাসিত নয় কেবল, একরাশ আকাঙ্ক্ষা, দমন, বিনিয়োগ ও আগাম হিসাব-নিকাশ দ্বারাও পরিচালিত। আমরা যদি যথার্থ পণ্ডিতি কাজ যেমন, সিলভেস্ত্রা ডি সেসির *ক্রেস্তোমাতি অ্যারাব* বা এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেইনের *অ্যাকাউন্ট অব দ্য ম্যানারস অ্যান্ড কাস্টমস অব দ্য মডার্ন ইজিপশিয়ান*-এর কথা নির্দেশ করি, তাহলে মনে রাখা দরকার, রেনান ও গোবিনোর বর্ণবাদী ভাবাদর্শের জন্যও একই প্রেরণা থেকে– ভিক্টোরীয় যুগের অনেক পর্নোগ্রাফিক উপন্যাসও (দ্র. *দ্য লাস্ট ফুল তুর্ক*[৫] স্টিভেন মার্কুসের বিশ্লেষণ দেখুন)।

তবু বারবার নিজে নিজেই প্রশ্ন করা উচিত, প্রাচ্যতত্ত্বের কোন দিকটি সর্বাধিক গুরুত্ববহ : প্রচুর বাস্তব তথ্য-উপাত্ত পায়ে দলে গড়ে ওঠা একগুচ্ছ সাধারণ ধারণ– যেগুলো ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ব, বিভিন্ন ধরনের বর্ণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি 'প্রাচ্য'বিষয়ক ভাবান্ধ বিমূর্ত ধারণার আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে?– নাকি, প্রায় অসংখ্য লেখকের লেখা স্বাতন্ত্র্যধর্মী গ্রন্থরাশি যে সব লেখক প্রাচ্য বিষয়ে একক তৎপরতার নমুনা হিসেবে বিবেচিত হবেন?

এক অর্থে সর্বজনীন ও বিশেষ একই বিষয়ে দুই দৃষ্টিকোণ মাত্র। উভয় ক্ষেত্রেই উইলিয়াম জোনস, নেরভাল ও ফ্লবেয়ারের মতো বিরাট শিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে হবে। তা ছাড়া, দুই দৃষ্টিকোণ একসাথে বা একটার পর আরেকটা প্রয়োগ করা যাবে না কেন? যদি পদ্ধতিগতভাবে খুব বেশি সর্বজনীন বা খুবই ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ বজায় রাখা হয়, তাহলে কি বিকৃতির (ঠিক যা করার প্রবণতা আছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যতত্ত্বে) অনিবার্য ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে না?

আমার দ্বিবিধ ভয় হলো বিকৃত ও ভুল– খুবই অন্ধ সর্বজনীন বা খুবই স্থানিক দৃষ্টিকোণের দ্বারা সৃষ্ট ভুল। এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য আমি সমকালীন বাস্তবতার প্রধান তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার মনে হয়, তা আমাদের আলোচিত পদ্ধতিগত জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসার একটি উপায় বাতলে দেবে। ঐ পদ্ধতিগত জটিলতা প্রথমত, কাউকে বাধ্য করতে পারে এমন অপরিশোধিত বক্তব্য রচনায় যার পেছনে শ্রম দেওয়া অর্থহীন। অথবা দ্বিতীয়ত, কাউকে এমন খুঁটিনাটি পরমাণুমুখী বিশ্লেষণ লেখায় চালিত করতে পারে, যার ফলে প্রাচ্যতত্ত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্মাণ ও বিশেষ সামর্থ্য প্রদানে সক্রিয় উপাদানরাশির চিহ্নসমূহ আলোচনার বাইরে থেকে যেতে পারে। তাহলে, কীভাবে ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং তাকে তার মেধাদীপ্ত এবং কোনোভাবেই নিষ্ক্রিয় বা কেবল স্বৈরতান্ত্রিক নয়– এমন সর্বজনীন ও আধিপত্যবাদী পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে স্থাপন করা যায়?

তিন

আমি সমকালীন বাস্তবতার তিনটি দিক তুলে ধরলাম : এখন ওগুলো বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপে আলোচনা করব, যাতে বোঝা যায় কীভাবে আমি একটি বিশেষ ধারার গবেষণা ও লেখায় পরিচালিত হয়েছি।

১. রাজনৈতিক ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের পার্থক্য

শেক্সপিয়ার বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ-সম্পর্কিত জ্ঞান রাজনৈতিক জ্ঞান নয়, কিন্তু সমকালীন চীন বা রাশিয়া-সম্পর্কিত জ্ঞান রাজনৈতিক– এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন খুবই সহজ। আমার নিজের প্রথাগত ও পেশাগত পরিচয় 'মানবতাবাদী'। এমন এক অভিধা যা ইঙ্গিত করে মানববিদ্যা আমার বিষয়; সুতরাং এ বিষয়ে আমি যা-ই করি, তা রাজনৈতিক কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমি অবশ্যই এসব লেবেল ও পরিভাষা সূক্ষ্মতর আর্থ-ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করছি না; যে সাধারণ অর্থ বোঝাতে চাই তা সর্বজনীনভাবে গৃহীত। একজন মানবতাবাদী যিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে লেখেন বা কিটস-বিশেষজ্ঞ একজন সম্পাদক রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত নন। আমার এ বক্তব্যের একটি কারণ এই যে, তিনি যা করছেন, তা প্রাত্যহিক বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব ফেলে বলে মনে হয় না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি যার বিষয়, তিনি কাজ করেন অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্রে, যেখানে সরকারের যথেষ্ট স্বার্থ জড়িত। তিনি গবেষণা বা প্রস্তাবনা আকারে যা সৃষ্টি করবেন তা নীতিনির্ধারক, পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিবিদ, গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের দ্বারা গৃহীত হবে।

মানবতাবাদী লেখক ও নীতিনির্ধারণী বা রাজনৈতিক গুরুত্ববহ লেখকের পার্থক্য আরো বিস্তৃত করতে চাইলে বলা যায় যে, প্রথমোক্ত জনের আদর্শগত রঙের রাজনৈতিক গুরুত্ব একটি দৈবাৎ ব্যাপার (যদিও তার সহকর্মীদের কাছে খুবই জরুরি মনে হতে পারে এবং তারা তার স্ট্যালিনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট বা সরল-উদারতাবাদী আদর্শের প্রতি আপত্তি তুলতে পারেন); অন্যদিকে, দ্বিতীয়োক্ত জনের আদর্শিক মতবাদ সরাসরি বুনে দেওয়া হয় তার কর্মে– আধুনিক বিদ্যায়তনে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজতত্ত্বে যেগুলো আসলে মতাদর্শিক বিজ্ঞান মাত্র। তাই এগুলোকে 'রাজনৈতিক' আখ্যায়িত করার যোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়।

যাহোক, সমকালীন পাশ্চাত্যে (এবং এখানে আমি বলছি প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রে) সৃষ্ট জ্ঞানে যে নিয়ামক প্রভাব পড়েছে তা হলো, জ্ঞান হবে অ-রাজনৈতিক, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বিদ্যায়তনিক, নিরপেক্ষ, দলাদলি ও সংকীর্ণ মতবাদগত বিশ্বাসের উর্ধ্বে। এরকম তাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষার সাথে কারো কোনো ঝগড়া থাকার কথা নয়। তবে চর্চা ও বাস্তব অনেক বেশি সমস্যাসংকুল। কেউ এমন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করেনি, যাতে লেখককে বিচ্ছিন্ন করা যায় তার জীবনের পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে– তার শ্রেণির সাথে (সচেতন বা অসচেতন) সম্পর্ক, একরাশ বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান কিংবা সমাজের সদস্য হিসেবে কৃত তৎপরতা থেকে। তিনি পেশাগতভাবে যা করেন তার ওপর ছাপ পড়বে এ সমস্ত কিছুরই; যদিও খুব স্বাভাবিকভাবেই তার গবেষণা ও ফলাফল চেষ্টা করবে নির্দয় প্রাত্যহিক বাস্তবের সীমাবদ্ধতা ও রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে তুলনামূলক মুক্ত স্তরে পৌঁছার। কারণ, জ্ঞানের একটি ব্যাপার হলো, জ্ঞান উৎপন্নকরণে সেই (মনোযোগ-বিক্ষেপক জীবন-পরিস্থিতির ফাঁদে জড়ানো) ব্যক্তির চেয়ে তার জ্ঞান কম পক্ষপাতদুষ্ট। তবু এই জ্ঞান স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ-রাজনৈতিক নয়।

সাহিত্য বা ধ্রুপদ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় স্বাভাবিক বা অনিচ্ছাকৃত রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে কি না তা অনেক বড় প্রশ্ন, যা আমি অন্যত্র কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করেছি।[৫] এখানে আমি যা দেখাতে আগ্রহী তা হলো, বিশুদ্ধ জ্ঞান মৌলিকভাবে অ-রাজনৈতিক (এবং বিপরীতক্রমে, খুব বেশি রাজনৈতিকায়িত জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান নয়)– এই সাধারণ উদারতাবাদী ধারণা কীভাবে জ্ঞান-সৃজন মুহূর্তে বলবৎ ও গোপনে সুসংগঠিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আড়াল করে রাখে।

আজকাল কাউকে সহজে বুঝতে দেওয়া হয় না যে, অ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ভান করা নীতি ভাঙার দুঃসাহস নিয়ে যখন কিছু রচিত হয়, তখন সেই রচনাকে ছোট করার জন্য 'রাজনৈতিক' বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়। আমরা, প্রথমত, বলতে পারি, নাগরিক সমাজ বিভিন্ন জ্ঞানশাখার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার রাজনৈতিক গুরুত্ব গ্রহণ করে নেয়। সীমিত ক্ষেত্রে, কোনো জ্ঞানশাখা সরাসরি আর্থ-মাত্রায় কতটা

রূপান্তরযোগ্য, সেই সম্ভাবনা থেকে আসে তার রাজনৈতিক গুরুত্ব; তবে বৃহত্তর অর্থে একটি বিষয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব আসে রাজনৈতিক সমাজে অর্জনযোগ্য ক্ষমতার উৎসের সাথে তার সম্পর্কের নিবিড়তা থেকে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি সরবরাহক্ষমতা এবং সামরিক শক্তির ওপর এর প্রভাবসম্পর্কিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিযুক্তি পেতে পারে এবং এর ফলে এটি লাভ করতে পারে একধরনের রাজনৈতিক মর্যাদা যা কোনো ফাউন্ডেশনের আংশিক আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত টলস্টয়ের প্রথম দিককার উপন্যাসসম্পর্কিত গবেষণার ভাগ্যে জোটা অসম্ভব। তবু নাগরিক সমাজের কাছে উভয় রচনা একই বিষয়, অর্থাৎ রুশ অধ্যয়ন হিসেবে গৃহীত; যদিও হতে পারে একটি কাজ খুবই রক্ষণশীল কোনো অর্থনীতিবিদ এবং অন্যটি বিপ্লবী সাহিত্য-ইতিহাসবেত্তার দ্বারা সম্পাদিত। আমি বলতে চাচ্ছি, 'অর্থনীতি' বা 'সাহিত্য ইতিহাস'-এর মতো নির্দিষ্ট বিষয়ের চেয়ে 'রুশ' শিরোনামের সামগ্রিক ক্ষেত্রটির রাজনৈতিক গুরুত্ব বেশি। কারণ গ্রামসির রাজনৈতিক সমাজ নাগরিক সমাজে বিদ্যায়তনের মতো জায়গায় পৌঁছে যায় এবং ওগুলোয় সঞ্চার করে দেয় তার প্রত্যক্ষ আগ্রহ-অনাগ্রহের বোধ।

আমি সাধারণ তাত্ত্বিক পটভূমিতে এসব বিষয়ে আর জোর দিতে চাই না। আমার মনে হয়, আরও নির্দিষ্ট আলোচনাতেও আমার বিষয়টির মূল্য ও বিশ্বস্ততা দেখানো যেতে পারে; যেমন– সরকার পরিচালিত সামরিক গবেষণা– যার নাম দেওয়া হয় 'উদ্দেশ্যমূলক পাণ্ডিত্য'– তার ধারণা এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের সহায়ক সম্পর্কের ওপর নোয়াম চমস্কির গবেষণা[৮]। এখন যেহেতু ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সম্প্রতি আমেরিকাও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তাই বিদেশে যখন যেখানেই তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়, তখনই তাদের রাজনৈতিক সমাজ নাগরিক সমাজে সঞ্চারিত করে দেয় একধরনের জরুরিত্বের বোধ, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রেরণা।

আমি সন্দিহান এমন বক্তব্য আদৌ বিতর্কিত কি না যে, শেষ উনিশ শতকের ভারত বা মিসরে একজন ইংরেজ ওই সব দেশের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল, যেগুলোর মর্যাদা তার কাছে ব্রিটিশ উপনিবেশের বেশি কিছু ছিল না। আবার পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে ভিন্ন মনে হতে পারে যদি বলা হয়– ভারত ও মিসর-সম্পর্কিত সকল প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান কোনো-না-কোনোভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলির দ্বারা রঞ্জিত, প্রভাবিত ও দূষিত; প্রাচ্যতত্ত্ব-সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনায় আমি আসলে তা-ই বলছি।

কারণ যদি এ বক্তব্য সঠিক হয় যে মানববিদ্যায় সৃষ্ট কোনো জ্ঞান কখনোই মানবীয় বিষয় হিসেবে রচয়িতার সাথে রচয়িতার আপন-পরিস্থিতির সম্পর্ক উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে পারে না, তবে এ-ও সত্য যে, একজন ইউরোপীয় বা

আমেরিকানের প্রাচ্যবিষয়ক গবেষণা অস্বীকার করতে পারে না তার বাস্তবতার মূল এই পরিস্থিতিকে যে, তিনি প্রাচ্যের মুখোমুখি হয়েছেন প্রথমত, একজন ইউরোপীয় বা আমেরিকান হিসেবে, দ্বিতীয়ত ব্যক্তি হিসেবে এবং এ পরিস্থিতিতে একজন ইউরোপীয় বা আমেরিকান হওয়ার ব্যাপারটা নিছক নিষ্ক্রিয় বাস্তবতা নয়। তা বুঝিয়েছে এবং বোঝায়– যত অস্পষ্টভাবেই হোক– সচেতন হয়ে ওঠা যে, তিনি এমন একটি বিশেষ শক্তির অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্যে যার নিশ্চিত স্বার্থ জড়িত; এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি এমন এক অংশের মানুষ যে অংশটির সাথে– সেই হোমারের সময় থেকে– প্রাচ্যের নিবিড় সম্পর্কের নির্দিষ্ট ইতিহাস রয়েছে।

বলা যায়, আগ্রহ সৃষ্টির প্রশ্নে এসব রাজনৈতিক বাস্তবতা স্থূল এবং এখনো খুবই অনালোচিত। যে কেউ ওই সব বিষয়ে একমত হতে পারেন, যদিও তিনি হয়তো মানেন না যে, এগুলোর তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল– বিশেষত ফ্লবেয়ারের কাছে যখন তিনি *স্যালামবো* লেখেন, কিংবা *মডার্ন ট্রেন্ড ইন ইসলাম* রচনার সময় এইচ. আর. গিব-এর কাছে। মুশকিল হলো, আমার আলোচিত বৃহৎ প্রভাবসম্পাতি ঘটনা আর উপন্যাস বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা লিখিত হওয়ার সময় তার অনুপুঙ্খ শৃঙ্খলার নিয়ামক দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটির মধ্যে পার্থক্য বিশাল।

যদি শুরু থেকেই এমন ধারণা দূরে সরিয়ে রাখি যে, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের মতো বৃহৎ বাস্তবতা যান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্টকরণের ক্ষমতাসহ সংস্কৃতি ও মতাদর্শের মতো জটিল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে আমরা এক আকর্ষণীয় গবেষণার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করব। আমার ধারণা, আমার প্রদত্ত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী প্রাচ্য বিষয়ে ইউরোপীয়, অতঃপর আমেরিকান আগ্রহের সম্পর্কটি রাজনৈতিক। সংস্কৃতি সে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। রূঢ় রাজনৈতিক, আর্থ ও সামরিক যুক্তিবোধের পাশাপাশি সংস্কৃতিও গতিশীলভাবে কাজ করেছে বিচিত্র ও জটিল প্রাচ্য নির্মাণে, যে প্রাচ্য অবশ্যই বিচিত্র ও জটিলরূপে প্রাচ্যতত্ত্বে অস্তিত্ববান।

অতএব, প্রাচ্যতত্ত্ব, সংস্কৃতি, পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠানে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত সাদামাটা রাজনৈতিক বিষয় বা জ্ঞানশাখা নয়, প্রাচ্য সম্পর্কে বিরাট ও বিস্তৃত গ্রন্থরাজিও নয়, নয় তা 'প্রাচ্য'-জগৎকে পরাধীন করে রাখার জন্য দুষ্টচক্র পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার প্রতিনিধিত্বমূলক ও অভিব্যক্তিস্বরূপ। বরং তা হলো নন্দনতাত্ত্বিক, পণ্ডিতি, অর্থনৈতিক, সমাজবিদ্যাসংক্রান্ত ও ঐতিহাসিক রচনায় ভূ-রাজনৈতিক সচেতনতা সঞ্চার। এ হলো সযত্ন বিশদায়ন– কেবল মৌলিক ভৌগোলিক পার্থক্যেরই নয় (পৃথিবী দুটো অসমান অংশ 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্যে' বিভক্ত) একরাশ স্বার্থেরও যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আবিষ্কার, ভাষিক পুনর্গঠন, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বর্ণনা প্রভৃতি উপায়ে সৃষ্টি করে এবং তা বহালও রাখে। প্রাচ্যতত্ত্ব হলো দৃষ্টিগোচরভাবে ভিন্ন (বা বিকল্প ও নতুন) জগৎকে উপলব্ধি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে

নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিতকরণ এমনকি, অধিভুক্তকরণের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়; সর্বোপরি, প্রাচ্যতত্ত্ব একটি ডিসকোর্স যা কোনোভাবেই স্থূল রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সরাসরি সংযোগে সম্পর্কিত নয়, বরং বিভিন্ন অসমান শক্তির লেনদেনে জন্ম নিয়ে টিকে আছে এবং ক্ষমতার রাজনীতির সাথে (যেমন ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে), ক্ষমতার বুদ্ধিবৃত্তিতার সঙ্গে (যেমন প্রচল বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান বা অন্য কোনো কৌশলগত নীতিবিজ্ঞানের লেনদেনে), ক্ষমতার সংস্কৃতির সাথে (যেমন, রক্ষণশীলতা, রুচিবোধ, রচনা ও মূল্যবোধের রীতিনীতির সাথে), ক্ষমতার নৈতিকতার সাথে (যেমন এ ধারণা যে 'আমরা' পশ্চিমারা কী করি এবং ওরা 'প্রাচ্যবাসীরা' কী করতে পারে না বা বুঝতে পারে না যে, 'আমরা' কী করতে সক্ষম)–আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্টরূপ লাভ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, আমার আসল বক্তব্য হলো প্রাচ্যতত্ত্ব আধুনিক রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য এক মাত্রা; এটি কেবল তার প্রতিনিধিত্বই করে না। এবং তাই, তা যতটা না প্রাচ্যের সাথে তার চেয়ে বেশি 'আমাদের' জগতের সাথে সম্পর্কিত।

প্রাচ্যতত্ত্ব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয় বলে মহাফেজখানার শূন্যগর্ভে তার অস্তিত্ব নেই; বরং উল্টো দেখানো সম্ভব যে, প্রাচ্য সম্পর্কে যা চিন্তা করা হয়েছে, বলা হয়েছে, এমনকি করা হয়েছে তা ঘটেছে একটি নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বোধগম্য সীমানা অনুসরণ করে (হয়তো তার মধ্যেই)।

এখানেও দেখা যাবে বৃহৎ উপরিকাঠামোগত চাপ এবং রচনার অনুপুঙ্খ ও বয়ানের ঘটনাবলির মাঝখানে নির্দিষ্ট মাত্রার আর্থ-ব্যবধান ও বিশদায়ন ক্রিয়াশীল। আমি মনে করি, প্রকৃত মানবিক লেখক তিনিই, যিনি 'পরিপ্রেক্ষিতেই রচনা অস্তিত্ববান' মনে করে যথার্থ সন্তুষ্ট, যিনি মনে করেন আন্তরচনা সম্পর্ক বলে কিছু একটি আছে এবং যিনি বিশ্বাস করেন প্রথা, অগ্রজেরা ও ভাষারীতির চাপ লেখকের প্রকাশ ক্ষমতা সীমিত করে দেয়–একদা ওয়াল্টার বেনজামিন যাকে বলেছিলেন 'সৃষ্টির রীতিনীতির নামে সৃজনশীল ব্যক্তির নিকট থেকে চড়া মাশুল আদায়,' যদিও সে নীতি অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় কবি নিজে বিশুদ্ধ হৃদয় থেকে তার রচনা সৃষ্টি করেছেন।[৭]

এ সত্ত্বেও লেখকের ওপর একইভাবে সক্রিয় রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও মতাদর্শগত চাপের বিষয়টি স্বীকার করতে অনিচ্ছা দেখা যায়। একজন মানবতাবাদী বিশ্বাস করবেন বালজাকের কোনো ভাষ্যকারের কাছে এ বিষয়টি আকর্ষণীয় বলে মনে হবে যে, তিনি *কমেডি হিউমেইন* রচনায় জিওফ্রে সেইন্ট-হিলারি ও কুভিয়েরের দ্বন্দ্ব দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু বালজাকের প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে তার ওপর সক্রিয় গভীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রের একই রকম চাপের ব্যাপারটি

দেখা হয়েছে একরকম অস্পষ্টতায়; তাই বিষয়টি সিরিয়াস গবেষণার অনুপযোগী মনে হয়েছে। একইভাবে যেমন হ্যারি ব্রেকেন অবিরাম দেখিয়ে চলেছেন–দার্শনিকেরা লক, হিউম ও সাম্রাজ্যবাদের আলোচনাকালে বিবেচনাতেও আনেন না যে, ধ্রুপদ যুগের এসব লেখকের 'দার্শনিক' মতবাদ আর বর্ণবাদী তত্ত্ব, দাসপ্রথা ও ঔপনিবেশিক শোষণে সমর্থন প্রদানের মধ্যে স্পষ্ট যোগাযোগ রয়েছে।[৮] এগুলো হলো খুবই সাধারণ কৌশল, যা অবলম্বন করে সমকালীন পাণ্ডিত্যধারা নিজেকে বিশুদ্ধ রাখে।

এ কথা হয়তো সত্যি যে, রাজনীতির কাদায় সংস্কৃতির নাক চোবানোর অধিকাংশ প্রয়াস কাঁচা, মূর্তি-বিনাশী। হয়তো আমার নিজের বিষয় সাহিত্যও ভাষ্য, সোজা কথায়, অনুপুঙ্খ কেতাবি বিশ্লেষণে অর্জিত বিরাট কৌশলগত উন্নয়নের সাথে তাল রাখেনি। কিন্তু এ সত্য এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই যে, সামগ্রিক অর্থে সাহিত্য সমালোচনা, নির্দিষ্ট করে বলতে আমেরিকান মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরা, কেতাবি ও ঐতিহাসিক ও পাণ্ডিত্যের ধারায় মূল কাঠামো ও উপরিকাঠামোর ফাঁক কমানোর নিবিষ্ট প্রয়াস এড়িয়ে গেছেন। অন্যত্র আমি এ-ও পর্যন্ত বলেছি যে, সামগ্রিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতির নিবিড় আলোচনাকে সীমাবহির্ভূত বলে ঘোষণা করে।[৯]

এ সত্ত্বেও, প্রাচ্যতত্ত্ব আমাদের সরাসরি দাঁড় করিয়ে দেয় এ প্রশ্নের মুখোমুখি যে, এই রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ অধ্যয়ন, ভাব-কল্পনা ও পাণ্ডিত্যময় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশাল একটি ক্ষেত্রকে এমনভাবে পরিচালিত করে যে, তা উপেক্ষা করা বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক অসম্ভবতা হয়ে দাঁড়ায়। তবু থেকেই যায় ফাঁকি দেওয়ার পুরোনো কৌশল–এমন অজুহাত যে, একজন সাহিত্যিক ও একজন দার্শনিক যথাক্রমে সাহিত্য ও দর্শনের ব্যাখ্যা রচনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত; রাজনীতি ও ভাবাদর্শ বিশ্লেষণে নয়। অন্য কথায়, বিশেষজ্ঞ যুক্তিতর্ক বৃহত্তর, আমার বিবেচনায় অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সিরিয়াস পরিপ্রেক্ষিত আড়াল করে রাখতে সক্ষম।

আমার মনে হয়, এখানে দুভাগে বিভক্ত একটি সহজ জবাব আছে–বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতি (বা প্রাচ্যতত্ত্ব)-বিষয়ক আলোচনার সাথে এটি যতটা সম্পর্কিত। প্রথমত, উনিশ শতকের (একইভাবে প্রযোজ্য যে তার পূর্বের যুগের) সকল লেখকই সাম্রাজ্যের ব্যাপারটি সম্পর্কে বিশেষ রকম সচেতন ছিলেন। এটি এমন এক বিষয় যা সঠিকভাবে আলোচিত হয়নি। তবে একজন আধুনিক ভিক্টোরীয় সমালোচকের স্বীকার করতে সময় লাগবে না যে, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে উদার সংস্কৃতির নায়ক– যেমন জন স্টুয়ার্ট মিল, আর্নল্ড, কার্লাইল, নিউম্যান, ম্যাকলে, রাস্কিন, জর্জ এলিয়ট এমনকি ডিকেন্সের নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাদের লেখায় যে তা সক্রিয় ছিল, সেটি সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব। সুতরাং এমনকি

একজন বিশেষজ্ঞকে এই জ্ঞান নিয়ে কাজ করতে হবে যে, মিল, নমুনাস্বরূপ, *লিবার্টি অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট* গ্রন্থে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তার মতামত ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ঠিক হবে না (তার জীবনের বড় অংশ কেটেছে ভারতে পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে)। কারণ, ভারতীয়রা সভ্যতার দিক থেকে, বর্ণের দিক থেকে নয় যদিও, নিম্নমানের। একই রকম স্ববিরোধিতা মার্ক্সেও লক্ষণীয় যা আমি বর্তমান গ্রন্থে দেখিয়েছি। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদরূপী রাজনীতি সাহিত্য, পাণ্ডিত্য, সমাজবিদ্যা-সংক্রান্ত তত্ত্ব ও ইতিহাস রচনায় প্রভাব ফেলে–এমন বিশ্বাস করার অর্থ এই বলা নয় যে, সংস্কৃতি একটি নিম্নমানের কলঙ্কিত বিষয়। বরং উল্টো আমার বক্তব্য হলো, যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, লেখক চিন্তাবিদদের ওপর সংস্কৃতির মতো রঞ্জক ও আধিপত্যবাদী প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ চাপ সৃজনোদ্দীপক–কেবল বাধাদায়ক নয়, তাহলে আমরা এগুলোর টিকে থাকার শক্তি এবং দীর্ঘায়ুর বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব। এই ধারণাটিই গ্রামসিসহ ফুকো ও রেমন্ড উইলিয়ামসও নিজ নিজ স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। এমনকি বহুখণ্ডের বয়ানি বিশ্লেষণের চেয়ে *দ্য লঙ রেভ্যুলেশন*-এর 'দি ইউজেস অব দি এম্পায়ার'-এ উইলিয়ামসের দু-এক পৃষ্ঠার আলোচনা আমাদের উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে অনেক বেশি অবহিত করে।[১০]

আমি তাই প্রাচ্যতত্ত্বকে পাঠ করি ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান–এ তিন বিশাল সাম্রাজ্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ব্যক্তি লেখকের বেগবান আদান-প্রদান হিসেবে। এসব সাম্রাজ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ও কাল্পনিক সীমানার ভেতরেই উৎপাদিত হয়েছে ওই সব রচনা। একজন পণ্ডিত হিসেবে আমি স্থূল রাজনৈতিক ঘটনাবলিতে নয়, অনুপুঙ্খেই সবচেয়ে আগ্রহবোধ করি। ঠিক যেমন লেইন বা ফ্লবার্ত বা রেনানে আমাদের আগ্রহের বিষয় এই নয় যে, পশ্চিমারা যে প্রাচ্যবাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর তা (তাদের মতে) তর্কহীন সত্য, বরং এ সত্যের দ্বারা উন্মুক্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রটিতে তাদের অনুপুঙ্খ কাজের মধ্যে যথাযথ স্বাতন্ত্র্যে গড়েপিটে উপস্থাপিত প্রমাণাদিই আগ্রহের মূল বিষয়। এখানে আমি কী বলছি তা বোঝার জন্য লেইনের *ম্যানার্স অ্যান্ড কাস্টমস অব দ্য মডার্ন ইজিপশিয়ান*-এর কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট। রচনাশৈলী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মেধাদৃপ্ত অনুপুঙ্খ উপস্থাপনের জন্যই এটি ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ বিষয়ে ধ্রুপদ কাজ, এতে প্রতিফলিত বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নয়।

অতএব, প্রাচ্যতত্ত্ব যেসব রাজনৈতিক প্রশ্ন অনিবার্য করে সেগুলো এরকম: আর কোনো ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক, নন্দনতাত্ত্বিক, পণ্ডিতি ও সাংস্কৃতিক শক্তি প্রাচ্যতত্ত্বের মতো সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যধারা সৃষ্টিতে ব্যয়িত হয়েছে? পৃথিবীর প্রতি প্রাচ্যতত্ত্বের মোটা দাগের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব গঠনে ভাষাবিজ্ঞান, শব্দার্থবিদ্যা, ইতিহাস,

জীববিদ্যা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব, উপন্যাস, গীতিকবিতা প্রভৃতি কীভাবে কাজে লেগেছে? প্রাচ্যতত্ত্বের অভ্যন্তরেই বা কী ধরনের পরিবর্তন, স্বরান্তর, পরিশোধন এমনকি বিপ্লব ঘটে গেছে? এ পটভূমিতে মৌলিকতা, অবিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রভৃতির অর্থ কী? কীভাবে প্রাচ্যতত্ত্ব এক যুগ থেকে আরেক যুগে হস্তান্তরিত বা জন্মান্তরিত হয়েছে? কী উপায়ে আমরা, নিঃশর্ত যুক্তিতর্কের ফলস্বরূপ নয়–স্বেচ্ছা-প্রণোদিত মানবকর্ম হিসেবে, প্রাচ্যতত্ত্বের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনামালাকে তাদের ঐতিহাসিক অনুপুঙ্খের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে পারি–এমনভাবে যেন এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কাজ, রাজনৈতিক প্রবণতা, রাষ্ট্র ও আধিপত্যের নির্দিষ্ট কিছু বাস্তব দিক নিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যটি চোখ এড়িয়ে না যায়? এসব দিক নিয়ে পরিচালিত মানবতাবাদী বিশ্লেষণ রাজনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়েও দায়িত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, এ ধরনের আলোচনা জ্ঞান ও রাজনীতির সম্পর্কে কিছু বাঁধা-ধরা নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবে। আমার কথা হলো, এরকম মানবতাবাদী অনুসন্ধানকে এ বিশ্লেষণের নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত, বিষয় ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পটভূমিতে ওই সম্পর্কের প্রকৃতি প্রকাশ করতে হবে।

২. পদ্ধতিগত প্রশ্ন

মানববিদ্যায় কাজ করার প্রথম ধাপ অনুসন্ধান ও নির্মাণ। যাত্রা শুরুর একটা বিন্দু–একটি প্রারম্ভনীতি প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছি পূর্বের একটি গ্রন্থে।[১১] যা শিখেছি এবং উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি তা হলো, প্রারম্ভ বিন্দু বলে কিছু দেওয়া থাকে না, সোজা কথায় পাওয়া যায় না; এবং প্রত্যেক প্রকল্পের শুরুটা হওয়া উচিত এমন যেন তা অনুবর্তী আলোচনা সম্ভাবিত করে তোলে। প্রাচ্যতত্ত্বের বর্তমান গবেষণায় এ শিক্ষার কঠিন দিকটি যতটা সচেতনভাবে অতিক্রম করেছি (সত্যিই বলা সম্ভব নয়, ব্যর্থতা নাকি সাফল্যের সাথে) তা আমার অভিজ্ঞতায় আর কখনো ঘটেনি।

'প্রারম্ভ'র ধারণা, প্রকৃতপক্ষে 'শুরু' করার কাজটি অনিবার্য করে তোলে সীমা-নির্দেশন, যার মাধ্যমে বড় কিছু থেকে ছোট একটি অংশ কেটে আকার দেওয়া হয়, ছোট অংশটিকে বড় অংশটি থেকে আলাদা করে 'শুরু'র জন্যও 'শুরু'র ধাপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। টেক্সটের ছাত্রদের জন্য উদ্বোধক সীমা-নির্দেশনের এমন একটি ধারণা হলো লুইস আলথুসারের *প্রবলেম্যাটিক*– কোনো রচনা বা রচনাগুচ্ছের নির্দিষ্ট ও সীমাচিহ্নিত ঐক্য যা গড়ে উঠেছে বিশ্লেষণের মাধ্যমে[১২]। এ সত্ত্বেও প্রাচ্যতত্ত্বের বেলায় (যা লুইস আলথুসারের বিষয়, অর্থাৎ মার্ক্সের টেক্সটেরও বিরোধিতা করে) সমস্যাটি কেবল যাত্রাস্থল খুঁজে বের করা বা *প্রবলেম্যাটিকই* নয়, এখানে কোনো

কোনো রচনা, গ্রন্থকার ও সময়পর্ব আলোচনায় সবচেয়ে সাযুজ্যপূর্ণ তা স্থির করার প্রশ্নটিও যুক্ত।

প্রাচ্যতত্ত্বের এনসাইক্লোপিডিয়া-জাতীয় কাহিনিমূলক ইতিহাস রচনা আমার কাছে বোকামি বলে মনে হয়েছে। তার প্রথম কারণ, আমার নির্দেশক-নীতি যদি হয় 'প্রাচ্যকে নিয়ে ইউরোপীয় ভাব-কল্পনা', তাহলে কোন কোন রচনা আলোচনা করতে হবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা থাকে না। দ্বিতীয়ত, কেতাবি পদ্ধতিটি আমার বর্ণনামূলক ও রাজনৈতিক আগ্রহের সাথে খাপ খায় না। তৃতীয়ত, রেমন্ড স্কোয়াবের *লা রেনেসাঁ অরিয়ঁতাল*, জোহান ফাকের *Die Arabischen studien in Europa his in den anfang des 20 Jahrhunderts* এবং অতি সাম্প্রতিক ডরোথি মেটলিৎজকির *দ্য ম্যাটার অ্যারাবি ইন মিডিয়াভল ইংল্যান্ড*[১৩]–এর মতো রচনায় ইউরো-প্রাচ্য সম্পর্কের কিছু দিক নিয়ে জ্ঞানকোষ টাইপের কাজ করা হয়েছে, যা ওপরে বর্ণিত সামগ্রিক রাজনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমিতে সমালোচকদের কাজ ভিন্ন করে তোলে।

তবু বিশাল গ্রন্থরাজি কেটেছেঁটে নিয়ন্ত্রণযোগ্য আকারে আনার এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ওই গ্রন্থরাজির থেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলায় কিছু একটি সাজিয়ে নেওয়ার সমস্যা থেকেই যায়; আবার একই সাথে লক্ষ রাখতে হবে এ রচনাগুচ্ছের সময়ানুক্রমিক অমনোযোগী বিন্যাসটি যেন অনুসৃত না হয়। অতএব, আমার প্রারম্ভ বিন্দু হলো প্রাচ্য সম্পর্কে একীভূত ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ফরাসি অভিজ্ঞতা; আবার বিষয়টির সেই ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি যা ওই অভিজ্ঞতা সম্ভব করে তুলেছে এবং অভিজ্ঞতার মান ও চারিত্র্যও। কেটেছেঁটে কমিয়ে আনা একগুচ্ছ প্রশ্ন (যদিও এখনো সংখ্যায় বহু) আমি আলোচনা করব, কয়েকটি কারণে। প্রশ্নগুলো ইসলাম ও আরব বিষয়ে ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকানদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে, যা হাজার বছর ধরে প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এ কাজটি করার সাথে সাথে প্রাচ্যের বিশাল এক অংশ–ভারত, জাপান, চীন, দূরপ্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চল–বাদ পড়ে যায় বলে মনে হয়। তার কারণ এই নয় যে, ওই সব অঞ্চল গুরুত্বহীন (ওগুলোই অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ) বরং এ জন্য যে দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করে নিকট-প্রাচ্য বা ইসলামসম্পর্কিত ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা আলোচনা করা সম্ভব। এ সত্ত্বেও প্রাচ্যে সামগ্রিক ইউরোপীয় স্বার্থের ইতিহাস, বিশেষ করে প্রাচ্যের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল যেমন মিসর, সিরিয়া ও আরবে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার আলোচনা কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে পড়বে, যদি প্রাচ্যের দূরবর্তী অংশে–এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পারস্য ও ভারতে–ইউরোপের সংশ্লিষ্টতা আলোচনা করা না হয়।

লক্ষণীয় একটি ব্যাপার হলো, মিসর ও ভারতের যোগাযোগ–বিশেষত আঠারো-উনিশ শতকের ব্রিটেন যতটা সংশ্লিষ্ট ছিল। একইভাবে জেন্দ আবেস্তার অর্থ উদ্ধারে

ফরাসি ভূমিকা, উনিশ শতকের প্রথম দশকে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্যারিসের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বাস্তবতায় উদ্দীপ্ত নেপোলিয়নের প্রাচ্যবিষয়ক আগ্রহ–দূরপ্রাচ্যে এসব স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিকট-প্রাচ্যে ইসলাম ও আরবদের মাঝে ফরাসি স্বার্থকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে।

সতেরো শতকের শেষ থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় আধিপত্য করেছে। ওই পদ্ধতিভিত্তিক স্বার্থ ও আধিপত্য সম্পর্কে আমার আলোচনা এ কটি বিষয়ের প্রতি সুবিচার করেনি : (ক) প্রাচ্যতত্ত্বে জার্মানি, ইতালি, রাশিয়া, স্পেন ও পর্তুগালের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং (খ) আঠারো শতকে প্রাচ্যবিষয়ক গবেষণা ও লেখালেখিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাত–বিশপ লাউথ, এইখ হর্ন, হার্ডার ও মেকিয়াভেলি প্রমুখ অগ্রগামীর দ্বারা বাইবেল গবেষণায় সূচিত বিপ্লব।

প্রথমত, আমাকে ব্রিটিশ-ফরাসি ও এরপর আমেরিকান ব্যাপারগুলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হয়েছে। কারণ ব্রিটিশ ও ফ্রান্স কেবল প্রাচ্য ও প্রাচ্যবিদ্যায় পথিকৃৎ জাতিই নয়, এই পথিকৃৎ অবস্থান তারা ধরেও রেখেছিল প্রাক-বিশ শতকের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ দুই সাম্রাজ্যবাদী নেটওয়ার্কের গুণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রাচ্য বিষয়ে আমেরিকার অবস্থান হয়–আমি মনে করি, অত্যন্ত সচেতনভাবেই পূর্বের দুই ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা খনন করা স্থানে। তাই আমি এ-ও বিশ্বাস করি, নিরেট উৎকর্ষ, পারম্পর্য ও সংখ্যাগত বিশালতা ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান রচনারাজিকে জার্মানি, ইতালি, রাশিয়া ও অন্যত্র কৃত নিশ্চিত গুরুত্বপূর্ণ কাজেরও ঊর্ধ্বে তুলে এনেছে। এ কথাও সত্য যে প্রাচ্যবিষয়ক পাণ্ডিত্যের প্রধানতম পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়েছে হয় ব্রিটেন অথবা ফ্রান্সে; অতঃপর তা বিস্তৃত করেছে জার্মানরা। যেমন সিলভেস্ত্রা ডি সেসি কেবল প্রথম আধুনিক ইউরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকই নন, যিনি ইসলাম, আরবি সাহিত্য, দ্রুজ ধর্মমত ও সাসানিদ পারস্য নিয়ে কাজ করেছেন, তিনি তুলনামূলক জার্মান ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা শ্যাঁপোলিয়ঁ ও ফ্রাঞ্জ বপের শিক্ষকও। একই রকম অগ্রবর্তিতা ও উত্তরাকালীন খ্যাতি দাবি করা যায় উইলিয়াম জোনস ও ইউলিয়াম লেইনের জন্যও।

দ্বিতীয়ত, এবং এখানেই আমার প্রাচ্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় ব্যর্থতার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল এসব কারণে যে আমার ভাষায় 'আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব' বিকাশের পটভূমি হিসেবে বাইবেল অধ্যয়নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে প্রাসঙ্গিক হলো, ই. এস. শ্যাফার্সের প্রভাবসম্পাতি *কুবলা খান* ও *দ্য ফল অব জেরুজালেম*[১৪]। এটি রোমান্টিসিজমের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা অনিবার্য অধ্যয়ন–কোলরিজ, ব্রাউনিং ও জর্জ এলিয়টে যা হয়েছে তার ভিত্তিমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ। জার্মান পণ্ডিতদের বাইবেল অধ্যয়নবিষয়ক রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক উপাত্ত বেছে সমন্বিতকরণ এবং তা ব্যবহার করে বুদ্ধিদৃপ্ত ও

মনোগ্রাহীরূপে ওই তিন ব্রিটিশ লেখককে পাঠ করার মধ্য দিয়ে শ্যাফার্সের কাজ স্কোয়াব কর্তৃক চিহ্নিত বহির্কাঠামোরেখাকে আরও পরিশুদ্ধ করেছে। তবু গ্রন্থটিতে যে জিনিসটির অভাব রয়েছে তা হলো, রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক তীক্ষ্ণতা, যা আছে ব্রিটিশ-ফরাসি লেখকদের রচনায়, যারা আমার মুখ্য আগ্রহ। তা ছাড়া শ্যাফার্স করেননি, কিন্তু আমি বিদ্যায়তনিক ও সাহিত্যিক প্রাচ্যতত্ত্বে পরবর্তীকালের বিস্তারগুলো ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছি। এগুলোয় একদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্বের সংযোগ, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের ছাপ আছে। আমি এ-ও দেখাতে চাই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ সকল পূর্বসংঘটিত ব্যাপারগুলোই কীভাবে কমবেশি পুনরুৎপাদিত হয়েছে আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্বে।

এতৎসত্ত্বেও আমার লেখায় বিভ্রম-সম্ভাবক একটি দিক রয়ে গেছে। আমি সেসি-প্রভাবিত উদ্বোধন-পর্বের পরবর্তীকালের জার্মানদের কাজ নিয়ে কদাচিৎ উল্লেখ ছাড়া বিস্তারিত আলোচনা করিনি। বিদ্যায়তনিক প্রাচ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য নিয়ে সূচিত কোনো রচনায় যদি স্টেইনথাল, মুলার, বেকার, গোলজ্জিয়ের, ব্রোকেলমান নোলডিকের মতো (কয়েকজন মাত্র উল্লেখিত) পণ্ডিতদের প্রতি সামান্যমাত্র মনোযোগ দেওয়া হয় তাহলে তা সমালোচিত হওয়া উচিত; এবং আমি মুক্ত চিত্তে নিজের সমালোচনা করি। বিশেষত, আমার দুঃখ, উনিশ শতকের মাঝামাঝি কালপর্বে জার্মানদের অর্জিত বিরাট বৈজ্ঞানিক মর্যাদা আরও ভালোভাবে বিবেচনায় আনিনি; এ ধরনের উপেক্ষাকেই জর্জ এলিয়ট সংকীর্ণমনা ব্রিটিশ পণ্ডিতদের দ্বারা জার্মান পণ্ডিতদের নিন্দা বলে অভিহিত করেছিলেন। আমার মাথায় আছে *মিডলমার্চ*-এ জর্জ এলিয়টের বর্ণনায় ক্যাসোবনের অবিস্মরণীয় চিত্রটি। তার চাচাতো ছোট ভাই ল্যাডিস্লোর মতে, ক্যাসোবন যেসব পুরাণকাহিনির সমাধান শেষ করতে পারেননি, তার একটা কারণ তিনি জার্মান পাণ্ডিত্যের সাথে পরিচিত ছিলেন না। কেবল এ কারণে নয় যে, তিনি এমন বিষয়ই বেছে নিয়েছেন যা 'রসায়নের মতো পরিবর্তনশীল, যেখানে নিয়ত নতুন আবিষ্কার জন্ম দিচ্ছে নতুন দৃষ্টিকোণ'। তিনি এমন এক দায়িত্ব নেন যা প্যারাসেলসোসকে ভুল প্রমাণ করার প্রয়াসের সমতুল্য, এই অজুহাতে যে, 'জানেন, তিনি প্রাচ্যতাত্ত্বিক নন!'[১৫]

জর্জ এলিয়ট এমন ধরে নিয়ে ভুল করেননি যে, ১৮৩০ সালের মধ্যে, অর্থাৎ *মিডলমার্চ* চলমান যখন, তখন জার্মান পাণ্ডিত্য পুরোপুরি ইউরোপীয় খ্যাতি অর্জন করেছে। তবু উনিশ শতকের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে কখনো প্রাচ্যে বলবৎ দীর্ঘকালীন জাতীয় স্বার্থ ও প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে অংশীদারির সম্পর্ক বিকশিত হয়নি। ভারত, লেভান্ত, উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশ-ফ্রেঞ্চ উপস্থিতির তুলনায় বিশেষ কোনো অবস্থান ছিল না জার্মানির। তা ছাড়া জার্মানির 'প্রাচ্য বিশেষভাবে পণ্ডিতি প্রাচ্য, অথবা অন্তত ধ্রুপদ প্রাচ্য' : এ প্রাচ্য গীতিকবিতা, কল্পকাহিনি, এমনকি

উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা প্রকৃত প্রাচ্য নয়–) যেভাবে শ্যাতোব্রোঁ, লেইন, ল্যামারটিন, বার্টন, ডিজরাইলি, নেরভালের কাছে সিরিয়া ও মিসর ছিল যথার্থ আসল।

প্রাচ্য বিষয়ে জার্মানির সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো কাজ গ্যোয়েটের *Wostostlicher Diwan* ও ফ্রেডরিখ শ্লেগেলের *Uber die Sprache and Weisheirt der indier* রচিত হয়েছিল যথাক্রমে রাইন নদীতে একটা ভ্রমণ এবং প্যারিস গ্রন্থাগারে কয়েক ঘণ্টা যাপনের ওপর ভিত্তি করে; এ ব্যাপারটি গুরুত্ববহ। জার্মান পাণ্ডিত্য প্রাচ্যতত্ত্বের কৌশলগুলো সূক্ষ্ম ও বিকশিত করেছে, আর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক প্রাচ্য থেকে সংগৃহীত রচনা, পুরাণ ও ভাষার ওপর এসব কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে।

ব্রিটিশ-ফরাসি ও পরবর্তীকালের আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্বের সাথে জার্মান প্রাচ্যতত্ত্বের সাদৃশ্য হলো, পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রাচ্যের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্বের অনেকটাই প্রাচ্যতত্ত্ব-সম্পর্কিত যেকোনো বর্ণনার বিষয় হবে; বর্তমান রচনাতেও তা-ই হয়েছে। প্রাচ্যতত্ত্ব নামটিই গম্ভীর, হয়তো ভাবনাসাধ্য পাণ্ডিত্যের ইঙ্গিত করে। যখন আমি আধুনিক আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহার করি (যেহেতু, তারা নিজেদের প্রাচ্যতাত্ত্বিক বলেন না, তাই আমার ব্যবহার রীতিবিরুদ্ধ), তা করি মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে, যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যবিদেরা এখনো উনিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্ব-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানের ছিটেফোঁটা অবশেষের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বিশেষজ্ঞতা সম্পর্কে রহস্যময় বা প্রকৃতি-প্রদত্ত কিছু নেই। এটা গঠিত, আলোকোদ্ভাসিত, প্রচারিত : এটা উপায়স্বরূপ, প্ররোচক। এর নির্দিষ্ট মর্যাদা আছে; এটা রুচি ও মূল্যবোধ-বিষয়ক নীতিমালাও রচনা করে। তা যেসব নির্দিষ্ট মতাদর্শকে সত্য বলে তুলে ধরে এবং যে ঐতিহ্য, উপলব্ধি ও বিচার-বিবেচনা সংগঠিত, সংক্রমিত ও পুনরুৎপাদন করে, তা থেকে একে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, কর্তৃত্ব বিশ্লেষণযোগ্য এবং একে অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে। কর্তৃত্বের ওই সব আরোপিত ধর্ম প্রাচ্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি বর্তমান অধ্যয়নে যা করেছি, তার অনেকটাই হলো প্রাচ্যতত্ত্বের ঐতিহাসিক কর্তৃত্ব এবং এর ব্যক্তিক কর্তৃত্ব বর্ণনা।

আমি কর্তৃত্ব বিশ্লেষণে যেসব প্রধান প্রধান কৌশল ব্যবহার করেছি, ওগুলোকে এভাবে বলা যায় : কৌশলগত অবস্থান–লেখক প্রাচ্যের যে বিষয় নিয়ে লিখছেন, তার প্রেক্ষিতে রচনায় তার অবস্থান বর্ণনার উপায়, কৌশলগত গঠন–যে প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ রচনা, রচনার কোনো একটা ধরন বা গোটা একটি শ্রেণি-ঐক্য ও পারস্পরিক নিবিড়তা পায় এবং নিজেদের মধ্যে ও সেই সূত্রে সমগ্র সংস্কৃতিতে

পারস্পরিক উল্লিখন-ক্ষমতা লাভ করে সেই প্রক্রিয়ার সাথে রচনাগুচ্ছের সম্পর্ক বিশ্লেষণের উপায় হলো কৌশলগত গঠন। আমি কৌশলের ধারণা ব্যবহার করেছি শুধু সেই সমস্যাটি চিহ্নিত করার জন্য, প্রাচ্যবিষয়ক প্রতিটি লেখকই যা বোধ করেন : তা হলো 'প্রাচ্য'কে কীভাবে বাগে আনতে হবে, কোন উপায়ে এতে ঢুকতে হবে এবং কীভাবে এর মহত্ত্ব, এর বিস্তার ও বিরাট আওতার কাছে পরাজয় বা মোহগ্রস্ত তা ঠেকাতে হবে। যিনিই প্রাচ্য সম্পর্কে লেখেন, তাকেই প্রাচ্যের মুখোমুখি অবস্থান নিতে হয়। তার এই অবস্থান অনূদিত হয় তার রচনায় যার মধ্যে আছে গৃহীত বয়ন-স্বর, তার নির্মিত কাঠামো, চিত্রকল্প, বিষয়বস্তু, রচনায় ছড়ানো উপাদানসমূহ; এ সমস্ত কিছুই যুক্ত হয় সুচিন্তিতভাবেই পাঠকের কাছে পৌঁছার, প্রাচ্যকে ধারণ করার এবং প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করা বা তার পক্ষে কথা বলার প্রয়াসে। এর কিছুই বিমূর্তভাবে ঘটে না। প্রাচ্যবিষয়ক প্রত্যেক লেখকই (এমনকি হোমারও) প্রাচ্যসম্পর্কিত কিছু পূর্বঘটনা, কিছু পূর্বজ্ঞান ধরে নেন, তিনি সেসবের ওপর নির্ভর করেন, সেগুলোর উদাহরণ টানেন। তা ছাড়া প্রাচ্যবিষয়ক প্রতিটি রচনাই অন্যান্য সমধর্মী রচনা, পাঠকগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং প্রাচ্যের সাথেও নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। প্রাচ্যবিষয়ক বিভিন্ন রচনা, পাঠকগোষ্ঠী এবং প্রাচ্যের কয়েকটি দিকের পারস্পরিক সম্পর্কের যূথবদ্ধতা আভাসিত করে বিশ্লেষণযোগ্য একটি কাঠামো; যেমন, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা, প্রাচ্যবিষয়ক সাহিত্য-নির্যাসের সংকলনসমূহ, ভ্রমণকাহিনি, প্রাচ্য কল্পকাহিনি ইত্যাদি; কালপর্ব, চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে (যেমন স্কুল, লাইব্রেরি, পররাষ্ট্র দপ্তরে) এগুলোর অবস্থান প্রাচ্যতত্ত্বকে দেয় সামর্থ্য ও কর্তৃত্ব।

আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে, প্রাচ্যবিষয়ক রচনায় যা লুক্কায়িত বা সুপ্ত তার বিশ্লেষণ আমার কর্তৃত্ব-বিষয়ক আগ্রহের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং রচনার উপরিতলের বিশ্লেষণ–যেখানে বর্ণনা সেই বহিরঙ্গেই আমার আগ্রহ। এ ধারণাটি আরও বেশি বিস্তৃত করা যেতে পারে বলেও আমি মনে করি না। প্রাচ্যতত্ত্ব বিকাশের উপক্রমণিকা হয়েছে বহিরঙ্গের ওপর; অর্থাৎ এই বাস্তবের ওপর ভিত্তি করে যে প্রাচ্যতাত্ত্বিক, কবি বা পণ্ডিত প্রাচ্যকে কথা বলিয়েছে, প্রাচ্যকে বর্ণনা করেছে, তার রহস্য সরলভাবে পশ্চিমের জন্য এবং পশ্চিমের কাছে তুলে ধরেছে।

লেখক প্রাচ্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন না–কেবল এটুকু ব্যতীত যে, তার কথা বলার প্রথম কারণ প্রাচ্য। তিনি যা বলেন ও লেখেন, তা কথিত ও লিখিত হওয়ার ঘটনাগুণে ইঙ্গিত করে যে, প্রাচ্যতাত্ত্বিক (দৈহিক) অস্তিত্বের দিক থেকে এবং নৈতিকতার প্রশ্নেও প্রাচ্যের বাইরে আছেন। এই বহিরঙ্গের উৎপাদন হলো প্রতিনিধিত্ব। সেই দূর অতীতে এস্কিলাসের নাটক *দ্য পার্সিয়ান*-এর সময়ই প্রাচ্য বহুদূরবর্তী ও প্রায়শ হুমকিজনক 'অন্যতা' (আদারনেস) থেকে রূপান্তরিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত পরিচিত অবয়বে (এস্কিলাসে শোকরত এশীয় নারীতে)। *দ্য পার্সিয়ান*-

এ প্রতিনিধিত্বের নাটকীয় বর্তমানতা এ বাস্তবতা আড়াল করে রাখে যে, দর্শক খুবই কৃত্রিম একটি অভিনয় দেখছেন, যাকে প্রাচ্যের বাইরের কোনো এক ব্যক্তি সমস্ত প্রাচ্যের প্রতীকরূপে হাজির করেছেন। তাই প্রাচ্যবিষয়ক রচনার যে বিশ্লেষণ আমি উপস্থিত করি, তা প্রাচ্যের স্বাভাবিক প্রতিরূপের প্রতিনিধিত্বের ওপর নয়, বরং প্রতিনিধিত্বরূপী প্রতিনিধিত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর গুরুত্ব দেয়, যা কোনোভাবেই অদৃশ্য নয়।

এরকম দৃষ্টান্ত মিলে তথাকথিত 'সত্যাশ্রয়ী' রচনায় (ইতিহাস, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক গবেষণাকর্মে), তেমনি প্রকৃত সৃষ্টিশীল (সোজা কথায় কাল্পনিক) রচনায়। ওতে দেখা হয় রচনারীতি, বক্তব্যের গঠন, বিন্যাস, বর্ণনাকৌশল, ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। প্রতিনিধিত্বের সঠিকতা, বা প্রকৃত বিষয়ের তুলনায় এর বাস্তবতা কতটুকু, তার প্রতি নজর দেওয়া হয় না। প্রতিনিধিত্বের বহিরঙ্গ সকল সময় এ ধরনের প্রচলিত জনপ্রিয় উক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় : তা হলো, 'প্রাচ্য যদি নিজেকে *প্রতিনিধিত্ব* করতে পারত তাহলে তা সে করত; যেহেতু প্রাচ্য তা পারে না, তাই প্রতিনিধিত্ব 'বেচারা' প্রাচ্যের জন্য সেই দায়িত্ব পালন করে'। যেমন– *Eighteenth Brumaire of Louise Bonaparte*-এ মার্ক্স লিখেছেন, 'Sie konnen sich nicht vertreten, sie mussen vertreten werden'।

বাইরের দিকটায় জোর দেওয়ার একটা কারণ হলো, আমার বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ডিসকোর্স ও কোনো সংস্কৃতিতে আদান-প্রদান সম্পর্কে একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার যে, এটি সচরাচর যা প্রচার করে তা সত্য নয়, *প্রতিনিধিত্ব* মাত্র। এখানে পুনর্বার দেখানোর প্রয়োজন নেই যে, ভাষা নিজে একটি সুসংগঠিত ও সংকেতাবদ্ধ পদ্ধতি যা অভিব্যক্তিকরণ, নির্দেশন, বক্তব্য ও তথ্য আদান-প্রদান, প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদির জন্য অনেক কৌশল ব্যবহার করে। যেকোনো দৃষ্টান্তে–বিশেষত লিখিত ভাষায় 'প্রদত্ত উপস্থিতি' বলে কিছু নেই, আছে প্রতি-উপস্থিতি বা 'প্রতিনিধিত্ব'। অতএব, প্রাচ্যসম্পর্কিত লিখিত বক্তব্যের মূল্য, কাঙ্ক্ষিত ফলোৎপাদন ক্ষমতা, সামর্থ্য ও আপেক্ষিক সত্যতা প্রাচ্যের মুখাপেক্ষী নয়, এবং মূলগতভাবে প্রাচ্যের ওপর নির্ভরশীলও হতে পারে না। বরং উল্টো লিখিত বক্তব্যই 'প্রাচ্য'র প্রকৃত সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্থানচ্যুত হওয়ার গুণে এবং প্রকৃত প্রাচ্য এখানে অপ্রয়োজনীয় হওয়ার কারণে পাঠকের কাছে নিজেই একধরনের 'উপস্থিতি'। তাই প্রাচ্যতত্ত্বের সবকিছু প্রাচ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ ও প্রাচ্য থেকে দূরবর্তী; অর্থাৎ প্রাচ্যতত্ত্ব যতটা অর্থ বহন করে, তা প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যর ওপরই বেশি নির্ভরশীল এবং সে অর্থ আবার সরাসরি নির্ভর করে প্রতিনিধিত্বকরণের পশ্চিমের ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশলের ওপর, যে কৌশলসমূহ প্রাচ্যকে দৃশ্যমান, পরিষ্কার এবং এতৎসম্পর্কিত ডিসকোর্সে আসীন করে। এই প্রতিনিধিত্ব দূরবর্তী ও আকারহীন প্রাচ্যের ওপর নির্ভর করে না; বরং

নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য, প্রথা এবং তাদের কার্যকারিতার জন্য পরস্পর সম্মত উপলব্ধির সংকেতসমূহের ওপর।

আঠারো শতকের শেষ তৃতীয়াংশের পূর্বে প্রাচ্যর 'প্রতিনিধিত্ব' এবং পরবর্তীকালের (অর্থাৎ আমি যাকে বলছি আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব, তার) 'প্রতিনিধিত্ব'র পার্থক্য হলো দ্বিতীয়োক্ত কালপর্বে তা অত্যন্ত বিস্তৃত। এ কথা সত্য যে ইউলিয়াম জোনস ও অ্যাঁকুইতিল দুপেরন এবং নেপোলিয়নের মিসর অভিযানের পর ইউরোপ প্রাচ্যকে পূর্বের তুলনায় আরও বৈজ্ঞানিকভাবে জানতে পারে, আরও বৃহত্তর কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলার সাথে ওখানে বসবাসের সুযোগ পায়। তবে ইউরোপের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো নতুন বিস্তৃত সুযোগ এবং প্রাচ্যকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কৌশলগত পরিশোধন। শতাব্দীর শেষে যখন প্রাচ্য নিশ্চিতভাবে তার 'ভাষার যুগ' উন্মোচিত করে এবং এভাবে বাতিল করে হিব্রুর স্বর্গীয় উত্তরাধিকার, তখন একদল ইউরোপীয়ই সে আবিষ্কার সম্পন্ন করে, অন্য পণ্ডিতদের কাছে তা হস্তান্তর করে এবং এ আবিষ্কার সংরক্ষণ করা হয় নতুন বিজ্ঞান 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে'। ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচ্যকে বিশ্লেষণ করার জন্য জন্ম হয় নতুন এক শক্তিশালী বিজ্ঞানের, সেই সঙ্গে একরাশ সম্পর্কযুক্ত বৈজ্ঞানিক আগ্রহের, ফুকো যা তার *অর্ডার অব থিংস*-এ দেখিয়েছেন। তেমনি উইলিয়াম ব্যাকফোর্ড, বায়রন, গ্যোয়েটে ও হুগো তাদের শিল্পসৃষ্টির দ্বারা প্রাচ্যকে পুনর্গঠিত করেন; তাদের সৃষ্ট কল্পমূর্তি, ছন্দ, উদ্দেশ্যের মাধ্যমে দৃশ্যমান করে তোলেন এর বর্ণ, বিভা ও জনগোষ্ঠী। 'বাস্তব' প্রাচ্য বড়জোর একজন লেখকের উদ্দেশ্য উসকে দেয়; তাকে পরিচালিত করে কদাচিৎ।

প্রাচ্যতত্ত্ব পশ্চিমের সৃষ্ট ও সাধারণভাবে গৃহীত বস্তুভিত্তির চেয়ে তার সৃজক সংস্কৃতির প্রতিই অধিক সাড়া দেয়। অতএব, প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাসের রয়েছে একদিকে, আন্তরসামঞ্জস্য এবং অন্যদিকে, তাকে ঘিরে থাকা আধিপত্যকারী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে সুস্পষ্ট একরাশ সম্পর্ক। আমার বিশ্লেষণ দেখানোর চেষ্টা করেছে এ ক্ষেত্রটির আকৃতি ও আন্তরসংগঠন, এর অগ্রদূতগণ, রক্ষণশীল কর্তৃত্ব, নীতিনির্ধারক, গ্রন্থরাজি, মতাদর্শ, উপমান ব্যক্তিত্ব, এর অনুসারী দল, বিকাশসাধকবৃন্দ ও নতুন বিশেষজ্ঞদলকে। সংস্কৃতিকে শাসন করে এমন সব শক্তিশালী মতবাদ থেকে প্রাচ্যতত্ত্ব কীভাবে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং তা দ্বারা অবহিত হয়েছে, তা দেখানোর প্রয়াসও আছে। সুতরাং ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচ্য, ফ্রয়েডীয় প্রাচ্য, স্পেঙলারিয়ান প্রাচ্য, ডারউইনীয় প্রাচ্য, বর্ণবাদী প্রাচ্য ইত্যাদি নানা রকম প্রাচ্য ছিল (ও আছে)। এ সত্ত্বেও বিশুদ্ধ, নিঃশর্ত 'প্রাচ্য'-জাতীয় কিছু কখনোই ছিল না; একইভাবে প্রাচ্যতত্ত্বের অবৈষয়িক কোনো রূপ কখনো ছিল না, প্রাচ্যের 'ভাবমূর্তি'-জাতীয় নির্দোষ কিছু তো দূরের কথা।

অন্তঃস্থ এই বিশ্বাস এবং তার ফলস্বরূপ পদ্ধতিগত ঘটনাক্রমের প্রশ্নে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি, সেসব পণ্ডিতের থেকে যারা চিন্তার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন।

প্রাচ্যবিষয়ক ডিসকোর্সের বিবৃতির বিশেষ অর্থ আরোপ ও প্রশাসনিক ঢং, সবচেয়ে বড় কথা বৈষয়িক কার্যকারিতা সম্ভবপর হয়ে ওঠে এমনতর সব উপায়ে যা মতাদর্শের যেকোনো রুদ্ধদ্বার ইতিহাস বর্জন করতে চাইবে। তবে বাড়তি জোর প্রদান এবং বৈষয়িক কার্যকারিতা ছাড়া প্রাচ্যতত্ত্ব হয়ে উঠবে আরেকটি মতাদর্শ মাত্র; অথচ তা মতাদর্শের চেয়ে বেশি কিছু ছিল এবং আছে। আমি তাই কেবল গবেষণাকর্ম নয়, সাহিত্যিক রচনা, রাজনৈতিক বর্ণনা, সাংবাদিক লেখাজোখা, ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ, ধর্ম ও ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়নও পরীক্ষা করেছি। অন্য কথায়, আমার *বহু-আঁশলা* পরিপ্রেক্ষিত সামগ্রিকভাবে 'ঐতিহাসিক' ও নৃতাত্ত্বিক, এই শর্তে যে আমি মনে করি, সকল রচনাই বৈষয়িক ও পরিস্থিতি সম্পৃক্ত–এমন এক উপায়ে যা শ্রেণিতে শ্রেণিতে ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে যুগে ভিন্ন ভিন্ন।

যার কাছে আমার অনেক ঋণ সেই মিশেল ফুকো যদিও মনে করেন না, কিন্তু আমি মনে করি, প্রাচ্যতত্ত্বের মতো কোনো ডিসকোর্সের একই ধরনের অবয়ব ফুটিয়ে তুলে সাধারণ লেখকদের যে গ্রন্থরাজি সেগুলোর ওপর বিভিন্ন ব্যক্তি-লেখকের গভীরতর একক প্রভাবও পড়ে। বিপুল পরিমাণ গ্রন্থের স্তূপ বিশ্লেষণের একটা কারণ হলো, এসব রচনা পরস্পরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে; প্রাচ্যতত্ত্ব তো বিভিন্ন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে উদ্ধৃত করার একটা পদ্ধতিও। নেরভাল, ফ্লবেয়ার ও রিচার্ড বার্টনের মতো বিচিত্র ব্যক্তিত্ব এডওয়ার্ড ইউলিয়াম লেইনের *ম্যানারস অ্যান্ড কাস্টমস অব মডার্ন ইজিপশিয়ানস* পড়েছেন এবং উদ্ধৃত করেছেন। যিনি কেবল মিসর নয়, প্রাচ্যের যেকোনো বিষয়ে লিখবেন বা চিন্তা করবেন, তিনিই লেইনকে ব্যবহার করতে বাধ্য; কারণ লেইন এক্ষেত্রে বিবেশষজ্ঞ হিসাবে বিবেচিত। নেরভাল যে *মডার্ন ইজিপশিয়ান* থেকে হুবহু একটা প্যারা উদ্ধৃত করেন তা মিসরকে বর্ণনার জন্য নয়, বরং সিরিয়ার একটা গ্রামের দৃশ্য বর্ণনায় লেইনের সহায়তা গ্রহণের জন্য। লেইনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য তার বিশেষজ্ঞ অবস্থান ও সুযোগ প্রস্তুত ছিল। কারণ, তিনি যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন, প্রাচ্যতত্ত্ব সেই গ্রহণযোগ্যতাকে ছড়িয়ে পড়ার সনদ দিতে পারত। তার রচনার উদ্ভটত্ব না বুঝলে লেইনের গ্রহণযোগ্যতাও বোঝা যাবে না। একই কথা সত্যি রেনান, সেসি, ল্যামারটিন, শ্লেগেল এবং অন্য প্রভাবশালী লেখকদের গোটা একটা দল সম্পর্কেও। ফুকো বিশ্বাস করেন, সচরাচর একক রচনা বা একজন লেখক অতটা গুরুত্বপূর্ণ নন; বাস্তবে, প্রাচ্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে (এবং অন্য কোথাও নয়) তা হয়নি। যথারীতি আমার বিশ্লেষণে নিবিড় গ্রন্থ পাঠ ব্যবহার করেছি, যার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি লেখক বা একক রচনা এবং সেই রচনা যে একীভূত গ্রন্থরাজির দলভুক্ত তার মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করা।

এ গ্রন্থে যদিও প্রচুরসংখ্যক লেখক অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তবু এটি প্রাচ্যতত্ত্বের সামগ্রিক বর্ণনা বা সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। এই ব্যর্থতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

প্রাচ্যতত্ত্বের মতো নিবিড় একটি গঠন এখনো পশ্চিমা সমাজে টিকে আছে এবং ক্রিয়াশীল রয়েছে এর সমৃদ্ধির কারণে; আমি কেবল নির্দিষ্ট সময়পর্বে ওই গঠনের কিছু অংশ বর্ণনা করেছি এবং বড়জোর ইঙ্গিত করেছি অনুপুঙ্খ বৃহত্তর সমগ্রের প্রতি যাতে রয়েছে আকর্ষণীয়, বিস্ময়কর পরিসংখ্যান, গ্রন্থাদি ও ঘটনাবলির ছাপ। অবশ্য এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে বর্তমান রচনাটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্ভাব্য অনেক কিস্তির এক কিস্তি এবং আমার আশা, অনেক লেখকই আছেন যারা বাকি অংশ রচনা করবেন। সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক প্রবন্ধও এখনো লেখা হয়নি। অন্যান্য গবেষণা হয়তো প্রাচ্যতত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক কিংবা ইতালীয়, ডাচ, জার্মান ও সুইস প্রাচ্যতত্ত্বের বা পাণ্ডিত্যময় রচনা ও কাল্পনিক রচনার পারস্পরিক গতিবেগ অথবা প্রশাসনিক মতাদর্শ ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়মনীতির গভীরতর স্তরে প্রবেশ করত। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতো প্রাচ্যতত্ত্বের সমকালীন বিকল্পসমূহ বিশ্লেষণের সূচনা করলে, কীভাবে অন্যান্য সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীকে উদারতাবাদী বা দমনবিমুখ ও অ-প্রভাবক পটভূমিতে অধ্যয়ন করা যায়, সে প্রশ্ন উত্থাপন করলে। তবে সেক্ষেত্রে জ্ঞান ও ক্ষমতার জটিল সমস্যাটি সম্পর্কেও পুনরায় ভেবে দেখতে হবে। বর্তমান রচনায় এসব কাজ পীড়াদায়কভাবে অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

সবশেষে হয়তো আত্ম-তোষামোদকর ভঙ্গিতে বলব, এখানে আমি পদ্ধতিগত যে লক্ষ রেখেছি তা হলো, এ রচনাটি আমি লিখেছি মনে মনে বেশ কিছু পাঠককে সামনে রেখে। প্রাচ্যতত্ত্ব সাহিত্য ও সমালোচনার ছাত্রদের কাছে সমাজ, ইতিহাস ও রচনার আন্তসম্পর্কের চমৎকার উদাহরণ তুলে ধরে; অধিকন্তু পশ্চিমা সমাজে প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক ভূমিকা প্রাচ্যতত্ত্বকে ভাবাদর্শ, রাজনীতি ও ক্ষমতার যুক্তিবোধের সাথে সম্পর্কিত করে, যা সাহিত্যিক সমাজের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে।

প্রাচ্যবিষয়ক সমকালীন শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গ থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারকদের জন্য আমি দুটো প্রান্ত ভেবে নিয়ে লিখেছি : এক, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জন্ম ও বংশপরিচয় এমনভাবে উপস্থাপন করেছি, যা আগে কখনো করা হয়নি; দুই, তাদের লেখাজোখা যেসব অ-জিজ্ঞাসিত আন্দাজের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলোর সমালোচনা করেছি–বেগবান আলোচনার সূত্রপাত হবে এই আশায়। সাধারণ পাঠকদের জন্য বর্তমান গ্রন্থে এমন সব বিষয় আলোচিত হয়েছে যা সকল মনোযোগ টেনে নেয়। তার সবই 'আন' (আদার) সম্পর্কে পশ্চিমের উপলব্ধি ও মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত নয় কেবল, ভিকোর ভাষায় 'জাতিসমূহের পৃথিবীতে' পশ্চিমা সংস্কৃতির একক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সাথেও যুক্ত। সবশেষে, তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের পাঠকদের কাছে এ রচনা, পশ্চিমা রাজনীতি এবং সে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত অ-পশ্চিমা জগৎকে বোঝার জন্য ততটা নয়, বরং এটা পশ্চিমা সংস্কৃতির শক্তি উপলব্ধির একটা ধাপরূপে বিবেচনার দাবিদার, যে শক্তিকে প্রায়শই বাইরের ব্যাপার বা সাজসজ্জার মতো বলে ভুল করা হয়।

আমার অভিপ্রায় সাংস্কৃতিক আধিপত্যের দুর্মর কাঠামোটি অঙ্কিত করা, এবং বিশেষ করে প্রাক্তন-উপনিবেশিত মানুষদের ক্ষেত্রে, ওই কাঠামোটি নিজেদের এবং অন্যের ওপর আরোপের প্রলোভন ও আরোপের ফলে সম্ভাব্য বিপদের বিষয়টি পরিষ্কার করা।

গ্রন্থটি বিভক্ত তিনটি দীর্ঘ অধ্যায় ও ১২টি উপ-অধ্যায়ে। ওই প্রদর্শনের কাজটি যত বেশি সম্ভব ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য এগুলো করা হয়েছে। ঐতিহাসিক কালপর্ব ও অভিজ্ঞতা এবং দার্শনিক ও রাজনৈতিক বিষয় উভয় দিক বিচার করে প্রাচ্যতত্ত্বের সকল মাত্রা ঘিরে একটি বিশাল রেখা অঙ্কিত হয়েছে প্রথম অধ্যায় 'প্রাচ্যতত্ত্বের সীমানা'তে। আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের বিকাশ চিহ্নিতকরণের প্রয়াস রয়েছে সময়ানুক্রমিক বর্ণনা এবং গুরুত্বপূর্ণ কবি, শিল্পী, পণ্ডিতদের রচনায় ব্যবহৃত সাধারণ কৌশলসমূহ বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তৃতীয় অধ্যায় 'বর্তমান প্রাচ্যতত্ত্ব' শুরু হয়েছে যেখানে তার পূর্বপুরুষেরা শেষ করে গেছেন সেখান থেকে অর্থাৎ ১৮৭০ সালের কাছাকাছি। এটি প্রাচ্যে ব্যাপক উপনিবেশ বিস্তারের কালপর্ব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা চরমে পৌঁছায়। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ অংশ ব্রিটিশ ও ফরাসি আধিপত্যের পরিবর্তে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারটি তুলে ধরেছে; সবশেষে, ওখানে আমি সমকালীন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচ্যতত্ত্বের বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক বাস্তবতাসমূহ অঙ্কনের চেষ্টা করেছি।

৩. ব্যক্তিক মাত্রা

প্রিজন নোটবুকে গ্রামসি বলেন, 'বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনার শুরুটা হলো নিজে প্রকৃতপক্ষে কী, সে-সম্পর্কিত সচেতনতা এবং নিজেকে জানা–বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উৎপাদনরূপে, যে প্রক্রিয়া আপনার মধ্যে অসীম চিহ্নরাশি সঞ্চিত করেছে অথচ তার কোনো তালিকা রাখেনি'। এরপর গ্রামসি যে মন্তব্য করেন তা প্রাপ্ত একমাত্র ইংরেজি অনুবাদে কোনো অজ্ঞাত কারণে বর্জিত হয়েছে। অথচ গ্রামসির মূল ইতালীয় পাঠে এ কথাগুলো যোগ করে শেষ করা হয়েছে : 'অতএব, শুরুতে ওই রকম একটা তালিকা প্রস্তুতকরণ নিতান্ত জরুরি'।[১৬]

এ রচনায় আমার ব্যক্তিগত বিনিয়োগের বেশির ভাগটাই এসেছে দুটো ব্রিটিশ উপনিবেশে বেড়ে ওঠা শিশু হিসেবে 'প্রাচ্যদেশীয়' হয়ে ওঠার সচেতনতা থেকে। ওই দুই উপনিবেশে ও যুক্তরাষ্ট্রে আমার সকল পড়াশোনা পশ্চিমা ধাঁচের। এ সত্ত্বেও কম বয়সের ওই সুগভীর সচেতনতা অক্ষয় রয়ে গেছে। আমার এই অধ্যয়ন অনেক দিক থেকে প্রাচ্য বিষয়রূপী 'আমার' ওপর সেই সংস্কৃতির চিহ্নসমূহের তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস, যে সংস্কৃতির আধিপত্য সকল প্রাচ্যবাসীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে আমার বেলায় মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে ইসলামি প্রাচ্য।

গ্রামসি কর্তৃক নির্দেশিত তালিকাটি আমার অর্জন কি না, সে বিচার আমার কাজ নয়, যদিও অনুভব করেছি ওই রকম একটি তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি। সমগ্র রচনাতেই যতটা তীব্র ও যুক্তিসংগতভাবে সম্ভব বিশ্লেষণমুখী চেতনা সক্রিয় রাখার চেষ্টা করেছি; তেমনি সৌভাগ্য যে আমার শিক্ষার সুফল হিসেবে ঐতিহাসিক, মানববিদ্যা-সম্পর্কিত ও সাংস্কৃতিক গবেষণার কৌশলগুলো ব্যবহার করেছি। প্রাচ্যজনরূপে আবার এত কিছুর মধ্যেও ভুলে যাইনি যে, পরিগণিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমার ব্যক্তিগত ভূমিকাজনিত এক সাংস্কৃতিক বাস্তবতা রয়েছে।

যে জটিল ঐতিহাসিক পরিস্থিতিসমূহ বর্তমান গবেষণা সম্ভব করে তুলেছে, এখানে আমি সেগুলোর পরিকল্পিত তালিকা তুলে দিতে পারি কেবল। ১৯৫০ সাল থেকে যিনিই পশ্চিমে, বিশেষত, আমেরিকার বাসিন্দা, তিনিই 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য' সম্পর্কের এক বিশেষ যুগ অতিক্রম করেছেন। কারও নজর এড়ানোর কথা নয় যে, এ কালপর্বে প্রাচ্য বরাবরই বিপদ ও হুমকির নির্দেশক, যা প্রথাগত প্রাচ্যকে আবার রাশিয়াকেও বোঝায়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অঞ্চল-অধ্যয়ন কর্মসূচি ও ইনস্টিটিউটগুলো প্রাচ্যবিষয়ক পণ্ডিতি গবেষণাকে জাতীয় নীতির অঙ্গে পরিণত করে। প্রাচ্যের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক অদ্ভুতত্ত্বের জন্য এদেশে জনস্বার্থমূলক বিষয়াদির মধ্যে প্রাচ্য সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহও অন্তর্ভুক্ত। ইলেকট্রনিক যুগের পশ্চিমা নাগরিকদের কাছে পৃথিবী যদি তাৎক্ষণিক প্রবেশযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে প্রাচ্যও তার অনেক কাছে এসে গেছে এবং প্রাচ্য এখন তার কাছে যতটা না মিথ, তার চেয়ে বেশি পশ্চিমের, বিশেষ করে আমেরিকান স্বার্থের ছক কাটা একটি এলাকা।

উত্তরাধুনিক ইলেকট্রনিক পৃথিবীর একটি প্রবণতা হলো, পূর্বের নমুনা নতুনভাবে আরোপ করা এবং তার আলোকে প্রাচ্যকে বিচার করা। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও সকল প্রচারমাধ্যমের শক্তি তথ্যরাশিকে জোরপূর্বক একটি ক্রমশ আদর্শায়িত ছাঁচে রূপান্তরিত করে। প্রাচ্যের ক্ষেত্রে ওই আদর্শায়ন ও সাংস্কৃতিক ছাঁক-ঢালাইকরণ জোরদার করেছে উনিশ শতকীয় বিদ্যায়তনিক ও কাল্পনিক পিশাচবিদ্যার রহস্যময় প্রাচ্যের ধারণাকেই। এটি সবচেয়ে বেশি সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে নিকট-প্রাচ্যকে হৃদয়ঙ্গম করার প্রক্রিয়ায় (অন্য কোথাও অতটা সত্য নয়)।

আরব ও ইসলামকে সবচেয়ে সহজভাবে উপলব্ধির কাজটিও খুবই রাজনৈতিকায়িত–প্রায় গোলযোগপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করার জন্য দায়ী হলো তিনটি জিনিস। এক, পশ্চিমে জনপ্রিয় আরব ও ইসলামবিরোধী বোধ, যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাসে প্রতিফলিত; দুই, ইসরাইলি ইহুদি-রাষ্ট্রবাদ ও আরবদের সংঘাত, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিদের ওপর তেমনি উদারপন্থী সংস্কৃতি ও পরিশেষে

জনগোষ্ঠীর ওপর তার প্রভাব; তিন, আরব ও ইসলামের সাথে অভিন্ন বোধ করা বা ভাবাবেগমুক্ত আলোচনা সম্ভব করে তোলার মতো সাংস্কৃতিক অবস্থানের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। এ ছাড়া, বলা বাহুল্য যে, 'স্বাধীনতাপ্রিয়' ও 'গণতান্ত্রিক ইসরাইল' এবং তার বিপরীতে 'অশুভ, স্বৈরতান্ত্রিক, সন্ত্রাসী' আরবের ধারণাজাত নির্বোধ বিরোধাত্মক দ্বৈততা এবং সুগভীর শক্তি-রাজনীতি ও তেল-অর্থনীতির সাথে মধ্যপ্রাচ্য এতই জড়িয়ে গেছে যে, কেউ নিকট-প্রাচ্য সম্পর্কে কথা বলার সময় আসলে কী বলছে তা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারার সম্ভাবনা হতাশাজনকভাবে ক্ষীণ।

এসব বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় অংশত উদ্বুদ্ধ করেছে। পশ্চিম, বিশেষ করে আমেরিকাতে একজন আরব-ফিলিস্তিনির জীবনযাপন খুবই হতাশাগ্রস্ত। এদেশে এমন একটা সর্বসম্মত ধারণা আছে যে, এখানে তার (একজন ফিলিস্তিনি/আরবের) রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। যখন তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব মেনেও নেওয়া হয়, তখন মনে করা হয়, তার উপস্থিতি হয় বিরক্তিকর নতুবা 'প্রাচ্যদেশীয়'। আরব বা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রক বর্ণবাদী জাল, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, মানবতাবিরোধী মতাদর্শ প্রকৃতপক্ষে খুবই শক্তিশালী। এই জালটিকেই প্রত্যেক ফিলিস্তিনি তার অদ্বিতীয় শাস্তিমূলক নিয়তি হিসেবে অনুভব করতে বাধ্য। এ বিষয়টি পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে; ফলত সে (ফিলিস্তিনি) এমন মন্তব্য করছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে নিকট-প্রাচ্যের সাথে বিদ্যায়তনিকভাবে জড়িত কোনো প্রাচ্যতাত্ত্বিকই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রাচ্যের সাথে একাত্মবোধ করেননি। অবশ্যই নির্দিষ্ট মাত্রার একাত্মতার বোধ সৃষ্টিও হয়েছে। তবে তা কখনো ইহুদি রাষ্ট্রবাদের সাথে উদার আমেরিকান একাত্মবোধের মতো গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছায়নি এবং প্রায়শ (আরবদের সাথে) ওই একাত্মবোধ সহজাতভাবে হয় কলঙ্কময় রাজনৈতিক ও আর্থ-স্বার্থ (উদাহরণত তেল কোম্পানি, পররাষ্ট্র দপ্তরের অ্যারাবিস্ট) অথবা ধর্মীয় সম্পৃক্তি দোষে দুষ্ট।

তাই ক্ষমতা ও জ্ঞানের জোট যে 'প্রাচ্যজন' সৃষ্টি করছে এবং এক অর্থে তার মানবিক অস্তিত্ব মুছে ফেলছে, তা আমার কাছে কেবল বিদ্যায়তনিক বিষয় নয়। এ সত্ত্বেও তা কিছু অনিবার্য গুরুত্ববহ বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়। খুবই বৈষয়িক ব্যাপার, অর্থাৎ প্রাচ্যতত্ত্বের উত্থান, বিকাশ ও একীভুবন বর্ণনায় আমি আমার মানবিক ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ব্যবহার করতে পারতাম। প্রায়ই সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক এমনকি ঐতিহাসিকভাবে নির্দোষ বলে ধরে নেওয়া হয়। আমার কাছে তা সব সময়ই ভিন্ন কিছু বলে মনে হয়েছে।

প্রাচ্যতত্ত্ববিষয়ক গবেষণায় আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে (আশা করি আমার সাহিত্যিক সহকর্মীদেরও বিশ্বাস জন্মাবে) যে, সমাজ ও সাহিত্য কেবল একত্রেই উপলব্ধি ও অধ্যয়ন করা সম্ভব। তা ছাড়া, প্রায় দুর্লঙ্ঘনীয় যুক্তিতে বিচার করে দেখেছি, আসলে

পশ্চিমের অ্যান্টি-সেমিটিজমের এক অদ্ভুত, গোপন অংশীদারের ইতিহাস লিখছি আমি। ইসলামি শাখায় যেরূপ আলোচনা করেছি–এটি অ্যান্টি-সেমিটিজম ও প্রাচ্যতত্ত্ব ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সত্যরূপে পরস্পর খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। এর শ্লেষার্থ বোঝার জন্য কোনো আরব ফিলিস্তিনির কাছে কেবল এর উল্লেখ করাই যথেষ্ট। তবে সাংস্কৃতিক আধিপত্য যেভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার চেষ্টাও আমি করেছি। তা যদি প্রাচ্যের সাথে একটি নতুন ধরনের আদান-প্রদানের সূচনা করে, প্রকৃতপক্ষে তা যদি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ধারণাটিই মুছে ফেলে তাহলে, রেমন্ড ইউলিয়ামসের ভাষায়, 'উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আধিপত্যপ্রবণ রীতি'[১৬] বি-শিক্ষণের প্রক্রিয়ায় কিছুটা এগোতে পারব আমরা।

অধ্যায় এক

প্রাচ্যতত্ত্বের সীমানা

...le genie inqiiet et ambitieux de europeens... impatient d'employer les nouveaux instruments de leur puissance

—Jean-Baptiste-Joseph Fourier,

Preface historique (1809), *Description de l'Egypt.*

• ক •

প্রাচ্যকে জানা

জুন ১৩, ১৯১০ : 'মিসরে আমাদের যেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে' তার ওপর হাউস অব কমন্সের উদ্দেশে ভাষণ দেন আর্থার জেমস বেলফোর। 'আইলস অব উইট বা ওয়েস্ট রাইডিং ইয়র্কশায়ার'-এ উত্ত্যক্ত করছে যেসব সমস্যা, তিনি বলেন 'এগুলো তা থেকে ভিন্ন ধরনের।' বেলফোর কথা বলেন পাণ্ডিত্যের সাথে–পার্লামেন্টের দীর্ঘকালীন সদস্যপদ, লর্ড স্যালিসবারির প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিব, আয়ারল্যান্ড বিষয়ে প্রাক্তন মুখ্য সচিব, স্কটল্যান্ড বিষয়ে প্রাক্তন সচিব, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, অসংখ্য পররাষ্ট্রবিষয়ক সমস্যা, পরিবর্তন ও কৃতিত্বের পাণ্ডিত্য নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী কর্মতৎপরতায় জড়িত থাকার সময় বেলফোর এমন এক রানির পক্ষে দায়িত্ব পালন করেন যিনি ১৮৭৬ সালে ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষিত হন। আফগান ও জুলু যুদ্ধ, ১৮৮২ সালে ব্রিটিশদের মিসর দখল, সুদানে জেনারেল গর্ডনের মৃত্যু, ফ্যাসুদার ঘটনা, ওমডারমানের যুদ্ধ, বোয়ার যুদ্ধ ও রুশ-জাপান যুদ্ধ অনুসরণের জন্য তাকে বিশেষভাবে অসাধারণ প্রভাবশালী সব পদে বসানো হয়। বিশেষ সামাজিক খ্যাতি ছাড়াও, তার শিক্ষা ও বুদ্ধির ব্যাপ্তি–একাধারে বার্গসঁ, ম্যান্ডেল, থেয়িজিম এবং গলফের মতো বিচিত্র বিষয়ে লিখতে পারার ক্ষমতা–ইটনে, ট্রিনিটি কলেজ ও ক্যামব্রিজে পড়াশোনা এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আপাতদৃষ্টিতে তার দখল–এ সমস্ত কিছুই তাকে ১৯১০ সালের কমন্সসভায় ওই সব কথা বলার বিশেষ অধিকার এনে দেয়। আরও কথা আছে বেলফোরের বক্তব্য সম্পর্কে, কিংবা একে এত প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিকভাবে উপস্থাপনের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

কয়েকজন সদস্য 'মিসরে ইংল্যান্ডের' প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন (এটি আলফ্রেড মিলনার্সের ১৮৯২ সালের আগ্রহ সৃষ্টিকারী গ্রন্থের বিষয়)। তবে এর মধ্য দিয়ে তারা আসলে বলেন যে, একসময়ের মুনাফাজনক পেশা এখন সমস্যার উৎসে পরিণত হয়েছে এবং মিসরীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটেছে। মিসরে ইংল্যান্ডের অবস্থান অটুট রাখা এখন আর ততটা সহজ নয়। তাই বেলফোর অবহিত ও ব্যাখ্যা করবেন।

টিনিসাইডের সদস্য জে. এম. রবার্টসনের চ্যালেঞ্জের কথা স্মরণ করে বেলফোর নিজেই আবার রবার্টসনের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন : 'আপনি যাদের 'প্রাচ্যজন' বলবেন বলে ঠিক করেছেন, তাদের তুলনায় এমন শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব গ্রহণের কি অধিকার আছে আপনার?' 'অরিয়েন্টাল' বা 'প্রাচ্যজন'/'প্রাচ্যদেশীয়' শব্দগুলো পছন্দ করার ব্যাপারটি প্রথাগত; চসার, ম্যান্ডেভিল, শেক্সপিয়ার, ড্রাইডেন, পোপ, বায়রনও এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি ভৌগোলিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এশিয়া বা প্রাচ্যকে বোঝায়।

প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিত্ব, প্রাচ্যদেশীয় গল্প, প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র, প্রাচ্যদেশীয় উৎপাদন পদ্ধতি–এসব কথা ইউরোপে ব্যবহার করা যায়, অন্যরা বুঝতেও পারে। মার্ক্স এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন; এখন বেলফোর ব্যবহার করছেন। তার পছন্দের ব্যাপারটি বোঝা যায় এবং তা কোনো মন্তব্যও দাবি করে না।

> 'আমি বড়ত্বের ভাব দেখাচ্ছি না। তবে আমি বলি (রবার্টসন ও অন্য যে কাউকে)...ইতিহাস সম্পর্কে খুবই ভাসা ভাসা জ্ঞান যার, সেই সব ঘটনারাজির চেহারাটা একটু দেখবেন কি যেগুলো নিয়ে কাজ করতে হয় একজন ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ককে, যখন তাকে প্রাচ্যের অন্য জাতিগুলোর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়? আমরা অন্য কোনো দেশের চেয়ে মিসরের সভ্যতাকে ভালোভাবে জানি; আমরা তাকে অতীত পর্যন্ত জানি, খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানি, আমরা এর সম্পর্কে অনেক বেশি জানি। আমাদের জাতির ইতিহাসের ক্ষুদ্র ব্যাপ্তি যে যুগে প্রাগৈতিহাসিক কালে গিয়ে হারিয়ে গেছে, তখনই মিসরের সভ্যতা তার যৌবন পার হয়ে এসেছে। শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতার কথা বলবেন না।'

বেলফোরের বক্তব্য এবং পরে যে বক্তব্য আসে, তাকে প্রভাবিত করে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : জ্ঞান ও ক্ষমতা–বেকনের মূলভাব। বেলফোর যখন ব্রিটেন কর্তৃক মিসর-দখলের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেন, তখন তার মনে 'শ্রেষ্ঠত্ব'র ধারণা মিসরে 'আমাদের' জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ছিল, সামরিক বা অর্থনৈতিকভাবে নয়। বেলফোরের কাছে জ্ঞানের অর্থ হলো কোনো জাতিকে তার উৎপত্তি থেকে শুরু করে পরম বিকাশ ও পতন পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখা–এবং, অবশ্যই, তা করতে সক্ষম হওয়ায়ও বোঝায়। জ্ঞান হলো অব্যবহিত ও অহংয়ের ঊর্ধ্বে উঠে দূর ও অজানায় প্রবেশ। সহজাতভাবেই, এ ধরনের জ্ঞানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার ঝুঁকির মুখে থাকে। ওই উদ্দেশ্য হলো সত্য : সভ্যতার প্রকৃতি অনুযায়ী যদি তা বিকশিত, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ও, তবু যা-ই ঘটুক না কেন–তা মৌলিকভাবে এবং জ্ঞানগত দিক থেকে স্থিতিশীল। এরকম একটি বিষয়ে ওই ধরনের জ্ঞান হলো এর ওপর আধিপত্যকরণ এবং কর্তৃত্ব অর্জন। এখানে 'আমাদের' জন্য কর্তৃত্বের অর্থ হচ্ছে প্রাচ্যের দেশটির স্বশাসনের অধিকার অস্বীকার করা; যেহেতু আমরা একে জানি, এবং এক অর্থে আমরা একে জানি বলেই এটি অস্তিত্বশীল।

মিসর সম্পর্কে ব্রিটিশের জ্ঞান হলো বেলফোরের মিসর; সেই জ্ঞানের গুরুভার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টতার প্রশ্নকে তুচ্ছ মনে করতে বাধ্য করে। বেলফোর কোথাও ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠত্ব ও মিসরের নিকৃষ্টতা অস্বীকার করেননি। তা সবাই মেনে নিয়েছে বলেই তিনি ধরে নেন, যখন তিনি জ্ঞানের পরিণতিক্রম বর্ণনা করেন :

> ‘সর্বপ্রথম বাস্তব ঘটনাবলির প্রতি তাকান। ইতিহাসে আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথেই পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ নিজস্ব শাসন পরিচালনার ক্ষমতা প্রদর্শন করে...নিজেদের মেধার বলেই,...সামগ্রিকভাবে যাকে প্রাচ্য বলা হয় সেখানে, প্রাচ্যের সমগ্র ইতিহাস দেখতে পারেন, আপনি কখনো স্বায়ত্তশাসনের চিহ্ন পাবেন না। তাদের মহান শতাব্দীসমূহ–খুবই মহান ছিল যেগুলো–পার হয়ে গেছে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের অধীনে। সভ্যতায় ওদের মহৎ–আসলেই খুব মহৎ যা-কিছু অবদান তা সম্পন্ন হয়েছে ওই ধরনের শাসনব্যবস্থায়। বিজেতাকে হটিয়ে বিজেতা এসেছে। এক আধিপত্য অনুসরণ করে এসেছে আরেক আধিপত্য। কিন্তু ভাগ্য ও সৌভাগ্যের সকল বিপ্লবে আপনি কখনো দেখবেন না যে, ওই সকল জাতির কোনোটি নিজ উদ্যোগে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে বলা যায়, স্বায়ত্তশাসন তা প্রতিষ্ঠা করেছে। এ হলো বাস্তবতা, শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতার কথা নয়। আমি মনে করি, প্রাচ্যের সত্যিকারের একজন জ্ঞানী ব্যক্তিও বলবেন যে, মিসরে ও অন্যত্র আমরা যে সকল ক্ষমতাসীন সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি, তা কোনো দার্শনিকের কাজ নয়। ওটি হলো নোংরা কাজ, প্রয়োজনীয় শ্রম দিয়ে যাওয়ার নিকৃষ্ট কাজ।’

যেহেতু ওই সব বাস্তব ঘটনা হলো বাস্তব, তাই বেলফোর অবশ্যই তার যুক্তি-তর্কের দ্বিতীয় পর্ব অব্যাহত রাখবেন:

> ‘একনায়কতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করলে ওই মহৎ জাতিসমূহের জন্য (আমি তাদের মহত্ত্ব স্বীকার করি) কি মঙ্গলকর হবে? আমি মনে করি মঙ্গলজনক হবে। অভিজ্ঞতা দেখায়, সমগ্র ইতিহাসে ওরা যে ধরনের শাসনব্যবস্থায় ছিল, তার চেয়ে বর্তমান সরকারব্যবস্থা অনেক ভালো। তা শুধু ওদের জন্যই মঙ্গলজনক নয়, গোটা সভ্য পশ্চিমের জন্যও শুভ। আমরা মিসরীয়দের জন্য মিসরে আছি। তবু কেবল মিসরীয়দের জন্য আমরা মিসরে অবস্থান করছি না, আমরা ওখানে আছি সমগ্র ইউরোপের জন্যও।’

‘আমাদের’ কাজ করতে হয় যাদের সাথে, তাদের জন্য ঔপনিবেশিক দখলদারিত্ব মঙ্গল করছে বলে ওরা (প্রাচ্যজন) যে তার প্রশংসা করে কিংবা নিদেনপক্ষে বুঝতে পারে এমন কোনো প্রমাণ দেখাননি বেলফোর। যা-ই হোক, মিসরীয়কে নিজের কথা নিজে বলতে দেয়ার বিষয়টি বেলফোরের মনে উদয় হয়নি। কারণ ধরে নেয়া যেতে পারে, যে মিসরীয়ই মুখ খুলবে সে-ই ‘উসকানিদাতা, সমস্যা সৃষ্টিতে ষড়যন্ত্রত’ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক; বৈদেশিক আধিপত্যের ‘সমস্যা’ দেখেও দেখে

না এমন দেশি, ভালো মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতএব, নৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার পর বেলফোর বাস্তবের প্রতি নজর দেন : 'তাহলে, যদি আমাদের দায়িত্বই শাসন করা, কৃতজ্ঞতা পেয়ে বা না পেয়ে, ওখানকার জনগোষ্ঠীকে যেসব ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি তার সত্যিকার আন্তরিক স্মৃতিসমেত বা স্মৃতি ছাড়া (বেলফোর এখানে অবশ্যই স্বাধীনতা হারানো বা অন্তত অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকাজনিত ক্ষতি হিসেবে ধরেননি) এবং ওদের আমরা যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি, তার উজ্জ্বল স্মৃতিসহ অথবা স্মৃতি ছাড়া; তাই যদি আমাদের দায়িত্ব হয়, তবে তা কীভাবে পালিত হবে?' ইংল্যান্ড 'আমাদের শ্রেষ্ঠ সবকিছু' ওই দেশে রপ্তানি করে। ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলা, জীবন-যাপনের ভিন্ন অবস্থা, ভিন্ন জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝখানে এই আত্মস্বার্থহীন প্রশাসকেরা তাদের কাজ করে যায়। তাদের শাসনকার্য সম্ভব হয়ে ওঠে যদি তারা বুঝতে পারে যে, তাদের প্রতি নিজ দেশের সরকারের সমর্থন রয়েছে, যে সরকার তাদের সকল কাজ অনুমোদন করবে।

> 'একেবারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এমন সহজাত ধারণা আছে যে, ওদের কাজ করতে হবে যাদের সাথে, তাদের প্রেরক দেশটির শক্তি, কর্তৃত্ব, সহানুভূতি, পূর্ণ ও বিদ্বেষহীন সমর্থন এদের (ঔপনিবেশিক প্রশাসক-কর্মচারীদের) পেছনে নেই। ওই জনগোষ্ঠীটি নিয়মশৃঙ্খলার বোধটুকু হারিয়ে ফেলে, যা তাদের সভ্যতার ভিত্তি। ঠিক যেমন আমাদের কর্মকর্তারা হারিয়ে ফেলেছে সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বোধ। এই প্রশাসকদের যাদের মাঝে পাঠানো হয়েছে, তাদের মঙ্গলের জন্য এরা যা কিছু করতে পারে, তার ভিত্তিই হলো ওই বোধ।'

এখানে বেলফোরের যুক্তিবোধ বেশ আকর্ষণীয়, তার গোটা বক্তব্যের শুরুর অংশটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে নয় মোটেও। ইংল্যান্ড মিসরকে জানে; মিসর হলো তা-ই ইংল্যান্ড যা জানে: ইংল্যান্ড জানে যে মিসর নিজস্ব সরকারে চলতে পারে না; ইংল্যান্ড তা নিশ্চিত করে মিসর দখলের মধ্যে দিয়ে; মিসরীয়দের নিকট মিসর হলো ইংল্যান্ড যা দখল করেছে এবং শাসন করছে। অতএব, বিদেশি দখলদারি হলো সমকালীন মিসরীয় 'সভ্যতার ভিত্তি'। ব্রিটিশ দখলদারি মিসরের প্রয়োজন ছিল; প্রকৃতপক্ষে মিসর জোর দিয়ে তা চেয়েছে। কিন্তু যদি শাসক শাসিতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিজ দেশের পার্লামেন্টের সন্দেহের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় তা হলে–'যে জাতিটি প্রভাবশালী–এবং আমি মনে করি, প্রভাবশালীই থাকা উচিত–তার কর্তৃত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।' শুধু যে ইংলিশ মান-মর্যাদা নষ্ট হয় তা-ই নয়–'মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ কর্মকর্তার পক্ষে দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়বে–আপনারা যেমন চান ওদের তেমন করে গড়ুন, যত ধরনের চারিত্রিক গুণ ও মেধা কল্পনা করা যায়, তার সবই ওদের মধ্যে সঞ্চার করে দিন। ওদের পক্ষে সেই মহান দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে না যা মিসরে, কেবল আমরা নই–সমগ্র সভ্য পৃথিবী তাদের ওপর অর্পণ করেছে।'[১]

বাগ্মিতা হিসেবে বেলফোরের বক্তব্য বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বিশেষত যেভাবে তিনি বিভিন্ন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এখানে (ওই সব চরিত্রের মধ্যে) অবশ্য ইংরেজরাও আছেন, যাদের বোঝাতে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে একজন ক্ষমতাশালী, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের গুরুত্বসমেত; এ ব্যক্তি মনে করেন তার জাতির ইতিহাসে যা কিছু ভালো, তিনি হলেন তারই প্রতিনিধি।

বেলফোর সভ্য পৃথিবী পশ্চিমের হয়েও কথা বলতে পারেন, মিসরে কর্মরত ক্ষুদ্র একদল কর্মকর্তার পক্ষ থেকেও। তিনি যদি প্রাচ্যবাসীর পক্ষ থেকে কথা না বলে থাকেন, তার কারণ, তারা যাহোক, অন্তত ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তবু তিনি জানেন ওরা কী বোধ করে, যেহেতু তিনি জানেন ওদের ইতিহাস, তার মতো লোকদের ওপর ওদের নির্ভরশীলতা এবং ওদের প্রত্যাশার কথা।

তবু তিনি ওদের পক্ষ থেকেও কথা বলেন–এই অর্থে যে, ওরা যা বলতে পারত–যদি তাদের প্রশ্ন করা হতো এবং ওরা আদৌ উত্তর দিতে সক্ষম হতো–তা হতো এরই মধ্যে যা প্রমাণ হয়ে গেছে তা অর্থহীনভাবে নিশ্চিতকরণঃ যে, ওরা প্রজার জাত, এমন এক জাতিদ্বারা শাসিত যে জাতি ওদেরকে এবং কিসে ওদের মঙ্গল-অমঙ্গল তা ওদের চেয়ে অনেক বেশি ভালো জানে। ওদের মহান মুহূর্তগুলো অতীতের গর্ভে; ওরা যে আধুনিক পৃথিবীর যোগ্য হয়েছে তার কারণ ক্ষমতাধর ও অত্যাধুনিক সাম্রাজ্যগুলো ওদেরকে অবনতির চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে বের করে এক উৎপাদনশীল উপনিবেশের পুনর্বাসিত অধিবাসীতে উন্নীত করেছে।

বিশেষত মিসর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি চমৎকার নমুনা। নিজ দেশের পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে ইংল্যান্ড, পশ্চিম এবং পশ্চিমা সভ্যতার পক্ষ থেকে মিসর সম্পর্কে কতটা বলার অধিকার আছে তার, সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন বেলফোর। কারণ মিসর যেকোনো উপনিবেশের মতো একটি উপনিবেশ মাত্র ছিল না। এটি ছিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের যাথার্থ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র। ইংল্যান্ড কর্তৃক মিসরকে সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করার পূর্ব পর্যন্ত মিসর ছিল প্রাচ্যের পশ্চাদপদতার প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক নমুনা। ইংলিশ জ্ঞান ও ক্ষমতার পূর্ণ বিজয়োল্লাসে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল সে।

যে বছর ইংল্যান্ড মিসর দখল করে এবং কর্নেল আরাবির জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমিত হয়, সেই ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসরে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি ও মিসরের মালিক ছিলেন ইভেলিন ব্যারিং (ওভার-বিয়ারিং হিসেবেও পরিচিত) লর্ড ক্রোমার। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ের ৩০ তারিখে বেলফোরই হাউস অব কমন্সে দাঁড়িয়ে ক্রোমারকে মিসরে সম্পাদিত তার কর্মের জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের অবসর-পুরস্কার প্রদানের প্রকল্পে সমর্থন করেন। 'মিসরকে নির্মাণ করেছেন' ক্রোমার, বেলফোর বলেন :

> 'তিনি যা স্পর্শ করেছেন, তাতেই সফল হয়েছেন...গত সিকি শতাব্দীব্যাপী ক্রোমারের অবদান মিসরকে সামাজিক ও আর্থিক অবক্ষয়ের চরম অবমাননাকর বিন্দু থেকে তুলে এনেছে প্রাচ্য জাতির মধ্যে বর্তমানের–আমি বিশ্বাস করি–সম্পূর্ণ একক, অনন্য অবস্থানে, আর্থিক ও নৈতিক সমৃদ্ধিতে।'[২]

মিসরের নৈতিক সমৃদ্ধি কীভাবে পরিমাপ করা হলো, বেলফোর তা বলার ঝুঁকি নেননি। ইংল্যান্ড থেকে মিসরে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়, তার সমান রপ্তানি হয় বাকি সমগ্র আফ্রিকায়। তা অবশ্য মিসর ও ইংল্যান্ডের কেবল পারস্পরিক (যদিও অসম) আর্থিক সমৃদ্ধি নির্দেশ করে। তবে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একটি প্রাচ্যদেশের অভগ্ন, সর্বগ্রাসী পশ্চিমা অভিভাবকত্ব; দখলের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছেন এবং বাস্তবায়িত করেছেন যারা–পণ্ডিতবর্গ, ধর্ম-প্রচারক, ব্যবসায়ী, সৈনিক ও শিক্ষক থেকে শুরু করে ক্রোমার-বেলফোরের মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সকলই দেখলেন তারা নিজেরাই মিসরকে সহযোগিতা করছেন, পরিচালনা করছেন, এমনকি কখনো কখনো জোর করে *ঠেলে* দিচ্ছেন প্রাচ্যের অবহেলা থেকে বর্তমান নিঃসঙ্গ, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে।

মিসরে ব্রিটিশসাফল্য ব্যতিক্রমধর্মী হতে পারে–বেলফোর যেমন বলেছেন, তবে অযৌক্তিক বা অব্যাখ্যেয় নয়। ক্রোমারের দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা এবং প্রাচ্য সভ্যতা সম্পর্কে বেলফোরের ধারণা–এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত একটি সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী মিসরের বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রিত হতো। বিশ শতকের প্রথম দশকজুড়ে এ তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল যে, এটি কার্যকর–প্রচণ্ড ভালোভাবে কার্যকর। বক্তব্যটি সংক্ষেপ ও সরল করলে যা দাঁড়ায় তা পরিষ্কার, যথাযথ এবং হৃদয়ঙ্গম করা সহজ: এখানে পশ্চিমের মানুষ আছে, আর আছে প্রাচ্যবাসী, প্রথমোক্তরা আধিপত্য করবে; সেই আধিপত্যের শিকার হতে হবে অবশ্যই দ্বিতীয়োক্তদের : যা সচরাচর বোঝায় তারা তাদের ভূমি দখল করে নিতে দেবে, তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে, তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ তুলে দেবে কোনো-না-কোনো পশ্চিমা শক্তির হাতে। ওই ক্রোমার ও বেলফোর, অচিরেই আমরা দেখব, মানবতাকে নগ্ন করে এমন নিষ্ঠুর সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সত্তায় নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন, যা তাদের অনৈতিকতার ইঙ্গিত নয় মোটেও। বরং এ হলো তারই প্রমাণ যে, একটি সাধারণ তত্ত্বকে ওরা যখন প্রয়োগ করেন, তখন তা কেমন সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছিল–কেমন সূক্ষ্ম ও কার্যকর।

প্রাচ্যজন সম্পর্কে বেলফোরের বিশ্লেষণে বিষয়মুখী বিশ্বজনীনতার ভান আছে। তার মতো না করে, ক্রোমার কথা বলেন নির্দিষ্ট প্রাচ্যবাসী সম্পর্কে, যাদের তিনি শাসন করেছেন অথবা যাদের নিজে কাজ করতে হয়েছে–প্রথমে ভারতে, পরে মিসরে পঁচিশ বছর ধরে; এবং তখনই তিনি ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যে শ্রেষ্ঠ কনসাল জেনারেল

হিসেবে আবির্ভূত হন তিনি। বেলফোরের 'প্রাচ্যজন' হলো ক্রোমারের 'শাসিত-জাতি'। এ বিষয়ে একটি নিবন্ধনও লেখেন ক্রোমার, ১৯০৮ সালের জানুয়ারির *এডিনবার্গ রিভিউ*-এ তা প্রকাশিত হয়। ওখানে পুনরায় দেখা যায় শাসিত জাতি বা প্রাচ্যজনদের সম্পর্কে জ্ঞানই ওদের ব্যবস্থাপনার কাজটিকে সহজ ও লাভজনক করে দিয়েছে। অধিক ক্ষমতার জন্য প্রয়োজন অধিক তথ্য ও নিয়ন্ত্রণ। ক্রোমারের ধারণা হলো, নিজ দেশে সামরিকবাদ ও বাণিজ্যিক আত্মম্ভরিতা এবং উপনিবেশে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান (যেহেতু 'খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার সূত্র অনুসারে' ব্রিটেনের সরকারের বিরুদ্ধে যায়) নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে না। কারণ, ক্রোমার বলেন, যদি যুক্তিবোধ এমন একটি বিষয় হয়ে থাকে যে, প্রাচ্যবাসীরা তার অস্তিত্ব উপেক্ষা করার মতো পরিস্থিতিতেই বাস করে, তাহলে তাদের ওপর অতি-বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ব্যবস্থা আরোপ বা তাদের জোরপূর্বক যুক্তি মানতে বাধ্য করা শাসনের সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং সঠিক পদ্ধতি হলো, 'সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করা এবং ধৈর্যসহকারে শাসিত জাতির সন্তুষ্টির মধ্যে শাসক ও শাসিতের আরও কার্যকর এবং আশা করা যায় আরও দৃঢ় সম্পর্ক খুঁজে বের করা।'

শাসিত জাতিকে এরূপ সান্ত্বনা দেওয়ার পেছনে সর্বত্র ওত পেতে আছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি: তা সূক্ষ্ম উপলব্ধি ও বিরল ব্যবহারের জন্য যতটা কার্যকর, তার সৈন্যদল, নির্দয় কর-আদায়কারী ও সংযমহীন শক্তির জন্য ততটা নয়। এক কথায় সাম্রাজ্যকে বিচক্ষণ হতে হবে; লিপ্সাকে আত্মস্বার্থহীনতার সাথে এবং অসহিষ্ণুতাকে নমনীয় বিধি-বিধানের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে।

> 'আরও স্পষ্ট করতে হলে বলতে পারি, যখন বলা হয়, বাণিজ্যিক উৎসাহ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রয়োজন, তখন এর অর্থ হলো ভারতীয়, বা মিসরীয় বা শিল্লুক বা জুলুদের সাথে কাজ করার সময় প্রথম যে প্রশ্নটি বিবেচনায় আনা উচিত তা হলো, এই মানুষগুলো–জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যাদের সবাই কমবেশি 'অভিভাবকত্বের অধীন'–কোন জিনিসটাকে তাদের স্বার্থের জন্য সবচেয়ে ভালো মনে করে, বিষয়টি গভীরতর বিবেচনার দাবি করে যদিও। তবে স্থানীয় বিচার-বিবেচনায় সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও পশ্চিমা জ্ঞানের আলোকে সচেতনভাবে কোনোটাকে শাসিতজাতির জন্য সর্বোত্তম মনে করি তা বিবেচনা করে প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে পরিণামে ইংরেজ জাতির পক্ষে যায় এমন প্রকৃত বা অনুমানকৃত সুবিধাদি বিবেচনায় আনা উচিত নয়। কিংবা যা সচরাচর ঘটে থাকে–কোনো প্রভাবশালী ইংরেজ বা ইংরেজদের একটি শ্রেণি কর্তৃক উপস্থাপিত স্বার্থকেও নয়।
>
> যদি সমগ্র ব্রিটিশ জাতি অটলভাবে এ নীতি মনে রাখে এবং এর প্রয়োগের ওপর জোর দেয় তাহলে–যদিও আমরা ভাষা বা জাতিগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট দেশপ্রেমের মতো কিছু সৃষ্টি করতে পারব না সত্যি, তবে–যারা অনুগ্রহ লাভ

> করেছে ও ভবিষ্যতে যারা করবে তাদের কৃতজ্ঞতা এবং শ্রেষ্ঠতর মেধা ও আত্মস্বার্থহীন আচার-আচরণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে একরকম কসপলিটান আনুগত্য বিকশিত করতে পারব হয়তো। সেক্ষেত্রে যে কোনো পরিস্থিতিতেই কিছুটা আশা থাকে যে, মিসরীয়রা ভবিষ্যৎ কোনো আরাবির হাতে নিজের সহায় সম্পদ ছুড়ে দেয়ার আগে দোনামোনা করবে। এমনকি মধ্য-আফ্রিকার আদিমরাও ঘটনাক্রমে এক-আধটা মন্ত্রোচ্চারণ করতে শিখবে অ্যাসট্রে রেডাস্ত্রের সম্মানে, যাকে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা জিন দেননি কিন্তু ন্যায়বিচার দিয়েছেন। তার চেয়ে বড় কথা, বাণিজ্য লাভবান হবে।'[৩]

শাসিত জাতির তরফ থেকে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ শাসকগণ কতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ক্রোমার কর্তৃক মিসরীয় জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধিতায়। স্থানীয় স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, বিদেশি দখলের অবসান, আত্মবিকাশমান জাতীয় সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি অ-বিস্ময়কর দাবিসমূহ ক্রোমার কর্তৃক বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি স্পষ্ট নিশ্চিত করেছেন, মিসরের প্রকৃত ভবিষ্যৎ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে নেই–যা কেবল স্থানীয় মিসরীয়দের গ্রহণ করবে, বরং আছে বিস্তৃত কসমোপলিটানিজমে।[৪] অধীন জাতির মধ্যে এই বোধ নেই যে ওরা জানবে কোনটা তাদের জন্য ভালো। ওরা প্রাচ্যজন, যাদের চরিত্র বিষয়ে ক্রোমার খুবই জ্ঞান রাখেন, কারণ তিনি ভারত ও মিসর উভয় দেশেই তাদের সাহচর্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রাচ্যজনের ব্যাপারে ক্রোমারের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক কাজ হলো তাদের পরিচালনা করা; পরিস্থিতি যদিও এখানে-সেখানে কিছু ভিন্ন হতে পারে, তবু সর্বত্র প্রায় একই রকম। এর কারণ প্রাচ্যের মানুষ প্রায় সবখানেই এক রকম।'

অবশেষে অগ্রসর হওয়া যাক দীর্ঘসময় ধরে বিকশিত, জ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় বিষয়ের দিকে–প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তব–উভয় জ্ঞান, আধুনিক পশ্চিমা প্রাচ্যতত্ত্বের এক শতাব্দীর ঐতিহ্যসূত্রে যার উত্তরাধিকারী হলেন ক্রোমার ও বেলফোর : প্রাচ্যজন ও প্রাচ্যজনবিষয়ক জ্ঞান, তাদের জাতিগত পরিচয়, স্বভাব-চরিত্র, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও সম্ভাবনা-সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞান খুবই কার্যকর। ক্রোমার বিশ্বাস করেন, তিনি মিসর শাসনে এই জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন। তাছাড়া, এটি পরীক্ষিত এবং অপরিবর্তিত জ্ঞান। যেহেতু 'প্রাচ্যজন' সকল বাস্তব উদ্দেশ্যেই 'আদর্শিক' মানুষমাত্র, যাকে যেকোনো প্রাচ্যতাত্ত্বিক বা প্রাচ্যের শাসক পরীক্ষা করে দেখতে পারে, বুঝতে পারে, উন্মোচিত করে দিতে পারে। তাই দুই খণ্ডের *মডার্ন ইজিপ্ট* গ্রন্থের চৌত্রিশতম অধ্যায়ে ক্রোমার নিজ অভিজ্ঞতার ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল রেকর্ডে প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের একরকম ব্যক্তিগত মতামত উপস্থিত করেন :

> 'স্যার আলফ্রেড লাইয়াল আমাকে একবার বলেছিলেন, 'প্রাচ্যের মন যাথার্থকে ভয় পায়। প্রত্যেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের উচিত এই নীতিকথাটি মনে রাখা।' যাথার্থ্যের অভাব–যা সহজেই রূপান্তরিত হতে পারে অসততায়–প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যদেশীয় মনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

ইউরোপীয় মানুষ অনেকখানি কার্যকারণবাদী। ঘটনা সম্পর্কে তার বিবরণ অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত। তিনি প্রকৃতিগতভাবে যুক্তিবাদী, যদিও তিনি হয়তো যুক্তিবাদ অধ্যয়ন করেননি। প্রকৃতিগত কারণেই যেকোনো সত্যকে মেনে নেয়ার আগে তিনি প্রমাণ চান; তার প্রশিক্ষিত বুদ্ধি কাজ করে একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মতো। অন্যদিকে, তার চিত্রবৎ রাস্তার মতোই প্রাচ্যজনের মনে সুষম গঠন-সৌষ্ঠবের অভাব প্রবল। তার যৌক্তিক বিশ্লেষণ হলো তার অতীব নোংরা বর্ণনা। যদিও প্রাচীন আরবেরা কিছুটা উৎকৃষ্ট মাত্রার দ্বান্দ্বিক জ্ঞান অর্জন করেছিল, তাদের বংশধরদের মধ্যে এককভাবে যুক্তিতর্কের গুণটির অভাব প্রকট। এরা সচরাচর কোনো সাদামাটা বর্ণনার একেবারেই অনিবার্য পরিসমাপ্তি টানতেও অক্ষম, যদিও তার সত্যতা ওরা স্বীকার করতেও পারে। সাধারণ একজন মিসরীয়র কাছ থেকে কোনো ঘটনার বিবরণ জানার জন্য রীতিমতো সযত্ন-উদ্যম করতে হয়। সাধারণত তার ব্যাখ্যা হয় দীর্ঘ। স্বচ্ছতার অভাব তাতে প্রবল। সে তার গল্প শেষ করার আগে অন্তত আধা ডজনবার নিজের বক্তব্যের সাথেই গরমিল করে ফেলবে। সবচেয়ে কোমল প্রক্রিয়ার জেরার মুখেও ওরা সচরাচর ভেঙে পড়ে।'

অতঃপর প্রাচ্যজন অথবা আরবেরা সহজেই প্রতারিত হয় বলে দেখানো হয়েছে। 'শক্তি ও উদ্যম নেই ওদের'; জীবজন্তুর প্রতি নির্দয়তা, মাত্রাতিরিক্ত চাটুকারিতা, চক্রান্ত, চালাকিতে দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্রাচ্যবাসীরা না পারে রাস্তায় হাঁটতে, না ফুটপাতে (চতুর ইউরোপীয়রা দ্রুত উপলব্ধি করতে পারে রাস্তা এবং ফুটপাত হাঁটার জন্যই নির্মিত, প্রাচ্যজনের বিশৃঙ্খল মন তা বুঝতে ব্যর্থ হয়)। এরা অসংশোধনীয় মিথ্যুক। এরা 'চরম অলস ও সন্দেহপ্রবণ' এবং সবকিছুতেই অ্যাংলোস্যাক্সন জাতির স্পষ্টতা, ঋজুতা ও মহত্ত্বের বিরোধিতা করে।[৬]

ক্রোমার কোথাও গোপনের চেষ্টা করেননি যে, তার নিকট প্রাচ্যজন হলো সর্বদা ও একমাত্র মানব-বস্তু ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোয় তিনি যাদের পরিচালনা করেছেন। 'যেহেতু আমি একজন কূটনীতিক ও প্রশাসক, যার গবেষণার প্রধান বিষয় হলো মানুষ...তাকে পরিচালনার দৃষ্টিকোণ থেকে,' ক্রোমার বলেন, 'আমি এই পর্যবেক্ষণে সন্তুষ্ট যে, কোনো-না-কোনোভাবে প্রাচ্যবাসীরা কাজ করে, কথা বলে এবং চিন্তা করে এমন এক পন্থায় যা ইউরোপীয়দের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।[৭]

ক্রোমারের বর্ণনা অবশ্যই অংশত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রদত্ত। তিনি তবু তার মতের সমর্থনে এখানে-সেখানে রক্ষণশীল প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের মতও উল্লেখ করেছেন (বিশেষত আর্নেস্ত রেনান ও কনস্ট্যানটিন ডি ভোলনির)। আবার প্রাচ্যবাসীরা কেন ওই রকম সে কারণ ব্যাখ্যা করার সময় তিনি এ বিশেষজ্ঞদের থেকে ভিন্নমতও প্রকাশ করেন। তার কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রাচ্যজন সম্পর্কে যেকোনো জ্ঞান তার মতের সত্যতা প্রমাণ করবে। জেরার মুখে মিসরীয়রা ভেঙে

পড়ে বলে যে বর্ণনা দিয়েছেন ক্রোমার, তাতে মনে হয়, তার মতে, প্রাচ্যের মানুষ অপরাধী। সেই অপরাধ হলো প্রাচ্যের মানুষ 'প্রাচ্যজন'। এ হলো এরই প্রমাণ যে, এরকম অনুলাপ সাধারণ্যে এতটাই গৃহীত হয় যে, ইউরোপীয় যুক্তিবোধ ও সুষম মনকে পুনর্বিবেচনার সুযোগ না দিয়েই তা লেখা সম্ভব হয়েছে। অতএব, যা প্রাচ্যজনের আচার-আচরণের আদর্শ বলে বিবেচিত হয়, তা থেকে যেকোনো বিচ্যুতিকে মনে করা হয় অস্বাভাবিক; পরিণতিতে মিসর থেকে ক্রোমারের পাঠানো সর্বশেষ রিপোর্টে মিসরীয় জাতীয়তাবাদকে দাবি করা হয় 'সম্পূর্ণ মহৎ ধারণা' এবং 'দেশীয় নয়, বরং বিদেশি (প্রভাবজাত) বিকাশের চারাগাছ'।[৮]

ক্রোমার ও বেলফোর তাদের প্রকাশ্য নীতি ও লেখার সর্বত্র যে জ্ঞানভান্ডার ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক রক্ষণশীলতার সংকেতসমূহের ভান্ডার থেকে উল্লেখ করেছেন তাকে তুচ্ছ মনে করলে ভুল হবে। যদি সহজভাবে বলা যায়, প্রাচ্যতত্ত্ব হলো ঔপনিবেশিক শাসনকে যৌক্তিক করে তোলা, তাহলে একটি সত্য উপেক্ষা করা হয়। তা হলো উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর নয়, পূর্বেই প্রাচ্যতত্ত্ব ঔপনিবেশিক শাসনকে আগাম বহুদূর বৈধ করে তুলেছিল।

মানুষ সকল সময় বাস্তব বা কাল্পনিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে পরম বিভাজন আত্মতৃপ্তির সাথে মেনে নিয়েছেন বেলফোর ও ক্রোমার তা গড়ে উঠেছে বহু বছর, এমনকি বহু শতাব্দী ধরে। এর মধ্যে অবশ্যই অসংখ্য আবিষ্কার অভিযান হয়েছে, সংযোগ ঘটেছে বাণিজ্য ও যুদ্ধের মাধ্যমেও। তবে এ ছাড়াও আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্কের দুটো মুখ্য দিক ছিল। একটি হলো ইউরোপে প্রাচ্য সম্পর্কে বিকাশমান পদ্ধতিভিত্তিক জ্ঞান–সেই জ্ঞান যা জোরালো হয়েছে ঔপনিবেশিক সম্পর্ক-সংঘাতে, তেমনি ভিনদেশি ও অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে সর্বব্যাপী আগ্রহে বিকাশমান জাতিবিদ্যা, তুলনামূলক শরীরতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাসের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে।

এছাড়া ওই পদ্ধতিভিত্তিক জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়েছে ঔপন্যাসিক, কবি, অনুবাদক ও মেধাবী পর্যটকদের সৃষ্ট বিশাল একগুচ্ছ সাহিত্য। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্কের অন্য দিকটি এই যে, প্রাচ্য ইউরোপের পারস্পরিক সম্পর্কে ইউরোপ সর্বদা শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেছে; আধিপত্যের কথা না হয় না-ই বললাম। এ ব্যাপারটিকে সুভাষণে কোমল করে বলা সম্ভব নয়। সত্যি যে, দুর্বলের সাথে সবলের সম্পর্ক ভিন্ন চেহারায় ঢেকে রাখা সম্ভব; যেমন বেলফোর যখন প্রাচ্যের সভ্যতাকে মহৎ বলে স্বীকার করেন। কিন্তু পাশ্চাত্যে–যা এখানে আমাদের বিষয়–রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভিত্তির প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে দেখা হয় সবল ও দুর্বল পক্ষের সম্পর্করূপে। সে সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন পরিভাষা : বেলফোর ও ক্রোমার গৎবাঁধা ভঙ্গিতে অনেকগুলো ব্যবহার করেছেন। প্রাচ্যের মানুষ যুক্তিবিরহিত, পতিত,

বালসুলভ, 'ভিন্নরকম'; এভাবে ইউরোপীয়রা যুক্তিবাদী, গুণী, মানসিকভাবে পরিপক্ব, 'স্বাভাবিক'। কিন্তু সেই সম্পর্ক উজ্জীবিত করার ধরনটা সবখানে এই বাস্তবতায় গুরুত্ব আরোপ করে যে, প্রাচ্যের মানুষ বাস করে ভিন্ন কিন্তু সংগঠিত নিজেদের পৃথিবীতে–নিজস্ব জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক সীমানা ও অভ্যন্তরীণ সংসক্তির নীতিমালা-সংবলিত জগতে। এ সত্ত্বেও প্রাচ্যের মানুষদের 'জগৎ'-এর বোধগম্যতা ও স্বকীয়তা তাদের নিজস্ব চেষ্টায় অর্জিত নয়, তা এসেছে বরং (পশ্চিম কর্তৃক প্রাচ্যের ওপর) ওয়াকিবহাল, স্বার্থমুখী একগুচ্ছ প্রভাব আরোপণে, যার সাহায্যে পশ্চিম প্রাচ্যকে চিহ্নিত করে।

এতক্ষণ ধরে আমার আলোচিত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দুটো বৈশিষ্ট্য এভাবেই একত্র হয়। প্রাচ্যের জ্ঞান-শক্তি থেকে উৎসারিত বিধায়–এক অর্থে সৃষ্টি করে প্রাচ্য, প্রাচ্যজন ও তার 'জগৎ'। ক্রোমার ও বেলফোরের লেখার ভাষায় প্রাচ্যজন এমন কিছুরূপে আবির্ভূত হয়, যাকে বিচার করা হয় (যেমন আইনের আদালতে), এমন কিছুরূপে যাকে বর্ণনা ও অধ্যয়ন করা হয় (যেমন পাঠ্যসূচিতে), এমন কিছু যাকে সুশৃঙ্খল করা হয় (যেমন ক্লাসরুম ও কারাগারে) এবং এমন কিছু যাকে চিত্রিত করা হয় (যেমন প্রাণিবিদ্যা ম্যানুয়ালে)। লক্ষণীয় বিষয় হলো, উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রাচ্যজন অন্তর্ভুক্ত ও উপস্থাপিত হচ্ছে একটি আধিপত্যশীল কাঠামোর দ্বারা। এ কাঠামোর উৎস কী?

সাংস্কৃতিক শক্তি খুব সহজে আলোচ্য কিছু নয়, এবং বর্তমান রচনার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো সাংস্কৃতিক শক্তির প্রয়োগ হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্বকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা, একে গভীরভাবে ভেবে দেখা। অন্যকথায়, প্রথমে প্রচুর পরিমাণে সংশ্লিষ্ট উপাত্ত বিশ্লেষণ না করে সাংস্কৃতিক শক্তির মতো অস্পষ্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সাধারণীকরণ করে ফেলার ঝুঁকি না নেয়াই ভালো। তবে শুরুতে বলা যায় যে, উনিশ-বিশ শতকে পশ্চিম জড়িত ছিল, এমন একটি ধারণা গড়ে তোলা হয়েছিল যে, প্রাচ্য ও তার সবকিছু নিকৃষ্ট না-ও যদি হয়, তবু পশ্চিম কর্তৃক সংশোধনমূলক অধ্যয়নের যোগ্য অন্তত। প্রাচ্যকে তখন দেখা হতো শ্রেণিকক্ষ, ফৌজদারি আদালত, কারাগার, সচিত্র ম্যানুয়েলের দৃষ্টিকোণ থেকে। সুতরাং প্রাচ্যতত্ত্ব হলো প্রাচ্য সম্পর্কে সেই জ্ঞান যা প্রাচ্যের সকল কিছুকে বাছাই, পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, বিচার, শৃঙ্খলাভুক্তকরণ ও পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষ, আদালত, কারাগার বা ম্যানুয়ালে স্থাপন করে।

বিশ শতকের শুরুর বছরগুলোতে বেলফোর ও ক্রোমারের মতো লোকেরা যা বলেছে ও যেভাবে বলেছে তা তারা বলতে পারত। কারণ, এসব বলার জন্য যে শব্দভান্ডার, কল্প-প্রতিমা, আলংকারিক ভাষা ও নমুনা প্রয়োজন তা তারা পেয়েছে উনিশ শতকের পূর্বের প্রাচ্যতত্ত্বের ঐতিহ্য থেকে। এ সত্ত্বেও ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগ এলাকা যে

আক্ষরিক অর্থে ইউরোপ বা পশ্চিম কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে—এই জ্ঞান প্রাচ্যতত্ত্বকে জোরদার করেছে, প্রাচ্যতত্ত্বের দ্বারা বলশালী হয়েছে সে জ্ঞানও। প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখালেখি ও প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক অগ্রগতি এবং ইউরোপের নজিরবিহীন সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটে কাকতালীয়ভাবে ঠিক একই সময়। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে ইউরোপের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভূপৃষ্ঠের পঁয়ত্রিশ শতাংশ থেকে বেড়ে পঁচাশি শতাংশে দাঁড়ায়। প্রতিটি অঞ্চল তার শিকার হয়, তবে এশিয়া ও আফ্রিকার চেয়ে বেশি নয় কোনোটিই। সবচেয়ে বড় ছিল ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্য : কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্গী, আর সব ব্যাপারে আক্রমণাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাচ্যে, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে শুরু করে ইন্দোচীন ও মালয়েশিয়া পর্যন্ত তাদের ঔপনিবেশিক দখল ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল পরস্পর-সংলগ্ন, প্রায়শই একটি আরেকটির সীমানা মাড়িয়ে দিত। এ নিয়ে যুদ্ধও বাধত যখন-তখন। তবে, ইসলাম যে অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ও জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের কথা ছিল সেই নিকট প্রাচ্যে, অর্থাৎ আরব ভূমিতে ফরাসি ও ব্রিটিশসাম্রাজ্য পরস্পরের এবং 'প্রাচ্যে'র মুখোমুখি হয়—পূর্বপরিচিতি, জটিলতা ও উল্লেখযোগ্য তীব্রতার সাথে। উনিশ শতকের বেশির ভাগ সময়জুড়েই—১৮৮১ সালে লর্ড স্যালিসবারি যেমন মন্তব্য করেন—প্রাচ্য সম্পর্কে ওদের সাদৃশ্যপূর্ণ মতামত ছিল খুবই সমস্যাগ্রস্ত। 'আপনার কোনো ঘনিষ্ঠ মিত্র যদি এমন কোনো দেশে নাক গলায়, যেখানে আপনার গভীর স্বার্থ রয়েছে, তাহলে আপনার সামনে তিনটি পথ খোলা থাকে : আপনি তার নিন্দা করতে পারেন বা এককভাবে সব দখলে নিয়ে নিতে পারেন, অথবা ভাগাভাগি করতে পারেন। এই অঞ্চলটি ছেড়ে দেয়ার অর্থ ছিল আমাদের ভারতগামী পথের মাঝে ফরাসিদের বসিয়ে দেয়া। একক কর্তৃত্ব নেয়ার মধ্যে যুদ্ধের সমূহ ঝুঁকি থাকত। আমরা তাই তৃতীয়টি, অর্থাৎ অংশীদারির পথটাই বেছে নিলাম।'[১০]

এবং তারা ভাগাভাগি করে নেয়, এমন এক উপায়ে যা আমরা এখন খুঁজে দেখব। ওখানে ওরা যা ভাগ করে তা কেবল ভূমি বা মুনাফা কিংবা প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়; ভাগ করা হয় একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাও, আমি যাকে বলেছি 'প্রাচ্যতত্ত্ব'। প্রাচ্যতত্ত্ব হলো সাধারণভাবে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একরাশ তথ্যের একটি আর্কাইভ বা লাইব্রেরি। আর্কাইভকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে একরাশ মূল্যবোধ ও একগুচ্ছ ধারণা[১১], যেগুলো এরই মধ্যে নানা উপায়ে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এসব ধারণা ব্যাখ্যা করেছে প্রাচ্যজনের আচার-আচরণ; এগুলো প্রাচ্যজনকে সরবরাহ করেছে একরকম মানসিকতা, বংশবৃত্তান্ত ও পরিবেশ। সবচেয়ে বড় কথা, এগুলো প্রাচ্যজনকে স্থায়ী চরিত্রসম্পন্ন প্রপঞ্চরূপে দেখার ও সে অনুযায়ী আদান-প্রদান করার অনুমোদন দিয়েছে ইউরোপীয়দের। কিন্তু স্থায়িত্বসম্পন্ন যেকোনো ধারণার মতো প্রাচ্যতাত্ত্বিক ধারণাসমূহও সেসব মানুষদের প্রভাবিত করেছে, যাদের প্রাচ্যজন বলে অভিহিত করা হয় এবং প্রভাবিত করেছে তাদেরও

যাদের বলা হয়ে থাকে পাশ্চাত্যজন বা ইউরোপীয় বা পশ্চিমের মানুষ। মোট কথা, প্রাচ্যতত্ত্বকে ইতিবাচক মতবাদ মনে না করে চিন্তার ওপর একরাশ সীমাবদ্ধতারূপে উপলব্ধি করা ভালো। যদি পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাচ্যের নিকৃষ্টতাজনিত অমোচনীয় ব্যবধানই প্রাচ্যতত্ত্বের প্রাণ হয়ে থাকে, তাহলে প্রাচ্যতত্ত্ব তার বিকাশ ও উত্তরকালীন ইতিহাসের ধারায় কীভাবে সে ব্যবধানকে দৃঢ় ও গভীরতর করেছে, তা দেখার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

ভারত এবং অন্যান্য অঞ্চলের ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের পঞ্চান্ন বছর বয়সে অবসর প্রদানের রীতি গড়ে ওঠে উনিশ শতকের ব্রিটেনে। তখন প্রাচ্যতত্ত্বর আরেক দফা পরিশোধন লাভ করে। বয়োবৃদ্ধ ও মর্যাদাহীন কোনো পশ্চিমা মানুষকে দেখার সুযোগ দেয়া হয় না প্রাচ্যজনকে; তেমনি পশ্চিমের কোনো মানুষও প্রজার জাতের চোখে নিজেকে তেজি, যুক্তিবাদী, সদা-সতর্ক তরুণ শাসক ছাড়া আর কোনোরূপে আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন মনে করে না।[১২]

উনিশ ও বিশ শতকে প্রাচ্যতত্ত্ব বেশ কটি ভিন্ন ভিন্ন চেহারা গ্রহণ করে। সর্বপ্রথম, ইউরোপীয় অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রাচ্য বিষয়ে বিশাল এক সাহিত্য ভান্ডার ছিল ইউরোপের। বর্তমান আলোচনায় আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বে আরম্ভকাল বলে ধরা হয়েছে শেষ আঠারো শতক ও উনিশ শতকের শুরুর পর্বকে। এ পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো–এ সময়ই এডগার কুইনেটের ভাষায়–‘প্রাচ্যতত্ত্বের পুনর্জাগরণ’[১৩] ঘটে। হঠাৎই বিভিন্নমুখী একদল চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, শিল্পীর মধ্যে নতুন করে সচেতনতা দেখা দেয় চীন থেকে মেডিটেরেনিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচ্য সম্পর্কে। এ সচেতনতা অংশত ছিল সংস্কৃত, জেন্দ ও আরবি ভাষার নব আবিষ্কৃত ও অনূদিত সাহিত্যের ফলাফল, আর অংশগত নতুনভাবে উপলব্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের পরিণাম। এখানে, আমার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত, মিসরে নেপোলিয়নের দখল অভিযান নিকট প্রাচ্য ও ইউরোপের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল সুরটি সূচনা করে। ওই দখলাভিযান ছিল সত্যিকার অর্থে এক সংস্কৃতিকে আরেক সংস্কৃতি–আপাতভাবে শক্তিশালী আরেকটি সংস্কৃতি কর্তৃক বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রাস করার সূচনা। কারণ নেপোলিয়নের মিসর দখলের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে প্রক্রিয়ার শুরু হয়, তা এখনো প্রভাবিত করে চলেছে আমাদের সমকালীন সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পটভূমি।

বিশাল যৌথ পাণ্ডিত্যের মনুমেন্টস্বরূপ রচনা *ডিসক্রিপর্জঁ দ্য লা' ইজিপ্ট*-এর বর্ণনার মধ্য দিয়ে নেপোলিয়নের অভিযান প্রাচ্যতত্ত্বের জন্য পরিবেশন করে একটি দৃশ্যপট বা মঞ্চসজ্জা। মিসর এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ইসলামি দেশসমূহ বিবেচিত হয় প্রাচ্য বিষয়ে কার্যকর পশ্চিমা জ্ঞানের থিয়েটার, গবেষণাগার, জীবন্ত প্রদেশরূপে। একটু পরে আমি নেপোলিয়নের অভিযান প্রসঙ্গে ফিরে আসব।

নেপোলিয়নের অনুরূপ অভিজ্ঞতার বদৌলতে পশ্চিমে প্রাচ্য একটি জ্ঞান বৃক্ষরূপে

আধুনিকায়িত হয়। এটি হলো দ্বিতীয় রূপ, যার মধ্যে অস্তিত্ববান উনিশ ও বিশ শতকী প্রাচ্যতত্ত্ব। ওই কালপর্বেও আমি শুরু থেকে পরীক্ষা করে দেখব যে, তখন সর্বত্রই প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ আবিষ্কার, অভিজ্ঞতা ও মর্মগত উপলব্ধি নির্দিষ্ট ফর্মে, সম্ভব হলে আধুনিক ভাষায় বর্ণনা করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আধুনিক বাস্তবতার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্যবিষয়ক ধারণাসমূহ উপস্থাপনের আগ্রহ জেগে ওঠে। যেমন, ১৮৪৮ সালে সেমেটিক সম্পর্কে রেনানের ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান যে রীতিতে প্রকাশিত হয়েছে তা পণ্ডিতি বৈধতার জন্য সমকালীন তুলনামূলক ব্যাকরণ, তুলনামূলক শারীরসংস্থান বিদ্যা ও জাতিতাত্ত্বিক তত্ত্বসমূহ থেকে বিপুল পরিমাণে গ্রহণ করেছে। এ ঋণ রেনানের প্রাচ্যতত্ত্বকে দিয়েছে মর্যাদা। মুদ্রার উল্টো দিকে, পশ্চিমে আধুনিক ও গভীরতর প্রভাবসম্পাতী ভাবনাধারার মুখে প্রাচ্যতত্ত্বকে করেছে সমালোচনাযোগ্য, ভেদ্য; এখন পর্যন্ত তাই আছে। প্রাচ্যতত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদ, দৃষ্টবাদ, ইউটোপীয়ানিজম, হিস্টোরিসিজম, ডারউইনবাদ, বর্ণবাদ, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, মার্ক্সবাদ, স্পেঙলারবাদ প্রভৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মতো প্রাচ্যতত্ত্বেরও রয়েছে গবেষণার নমুনা, রীতিনীতি, নিজস্ব বিদ্বৎসমাজ, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। উনিশ শতকে এ ক্ষেত্রটির মর্যাদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়, তেমনি 'সোসিয়েট এশিয়াটিক', 'দ্য রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' 'The Deutsche Morgenladische Gesellschaft' এবং দি আমেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তিও। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতির পাশাপাশি সারা ইউরোপজুড়ে বাড়তে থাকে প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ক অধ্যাপকের সংখ্যাও। এর অব্যবহিত পরবর্তীকালে প্রাচ্যতত্ত্ব প্রচারের জন্য ব্যবহারযোগ্য মাধ্যমের সংখ্যাও স্ফীত হয়। Fundgraben des orients (১৮০৯) দিয়ে সূচিত প্রাচ্যতাত্ত্বিক সাময়িকীর প্রকাশনাও জ্ঞান বৃদ্ধি করে, বিশেষজ্ঞ-ক্ষেত্রের সংখ্যাও বাড়ায়।

এ সত্ত্বেও ওই সব তৎপরতার অতি সামান্যই এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দু-একটি মাত্র স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বা বিকশিত হয়েছে। কারণ, তৃতীয় যেরূপে প্রাচ্যতত্ত্ব ক্রিয়াশীল তা প্রাচ্যবিষয়ক চিন্তাভাবনার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এমনকি ওই যুগের সবচেয়ে সৃজনশীল কল্পনাশক্তির অধিকারী লেখক যেমন ফ্লবেয়ার, নেরভাল, স্কট প্রমুখও প্রাচ্য সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারতেন বা বলতে পারতেন, সেই বলা বা অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে নিয়ত সীমাবদ্ধতা বোধ করেছেন। কারণ, প্রাচ্যতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত বাস্তবতা বিবেচনার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ, যার গঠন বিকশিত করেছে একটি বিভাজন : পরিচিত (ইউরোপ, পশ্চিম, আমরা) ও অপরিচিত (প্রাচ্য, পূর্ব, ওরা)। এ ধারণা, এক অর্থে, সৃষ্টি ও উপস্থাপন করেছে দুটো জগৎ, যেগুলো উপলব্ধিতে এসেছে এ প্রক্রিয়াতেই। প্রাচ্যজন বাস করে 'তাদের

জগতে, 'আমরা' বাস করি আমাদের জগতে। কল্প-দর্শন ও বস্তুনির্ভর বাস্তবতা একে অপরকে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে এবং অব্যাহত রেখেছে তাদের কার্যক্রম। আদান-প্রদানের একটি স্বাধীনতা ছিল বরাবরই পশ্চিমের অনুকূলে; কারণ তার সংস্কৃতি অধিকতর শক্তিশালী, সে ভেদ করে ঢুকে যেতে পারে, বুঝতে পারে; আকার ও অর্থ দিতে পারে বিশাল এশীয় রহস্যে—যেমন একবার বলেছিলেন ডিজরাইলি। তবু আমার মনে হয়, এযাবৎ যা দেখেও দেখা হয়নি, তা হলো, অমন আনুকূল্যের সংকুচিত পরিভাষারাশি এবং ওই রকম কল্প-দর্শনের তুলনামূলক সীমাবদ্ধতা। আমার বক্তব্য হলো, প্রাচ্যতাত্ত্বিক বাস্তবতা অমানবিক এবং অটল; এর পরিধি এবং একইভাবে যতটা ওর প্রতিষ্ঠান ও সর্বব্যাপী প্রভাব এখন পর্যন্ত টিকে আছে, তা-ও।

কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্ব কীভাবে কাজ করে? কীভাবে একে একটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রপঞ্চ, চিন্তার একটি ধরন, একটি সমকালীন সমস্যা ও বিষয়গত বাস্তবতারূপে বর্ণনা করা যেতে পারে? সাম্রাজ্যের এক গুণী টেকনিশিয়ান ও প্রাচ্যতত্ত্বের সুফলভোগী ক্রোমারকে আবার বিবেচনায় আনা যায়। তিনি আমাদের প্রাথমিক উত্তর জোগাতে পারবেন। 'প্রজার জাতিসমূহের' সরকারে তিনি এ সমস্যা নিয়ে গলদঘর্ম হয়েছেন যে, কীভাবে ব্যক্তিগণের জাতি ব্রিটেন কিছু নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত বিশাল এক সাম্রাজ্য শাসন করবে। তিনি দেশে লন্ডনের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তুলনা করে পার্থক্য দেখান স্থানীয় প্রতিনিধিদের, যাদের রয়েছে অ্যাংলোস্যাক্সন ব্যক্তিত্ব এবং স্থানীয়দের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান। শেষোক্তরা 'স্থানীয় স্বার্থ হিসাব করা এমন উপায়ে প্রজাদের শাসন করতে পারে যা সাম্রাজ্যের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত, এমনকি সংকটময় করে তুলতে পারে। এ কারণে বিপদ বা আশঙ্কা উদ্ভূত হওয়ার পূর্বেই শেষ করে ফেলার মতো অবস্থানে থাকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ'। কেন? কারণ এই কর্তৃপক্ষ 'যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশের সুসমন্বিত তৎপরতা নিশ্চিত করতে পারে' এবং প্রজাদের সরকারের ওপর আপতিত পরিস্থিতির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারে।'[১৪]

এখানকার ভাষা অস্পষ্ট এবং আকর্ষণহীন, তবে যা বলা হয়েছে তা বোঝা কঠিন নয়। পশ্চিমে ক্ষমতার একটি কেন্দ্র এবং তা থেকে প্রাচ্যের দিকে বিচ্ছুরিত একটি বিরাট, সর্বগ্রাসী যন্ত্র কল্পনা করেন ক্রোমার। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সেখানে অক্ষুণ্ন থাকে, যন্ত্রটির নিয়ন্ত্রণও থাকে তার হাতে। প্রাচ্যে যন্ত্রটির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যন্ত্রটিতে যা সরবরাহ করে তা হলো—মানববস্তু, বস্তুগত সম্পদ, জ্ঞান, যা আপনার আছে। সে সব যন্ত্রটির দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে আরও অধিক ক্ষমতায়। বিশেষজ্ঞ জ্ঞান তুচ্ছ প্রাচ্য বস্তুকে তাৎক্ষণিক রূপান্তরিত করে দরকারি বস্তুতে : উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচ্যজন পরিণত হয় শাসিত জাত-এ, প্রাচ্য-মানসিকতার নমুনায়, এবং সবই ঘটে দেশে (ইংল্যান্ডে) 'কর্তৃত্ব' বৃদ্ধির নিমিত্তে। 'স্থানীয় স্বার্থ'

প্রাচ্যতাত্ত্বিকের বিশেষ স্বার্থ; সামগ্রিক সাম্রাজ্যবাদী সমাজের প্রধান স্বার্থ হলো 'কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব'। ক্রোমার নিখুঁতভাবে যা দেখেন তা হলো, সমাজ কর্তৃক জ্ঞানের ব্যবস্থাপনা, এই বাস্তব ঘটনা যে জ্ঞান–যত বিশিষ্টই হোক, তা–প্রথমে একজন বিশেষজ্ঞের স্থানীয় স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পরে পরিচালিত হয় কর্তৃত্বের সামাজিক প্রক্রিয়ায়। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় স্বার্থের এ মিথস্ক্রিয়া জটিল, কিন্তু বাছবিচারহীন নয়।

ক্রোমারের নিজের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি বলেন একজন ঔপনিবেশিক প্রশাসক হিসেবে তার 'মূল অধ্যয়নের বিষয় মানুষও'। যখন পোপ ঘোষণা করেন, মানবজাতির মূল অধ্যয়নের বিষয় হবে মানুষ। তিনি তখন সকল মানুষকেই নির্দেশ করেন, 'দরিদ্র ইন্ডিয়ানসমেত'। অথচ ক্রোমারের (মানুষ শব্দটির সাথে) 'ও'-এর ব্যবহার আমাদের মনে করিয়ে দেয় কোনো নির্দিষ্ট জাতের মানুষ, যেমন, প্রাচ্যজনকে যথাযথ অধ্যয়নের বিষয়রূপে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। কাজেই এই অর্থে প্রাচ্যজন সম্পর্কে যথাযথ অধ্যয় হল প্রাচ্যতত্ত্ব। যা অন্যান্য ধরনের জ্ঞান থেকে সঠিকভাবে আলাদাকৃত কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেকোনো কালে জ্ঞানকে ঘিরে থাকা বস্তুগত ও সামাজিক বাস্তবতার জন্য দরকারি বলে পরিগণিত হয়, ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ পায়। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের দিকে সার্বভৌমত্বের একটি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হয়, একটি ব্যঙ্গাত্মক শৃঙ্খল গড়ে ওঠে, যার সবচেয়ে পরিষ্কার রূপ একদা বর্ণনা করেছেন রুডইয়ার্ড কিপলিং :

খচ্চর, ঘোড়া, হাতি, বা বলদ তার চালককে মান্য করে, চালক মান্য করে তার সার্জেন্টকে এবং সার্জেন্ট তার লেফটেন্যান্টকে, লেফটেন্যান্ট তার ক্যাপ্টেনকে, ক্যাপ্টেন মেজরকে, মেজর কর্নেলকে, কর্নেল তিন রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ারকে, ব্রিগেডিয়ার তার জেনারেলকে মান্য করে, যিনি ভাইসরয়কে মেনে চলেন, ভাইসরয় আবার সম্রাজ্ঞীর সেবক।[১৫]

এই দানবীয় চেইন অব কমান্ডের মতো সুগঠিত ও ক্রোমারের 'হারমোনিয়াস ওয়ার্কিং'য়ের মতো দৃঢ়ভাবে পরিচালিত প্রাচ্যতত্ত্ব পশ্চিমের শক্তি ও প্রাচ্যের দুর্বলতাও প্রকাশ করতে পারে–যেভাবে পশ্চিম দেখেছে। এরকম দুর্বলতা ও সবলতা যেমন প্রাচ্যতত্ত্বে স্বাভাবিক, তেমনি সেই মতামতের সহজাত প্রবৃত্তি পৃথিবীকে মোটা দাগে বড় বড় অংশ ও অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। এই অঞ্চলগুলো পারস্পরিক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করে। ওই উত্তেজনার স্রষ্টা হলো তথাকথিত মৌলিক পার্থক্য।

এটিই প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক উত্থাপিত প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাপার। কেউ কি মানবীয় বাস্তবতাকে পরিষ্কারভাবে বিভাজিত করতে পারে–যেমনটি আসলেই মনে হয়; বিভিন্ন সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও জাতিকে বিভাজিত করতে পারে এবং তার পরিণামও কি মানবীয়ভাবে এড়াতে পারে? মানবীয়ভাবে পরিণতি এড়ানোর কথা বলে আমি জানতে চাচ্ছি যে, মানবজাতিকে 'আমরা' (পশ্চিম) ও 'ওরা'

(প্রাচ্যজনেরা) জাতীয় বিভাজনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত পারস্পরিক শত্রুতা এড়ানোর কোনো উপায় কি আছে? কারণ, এ ধরনের বিভাজন হলো এক রকম সাধারণ ধারণা, যার ব্যবহার ঐতিহাসিক ও বাস্তবিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিছু লোকের সাথে আর কিছু লোকের পার্থক্যের গুরুত্বকে–সাধারণভাবে, বিশেষভাবে নয়–জনপ্রিয়তার দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য। কেউ যখন বিশ্লেষণ, গবেষণা, জননীতির শুরু এবং শেষপ্রান্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতীয় বর্গ ব্যবহার করে (ক্রোমার ও বেলফোর যেমন ব্যবহার করেছেন) তখন তার ফলাফল হয় পার্থক্যের মেরুকরণ–প্রাচ্যজন আরও বেশি 'প্রাচ্যজন' এবং পাশ্চাত্যজন আরও বেশি 'পাশ্চাত্যজন' হয়ে ওঠে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সমাজের মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান সীমিত করে ফেলে। সংক্ষেপে, তার আধুনিক ইতিহাসের একেবারে গোড়া থেকে প্রাচ্যতত্ত্ব ভিনদেশির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তার একটি ভঙ্গি হিসেবে 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য'-জাতীয় বাঁধা-ধরা পার্থক্যভিত্তিক জ্ঞানের গৎবাঁধা নিয়মেই সর্বতোভাবে দুঃখজনক একটি প্রবণতা দেখায় : একটি 'পাশ্চাত্য' বা একটি 'প্রাচ্য' কামরায় চিন্তাকে প্রবাহিত করানোর উদ্দেশ্যে। কারণ, পশ্চিমে যেসব প্রাচ্যতাত্ত্বিক তত্ত্ব, চর্চা ও মূল্যবোধের দেখা মেলে, এ প্রবণতা তাদের মর্মমূলে ক্রিয়াশীল। প্রাচ্যের ওপর পশ্চিমের ক্ষমতার বোধ বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা সহকারে গৃহীত হয়েছে।

সমকালীন দু-একটি উদাহরণ এ পর্যবেক্ষণকে আরও পরিষ্কার করবে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষদের যে জগতের সাথে আদান-প্রদান করতে হবে, সে সমাজকে তারা সময় সময় জরিপ করে দেখবে, এটিই স্বাভাবিক। বেলফোর প্রায়ই তা করতেন। কিসিঞ্জারও করেন, তার প্রবন্ধ 'অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও পররাষ্ট্রনীতি'তে অন্তত খোলাখুলিভাবে। তিনি যে নাটক বর্ণনা করেছেন তা যথার্থ : একদিকে আভ্যন্তরীণ শক্তি, অন্যদিকে বৈদেশিক বাস্তবতার চাপের মধ্যে পৃথিবীতে কৌশলে তার আচরণ পরিচালনা করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। এ কারণে কিসিঞ্জারের আলোচনা পৃথিবী ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধাত্মক দ্বি-মেরু অবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া তিনি সচেতন কর্তৃত্বের সাথে কথা বলেন প্রধান প্রধান পশ্চিমা শক্তির কণ্ঠ হিসেবে, যেগুলোর সাম্প্রতিক ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা তাদের এমন এক পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে যে পৃথিবী সহজে তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার করে নেয় না। কিসিঞ্জার অনুভব করেন, যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল বিশ্বের তুলনায় শিল্পায়িত উন্নত পশ্চিমের সাথে কম সমস্যাসংকুলভাবে আদান-প্রদান করতে পারে। আবার, যুক্তরাষ্ট্র ও তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের (চীন, ইন্দোচীন, নিকট প্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা) সম্পর্কের সমকালীন বাস্তবতা দৃশ্যত একরাশ সমস্যায় কণ্টকময়, যা এমনকি কিসিঞ্জারও গোপন করতে পারেননি।

ভাষাতাত্ত্বিকেরা যাকে বলেন জড় বৈপরীত্য, প্রবন্ধটিতে সে পদ্ধতিতে অগ্রসর হন কিসিঞ্জার। তিনি দেখান, পররাষ্ট্রনীতি হতে পারে দুরকমের (ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ও

রাজনৈতিক), তেমনি দুই ধরনের কৌশল, দুটো সময়পর্ব ইত্যাদি। যুক্তি বিস্তারের ঐতিহাসিক পর্বটির শেষে এনে তিনি যখন সমকালীন পৃথিবীর মুখোমুখি হন, তখন একে যথারীতি দুভাগে ভাগ করেন। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ। প্রথম অর্ধেক, অর্থাৎ পশ্চিম গভীরভাবে এ ধারণার অনুবর্তী যে, পর্যবেক্ষকের নিকট বাস্তব পৃথিবী বাইরের জিনিস এবং জ্ঞান গঠিত হয় তথ্য সংরক্ষণ ও বিন্যাসের সমবায়ে–তা যত বেশি নিখুঁত, জ্ঞানও তত বেশি উন্নত। এর প্রমাণস্বরূপ কিসিঞ্জার বলেন যে, নিউটনীয় বিপ্লব উন্নয়নশীল বিশ্বে সংঘটিত হয়নি; 'সংস্কৃতির ওপর নিউটনীয় বিপ্লবের প্রথম যুগের প্রভাব পড়েনি। সংস্কৃতি অনিবার্যভাবে ধরে রেখেছে প্রাক-নিউটনীয় এ ধারণা যে, বাস্তব পৃথিবী প্রায় সম্পূর্ণতই পর্যবেক্ষকের অভ্যন্তরীণ বিষয়। পরিণতিতে, তিনি যোগ করেন, 'পশ্চিমের তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য নতুন দেশে সাম্রাজ্যবাদী বাস্তবতা ভিন্ন গুরুত্ববহ'। কারণ এক অর্থে এসব দেশ কখনো সে অভিজ্ঞতা আবিষ্কারের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়নি।[১৬]

প্রাচ্য যে নিখুঁত হতে অক্ষম সে প্রসঙ্গে ক্রোমারের মতো স্যার আলফ্রেড লিয়ালকে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয়নি কিসিঞ্জারের। কারণ, তিনি তার যুক্তি নিয়ে বিতর্কের সুযোগ রাখেননি, যাতে কোনো বৈধতা প্রদানের প্রয়োজন না হয় : আমরা আমাদের নিউটনীয় বিপ্লব সম্পন্ন করেছি, ওরা করেনি; চিন্তাবিদ হিসেবে আমরা ওদের চেয়ে ভালো।

ভালো! চূড়ান্ত পর্যায়ে রেখা টানা হয়েছে, ঠিক যে ঢঙে টেনেছিলেন বেলফোর ও ক্রোমার। অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তিবর্গ ও কিসিঞ্জারের মাঝখানে পড়ে আছে ষাট কিংবা আরও বেশি কিছু বছর। অসংখ্য যুদ্ধ ও বিপ্লব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে যে কিসিঞ্জার যাকে 'খুঁতযুক্ত' উন্নয়নশীল দেশ এবং ভিয়েনা সম্মেলন-পূর্ব ইউরোপের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন, সেই প্রাক-নিউটনীয় ভবিষ্যদ্বাণীভিত্তিক রীতি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। আবার, ক্রোমার ও বেলফোরের মতো নয়, কিসিঞ্জার অতএব এই প্রাক-নিউটনীয় পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হন, যেহেতু, তা 'সমকালীন বিপ্লবমুখী আলোড়ন সম্পর্কে যথেষ্ট নমনীয়তা দেখায়'। এভাবে নিউটন-উত্তর (বাস্তব) পৃথিবীর মানুষদের দায়িত্ব হলো 'কোনো সংকট কোনো একটি বিন্যাস অনিবার্য করে তোলার আগেই সেই বিন্যাসটি সংগঠিত করা।' অন্য কথায়, আমাদের এখনো এমন কোনো উপায় বের করতে হবে, যাতে উন্নয়নশীল পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটি কি ক্রোমারের সুসমন্বিতভাবে ক্রিয়াশীল কাল্পনিক যন্ত্রটির মতো নয়–যে যন্ত্রটি পরিকল্পিত হয়েছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের স্বার্থ দেখার জন্য, যা উন্নয়নশীল পৃথিবীর বিরোধিতা করে?

কিসিঞ্জার যখন পৃথিবীকে প্রাক-নিউটনীয় ও নিউটন-উত্তর বাস্তবতার ধারণায় ভাগ করেন, তখন তিনি হয়তো জানতেন না যে, বংশপরিচয়যুক্ত কোনো জ্ঞানভান্ডার থেকে

তিনি ঋণ গ্রহণ করছেন। কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য প্রাচ্যতাত্ত্বিদের দ্বারা নির্দিষ্টকৃত রক্ষণশীল বিভাজনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যারা পাশ্চাত্যবাসীদের থেকে প্রাচ্যজনকে আলাদা করে। প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মতো কিসিঞ্জারের স্বাতন্ত্র্যও মূল্যবোধমুক্ত নয়, তার সুর আপাতভাবে নিরপেক্ষ মনে হওয়া সত্ত্বেও। 'ভবিষ্যদ্বাণীভিত্তিক, নিখুঁততা, অভ্যন্তরীণ, পর্যবেক্ষণভিত্তিক বাস্তবতা' ও 'বিন্যাস' প্রভৃতি শব্দ ছড়িয়ে আছে তার বর্ণনায়; এগুলো হয় আকর্ষণীয়, পরিচিত, আকাঙ্ক্ষাযোগ্য গুণাবলি নতুবা বিপজ্জনক, উদ্ভট, বিশৃঙ্খল ত্রুটিনির্দেশ করে। আমরা দেখব প্রথানুগ প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও কিসিঞ্জার উভয়ই বিভিন্ন সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে ধারণা করে নেন একটি যুদ্ধক্ষেত্র যা তাদের পৃথক করে এবং দ্বিতীয়ত, অন্যকে (অবশিষ্ট পৃথিবীকে) নিয়ন্ত্রণ, ধারণ এবং না হলে (উন্নত জ্ঞান ও সুষমভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দ্বারা) পরিচালনা করার জন্য পশ্চিমকে আমন্ত্রণ জানায়। কোনো পরিণতি ও কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যয়ে এরকম শক্তিমুখীন বিভাজন বজায় রাখা হয়েছে তা এখন আর কাউকে মনে করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

আরেকটি উদাহরণ, যা নিখুঁতভাবে হয়তো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কিসিঞ্জারের বিশ্লেষণে জুড়ে দেয়া। আমেরিকান জার্নাল অব সাইকিয়াট্রি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় হ্যারল্ড ডব্লিউ গ্লিডেনের লেখা একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। গ্লিডেনকে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য বলে পরিচয় দেয়া হয়। নিবন্ধটির শিরোনাম (দি আরব ওয়ার্ল্ড), মূল সুর ও বিষয়বস্তু গভীরতর বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ প্রাচ্যতাত্ত্বিক মনের প্রবণতা তুলে ধরে। দুই কলামে, চার পৃষ্ঠায় গত ১ হাজার ৩০০ বছরকে বিবেচনায় এনে ১০০ মিলিয়নের বেশিসংখ্যক লোকের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনায় তার মতের ঠিক চারটি উৎস উল্লেখ করেন লেখক : ত্রিপলির ওপর লিখিত একখানি সাম্প্রতিক গ্রন্থ, মিসরীয় পত্রিকা আল-আহরামের একটি সংখ্যা, Oriente Mderno নামের একটি সাময়িকী এবং খ্যাতনামা প্রাচ্যতাত্ত্বিক মজিদ খাদুরির একটি বই। নিবন্ধটি তার মূল লক্ষ্য হিসেবে 'আরবদের আচরণের অন্তর্গত ক্রিয়াশীলতা উন্মোচন'-এর ইঙ্গিত দেয়, যা আমাদের নিকট 'অস্বাভাবিক' মনে হলেও ওদের কাছে 'স্বাভাবিক'। অনুকূল সূচনার পর আমাদের বলা হয়েছে যে, আরবরা সাদৃশ্যের ওপর জোর দেয়, ওরা লজ্জার সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে যাতে 'মর্যাদার পদ্ধতিটি' নির্ধারিত হয় অনুগামী ও খরিদ্দার জোগানোর সক্ষমতার হিসাবে (এক ফাঁকে আমাদের এ-ও বলা হয় যে, আরব সমাজ বরাবরই মক্কেল-পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কভিত্তিক); আরবরা কেবল সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতেই কাজ করতে পারে, অন্যের ওপর আধিপত্য করার ক্ষমতায় সম্পূর্ণত নির্ভর করে তাদের মর্যাদা। লজ্জার সংস্কৃতি–অতএব, ইসলাম–প্রতিশোধকে গুণে পরিণত করেছে (এখানে তিনি উল্লসিত ভঙ্গিতে আল-আহরামের জুন ২৯, ১৯৭০ সালের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চান, '১৯৬৯ সালে মিসরে সংঘটিত ১

হাজার ৭০টি খুনের ঘটনায়, যেখানে অপরাধীরা ধরা পড়েছে, দেখা গেছে ২০ শতাংশ খুন হয়েছে লজ্জা মোচনের আকাঙ্ক্ষায়, ৩০ শতাংশ ঘটেছে প্রকৃত বা কাল্পনিক ভুল সংঘটিত করতে গিয়ে, এবং ৩১ শতাংশ রক্তের বদলা নেয়ার আকাঙ্ক্ষায়)। পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও 'আরবদের জন্য একমাত্র যৌক্তিক কাজ হলো শান্তি স্থাপন...আরবদের বেলায় কিন্তু পরিস্থিতি ওই ধরনের যুক্তি দ্বারা পরিচালিত নয়, কারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমুখী হওয়ার বিষয়টি আরব সিস্টেমে কোনো মূল্যবোধ নয়।'

গ্লিডেন চালিয়ে যান, এরপর আরও আগ্রহের সাথে। লক্ষ্য করার মতো যে, আরব মূল্যবোধ প্রক্রিয়ায় যখন দলের মধ্যে পূর্ণ একাত্মতা দাবি করা হয়, তখন একই সাথে তা দলের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে রেষারেষিও উৎসাহিত করে, যা পরিণামে ওই একাত্মতার ধ্বংস ডেকে আনে। আরব সমাজে কেবল সাফল্যের হিসেব হয়, পরিণতি উপায়কে বৈধ করে। আরবরা 'স্বাভাবিকভাবেই' এমন পৃথিবীতে বাস করে যা সর্বব্যাপী সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত উদ্বেগে ভরপুর এক জগৎ; তা সাঁটিয়ে দিয়েছে অবাধ শত্রুতার লেবেল; 'এড়িয়ে যাওয়ার কলাকৌশল আরবদের জীবনে, তেমনি ইসলামেও বিশেষ বিকাশ লাভ করেছে।' আর সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে আরবদের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, তা করতে না পারলে তারা 'আত্মধ্বংসী' লজ্জাবোধ করে। অতএব, যদি 'পশ্চিমের লোকেরা মূল্যবোধের মাপকে শান্তিতে উঁচু আসনে বিবেচনা করে' এবং যদি 'সময়ের মূল্য সম্পর্কে আমাদের থেকে থাকে উঁচু মানের সচেতনতা', তবে আরবদের ক্ষেত্রে তা সত্যি নয়। 'প্রকৃতপক্ষে, আমাদের বলা হয়, 'আরবদের উপজাতীয় সমাজে (যেখানে আরব মূল্যবোধের উৎপত্তি) শান্তি নয়, শত্রুতাই স্বাভাবিক পরিস্থিতি। কারণ, তাদের অর্থনীতির প্রধান দুটো উপায়ের একটি ছিল লুটের অভিযান।' এ ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশদ আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো কীভাবে পশ্চিমা ও প্রাচ্য মূল্যবোধের নিক্তিতে উপাদানসমূহের সাপেক্ষ অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন তা দেখানো।[১৭]

এ হলো প্রাচ্যতাত্ত্বিক আত্মবিশ্বাসের দূরতম বিন্দু। কোনো তুচ্ছ সাধারণীকরণও সত্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়নি। প্রাচ্যজনের ওপর আরোপিত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের তালিকায় একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও নেই যা বাস্তব জগতের প্রাচ্যজনের ওপর প্রয়োগ করা হয় না। একদিকে আছে পাশ্চাত্যজন, অন্যদিকে আরব-প্রাচ্যজন; প্রথমোক্তরা (বিশেষ কোন রীতিতে নয়) বিচারবোধসম্পন্ন, শান্তিপ্রিয়, উদার, যুক্তিবাদী, প্রকৃত মূল্যবোধ লালনে সক্ষম, স্বাভাবিক সন্দেহ থেকে মুক্ত; দ্বিতীয়োক্তরা এর কোনোটাই নয়। প্রাচ্যসম্পর্কিত কোন যৌথ অথচ বিশেষায়িত মতামত থেকে এ ধরনের মন্তব্য উদ্ভূত হয়েছে? ক্রোমার, বেলফোর ও আমাদের সমকালীন রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তার এমন সাদৃশ্য দিয়েছে কোনো বিশেষ দক্ষতা, কোন কল্পজাগতিক চাপ, কোন প্রতিষ্ঠান ও প্রথাগুচ্ছ, কোন সাংস্কৃতিক শক্তি?

• খ •

কাল্পনিক ভূগোল ও তার প্রতিনিধিত্ব : প্রাচ্যের প্রাচ্যায়ন

প্রকৃতপক্ষে, প্রাচ্যতত্ত্ব পণ্ডিতি অধ্যয়নের বিষয়। পশ্চিমে মনে করা হয়, ১৩১২ সালে ভিয়েন চার্চ কাউন্সিল কর্তৃক 'আরবি, গ্রিক, হিব্রু, সিরীয় বিষয়ে প্যারিস, অক্সফোর্ড, বোলোগনা, অ্যাভিগন ও স্যালামঙ্কায়'[১৮] একটি করে চেয়ার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই প্রাচ্যতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক সূচনা। তবে প্রাচ্যতত্ত্বের যেকোনো বিবরণে শুধু পেশাদার প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও তাদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করলেই চলবে না, প্রাচ্য নামের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও জাতিগত ঐক্যভিত্তিক অধ্যয়নক্ষেত্রের ধারণাটিও বিবেচনা করতে হবে। 'অধ্যায়নক্ষেত্র' অবশ্যই সৃষ্ট। এগুলো কালক্রমে ঐক্য ও আসঞ্জন শক্তি লাভ করে। কারণ, পণ্ডিতেরা এমন কিছুতে আত্মনিয়োগ করেন, যাকে মনে হয় সর্বজন-গৃহীত বিষয়বস্তু। অবশ্য একটি কথা কখনো পরিষ্কার করে বলা হয় না যে, জ্ঞানক্ষেত্র বা অধ্যয়নক্ষেত্র কদাচিৎ অত সরলভাবে সংজ্ঞায়িত, যতটা এর প্রতিশ্রুতিশীল অনুগামী যেমন, পণ্ডিতবর্গ, অধ্যাপকবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ প্রমুখ দাবি করেন। অন্যদিকে একটি অধ্যয়নক্ষেত্র এমনকি ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস বা ঈশ্বরতত্ত্বের মতো প্রথাগত বিষয় আগাগোড়া এতটাই বদলে যেতে পারে যে, তার সর্বকাজে ব্যবহারযোগ্য বিষয়বস্তুর সংজ্ঞায়ন প্রায় অসম্ভব। এ-ও প্রাচ্যতত্ত্বের বেলায় সত্যি, মনোগ্রাহী কিছু কারণে।

ভৌগোলিক অধ্যয়নের একটি বিষয় হিসেবে পণ্ডিতি বিশেষীকরণ প্রাচ্যতত্ত্বের বেলায় যথেষ্ট উন্মোচক, যেহেতু কেউ এর সমান্তরালে পাশ্চাত্যতত্ত্ব নামে কোনো অধ্যয়নক্ষেত্র কল্পনা করার সম্ভাবনা কম। বিশেষ করে এরই মধ্যে, হয়তো এমনকি প্রাচ্যতত্ত্বের স্ব-কেন্দ্রিক মনোভঙ্গিও প্রকাশ্য রূপ পেয়েছে। কারণ যদিও অনেক পণ্ডিতি বিষয় মানববস্তুর প্রতি নির্দিষ্ট কোনো অবস্থান গ্রহণের ইঙ্গিত করে (যেমন একজন ঐতিহাসিক বর্তমানের একটি সুবিধাজনক অবস্থান থেকে মানব-অতীত নিয়ে আলোচনা করেন), কিন্তু বিচিত্র রকমের সামাজিক, ভাষাগত, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতি নির্দিষ্ট–কমবেশি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক–অবস্থান গ্রহণের যথার্থ উপমা নেই। একজন ধ্রুপদমুখী, একজন রোমান্স বিশেষজ্ঞ, এমনকি একজন

আমেরিকানবাদীও পৃথিবীর একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য অংশে দৃষ্টিপাত করবে, গোটা অর্ধেকটার ওপর নয়।

কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়টির সাথে জড়িয়ে আছে উল্লেখযোগ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা। প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ প্রথাগতভাবে মেতে আছেন প্রাচ্য বিষয়াদি নিয়ে (যারা নিজেদের প্রাচ্যতাত্ত্বিক বলে অভিহিত করেন, তাদের নিকট ইসলামি আইনে একজন বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যতাত্ত্বিক হিসেবে বিবেচিত এবং তিনি চীনা উপভাষা বা ভারতীয় ধর্ম বিশেষজ্ঞের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নন)। আমাদের তাই শিখতে হবে কীভাবে প্রাচ্যতত্ত্বের বিশাল, অপরিমেয় পরিধি এবং বিভাজন উপবিভাজনের প্রায় অসীম ক্ষমতা উপলব্ধিতে অবধারণ করা যায়; বিভাজন-ক্ষমতা এর একটি প্রধান স্বভাবও–এমন স্বভাব যা চোখে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী অস্পষ্টতা ও খুঁটিনাটি বিবরণের সন্দেহজনক মিশ্রণে।

এ সকল কিছুই প্রাচ্যতত্ত্বকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়রূপে বর্ণনা করে। প্রাচ্যতত্ত্বে 'তত্ত্ব' অন্যান্য সকল বিষয় থেকে এ বিষয়টির পার্থক্যের ওপর জোর দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়রূপে এর বিকাশের বিধি হলো এর ক্রমশ বর্ধিত পরিধি, বাছাই-প্রবণতা নয়। রেনেসাঁস পর্বে পেনিয়াস ও গুইলাম পোস্টাল ছিলেন বাইবেলোক্ত অঞ্চলসমূহের ভাষার প্রাথমিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ; যদিও পোস্টার অহংকার করতেন যে, তিনি চীন অবধি এশিয়া পাড়ি দিতে পারবেন কোনো দোভাষী ছাড়াই। কমবেশি আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাইবেল-বিষয়ক পণ্ডিত ও সেমেটিক ভাষার ছাত্ররা ইসলাম এবং জেসুইটরা চীন বিষয়ে নতুন অধ্যয়ন শুরু করায় চীনাবাদীরা হলেন প্রাচ্যতাত্ত্বিক।

শেষ আঠারো শতকে অ্যাঁকুইতিল দুপেরন ও স্যার উইলিয়াম জোনস বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আবেস্তা ও সংস্কৃতের সমৃদ্ধি আবিষ্কার করার আগ পর্যন্ত এশিয়ার গোটা মধ্য এলাকাটি প্রাচ্যতত্ত্বের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জয় করা সম্ভব হয়নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রাচ্যতত্ত্ব যতটা কল্পনা করা যায়, তেমনই বিশাল ধনাগারের মতো এক শিক্ষণীয় জ্ঞানক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই নতুন বিজয়ী বাছাইকরণ প্রক্রিয়ার দুটো চমৎকার সূচি আছে। এর একটি হলো লা রেনেসাঁস অরিয়েন্টাল[১৯]-এর রেমন্ড স্কোয়াব কর্তৃক প্রদত্ত ১৭৬৫ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী প্রাচ্যতত্ত্বের বর্ণনা। এ পর্বে ইউরোপের পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রাচ্য বস্তু-বিষয়াদির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের একেবারে বাইরে অনিবার্যভাবে প্রাচ্যবিদ্যা-মহামারি আক্রান্ত করেছিল ওই কালের সকল কবি, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিকদের। স্কোয়াবের মত হলো–প্রাচ্যতত্ত্ব নির্দেশ করে এশীয় সকল কিছুর প্রতি অ-পেশাদার বা পেশাদার আগ্রহ–যা অদ্ভুত, রহস্যময়, গভীরতর। এ হলো হাই রেনেসাঁসের কালে প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন জগতের প্রতি ইউরোপের আগ্রহের উত্তরকালীন পূর্বমুখী দিগ্‌বদল। ১৮২৯ সালে ভিকটর হুগো এই পরিবর্তনকে এদিকে স্থাপন করেন তার রচনায়।[২০] অতএব, উনিশ

শতকের প্রাচ্যতাত্ত্বিক হয় একজন পণ্ডিত (একজন চীন-বিশেষজ্ঞ, একজন ইসলাম বিশেষজ্ঞ বা একজন ইন্দো-ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ) অথবা একজন তীক্ষ্ণধী আগ্রহী (যেমন হুগো লেস অরিয়েন্টাল-এ, ওয়েস্টোস্টিসলার দিওয়ান-এ গ্যোয়েটে)—অথবা উভয়ই (যেমন, রিচার্ড বার্টন, এডওয়ার্ড লেইন, ফ্রেডরিখ শ্লেগেল)।

ভিয়েনের কাউন্সিলের পর থেকে প্রাচ্যতত্ত্ব কতটা বিস্তৃত হয়েছে তার দ্বিতীয় সূচি পাওয়া যায় বিষয়টির উনিশ শতকী কালপঞ্জিতে। ওই ধরনের কাজের মধ্যে সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জুলস মোহল-এর 'ভিনটি ডি হিস্টয়ের ডি অরিয়েন্টাল'...প্রাচ্যতত্ত্বে ১৮৪০ থেকে ১৮৬৭[২১] সালের মধ্যে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য সবকিছু নিয়ে দুই ভলিউমের চমৎকার একটি লগবুক। প্যারিসের এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন মোহল। উনিশ শতকের প্রথম আধাআধির বেশি সময়জুড়ে (ওয়াল্টার বেনজামিনের মতে গোটা উনিশ শতক ধরে) প্যারিস ছিল প্রাচ্যতাত্ত্বিক পৃথিবীর রাজধানী। সোসাইটিতে বাস্তবে সম্ভাব্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন মোহল। ওই সাতাশ বছরে কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত এশিয়াকে ছুঁয়ে এমন কোনো কাজ করেছেন কি না সন্দেহ যাতে 'কোনো-না-কোনো শিরোনামের' অধীনে নাক গলাননি মোহল। তার নাক গলানোটা অবশ্যই প্রকাশনার ব্যাপারে, তবে প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের আগ্রহবিষয়ক প্রকাশনার আওতা ছিল বিরাট। আরবি, অসংখ্য ভারতীয় উপভাষা, হিব্রু, পহলভি, আসিরীয়, বেবিলোনীয়, মঙ্গোলীয়, চীনা, বার্মিজ, মেসোপটেমীয়, জাভানিজ বিশেষজ্ঞ : প্রাচ্যতাত্ত্বিক বলে বিবেচিত ভাষাতাত্ত্বিক প্রায় অগণিত। এর ওপর প্রাচ্যতাত্ত্বিক অধ্যয়ন আপাতভাবে বিভিন্ন রচনা অনুবাদ ও সম্পাদনা থেকে শুরু করে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার সকল জানা নতুন/পুরোনো সভ্যতার মুদ্রা-বিজ্ঞানগত, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। গুস্তাভ দুগাত-এর রচনা (Historie des orientalistes de I Euroe du XII au XIX siecle, 1868-1870)[২২] এ সম্পর্কে বাছাইকৃত প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্বের আলোচনা। কিন্তু এর উপস্থাপিত ব্যাপ্তি মোহলের রচনার চেয়ে কম কিছু নয়।

যাহোক, এই বাছাইকরণের মধ্যে রয়ে গেছে কালো দাগ। প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা অধিকাংশ সময়ই গবেষণা ক্ষেত্রের সমাজ ও ভাষার প্রাচীন স্তরের প্রতিই আগ্রহী। এ বিষয়ে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের ইনস্টিটিউট ডি 'ইজিপ্ট একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম; এটি এই প্রথম যথেষ্ট মনোযোগ দেয় আধুনিক বা বাস্তব প্রাচ্যের প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নের প্রতি। এ ছাড়াও, অধীত প্রাচ্য আসলে এক কেতাবি পৃথিবী; প্রাচ্যের ছাপ অঙ্কিত হয় বই ও পাণ্ডুলিপির সাহায্যে, রেনেসাঁয় ধ্রুপদ গ্রিসের প্রভাব বিস্তারের মতো ভাস্কর্য ও কাব্যসাহিত্য-জাতীয় শিল্পবস্তুর তোতা-অনুকরণের মতো নয়। এমনকি প্রাচ্য ও প্রাচ্যতত্ত্বের পেশাগত সম্পর্কও ছিল

কেবল কেতাবি–এমনই যে, শোনা যায়, উনিশ শতকের প্রথম দিকে কয়েকজন জার্মান প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রথমবারের মতো (রচনার বাইরে প্রত্যক্ষ) আট হাতবিশিষ্ট একটি ভারতীয় মূর্তি দর্শনের পর চিরতরে তাদের প্রাচ্যবিষয়ক আগ্রহের আরোগ্য ঘটে।[২৩]

যখন কোনো বিজ্ঞ প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশটি ভ্রমণ করেন, তখন তার মানসিকতায় সক্রিয় থাকে তার অধীত ওই 'সভ্যতার' পরিবর্তন-অযোগ্য বিমূর্ত নীতিকথাগুলো। স্থানীয়, ক্ষয়ে যাওয়া, উপলব্ধি করতে অক্ষম মানুষের মধ্যে অসার্থকভাবে ওইসব জীর্ণ সত্যোক্তি প্রয়োগ করে এগুলোর সত্যতা প্রমাণ করার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি কদাচিৎ আগ্রহী হন প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা। সবশেষে, প্রাচ্যতাত্ত্বিক শক্তি ও পরিধি প্রাচ্য সম্পর্কে কেবল যথাযথ ইতিবাচক জ্ঞানই সৃষ্টি করেননি, প্রাচ্যের গল্পকাহিনি, রহস্যময় পুবের পুরাণ, এশিয়ার রহস্যময় গভীরতার ধারণা প্রভৃতিতে প্রচ্ছন্ন থাকা দ্বিতীয় স্তরের একধরনের জ্ঞানেরও জন্ম দিয়েছে–যার রয়েছে নিজস্ব জীবনধারা, ভি. জি. কিয়ার্নান জুৎসইভাবে যাকে বলেছেন, 'প্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপের যৌথ দিবাস্বপ্ন'।[২৪]

এর একটি সুখকর ফলাফল হলো উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ প্রাচ্য বিষয়ে যথার্থ কৌতূহলী : আমি মনে করি হুগো, গ্যোয়েটে, নেরভাল, ফ্লবার্ত, ফিটজেরাল্ডের মতো লেখকদের রচনার দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে এ-জাতীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখার একটি শ্রেণি ধরে নেয়া যথার্থ। এ ধরনের কাজের সাথে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে থাকে মুক্ত কল্পনার প্রাচ্য-পুরাণ, যে প্রাচ্য কেবল সমকালীন মনোভাব ও জনপ্রিয় সংস্কার থেকেই নয়–ভিকোর ভাষায়, পণ্ডিতবর্গ ও জাতিসমূহের আত্ম-অহংবোধ থেকেও উদ্ভূত হয়েছে। আমি এরই মধ্যে ইঙ্গিত করেছি এ ধরনের বিষয়বস্তুর রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে, যে প্রবণতা দেখা দেয় বিশ শতকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রাচ্যতাত্ত্বিক নিজেকে যেভাবে প্রাচ্যতাত্ত্বিক বলে পরিচয় দিতেন, এখন আর সেভাবে পরিচয় দেয়ার কথা নয়। এ সত্ত্বেও অভিধাটি এখনো ব্যবহার-উপযোগী, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রাচ্য ভাষা বা প্রাচ্য সভ্যতার ওপর প্রকল্প বা বিভাগ পরিচালনা করে। অক্সফোর্ডে প্রাচ্য অনুষদ রয়েছে, প্রিন্সটনে আছে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগ। সম্প্রতি ১৯৫৯ সালে ব্রিটিশ সরকার 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্লাভোনিক, পূর্ব-ইউরোপীয়, আফ্রিকান ও প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে অর্জিত উন্নতি সম্পর্কে মতামত...এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানের জন্য' একটি কমিশনকে ক্ষমতা প্রদান করে।[২৫] হেইটার রিপোর্ট শিরোনামে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত ওই রিপোর্ট 'প্রাচ্য' নামে বিস্তৃত অভিধাটি নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েছে বলে মনে হয়নি; বরং তা পর্যবেক্ষণ করে যে, ওই অভিধাটি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কার্যকরভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। এমনকি আধুনিক অ্যাংলো-আমেরিকান ইসলামচর্চায়

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম এইচ. এ. আর. গিবও নিজেকে অ্যারাবিস্ট না বলে প্রাচ্যতাত্ত্বিক বলেন। 'এরিয়া স্টাডিজ' ও 'প্রাচ্যতত্ত্ব' যে পরস্পর বদল সম্ভব, ভৌগোলিক শিরোনাম অন্তত তা দেখানোর জন্য ধ্রুপদ মানসিকতার গিব শেষ পর্যন্ত কুৎসিত নতুন-শব্দায়ন 'এরিয়া স্টাডিজ' শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন[২৬]। কিন্তু আমি মনে করি, তা জ্ঞান ও ভূগোল-এর আকর্ষণীয় সম্পর্ককে সুচতুরভাবে বিপথগামী করে। সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই আমি।

বহু বিরাট বিরাট অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও চিত্রকল্প ঝরে পড়া সত্ত্বেও মন নাছোড়বান্দার মতো–ক্লাদে লেভিস্ট্রেশনের ভাষায় বিজ্ঞান গঠন করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।[২৭] যেমন একটি আদিম উপজাতি তার অব্যবহিত পারিপার্শ্বের প্রতিটি পত্রময় উদ্ভিদ প্রজাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান, কাজ ও গুরুত্ব আরোপ করে। এসব ঘাসপাতার অনেকগুলোই কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু রেভিস্ট্রেশ যুক্তি দেখান যে, মনের প্রয়োজন বিন্যাস, এবং বিন্যাস অর্জিত হয় সবকিছু বিচার করা ও স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা এবং মন যেসব বিষয়ে সচেতন সেগুলোকে পুনরায় খুঁজে পাওয়া যায় এমন একটি নিরাপদ স্থানে জায়গা করে দেয়ার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ পরিপার্শ্ব গঠনকারী বস্তুপুঞ্জের সংগঠনে জিনিসগুলোকে এক একটি ভূমিকা প্রদান করার মাধ্যমে। এ ধরনের প্রাথমিক শ্রেণিবিভাজনের নিজস্ব যুক্তি আছে। কিন্তু যুক্তির যে রীতিনীতি দ্বারা সবুজ ফার্ন এক সমাজে দয়ার প্রতীক অন্য সমাজের ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়, তা যুক্তিনির্ভর নয়, নয় সর্বজনীন।

বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবধানকে যেভাবে দেখা হয়, তাতে সব সময়ই পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী একটা মাত্রা থাকে। পার্থক্যের সাথে সম্পর্ক মূল্যবোধের, যার ইতিহাস, কেউ যদি সবটুকু খুঁড়ে বের করতে পারে, সম্ভবত স্বেচ্ছাচারিতার মতো একই আদর্শ প্রদর্শন করবে। ফ্যাশনের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুব দেখা যায়। কেন পরচুলা, লেস-কলার, উঁচু বকলসের জুতো চালু হয়, আবার দশকের ব্যবধানে হারিয়েও যায়? এর উত্তর কিছুটা উপযোগিতা আর কিছুটা ফ্যাশনের সহজাত সৌন্দর্যে সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু আমরা যদি একমত হই যে, ইতিহাসের সমস্ত কিছু–যেমন ইতিহাসও মানুষের সৃষ্টি, তখন এ সত্য স্বীকার করে নেব যে, এটি কতই না সম্ভব যে, অনেক বস্তু বা স্থান বা কাল যাতে কোনো ভূমিকা ও অর্থ আরোপ করা হবে তা বিষয়গত বৈধতা অর্জন করবে কেবল তার ওপর সে অর্থ ও ভূমিকা আরোপ করার পর। তুলনামূলকভাবে অপ্রচলিত বিষয় যেমন 'বিদেশি, রূপান্তরিত' বা 'অস্বাভাবিক' ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে সত্যি।

এমন যুক্তি দেখানো যায় যে, কিছু বিশেষ বস্তু মনের সৃষ্টি এবং এই বস্তুগুলো যখন বস্তুগতভাবে অস্তিত্বশীল বলে মনে হয়–থাকে কেবল কাল্পনিক বাস্তবতায়। কয়েক একর জমিতে বসবাসরত একদল মানুষ তাদের জমি ও সংলগ্ন পরিবেশ এবং এর

বাইরের ভূমি–যাকে ওরা বলে অসভ্যদের দেশ–এর মাঝখানে সীমানা দেয়াল তুলবে। পরিচিত 'জায়গা'কে ওর বা ওদের বলে মনের মধ্যে চিহ্নিত করার এই সর্বজনীন নীতি হলো ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া, যা হতে পারে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকারী। আমি 'স্বেচ্ছাকারী' শব্দটি ব্যবহার করলাম, কারণ, 'আমাদের ভূমি-অসভ্যদের ভূমি' জাতীয় বিভাজনের কাল্পনিক ভূগোলে অসভ্যরা পার্থক্য স্বীকার করে নেয়ার দরকার পড়ে না। 'আমাদের' নিজেদের মনে সীমানা চিহ্নিত করাই যথেষ্ট; 'ওরা' এমনিতেই 'ওরা' হয়ে যায় এবং আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় ওদের এলাকা ও মানসিকতা। ক্ষেত্রবিশেষে মনে হয়, আধুনিক ও আদিম সমাজ এরকম নেতিবাচকভাবে তাদের পরিচয়ের বোধ অর্জন করত। পঞ্চাশ শতকের একজন এথেনীয় খুব সম্ভবত নিজেকে যতটা ইতিবাচকভাবে এথেনীয় ভাবত, ঠিক ততটাই 'অবর্বর' মনে করত নিজেকে। ভৌগোলিক সীমানা কাঙ্ক্ষিত পন্থায় সাথে করে আনে সামাজিক, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সীমানা। তবু যে বোধের ভেতর মানুষ নিজেকে বিদেশি ভাবে না তা নির্ভর করে ওখানে–তার নিজের সীমানার বাইরে–কী আছে সেই ধারণার ওপর? নিজের এলাকার বাইরে অপরিচিত এলাকায় মনে হয় ভিড় করে আছে সব ধরে নেয়া 'অনুষঙ্গ' ও কল্পনা।

ফরাসি দার্শনিক গ্যাস্টন বাশলার্দ একটি বিশ্লেষণ লেখেন, যার নাম দেন 'পরিসর'-এর কাব্যতত্ত্ব।[২৮] একটা বাড়ির ভেতরটা সম্পর্কে মন (তিনি বলেন) অর্জন করে একরকম ঘনিষ্ঠতার বোধ, গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা–বাস্তব বা কাল্পনিক যা-ই হোক। কারণ, তার অভিজ্ঞতা এর জন্য সঠিক বলে মনে হয়। এর ঘরটির বস্তুগত পরিসর–এর কোনা, বারান্দা, সেলার, কক্ষসমূহ–প্রভৃতির ওপর কাব্যিকভাবে যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়, ওগুলোর বাস্তব গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক কম। এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আমরা নাম করতে পারি বা অনুভব করতে পারি এমন কাল্পনিক বা পরিসংখ্যানগত মূল্যসহ কোনো গুণ, যা বাড়িটির ওপর আরোপিত হয়েছে–এভাবে একটি বাড়িকে মনে হতে পারে 'ভুতুড়ে' বা নিজের বাড়ির মতো কিংবা জেলখানা টাইপ অথবা জাদুর বাড়ি। অতএব, স্থান আবেগগত, এমনকি যৌক্তিক বোধ অর্জন করে কাব্যিক প্রক্রিয়ায়, যে উপায়ে অতিক্রান্ত বা নামহীন দূরত্ব অর্থবোধে রূপান্তরিত হচ্ছে। সময় নিয়ে ভাবার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে। বহু পূর্বে, শুরুতে, সময়ের শেষে প্রভৃতি কালপর্ব সম্পর্কে আমরা যা বুঝি বা জানি তা কাব্যিক–বানানো। মিসরে মধ্য-রাজবংশ-সম্পর্কিত একজন ঐতিহাসিকের বেলায় 'বহুপূর্ব কাল' পরিষ্কার একটি অর্থ নির্দেশ করে। এ সত্ত্বেও, মানুষ নিজের সময় থেকে খুবই ভিন্ন ও দূরবর্তী কোনো সময় বিষয়ে লুক্কায়িত যে আধা কাল্পনিক অবস্থা অনুভব করে, তা কিন্তু ওই অর্থ দ্বারা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না। কারণ সন্দেহ নেই যে, কল্পনাময় ভূগোল ও ইতিহাস মনের সন্নিকটস্থ ও দূরবর্তীর মধ্যকার দূরত্ব ও পার্থক্য

আরও নাটকীয় করার মধ্য দিয়ে মনকে তার নিজস্বতার বোধ শাণিত করতে সহায়তা করে। তা অন্য ক্ষেত্রেও কম সত্যি নয় : যেমন এ ধরনের যেসব অনুভূতি আমরা প্রায়ই বোধ করি যে, আমরা ষোড়শ শতকে বা তাহিতি দ্বীপে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম।

তাই এমন ভান করা অর্থহীন যে, সময় ও স্থান, কিংবা বলা যায়, ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে যা জানি, তা কাল্পনিক ছাড়া অন্য কিছু। ইতিবাচক ইতিহাস ও ইতিবাচক ভূগোল বলে যে ব্যাপারগুলো রয়েছে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে তার অর্জন প্রভাবিত করার মতো উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতরা এখন পৃথিবী, তার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন, যতটা জানতেন গিবনের যুগে। এর অর্থ এই নয় যে, যা জানার আছে, তার সবই তারা জেনে গেছেন; কিংবা আরও গুরুত্বপূর্ণ, এ-ও নয় যে, কাল্পনিক জ্ঞান ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানকে দূর করে দিয়েছে। এ ধরনের কাল্পনিক জ্ঞান ইতিহাস ও ভূগোলকে পরিসিক্ত করে, নাকি ওগুলো চাপা দিয়ে যায় সে সিদ্ধান্ত এখনই নেয়ার প্রয়োজন নেই। আপাতত শুধু এটুকু বলে রাখি যে তা আছে এবং যা কেবল ইতিবাচক জ্ঞান বলে মনে হয়, তার চেয়ে বেশি কিছু রূপে আছে।

প্রায় আদিকাল থেকে ইউরোপে প্রাচ্য ছিল অভিজ্ঞতানির্ভর জ্ঞানের চেয়েও বেশি কিছু। আর ডব্লিউ সাউদার্ন চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন যে অন্তত আঠারো শতকের প্রথমপাদে একধরনের ইসলামি প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ইউরোপের জ্ঞান ছিল অজ্ঞতাবোধক, কিন্তু জটিল।[২৯] তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ নয় বা খুব অবহিত নয়–প্রাচ্যের সাথে এমন একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক চারদিক থেকেই প্রাচ্যবিষয়ক বিভিন্ন ধারণা টেনে এনে জড়ো করেছে।

প্রথমে পশ্চিম ও প্রাচ্যের সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারটি বিবেচনা করা যাক। ইলিয়াডের সময় থেকেই তা জোরালভাবে প্রতিষ্ঠিত মনে হয়। প্রাচ্যের সাথে জড়িত সবচেয়ে প্রভাবশালী দুটো বৈশিষ্ট্য আদি এথেনীয় নাটকের নিদর্শন এস্কিলাসের দ্য পার্সিয়ান ও ইউরোপিদিসের ব্যাকি–তে প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রিক সেনাবাহিনীর নিকট জেরেক্সেসের পরিচালনাধীন পারস্যের সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ শোনার পর পারসিয়ানদের ওপর দুর্যোগ নেমে আসার বোধ অভিব্যক্ত করেন এস্কিলাস।

কোরাসের কণ্ঠে শোনা যায় এ শোক-সংগীতটি :

এশিয়ার তাবৎ ভূমি এখন
শূন্যতায় গোঙায়।
জেরেক্সেস সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল! ওহ! ওহ!
জেরেক্সেস ধ্বংস হয়েছে! ওহ! ওহ!

জেরেক্সেসের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ
সমুদ্রের জাহাজ সারিতে।
তাহলে কেন দারিয়ুস–
সুসার ওই প্রিয় মানব নেতা
তার লোকদের ক্ষতি করেনি
যখন সে তাদের যুদ্ধে চালিত করে।[৩০]

এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এশিয়া ইউরোপের কল্পনার গুণে ও কল্পনায় কথা বলছে, যে ইউরোপ চিত্রিত হয়েছে সমুদ্রের ওপারের শত্রু 'অন্য' পৃথিবী এশিয়ার ওপর বিজয়ীরূপে। এশিয়াকে দেয়া হয়েছে শূন্যতার অনুভূতি, ক্ষতি ও দুর্যোগ, যেন পশ্চিমের প্রতি প্রাচ্যের চ্যালেঞ্জকে অলংকৃত করার জন্য এবং দেয়া হয়েছে এই বিলাপ যে, কোনো গৌরবোজ্জ্বল অতীতে এশিয়া ছিল শক্তিশালী, ইউরোপের ওপর বিজয়ী।

সবচেয়ে বেশি এশীয়কৃত নাটক *ব্যাকি*-তে ডায়োনিসাস পরিষ্কারভাবে এশীয় বংশতালিকায় সম্পর্কিত এবং অতিমাত্রিক প্রাচ্য রহস্যের সাথে জড়িত। থিবসের রাজা পেনথিউস তার মা অ্যাগেইভ এবং অনুগামী ব্যাকেন্টিসদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত। ডায়োনিসাসের অসাধারণ ক্ষমতা বা স্বর্গীয় সত্তা অস্বীকার করে পেনথিউস ভয়াবহ শাস্তিপ্রাপ্ত। নাটকটি শেষ হয় আত্মকেন্দ্রিক ঈশ্বরের ভয়ংকর ক্ষমতা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে। দ্য ব্যাকির অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও নন্দনতাত্ত্বিক প্রভাবের ব্যাপ্তি চিহ্নিতকরণে ব্যর্থ হননি আধুনিক ভাষ্যকাররা। কিন্তু এর অতিরিক্ত ঐতিহাসিক এই বিবরণও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় যে, ইউরোপিদিস 'নিশ্চয়ই এই নতুন জ্ঞানে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, বেন্ডিস, সিবিল, সাবাডিউস, এডোনিস ও আইসিসের আনন্দময় বিদেশি ধর্মমতের প্রভাবেই ডায়োনিসিয়ান গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছিল হয়তো। এই ধর্মমতগুলো আবার এশিয়া মাইনর ও লেভান্থ থেকে বিস্তৃত হয়েছে এবং ওপলেপোনেশীয় যুদ্ধের হতাশাময়, ক্রমশ বিচার-বিবেচনাহীন বছরগুলোতে পিরাউস ও এথেন্স হয়ে পৌছেছে।'[৩১]

নাটক দুটোর যে দুই বৈশিষ্ট্য নিয়ে পশ্চিমে প্রাচ্যের সূচনা হয় তা ইউরোপের কাল্পনিক ভূগোলে অনিবার্য উপাদান হিসেবে বহাল থাকে। দুই মহাদেশের মাঝখানে একটি রেখা টানা হয়ে যায়। ইউরোপ শক্তিশালী ও স্পষ্ট; এশিয়া পরাজিত ও দূর। এস্কিলাস এশিয়াকে উপস্থাপন করেন, জেরেক্সেসের বৃদ্ধা পারস্য রানির মুখ দিয়ে এশিয়াকে কথা বলান। প্রাচ্যকে কথা বলিয়ে যে দৃষ্টগ্রাহ্য করে সে হলো ইউরোপ। এই উচ্চারণ মর্যাদাজনিত বিশেষ অধিকার–পুতুল নাচিয়ের নয়–যথার্থ এক স্রষ্টার, যার জীবন-সঞ্চারী ক্ষমতা প্রতিনিধিত্ব ও প্রাণময় করে পরিচিত সীমানার বাইরের নীরব ও বিপজ্জনক এক জগৎকে। নাট্যকারের কল্পনায় সৃষ্ট এশিয়ার ধারক

এস্কিলাসের অর্কেস্ট্রা এবং বিস্তৃত, আকারহীন, এলোমেলো পড়ে থাকা এশিয়াকে কখনো কখনো সহানুভূতিশীল, অধিকাংশ সময় আধিপত্যবাদী যাচাই-বাছাইয়ের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতির যে বিজ্ঞ মোড়কে, সে দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

দ্বিতীয়ত রয়েছে প্রাচ্যের আরেক প্রতিরূপ যেখানে সে পরোক্ষে উদ্যত বিপদস্বরূপ। সাধারণ মূল্যবোধের বিরুদ্ধে রহস্যময় ওই আকর্ষণীয় বৈপরীত্য, অর্থাৎ প্রাচ্যের অমিতাচার যুক্তিবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পশ্চিম থেকে প্রাচ্যকে আলাদা করার যে পার্থক্য তাকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে অনমনীয়তা হিসেবে, যার বশে পেনথিউস প্রথমে ঐতিহাসিক ব্যাকেন্টিসদের বাতিল করে দেয়। পেনথিউসের ধ্বংসের কারণ যতটা না ডায়োনিসাসের নিকট আত্মসর্পণ, তার চেয়ে বেশি ডায়োনিসাস-ভীতি সম্পর্কে তার ভুল আন্দাজ। ইউরোপিদিস যে শিক্ষণীয় উদাহরণ দিতে চান, তা নাট্যিক রূপ লাভ করেছে ক্যাডমাস ও টাইরেসিয়াসের উপস্থিতিতে, যে জ্ঞানী বৃদ্ধদ্বয় উপলব্ধি করে কেবল সার্বভৌমত্ব, মানুষদের শাসন করে না[৩২], বিচার-বিবেচনার মতো ব্যাপার রয়েছে ওখানে; এর অর্থ হলো ভিনদেশি শক্তি ও ক্ষমতাকে কব্জা করা এবং দক্ষতাসহকারে তার সাথে একটি বোঝাপড়ায় আসা। এর পর থেকে প্রাচ্য রহস্যকে গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়, এজন্য নয় মোটেও যে, প্রাচ্যজনেরা যুক্তিনির্ভর পশ্চিমা মনকে তার দীর্ঘায়ু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা প্রয়োগের পথে চ্যালেঞ্জ করে।

পশ্চিম ও প্রাচ্যের মতো বড়সড় বিভাজন অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাজন ডেকে আনে, বিশেষত সভ্যতার সাধারণ উদ্যমসমূহে যেমন–ভ্রমণ, বিজয়, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের মতো বহির্মুখী তৎপরতা উস্কে দেয়। ধ্রুপদ গ্রিস ও রোমে ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক সিজারের মতো জনব্যক্তিত্ব, বাগ্মী, কবিগণ গোত্র থেকে গোত্রকে, অঞ্চল থেকে অঞ্চল, মন থেকে মন, জাতি থেকে জাতিকে পৃথক করে শ্রেণিকরণবিদ্যার লৌকিক জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন, যার বেশির ভাগ আত্ম-সেবামূলক এবং রোমান ও গ্রিকদের অন্য জাতের মানুষদের থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য টিকে থাকে। কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্বের রয়েছে শ্রেণিবিভাজনের নিজস্ব ঐতিহ্য ও যাজকতন্ত্র। ঐতিহাসিক, পর্যটক, কৌতূহলী ও বিরামহীন ধারাবিবরক হেরোডটাস এবং বীর সম্রাট, বৈজ্ঞানিক, বিজেতা আলেকজান্ডার যে পূর্বে প্রাচ্য এসেছিলেন সে ব্যাপারটি, অন্তত দ্বিতীয় খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে কোনো পর্যটক বা পুবমুখী উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতিকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়নি।

প্রাচ্য অতঃপর পূর্বে হেরোডটাস, আলেকজান্ডার ও তাদের অনুবর্তীদের জানা ও দেখা বিজিত অঞ্চলসমূহ এবং পূর্বে জানা হয়নি এমন সব অঞ্চলে উপবিভাজিত হয়। খ্রিষ্টধর্ম প্রাচ্য-মধ্যস্থ স্তরগুলো সাজানো সম্পন্ন করে : একটি হয় নিকট প্রাচ্য,

অন্যটি দূরপ্রাচ্য; একটি পরিচিত প্রাচ্য—যাকে রেনে গ্রসেত বলেন, লেভান্ত্, অন্যটি নতুন প্রাচ্য[৩৩]। অতঃপর মনের ভূগোলে প্রাচ্য অদল-বদল হয় : পুরোনো জগৎরূপে—যেখানে মানুষ এডেন বা বেহেশতে প্রত্যাবর্তনের মতো ফিরে আসে পুরোনোর একটি নতুন রূপ সৃষ্টি করার জন্য, অন্যদিকে সম্পূর্ণ নতুন অঞ্চলরূপে যেখানে কেউ আসে কলম্বাস যেমন আমেরিকায় এসেছিলেন, তেমনভাবে নতুন পৃথিবী প্রতিষ্ঠার জন্য (যদিও শ্লেষাত্মক যে, কলম্বাস নিজে ভেবেছিলেন তিনি পুরোনো পৃথিবীর একটা নতুন এলাকা আবিষ্কার করেছেন। ওই সব প্রাচ্যের কোনোটিই সম্পূর্ণ কোনো একটি বা সম্পূর্ণ অন্যটি নয়; এ হলো তাদের দোলাচলবৃত্তিতা, প্রভাবক ইঙ্গিতময়তা—মনকে টানা ও দ্বিধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা; এগুলো আকর্ষণীয়।

দেখা যাক, প্রাচ্য, বিশেষ করে নিকট প্রাচ্য সুদূর অতীত থেকে কীভাবে মহৎ শ্রদ্ধাবোধের বিপরীতরূপে পশ্চিমের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। এখানে বাইবেল ও খ্রিষ্টধর্মের উত্থান ছিল, বাণিজ্য-পথ চিহ্নিতকারী এবং নিয়ম-কানুনের মধ্যে বাণিজ্যিক বিনিময় পদ্ধতির প্রবর্তক মার্কোপলো ছিলেন—যার পর ভারথেমা ও পিয়েত্রো, মিথ্যা কথাকার ম্যান্ডেভিল ছিলেন, অবশ্যই দুর্ধর্ষ বিজয়ী প্রাচ্য আন্দোলনসমূহ, বিশেষত ইসলাম ছিল, ছিল লড়াকু তীর্থযাত্রী ক্রুসেডারগণ। এসব অভিজ্ঞতাভুক্ত সাহিত্য থেকে সব মিলিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে সংগঠিত একটি আর্কাইভ গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বেরিয়ে আসে সীমিতসংখ্যক নিদর্শনমূলক বলয়াধার : ভ্রমণ, ইতিহাস, নীতিকথা, নমুনা, তর্কবিদ্যাগত সংঘাত। এসব লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যবিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে; এগুলো রূপ দিয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্পর্শের ভাষা, উপলব্ধি, ধরন। অসংখ্য দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে যা কিছুটা ঐক্য এনে দিয়েছে তা হচ্ছে দোলাচলবৃত্তিতা, একটু আগেই যে সম্পর্কে বলছিলাম।

চিহ্নিতভাবে ভিনদেশি ও দূর কোনো কিছু কোনো-না-কোনো কারণে অর্জন করে স্বল্প-পরিচিতের চেয়ে বেশি কিছু মর্যাদা। সম্পূর্ণ অভিনব অথবা সম্পূর্ণ জানারূপে বিভিন্ন বিষয় বিচারের প্রবণতা লোপ পায়; নতুন, মাঝবরাবর একটা ধরন দেখা দেয়—এমন একটি ধরন যা কাউকে নতুন কিছু—প্রথমবারের মতো দেখা কোনো কিছুকে পূর্বে চেনা অন্য কিছুর নতুনরূপ হিসেবে দেখার সুযোগ করে দেয়। সারগত দিক থেকে এই ধরন যতটা না নতুন তথ্য গ্রহণের উপায়, তার চেয়ে বেশি কোনো বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত মতামতের প্রতি হুমকিস্বরূপ ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি। মনকে যদি হঠাৎ করে জীবনের বৈপ্লবিক ধরনরূপে ভেবে নেয়া কিছু—যেমন আদি মধ্যযুগের ইউরোপের নিকট ইসলামের মতো কিছুর মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে তার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হবে রক্ষণশীল ও আত্মরক্ষামূলক। ইসলাম বিবেচিত হয়েছে পুরোনো অভিজ্ঞতা—এক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্মের জাল সংস্করণ হিসেবে। তাই হুমকিকে নির্বাক করা

হয়, জানা মূল্যবোধসমূহ নিজেরাই আরোপিত হয় এবং সবশেষে মন চাপমুক্ত হয় বিষয়টিকে হয় প্রকৃত অথবা পুনরাবৃত হিসেবে তার নিজের পরিসরে জায়গা করে দিয়ে। এরপর ইসলামকে মোকাবিলা করা হয়, যাতে থেকে যায় আপেক্ষিকভাবে সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্ব। তা অসম্ভব হতো যদি না এর কাঁচা নতুনত্বের ওপর মনোযোগ দেয়া হতো। প্রাচ্য সামগ্রিকভাবে পরিচিত রূপের জন্য পশ্চিমের ঘৃণা এবং নতুনত্ব বা অভিনবত্বের জন্য পশ্চিমের আনন্দ বা ভয়ের শিহরণের মধ্যে দোল খায়।

তবু যেখানে ইসলাম জড়িত, সেখানে ইউরোপের ভীতি আছেই–যদি সব সময় শ্রদ্ধা না হয়। ৬৩২ সালে মোহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর ইসলামের সামরিক এবং পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব বিপুল বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথমে পারস্য, সিরিয়া ও মিসর, পরে তুরস্ক, এরপর সিসিলি, ফ্রান্সের অংশবিশেষ বিজিত হয় অষ্টম ও নবম শতকে। তেরো ও চৌদ্দ শতক নাগাদ পূর্বে ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও চীন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে ইসলামি শাসন। এই অসাধারণ ও প্রবল আক্রমণের মুখে ভীতি ও সশ্রদ্ধ বিস্ময় প্রদর্শন ছাড়া ইউরোপ আর বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি। মুসলমানদের শিক্ষা, বনেদি সংস্কৃতি, অবিরল মহত্ত্বের ব্যাপারে (অপর্যাপ্ত আগ্রহ ছিল ইসলামের বিজয় প্রত্যক্ষকারী খ্রিষ্টান লেখকদের) বিগন বলেছেন তা ছিল 'ইউরোপের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অলস-নিষ্ক্রিয় যুগের সমবয়সী'। (তবে কিঞ্চিৎ আত্মতুষ্টির সাথে তিনি যোগ করেন, 'যেহেতু পশ্চিমে বিজ্ঞানের সূর্য উদিত, তাই প্রাচ্যবিদ্যা ক্ষয় ও অবণতিপ্রাপ্ত হবে বলে মনে হয়'।[৩৪]) পুবের সেনাবাহিনী সম্পর্কে খ্রিষ্টানরা গৎবাঁধা ধরনের যা অনুভব করে তা হলো, ওদের (মুসলমানদের মধ্যে) 'এক ঝাঁক মৌমাছির সব লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু বিশাল একটি হাত দিয়ে ওরা সবাই ধ্বংস করেছে' : এরকম লিখেছেন একাদশ শতকের মন্টে ক্যাসিনোর এক পাদ্রি এরখেমবার্ত।[৩৫]

এমন নয় যে, ইসলাম এমন কিছুই করেনি যা ত্রাস, ধ্বংস, দৈত্যসুলভ, ঘৃণ্য, অসভ্য, বর্বর জাতির সাথে সাদৃশ্যময়। ইসলাম ইউরোপের কাছে এক দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাত। সতেরো শতকের শেষ পর্যন্ত পুরো খ্রিষ্টীয় সভ্যতার জন্য এক অবিচল বিপদস্বরূপ। 'অটোমান বিপদের ঝুঁকি' ইউরোপের পাশাপাশি ওত পেতে থেকেছে। সময়ে ইউরোপীয় সভ্যতা সেই বিপদের ঝুঁকি ও তার লৌকিক জ্ঞানভান্ডার, তার মহৎ ঘটনারাজি, পরিসংখ্যান, গুণাবলি ও অধর্মাত্মা জীবনের বুননে মিশে যাওয়া ব্যাপার হিসেবে আত্মীকৃত করেছে।

স্যামুয়েল চিউ তার ধ্রুপদ কাজ *দ্য ক্রিসেন্ট অ্যান্ড দ্য রোজ*-এ অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন যে, কেবল রেনেসাঁর ইংল্যান্ডেই 'গড়পড়তা মেধা ও শিক্ষার একজন লোক'–এর আঙুলের ডগায় রয়েছে অটোমান ইসলামের ইতিহাসের তুলনামূলক বিপুলসংখ্যক অনুপুঙ্খ ঘটনাবালি। লন্ডন স্টেজে সে এসব দেখতেও পারে।[৩৬]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত রয়ে গেছে ওই বিরাট বিপজ্জনক শক্তির অনিবার্যভাবে খাটো করা রূপ, যা ইউরোপের জন্য প্রতীকায়িত। ওয়াল্টার স্কটের *সারাসিন*-এর মতো কাজের দ্বারা মুসলমান অটোমান বা আরবদের প্রতিনিধিত্বকরণ সব সময় দুর্দম প্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় মাত্র। নির্দিষ্ট একটি মাত্রা পর্যন্ত সমকালীন জ্ঞানী প্রাচ্যতাত্ত্বিকের ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কেও ওই কথা সত্য, যাদের লক্ষ্য যতটা না প্রাচ্য তার চেয়ে বেশি পশ্চিমের পড়ুয়া মানুষের নিকট প্রাচ্যায়িত প্রাচ্য—অতএব কম ভয়ংকর প্রাচ্য।

ভিন্ন দেশের এমন ঘরোয়া সংস্করণ সৃষ্টি বিশেষ বিতর্ককর বা নিন্দনীয় না: সকল সংস্কৃতিতে সকল মানুষের মধ্যে তা ঘটে। আমার লক্ষ্য ওই সত্যের ওপর জোর দেয়া যে প্রাচ্যতাত্ত্বিক, তেমনি প্রাচ্য সম্পর্কে ভেবেছেন বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এমন যেকোনো ইউরোপীয়, পশ্চিমা ব্যক্তি, এ-জাতীয় মানসিক ক্রিয়া করেছেন। তবে এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সীমিতসংখ্যক শব্দাবলি ও কল্প-প্রতিমা, যেগুলো নিজেরাই পরিণতি হিসেবে আরোপিত হয়েছে। পশ্চিমে ইসলামকে গ্রহণের ভঙ্গিটি একটি নিখুঁত উদাহরণ, যা পছন্দনীয়ভাবে অধ্যয়ন করেছেন ডানিয়েল নরম্যান। যেসব খ্রিষ্টান চিন্তাবিদ ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করেন তাদের ওপর সক্রিয় বাধ্যবাধকতাগুলোর একটি হলো সাদৃশ্য : যেহেতু যিশুখ্রিষ্ট খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তি, তাই সম্পূর্ণ ভুলভাবে ধরে নেয়া হয় ইসলামেও তেমনি মোহাম্মদ (সা.)। অতঃপর ইসলামের নাম দেয়া হয় মোহামেডানিজম এবং আপনা-আপনি মোহাম্মদ সম্পর্কে 'ভণ্ড' আখ্যা প্রয়োগ হয়।[৩৭] এরকম আরও অনেক ভুল ধারণা মিলে একটি বলয় সৃষ্টি করেছে, যার কাল্পনিক বহিরাবরণ কখনো ভাঙা হয়নি...। ইসলাম সম্পর্কে খ্রিষ্টধর্মের উপলব্ধি একীভূত স্বনির্ভর।[৩৮] ইসলাম হয়ে ওঠে একটি ইমেজ; শব্দটি ডানিয়েলের। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, সামগ্রিক প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে কথাটির প্রাসঙ্গিকতা আছে: এর কাজ ইসলামকে উপস্থাপন করা ততটা নয়, যতটা মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টানদের জন্য ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা।

> 'কোরআন কী বোঝায় বা কী বোঝায় বলে মনে করে মুসলমানরা, কিংবা কোনো একটি পরিস্থিতিতে মুসলমানরা কী চিন্তা করে অথবা প্রত্যক্ষ করে, তা উপেক্ষা করার অপরিবর্তনীয় প্রবণতা ইঙ্গিত করে যে কোরআন-কেন্দ্রিক ও অন্যান্য ইসলামি মতবাদ এমন এক ফর্মে উপস্থাপিত যে, তা খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস উৎপাদন করত মনে হয়; ইসলামের সীমানার সাথে লেখক-জনতার দূরত্ব বাড়তে থাকায়, আরও অমিত ফর্ম গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস হিসেবে যা বর্ণনা করে, তারা যে তা বিশ্বাসও করে, এমন মত প্রবল অনিচ্ছায় মেনে নেয়া হয়। খ্রিষ্টীয় চিত্রটিও আছে, যেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ (এমনকি সত্য ঘটনারাজির চাপের মুখেও) বর্ণনা যত সম্ভব বাদ দেয়া হয় না এবং সাধারণ বাহ্যিক সীমারেখা পরিত্যাগ করা হয় না। ওখানে মতভেদের ছায়া আছে, তবে

> কেবল একটি সাধারণ কাঠামোর ভেতরে। ক্রমবর্ধমান ক্রটিহীনতার স্বার্থে আনীত সকল সংশোধন আসলে আক্রান্ত হওয়ার মতো দুর্বলতা উপলব্ধি করায় গৃহীত ব্যবস্থা : তার নিরাপত্তা বিধান, দুর্বল কাঠামোয় কিনারা তুলে দেয়া। খ্রিষ্টীয় মত এমন একটি উত্থিত জিনিস, যা ধ্বংস করা যাবে না–পুনর্নির্মাণও না।[৩৯]

মধ্যযুগ ও রেনেসাঁর প্রথম পর্বে–বিচিত্র কবিতা, পণ্ডিতি বিতর্ক ও জনপ্রিয় কুসংস্কারসহ অসংখ্য উপায়ে আরও তীব্র হয় ইসলামের এই কঠোর খ্রিষ্টীয় চিত্রটি।[৪০] এর মধ্যে নিকট প্রাচ্য লাতিন-খ্রিস্টিয়ানিটির জগৎচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া বাকি সব সম্পন্ন হয়ে গেছে। যেমন চ্যানসন ডি রোলান্ডে সারাসিন-এর স্তব চিত্রিত হয়েছে আলিঙ্গনরত মোহাম্মদ ও অ্যাপোলো হিসেবে। আর, ডব্লিউ, সাউদার্ন সুন্দর বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় সিরিয়াস ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রকাশ্যে অভিপ্রায় দেখা দেয় যে, 'ইসলামের ব্যাপার নিয়ে একটা কিছু করতে হবে'। এ প্রবণতায় পরিস্থিতি মোড় নিয়ে পূর্ব-ইউরোপে সামরিক পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হয়।

সাউদার্ন ১৪৫০ থেকে ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের একটি নাটুকে উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। এ সময় চার পণ্ডিত জন অব সেগোভিয়া, নিকোলাস অব কুসা, জ্যাঁ জারমেই ও অ্যানিস লিভিয়াস (দ্বিতীয় পায়াস) সম্মেলনের মাধ্যমে ইসলামের সাথে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেন। ধারণাটি জন অব সেগোভিয়ার : মঞ্চে সম্মেলন করা এবং এতে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের পাইকারি হারে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টায় চালায়। 'সম্মেলনকে তিনি মনে করেন রাজনৈতিক ও একই সাথে ধর্মীয় কার্যকারিতাসমৃদ্ধ একটি হাতিয়ার, যা এক কথায় আধুনিক হৃদয়ে সহানুভূতি জাগাবে। তিনি হর্ষ প্রকাশ করেন, এমনকি তা যদি দশ বছরও টিকে থাকে, তাহলে তা হবে যুদ্ধের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ ও কম ক্ষতিকর।'

চার পণ্ডিতের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া হয়নি। তবু ইউরোপের নিকট প্রতিনিধিত্বশীল প্রাচ্যকে উপস্থাপনের জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিশোধিত প্রয়াস চালানোর কারণে–বেদে থেকে লুথার পর্যন্ত সামগ্রিক ইউরোপীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে–প্রাচ্য ও ইউরোপকে কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত করে একত্রে প্রদর্শন করানোর লক্ষ্যে এই উপাখ্যান খুব গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টানদের পরিকল্পনা ছিল মুসলমানদের বোঝানো যে, ইসলাম খ্রিষ্টধর্মের পথভ্রষ্ট একটি রূপ মাত্র। সাউদার্ন উপসংহার টানেন :

> আমাদের নিকট সব থেকে সন্দেহজনক ব্যাপার হলো যা (ইসলাম) ব্যাখ্যা করার জন্য তারা তৎপরতা শুরু করে, তার পূর্ণ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানে তাদের চিন্তা-পদ্ধতির ব্যর্থতা, বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করা তো দূরে থাক। বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষকদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বাস্তবে ঘটনাসমূহ খুব খারাপ বা খুব ভালো হয়ে দেখা দেয়নি। এবং এ হয়তো উল্লেখ করার মতোও নয় যে,

ওদের সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারকেরা যখন প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে একটি সুসমাপ্তির আশা করছিলেন, তখন তা বিশেষ ভালো কিছু হয়ে ওঠেনি। ওই সময় (ইসলাম সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের জ্ঞানভান্ডারের) কোনো উন্নতি সাধিত হয় কি? আমার ধারণা, উন্নতি হয়। এমনকি সমস্যার সমাধান একগুঁয়েভাবে দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেলেও তার সমস্যার ভাষ্য আরও জটিল আরও অভিজ্ঞতা-ঘেঁষা রূপ নেয়। মধ্যযুগে ইসলামকেন্দ্রিক সমস্যা দূরীকরণে শ্রম দিয়েছিলেন যেসব পণ্ডিত, তাদের উদ্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত সমাধান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন তারা। কিন্তু তারা এমন এক মানস-প্রকৃতি ও উপলব্ধিক্ষমতা অর্জন করেন যা অন্যদের মধ্যে, অন্য বিষয়ে সাফল্য অর্জনের দাবি রাখে।[৪১]

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের এ স্থলে এবং অন্যত্র সাউদার্নের বিশ্লেষণের সবচেয়ে উত্তম অংশটি হলো যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, পরিশেষে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের অজ্ঞতাই জটিল ও পরিশোধিত হয়েছে, ক্রমশ স্ফীতকায় ও যথাযথ হয়ে ওঠা পশ্চিমা জ্ঞানভাণ্ডারে কোনো ইতিবাচক স্তর রচিত হয়নি। কারণ গল্পকাহিনির নিজস্ব যুক্তিবিদ্যা আছে, উন্নতি বা পতনের নিজস্ব দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আছে। মধ্যযুগে মোহাম্মদের (সা.) চরিত্রের ওপর রাশি রাশি বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয় "মূলত (বারো শতকের) 'মুক্ত আত্মার' এক নবীর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রেখে, যিনি ইউরোপে আবির্ভূত হন এবং বিশ্বাস উৎপাদন ও ভক্তবৃন্দ সংগ্রহ করেন"। অনুরূপভাবে যেহেতু মোহাম্মদ (সা.) ভুয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানের প্রচারক বলে বিবেচিত, তিনি হয়ে ওঠেন যৌন-উচ্ছৃঙ্খলা, সমকাম ও লাম্পট্যের সারাৎসার এবং বিভিন্ন ধরনের গোটা একরাশ বিশ্বাসঘাতকতার সমাহার, যার সবই 'যৌক্তিকভাবে' তার ভাবাদর্শগত প্রতারণা থেকেই উদ্ভূত।[৪২] এভাবে প্রাচ্য অর্জন করে প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিত্ব–যার প্রত্যেকটি পূর্বের চেয়ে নিরেট, অভ্যন্তরীণভাবে পশ্চিমের কোনো-না-কোনো জরুরি পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে আরও সুষম। গোটা ব্যাপারটি এমন যে অসীমকে সীমিত কাঠামোয় মূর্ত করার উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে প্রাচ্যে একবার গেড়ে বসার পর তার অভ্যাস আর বদলাতে পারেনি ইউরোপ; প্রাচ্য, প্রাচ্যজন, আরব, ইসলামি, ভারতীয়, চিনা যা-ই হোক, সেগুলো হয়ে ওঠে কোনো বিরাট আদির ছদ্ম-প্রতিমায়ন–আদতে যার অনুকরণ করার কথা ছিল তাদের।

প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের এই আত্মকামমূলক ভাবাদর্শের চরিত্র বদলায়নি, সময়ে উৎস বদলেছে মাত্র। এভাবে আমরা দেখব বারো ও তেরো শতকে সর্বজনীনভাবে বিশ্বাস করা হতো আর 'খ্রিষ্টান জগতের বহির্ভাগ মাত্র, বিরুদ্ধবাদী দুর্বৃত্তদের আশ্রয়স্থল'।[৪৩] এবং মোহাম্মদ হলেন পূর্ববর্তী বিশ্বাসের (খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের) কুৎসারটনাকারী ধূর্ত এক চরিত্র; আবার কুড়ি শতকের মহাজ্ঞানীভাবাপন্ন জনৈক প্রাচ্যতাত্ত্বিক হলেন আরেক পণ্ডিত ব্যক্তি, যিনি দেখান ইসলাম আসলে দ্বিতীয় সারির আর্য-বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪৪]

শুরুতে আমরা প্রাচ্যতত্ত্বকে পণ্ডিতি অধ্যয়নের বিষয়রূপে যে বর্ণনা করেছিলাম, এখন তা আরও যৌক্তিক ভিত্তি লাভ করল। বিষয় বা অধ্যয়নক্ষেত্র সব সময় একটি বদ্ধ পরিসর। প্রতিনিধিত্বের ধারণাটি নাটকীয় : প্রাচ্য হলো নাট্যমঞ্চ, যেখানে গোটা পুব বন্দি। এই মঞ্চে বিভিন্ন চরিত্র আরোহণ করবে যার ভূমিকা হবে সেই বৃহত্তর সমগ্রের প্রতিনিধিত্ব, যা থেকে তারা উদ্ভূত। তাহলে মনে হয় প্রাচ্য পরিচিত ইউরোপীয় জগতের বাইরের কোনো অসীম বিস্তার নয়, বরং একটি বদ্ধ ক্ষেত্র, ইউরোপের সামনে গড়া একটি নাট্যমঞ্চ। প্রাচ্যতাত্ত্বিক একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, বৃহত্তর অর্থে সে বিশেষজ্ঞতার জন্য দায়ী হলো ইউরোপ, ঠিক যেভাবে একজন নাট্যকার কর্তৃক বিভিন্ন কারিগরি উপায়ে সৃষ্ট নাটকের জন্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে দায়ী (ও সংবেদনশীল) হলেন তার দর্শকেরা। এই প্রাচ্য নাট্যমঞ্চের গভীরে রয়েছে বিশাল এক সাংস্কৃতিক ভাণ্ড, যার প্রতিটি ধরন জাগিয়ে তুলেছে কল্পকথার রীতিতে সমৃদ্ধ এক পৃথিবী 'স্ফিংস, ক্লিওপেট্রা, এডেন, ট্রয়, সমকাম ও গোমরাহ, অ্যাস্তারতে, আইসিস ও আসিরিস, শেবা, জিনি, ম্যাগি, নিনেভাহ, প্রেসট্যাজন, মেহমুত, আরও ডজন ডজন : সাজানো, শতক ক্ষেত্রে আছে কেবল নামগুলো–আধা কল্পিত, আধা জানা : দৈত্য শয়তান, নায়কগণ; ত্রাস, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা। এই সাংস্কৃতিক ভাণ্ডের দ্বারা বিপুলভাবে উর্বর হয়েছে ইউরোপীয় কল্পনাশক্তি। মধ্যযুগ থেকে আঠারো শতকের মধ্যে আরিয়াস্তা, মিল্টন, মার্লো, টাসো, শেক্সপিয়ার, সার্ভেন্টিসের মতো লেখক এবং চেনসন ডি রোলান্ডো ও পোয়েমা ডেল সিড-এর রচয়িতারা তাদের সৃষ্টির জন্য প্রাচ্যের সমৃদ্ধি থেকে এমনভাবে গ্রহণ করেছেন, যা প্রাচ্যের চরিত্রসমূহ, কল্পনা, ধারণা তীক্ষ্ণতর করেছে। এ ছাড়াও ইউরোপের বিবেচনায় জ্ঞানগর্ভ প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতিও প্রচুর মিথকে কাজে লাগিয়েছে, এমনকি যখন আন্তরিকভাবেই মনে হয়েছে যে, জ্ঞান উন্নত হচ্ছে।

প্রাচ্য নাট্যমঞ্চে কীভাবে নাটকীয় কাঠামো ও পণ্ডিতি কল্প-মূর্তি একত্রে উঠে আসে তার একটি জনপ্রিয় উদাহরণ হলো বার্থলেমি ডি হারবেলটের *বিবলিওথিক অরিয়েন্টাল*; লেখকের মৃত্যুর পর এন্টয়েন গ্যালান্ডের ভূমিকাসহ ১৬৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এটি। ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম-এর মতে, সেল-এর কোরআন অনুবাদের প্রাথমিক আলোচনা ও সিমন অকলির হিস্টরি অব সারাসিনস (১৭০৮-১৮)সহ বিবলিওথিক 'ইসলামসম্পর্কিত নতুন উপলব্ধির প্রসার' ও 'অ-প্রাতিষ্ঠানিক পাঠক-বৃত্তে' ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'।৪৫

এরকম মন্তব্য ডি হারবেলটের কাজের অপর্যাপ্ত বর্ণনা দেয় মাত্র। তার গ্রন্থটি সেল ও অকলির রচনার মতো কেবল ইসলামে সীমাবদ্ধ নয়। ১৬৫১ সালে প্রকাশিত জোহান এইচ হটিংগারের হিস্টরিয়া অরিয়েন্টালিসকে বাদ দিলে বিবলিওথিক ইউরোপে আদর্শ রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর পরিধি সত্যিকার অর্থেই

যুগারম্ভমূলক। থাইজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান নাইটস-এর প্রথম ইউরোপীয় অনুবাদক গুরুত্বপূর্ণ আরববিদ গ্যালান্ড নিজে ডি হারবেলটের কাজের বিপুল আওতা তুলে ধরে তার কৃতিত্বকে পূর্ববর্তী প্রতিটি কাজের সাথে তুলনা করেন। গ্যালান্ড লিখেন যে, হারবেলট আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষার বহুসংখ্যক রচনা পাঠ করেন। এর ফলে ইউরোপীয়দের নিকট এযাবৎ গোপন বিষয়সমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হন তিনি।৪৬ এ তিনটি ভাষার একটি অভিধান রচনার পর ডি হারবেলট প্রাচ্যের ইতিহাস, ঈশ্বরতত্ত্ব, ভূগোল, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কল্পকাহিনি ও বাস্তবভিত্তিক আখ্যানসমূহ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি দুটো গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেন : একটি বিবলিওথিক বা লাইব্রেরি–অক্ষরক্রমে সাজানো একটি অভিধান, অন্যটি নির্বাচিত রচনার সংকলন। কেবল প্রথমোক্ত গ্রন্থটিই রচিত হয়।

বিবলিওথিক-এর বর্ণনা দিতে গ্যালান্ড লিখেছেন যে, গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছিল প্রধানত লেভান্থকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, যদিও আওতাভুক্ত কালপর্ব কেবল আদমের সৃষ্টি থেকে শুরু করে 'আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়'-এ শেষ করেননি। ডি হারবেলট আরও পিছিয়ে 'প্লাস ঔট' নামে বর্ণিত কল্পকথার ইতিহাস আমাদের পূর্ববর্তী সরিমানের দীর্ঘ যুগে চলে যান। গ্যালান্ডের বর্ণনা অগ্রসর হলে জানতে পারি বিবলিওথিক পৃথিবীর যেকোনো সামগ্রিক ইতিহাসের মতোই, যেহেতু এরও লক্ষ্য ছিল সৃষ্টি, মহাপ্লাবন, বাবেলের পতন–এসব বিষয়ে প্রাপ্ত জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ সারসংক্ষেপ সমাবেশকরণ। পার্থক্য এই যে, ডি হারবেলটের ব্যবহৃত উৎসসমূহ প্রাচ্যের।

তিনি ইতিহাসকে দুটো ধরনে ভাগ করেন : পবিত্র ও অপবিত্র (প্রথমটি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের, দ্বিতীয় মুসলমানদের), অতঃপর দুটো পর্ব–প্রাক ও উত্তর-ডিলুভিয়ানে বিভক্ত করেন। এভাবে ব্যাপক, বিচিত্র বিপথগামী ইতিহাস যেমন–মোগল, তাতার, তুর্কি ও স্লাভোনিক ইতিহাস আলোচনা করতে সমর্থ হন ডি হারবেলট। তিনি মুসলমান সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশও অন্তর্ভুক্ত করেন : দূরবর্তী প্রাচ্য থেকে শুরু করে হারকিউলিসের পিলার পর্যন্ত তাদের আচার-প্রথা, ঐতিহ্য, ভাষা, শাসকগোষ্ঠী, প্রাসাদসমূহ, নদী, উদ্ভিদকুলও। বিবলিওথিক তার পূর্ববর্তী যেকোনো রচনার চেয়ে বিস্তৃতভাবে সামগ্রিক।

গ্যালান্ড পরিশেষে (পাঠকদের এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়ে) তার 'আলোচনা' শেষ করেন যে, ডি হারবেলটের বিবলিওথিক 'অনুপমভাবে চমৎকার ও কার্যকর, পোস্টাল, স্কেলিগার, গালিয়াস, পোকক ও এরপিনিয়াসের মতো অন্যান্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণের সৃষ্টি সংকীর্ণভাবে ব্যাকরণিক, আভিধানিক, ভৌগোলিক বা এমন কিছু। কেবল ডি হারবেলটই এমন এক গ্রন্থ রচনায় সক্ষম হন যা ইউরোপীয়দের বোঝাতে পারে যে, প্রাচ্য সংস্কৃতিসম্পর্কিত লেখালেখি প্রশংসাহীন ও নিষ্ফলা নয়। গ্যালান্ডের মতে, প্রাচ্যকে জানা ও অধ্যয়ন করা বলতে কী বোঝায়, সে সম্পর্কে

কেবল ডি হারবেলটই পাঠকদের মনে পরিষ্কার সন্তোষজনক ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন–এমন ধারণা যা মনকে পূর্ণ করে, পূর্ব-লালিত আকাঙ্ক্ষারও মোচন ঘটায়।[৪৭]

হারবেলটের ম্যাটেরিয়াল অরিয়েন্টাল-সম্পর্কিত আলোচনায়; যেমন–সতেরো শতকের ভূগোলবিদ রাফায়েল দুমানের লেখায় ইউরোপীয়রা ধারণা করতে পারে যে, পশ্চিমা বিজ্ঞান প্রাচ্যকে পেছনে ফেলে যাচ্ছে, সেকেলে করে তুলছে।[৪৮] কিন্তু কেবল পশ্চিমা পরিপ্রেক্ষিতের সুবিধার লক্ষণই দেখা দেয়নি : প্রাচ্যের উর্বরতা আত্মসাৎ করার বিজয়ী কৌশলও উদ্ভূত হয় এবং তা পদ্ধতিগতভাবে, এমনকি, অক্ষরক্রমানুসারে সাধারণ পশ্চিমাদের আয়ত্ত করানোর প্রবণতা দেখা দেয়।

যখন গ্যালান্ড ডি হারবেলট সম্পর্কে বলেন যে, তিনি পাঠকদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেন, আমার ধারণা, তিনি বোঝাতে চান যে, বিবলিওথিক প্রাচ্য সম্পর্কে সর্বজনীনভাবে গৃহীত সাধারণ ধারণাসমূহ পুনরাবৃত্তি করে না। কারণ, প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার পাঠকের চোখে প্রাচ্যকে নিশ্চিত করেন; তিনি এরই মধ্যে গৃহীত দৃঢ় বিশ্বাস উল্টে দিতে চান না, চেষ্টাও করেন না। বিবলিওথিক যা করে তা হলো আরও পূর্ণাঙ্গ ও পরিচ্ছন্নভাবে প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্বকরণ : হয়তো অস্পষ্ট লেভান্টীয় ইতিহাসের ঘটনারাজি থেকে অনিয়মিতভাবে গৃহীত ঘটনাবলি, প্রাচীন কল্প-প্রতিমা, ইসলামি সংস্কৃতি, স্থান-নাম ইত্যাদির শিথিল সংগ্রহ যা রূপান্তরিত হয় একটি যৌক্তিক 'অ' থেকে 'হ' পর্যন্ত প্রাচ্য দৃশ্যরাজির সমাহারে। মোহাম্মদ (সা.) শিরোনামে ডি হারবেলট প্রথমে নবীর আখ্যাগুলো সরবরাহ করেন, অতঃপর মোহাম্মদের (সা.) ভাব ও মতাদর্শগত মূল্য নিশ্চিত করেন এভাবে :

> এই সেই ভণ্ড মেহমুত (খ্রিষ্টান) বিরোধী মতের প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রন্থ লেখক, যা ধর্মের নাম নিয়েছে, যাকে আমরা বলি মোহামেডান। [ইসলাম-এ দেখুন]
>
> আর্য, পলেশীয় বা পলিয়ানিস্ট ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন বিরুদ্ধবাদীরা যিশুখ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত করার সময় তার যেসব প্রশংসা করেছে, কোরআনের অনুবাদক ও মোহামেডান আইন বা ইসলাম বিশেষজ্ঞরা তাই আরোপ করেছে এই ভণ্ড নবীর ওপরও...।[৪৯]

মোহামেডান শিরোনামটি প্রাসঙ্গিক এবং অপমানকর ইউরোপীয় আখ্যা; সঠিক নাম 'ইসলাম' ঠেলে দেয়া হয়েছে অন্য এন্ট্রিতে। 'বিরুদ্ধবাদিতা...যাকে আমরা বলি মোহামেডান' ধরা পড়েছে প্রকৃত খ্রিষ্টধর্মের অনুকরণেরও অনুকরণে। অতঃপর মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীর দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবরণে ডি হারবেলট সরাসরি বর্ণনার কৌশল নেন। তবে বিবলিওথিকে মোহাম্মদকে (সা.) প্রদত্ত অবস্থানটিই জরুরি বিষয়। অবাধ বিরুদ্ধবাদিতাকেই যখন অক্ষরক্রমিক কাঠামোয় একটি শিরোনাম করার জন্য পরিষ্কার ভাবাদর্শিক বিষয়ে রূপান্তরিত করা হয়, তখন এর বিপদের

দিকটি অনুল্লিখিত থাকে। মোহাম্মদ (সা.) আর হুমকিস্বরূপ নীতিহীন, লম্পটরূপে পুবের পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান না, তিনি প্রাচ্য-নাট্যমঞ্চে তার অংশের নির্ধারিত (স্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ) আসনে চুপচাপ উপবিষ্ট[৫০]; তাকে দেয়া হয়েছে একটি বংশপরিচয়, এক দফা ব্যাখ্যা, এমনকি কিছু উন্নতি সবই এমন একটি সরল ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত, যা তাকে অন্য কোথাও অবস্থান গ্রহণে বাধা দেয়। এ ধরনের চিত্রকল্প খুবই বৃহত্তর সত্তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য : সে সত্তা এমন যে, তাকে এ-জাতীয় চিত্রকল্পের সাহায্যে ধরার আগ পর্যন্ত চারদিকে অসম্ভব রকম ছড়ানো-ছিটানো থাকে। সুতরাং, এ ধরনের চিত্রকল্প এ সত্তাকে সীমাচিহ্নিত করে উপলব্ধিতে সহায়তা করে। এগুলো আবার থিওফ্রেস্টাস, লা ব্রায়ার বা লেডের অসার দাম্ভিক, কুঞ্জুস বা পেটুক শ্রেণির সাথে সম্পর্কযুক্ত চরিত্রও। হয়তো এমন বলা ঠিক হবে না যে, মানুষ এসব চরিত্রকে মাইলস গ্লোরিয়াস বা ভণ্ড মোহাম্মদ (সা.) মতো করে দেখে। কারণ অপ্রামাণ্য যুক্তিতর্কে অবরুদ্ধ কোনো চরিত্রের বর্ণনা পাঠককে বড়জোর কোনো জটিলতা বা অস্পষ্টতা ছাড়াই এ-জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে এক ধরনের বর্গীয় ধারণা পেতে সহায়তা করে। ডি হারবেলট সৃষ্ট মেহমুত চরিত্রটিও চিত্রকল্প মাত্র। কারণ ভণ্ড নবী 'প্রাচ্যদেশীয়' নামের সামগ্রিক নাট্যিক প্রতিনিধিত্বেরই অংশ, যার সমগ্রতা ধারণ করে আছে বিবলিওথিক।

প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রতিনিধিত্বের নীতিশিক্ষামূলক গুণটিকে পুরো নাট্যাভিনয় থেকে আলাদা করা যাবে না। সুশৃঙ্খল পড়াশোনা ও গবেষণার ফলস্বরূপ সৃষ্ট বিবলিওথিক-এর মতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় লেখক তার অধীত বিষয়গুলোর ওপর যথাযথ বিন্যাস আরোপ করেছেন; তাছাড়া তিনি তার পাঠকদের কাছে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন যে, মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরবরাহ করছে শৃঙ্খলায় বিন্যাস্ত সুচিন্তিত বিবেচনা। এভাবে বিবলিওথিক ধারণা দেয় প্রাচ্যতত্ত্বের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে, যা পাঠককে সর্বত্র মনে করিয়ে দেয় যে, প্রাচ্যে পৌছতে হলে তাকে অবশ্যই পার হয়ে যেতে হবে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের পণ্ডিতি ছাঁকনি ও সংকেতলিখন। প্রাচ্যকে কেবল পশ্চিমা খ্রিষ্টধর্মের জরুরি নৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সাজিয়েই নেয়া হয়নি, পশ্চিমা মানসিকতা থেকে প্রেরিত একগুচ্ছ মনোভঙ্গি ও বিচার-বিবেচনার দ্বারা এর চারপাশে সীমারেখাও টেনে দেয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমা মনোভঙ্গি ও বিচার-বিবেচনা সঠিক কি না তা যাচাই ও সংশোধনের জন্য প্র্যাচ্যের কোনো উৎসের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি, বরং পাঠানো হয়েছে অন্য সব প্রাচ্যতাত্ত্বিক রচনার কাছে। প্রাচ্যতাত্ত্বিক নাট্যমঞ্চ যে নামে একে অভিহিত করছি আমি নৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কঠোর নিয়মানুবর্তিতার একটি পদ্ধতিতে পরিণত হয়। এভাবে প্রাচ্যসম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক পশ্চিমা জ্ঞানের প্রতিনিধিত্বকারী বিষয় হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ব তিনমুখী শক্তি খাটায় : প্রাচ্যের ওপর, প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ওপর এবং প্রাচ্যতত্ত্বের পশ্চিমা ভোক্তাদের

ওপর। এভাবে স্থাপিত তিনমুখী সম্পর্কের সামর্থ্যকে খাটো করে দেখাটা ভুল হবে বলে আমি মনে করি। কারণ ইউরোপীয় সমাজ, অর্থাৎ 'আমাদের' জগতের সীমানার বাইরে অবস্থিত হওয়ার কারণে প্রাচ্যকে (যা ওখানে, পূবদিকে) সংশোধন করা হয়েছে, এমনকি শাস্তিও দেয়া হয়েছে। এভাবে সম্পন্ন হয়েছে প্রাচ্যের প্রাচ্যায়ন। তা এমন এক প্রক্রিয়া যা প্রাচ্যকে কেবল প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের একটি প্রদেশ হিসেবেই চিহ্নিত করে না, পশ্চিমের অদীক্ষিত পাঠকদের প্রাচ্যতাত্ত্বিক সংকেতলিপিকেই (যেমন ডি হারবেলটের বিবলিওথিক) আসল প্রাচ্য বলে মানতে বাধ্য করে। মোট কথা, সত্য মূল জিনিসটাতে নেই বরং পণ্ডিতি বিচার-বিশ্লেষণের কর্মে পরিণত হয়েছে, যা মনে হয় তার অস্তিত্বের জন্য একসময় প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের কাছেও ঋণী।

নীতিশিক্ষামূলক এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ কঠিন কাজ নয়। আবার স্মরণ করে নেয়া উচিত যে, সমস্ত সংস্কৃতিই কাঁচা বাস্তবতা সংশোধন করে নেয়, মুক্ত অবস্থানরত বস্তু-বিষয়াদিকে রূপান্তরিত করে জ্ঞানাণুতে। এ রূপান্তরে কোনো সমস্যা নেই। অপরিশোধিত অজানার আপতনে মানবীয় মন বাধা দেয়াই স্বাভাবিক। তাই অন্য সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করার ঝোঁক–অন্য সংস্কৃতি যেমন আছে তেমন নয়, বরং গ্রাহকের স্বার্থে যেমন হওয়া উচিত সেভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা সব সংস্কৃতিতে সকল সময়ই বিদ্যমান। যাহোক, পশ্চিমাদের নিকট প্রাচ্যের বিষয়গুলো সব সময়ই পশ্চিমের কিছু বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। যেমন কিছু জার্মান রোমান্টিকের কাছে ভারতীয় ধর্ম হলো অনিবার্যভাবে জার্মান-খ্রিষ্টীয় সর্বেশ্বরবাদের প্রাচ্য সংস্করণ। অতঃপর প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার কর্ম হিসেবে নিয়েছেন প্রাচ্যকে 'কিছু একটা' থেকে অন্য 'কিছু একটায়' রূপান্তরিত করা; তিনি তা করেন তার নিজের জন্য, তার সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে–তার বিবেচনায়–প্রাচ্যজনের প্রয়োজনে। রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটি সুশৃঙ্খল; এটি শিক্ষালব্ধ, এর রয়েছে নিজস্ব সমাজ, সাময়িক পত্রাদি, ঐতিহ্য, শব্দসম্ভার, অলংকারশাস্ত্র। এর সবই পশ্চিমের উদ্ভূত পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিয়মনীতির সাথে সম্পর্কিত ও ওসবের দ্বারা সরবরাহকৃত। আমি দেখাব, এ প্রক্রিয়া খুব বেশি রকম সামগ্রিক হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখায়। এ প্রবণতা এত প্রবল যে উনিশ-বিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্ব জরিপ করার সময় গবেষকের মনে সব দূর করে যে ছাপ গভীর হয়ে বসে তা হলো, প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক উদাসভাবে সমগ্র প্রাচ্যের পরিলেখ তৈরির ইচ্ছা।

ধ্রুপদ গ্রিসে পশ্চিম কর্তৃক প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করার যে উদাহরণ আমি দিয়েছি তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় কত আগে থেকেই এ ধরনের ছককাটা পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। পূর্ববর্তী প্রতিনিধিত্বের ওপর পরিকল্পিত পরবর্তী প্রতিনিধিত্ব কতটা দৃঢ়ভাবে পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ ছিল, কতটা সতর্ক পরিকল্পনা ছিল ওদের, পশ্চিমের কাল্পনিক ভূগোলের অবস্থান নির্মাণ কতটা নাটকীয়ভাবে কার্যকর ছিল তা দেখানো

সম্ভব হবে যদি আমরা নজর দিই দান্তের 'ইনফার্নো'য়। ডিভাইন কমেডিতে দান্তের কৃতিত্ব পার্থিব বাস্তবতার যথাযথ বর্ণনা এবং খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের সর্বজনীন ও অপার্থিব পদ্ধতির নিশ্ছিদ্র একীভূতকরণ। ইনফার্নো গোরগোটেরিয়ো ও প্যারাডিসোর মধ্য দিয়ে হাঁটার সময় তীর্থ-পর্যটক দান্তে যা দেখেন তা হলো বিচার-বিশ্লেষণের অনুপম চিত্ররূপ। উদাহরণস্বরূপ, পাওলো ও ফ্রান্সেসকোকে দেখা যায় কৃত পাপের জন্য পরলোকে দোজখে বন্দি, তারা তাদের ভূমিকাতেই অভিনয় করছে–প্রকৃতপক্ষে জীবনযাপন করছে। পৃথিবীতে যাপিত জীবনই তাদের ওখানে টেনে নিয়েছে এবং সেই পারলৌকিক বসবাস নিয়তি হিসেবে আরোপ করেছে। এভাবে দান্তের কল্পিত চিত্রে প্রতিটি ব্যক্তিই কেবল তার প্রতিনিধিত্বই করে না শুধু, তার চরিত্রের বর্গ ও তার নিয়তিরও প্রতিনিধিত্ব করে।

'মাওমেতো'–মোহাম্মদ (সা.)–দেখা দেন ইনফার্নো'র ২৪তম ক্যান্টোতে। তাকে দেখানো হয়েছে দোজখের ৯টি বৃত্তের অষ্টমটিতে। নবমটিতে ভয়ংকর খাদের একটি বৃত্ত দোজখে শয়তানের মূল ঘাঁটি বেষ্টন করে আছে। তাই মোহাম্মদের (সা.) কাছে পৌঁছানোর পূর্বে দান্তে সেসব বৃত্ত পার হয়ে যান, যেগুলোয় অপেক্ষাকৃত কম পাপে পাপীরা বন্দি। যেমন কামুক, ধনলোলুপ, পেটুক (খ্রিষ্টধর্মের) বিরুদ্ধবাদী, প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ, আত্মহননকারী, ধর্ম-নিন্দুক প্রভৃতি মানুষ। নরকের সবচেয়ে নিচে যেখানে শয়তানের দেখা পাওয়া যাবে, সেখানে পৌঁছার পূর্বে, মোহাম্মদের (সা.) পর আছে কেবল জালকারী ও বিশ্বাসঘাতক (যার মধ্যে জুডাস, ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসও অন্তর্ভুক্ত)। অতএব, মোহাম্মদ (সা.) শয়তানের পদক্রমে, দান্তের ভাষায়, 'সেমিনেটর অ. ডি. স্কেন্ডুলা সেইসমা' বর্গের অন্তর্গত। মোহাম্মদের শাস্তি, যা তার পারলৌকিক পরিণতিও, উদ্ভটভাবে রুচিগর্হিত : তাকে চিবুক থেকে শুরু করে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত অবিরামভাবে চিরে দুভাগ করা হচ্ছে–দান্তের ভাষায় পিপার মতো, যার দুটো অংশ দুদিকে মেলে দেয়া হয়েছে। এ অংশে দান্তের কাব্য কেয়ামতের কোনো খুঁটিনাটি বর্ণনা থেকেই বঞ্চিত করেননি পাঠককে, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওরকম ভয়াবহ শাস্তিও। মোহাম্মদের (সা.) নাড়িভুড়ি ও মলমূত্রের বর্ণনাও নিরুদ্বেগে নিখুঁত। মোহাম্মদ (সা.) দান্তের কাছে তার শাস্তির কথা ব্যাখ্যা করে আলীর দিকে নির্দেশ করেন। একই সারিতে মোহাম্মদের (সা.) পূর্বেই আছেন আলী, তার জন্য নির্ধারিত শয়তান তাকেও চিরে দুভাগ করছে। তিনি দান্তেকে অনুরোধ করেন যেন তিনি ফ্রা ডলসিনোকে সতর্ক করে দেন। ডলসিনো এক বিদ্রোহী প্রিস্ট, তার অনুসারীরা নারী ও বস্তু-বিষয়াদির পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি নারী সঙ্গিনী গ্রহণ করেছেন, যা তার জন্য সঞ্চিত থাকবে। পাঠকদের ভুল হওয়ার কথা নয় যে, দান্তে ডলসিনো ও মোহাম্মদের (সা.) যৌনাচরণে সাদৃশ্য দেখেন–তাদের ঐশ্বরিক জ্ঞানলাভের ভানেও।

ইসলাম সম্পর্কে দান্তে যা বলতে চেয়েছেন, এটুকুই তার সব নয়। এর আগে ইনফার্নোতে অভিজাত একদল মুসলমানের দেখা মেলে। ওই গুণী ম্লেচ্ছদের দলে আছে আবিসিনা, আভিরয়েস, সালাদিন প্রমুখ যারা হেক্টর, অ্যানিস, আব্রাহাম, সক্রেটিস, প্ল্যাটো, অ্যারিস্টোটলসহ নরকের প্রথমবৃত্তে বন্দি থেকে লঘুতর, এমনকি সম্মানজনক শাস্তি ভোগ করছেন। এদের একমাত্র অপরাধ এরা খ্রিষ্টীয় ঈশ্বরবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

তাদের গুণের প্রশংসা করেছেন দান্তে। কিন্তু তারা খ্রিষ্টান নয় বলে লঘুভাবে ওদের নিন্দা করতে হয়েছে। পরলোকে পার্থক্যের স্তর সৃজন যথাযথ, কিন্তু প্রাক-খ্রিষ্টীয় জ্ঞান-জ্যোতিষ্কদের সাথে উত্তর-খ্রিষ্টীয় মুসলমানদের একই বর্গে নরকবাসের মধ্যে কালগত বিভ্রাট ও শৃঙ্খলাজনিত ব্যত্যয়ে দান্তের কোনো সমস্যা হয়েছে বলে মনে হয় না। এমনকি কোরআন যদিও যিশুখ্রিষ্টকে একজন নবী হিসেবে উল্লেখ করেছে, তবু দান্তে মহৎ মুসলিম দার্শনিক ও সম্রাটদের মনে করেছেন খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। এরা যে প্রাচীন, ধ্রুপদ সন্তদের মতো একই স্তরে বাস করতে পারেন, তা ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন কল্পনা। যেমন রাফায়েল কল্পনা করেছেন তার ফ্রেসকোতে দ্য স্কুল অব এথেন্স–এ সক্রেটিস ও প্ল্যাটোর সাথে আভিরয়েসও একাডেমির মেঝেতে কনুই ঘষছেন (যেমন ফেনেলনের ডায়লগ ডেস মর্টস (১৭০০-১৮)–এ একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সক্রেটিস ও কনফুসিয়াসের মধ্যে)।

দান্তে কর্তৃক ইসলামকে কাব্যিকভাবে উপলব্ধিতে বৈষম্য ও পরিশোধন ছককাটা পরিকল্পনা, প্রায় সৃষ্টিতাত্ত্বিক অপরিহার্যতার দৃষ্টান্ত; এর আশ্রয়েই ইসলাম ও তার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সম্পর্কে পশ্চিমের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং সর্বোপরি নৈতিক ধারণার সৃষ্টি। প্রাচ্য বা তার কোনো অংশের বাস্তব তথ্যের গুরুত্ব এখানে নগণ্য; যা গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত প্রভাবক তা হলো যাকে আমি বলছি প্রাচ্যতাত্ত্বিক দৃষ্টি। এ দৃষ্টি কোনোমতেই কেবল পেশাজীবী পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পশ্চিমে যারাই প্রাচ্য সম্পর্কে চিন্তা করেন তাদের সকলের এজমালি সম্পত্তি। কবি হিসেবে দান্তের ক্ষমতা এ পরিপ্রেক্ষিতকে আরও প্রতিনিধিত্বমুখী, আরও তীব্র করেছে। মোহাম্মদ (সা.), সালাহউদ্দীন, আভিরয়েস, আবিসিনা অলৌকিক এক সৃষ্টিতত্ত্বে স্থির গাথা[৫]–অন্যকিছুকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল তাদের 'কাজ' ও মঞ্চে আবির্ভূত অবস্থায় তাদের উপলব্ধি বিন্যাস গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এ-জাতীয় মনোভাবের প্রভাব সম্পর্কে ঈসাইয়াহ্ বার্লিন লিখেছেন :

> [এরকম] সৃষ্টিতত্ত্বে মানুষের পৃথিবী (কোনো কোনো সংস্করণে গোটা বিশ্ব) একটিমাত্র সর্বব্যাপ্ত ক্রমবিন্যাসে বিন্যস্ত যাতে ব্যাখ্যা করা হয় কেন কোনো একটি বস্তু ঠিক ওই বস্তুই; তা যা করে তা কোথায়, কখন এবং কেন করে; এর লক্ষ্য কী এবং কতটা সফলভাবে তা সে পালন করে; বিভিন্ন লক্ষ্যমুখী সত্তা

> একত্রে যে পিরামিড গড়ে তুলেছে, তাতে এসব সত্তার লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অধীনতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক কী। এই যদি বাস্তবতার সঠিক চিত্র হয় তা হলে অন্য সব বিশ্লেষণের মতো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণেরও মূল উপাদান হবে ব্যক্তি, দল, জাতি, প্রজাতির গুণ-স্বভাব ইত্যাদি–এবং বিশ্বজাগতিক বিন্যাসে প্রত্যেকটির নিজস্ব অবস্থানের ভিত্তিতে। এ সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী একজন মানুষ বা একটি বস্তুর অবস্থান জানাকে বলা যায় সেটি সম্পর্কে এই জানা যে, সেই মানুষ বা বস্তুটি কী করে এবং কেনই-বা এটি ওই নির্দিষ্ট বস্তুই হবে ও সে যা করে ঠিক তা-ই করবে। অতঃপর হওয়া ও মূল্য অবধারণ–অস্তিত্ব নিয়ে থাকা ও একটি কর্ম লাভ (এবং কমবেশি সফলভাবে তা সম্পন্ন করা) একই কথা এবং এক জিনিস। বিন্যাস এবং এককভাবে বিন্যাসই অস্তিত্ব দেয় ও বিলীন হওয়ার কারণ ঘটায়; এবং আরোপ করে উদ্দেশ্য, যাকে বলা যায় মূল্য ও অর্থবোধ; সবই ওখানে। বোঝার অর্থ হলো বিন্যাসটি উপলব্ধি করা। কোনো ঘটনা বা ক্রিয়া বা চরিত্র যত বেশি অনিবার্য বলে দেখানো যাবে, তা তত ভালোভাবে বোঝা যাবে, গবেষকের অন্তর্দৃষ্টি তত পূর্ণ হবে, আমরা একটি অনিবার্য সত্যের আরও নিকটবর্তী হব। কিন্তু এই মনোভাব অত্যন্ত অবাস্তব।[৫১]

এবং প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক প্রাচ্যতাত্ত্বিক মনোভাবও অবাস্তব। তা জাদুবিদ্যা ও পুরাণের সাথে একটি বদ্ধ পদ্ধতির স্বনিয়ন্ত্রিত, স্বচালিত চরিত্র ভাগাভাগি করে। এই পদ্ধতিতে বস্তু তা-ই সেটি প্রকৃত পক্ষে যা, বস্তু যা সেটি তা-ই–এখন বা চিরকাল–এই তত্ত্ববিদ্যাগত কারণে যে অভিজ্ঞতা–ধৃত বস্তুকে বদল বা স্থানচ্যুত করা যাবে না। প্রাচ্যের সাথে, বিশেষত ইসলামের সাথে ইউরোপের বোঝাপড়া প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করার এ পদ্ধতিকে আরও শক্তিশালী করেছে, ইসলামকে পরিণত করেছে, আঁরি পিরেনের ভাষায়–'বহিরাগত'-এর সারমূর্তিতে যার বিপরীতে মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালের ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। বর্বর আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের ঘটনার স্ববিরোধী প্রভাবে রোমান ও ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতিতে বর্বরতা অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ পিরেন যুক্তি দেখান যে, সাত শতকে শুরু হওয়া ইসলামি অভিযানের ফল হিসেবে ইউরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে সরে যায় উত্তরে। কারণ ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাটি তখন আরব প্রদেশ। এ সময় 'জার্মানবাদ ইতিহাসে তার ভূমিকা পালন শুরু করে। এযাবৎ রোমান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন ছিল। এখন শুরু হলো প্রকৃত রোমানীয়-জার্মান সভ্যতার উত্থান।' ইউরোপ নিজের মধ্যে আবদ্ধ হলো : প্রাচ্য যখন এমন কোনো স্থানও নয়, যেখানে কেউ বাণিজ্য করে তখন তা বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইউরোপ ও ইউরোপীয় সভ্যতার বাইরে। পিরেনের ভাষায় যা ইউরোপ তা 'বিশাল একীভূত খ্রিষ্টীয় সমাজ। পশ্চিম তার নিজস্ব জীবন-যাপন শুরু করেছে।'[৫২] দান্তের কবিতা, পিটার ও অন্যান্য প্রাচ্যতাত্ত্বিক, গুইবার্ট অব নজেন্ট ও বেদে থেকে রজার বেকন

পর্যন্ত ইসলামবিরোধী তর্কশাস্ত্রবিদ, ত্রিপলির ইউলিয়াম মাউন্ট সিয়নের বার্চার্ড, লুথার, পোয়েম ডেল চিড-এ, চ্যান্সন ডি রোঁলায়, এবং শেক্সপিয়ারের ওথেলো (পৃথিবীর নির্যাতক)-এ প্রাচ্য ও ইসলাম উপস্থিত হয়েছে বহিরাগতরূপে, যার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ইউরোপ অভ্যন্তরে।

কাল্পনিক ভূগোল–ইনফার্নো'র জীবন্ত চিত্র থেকে ডি হারবেলটের বিবলিওথিক এর কঠিন অবস্থান ইসলাম ও প্রাচ্যসম্পর্কিত আলোচনা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে উদ্ভট এক প্রতিনিধিত্বমূলক ডিসকোর্সের জগৎ ও প্রয়োজনীয় শব্দসম্ভারের বৈধতা এনে দেয়। এ ডিসকোর্সের অংশ, একটি ভাষ্য, একটি মন্তব্য। এ ডিসকোর্স সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বাধ্য করে যেন মোহাম্মদের (সা.) নাম উচ্চারিত হলেই সে এই মন্তব্য প্রথমেই গ্রহণ করে নেয়। প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্স–এখানে আমি বোঝাচ্ছি প্রাচ্যবিষয়ক আলোচনা ও লেখালেখিতে ব্যবহৃত পরিভাষা ও শব্দরাশি–এর বিভিন্ন অংশের মূলে আছে ভাষার অলংকার ও দৃঢ়োক্তি। নাটকের চরিত্রের ক্ষেত্রে ফ্যাশনেবল পোশাক যেমন, প্রকৃত প্রাচ্য বা আমার মূল বিষয় ইসলামের ক্ষেত্রে এসব ভাষিক অলংকারও তাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এগুলো ক্রুশের মতো যা প্রত্যেকেই বহন করে অথবা কমেডি ডেল আর্ট-জাতীয় নাটকের সঙের বহুবর্ণিল পোশাকের মতো। অন্য কথায়, প্রাচ্যকে চিত্রণের জন্য ব্যবহৃত ভাষার সাথে আসল প্রাচ্যের সম্পর্ক খোঁজার দরকার নেই। তা যতটা না এ জন্য যে ভাষাটি আদৌ সঠিক নয়, তার চেয়ে বরং এ কারণে যে ভাষাটি যথার্থ হওয়ার চেষ্টা করে না। এটি চেষ্টা করে ইনফার্নোতে দান্তে যা করার চেষ্টা করেছেন : তা হলো এক ও একই সময়ে প্রাচ্যকে বহিরাগতরূপে আঁকা এবং ছককাটা পরিকল্পনামাফিক একটি নাটকীয় মঞ্চের অন্তর্ভুক্ত করা, দৃশ্যত যার, ব্যবস্থাপক ও অভিনেতাদের সবাই ইউরোপের–কেবল ইউরোপের জন্যই। এজন্যই পরিচিত ও বহিরাগত এর মধ্যে দোলাচলবৃত্তিতা; মোহাম্মদ (সা.) সব সময়ই জাল বলে পরিচিত (কারণ তিনি আমাদের 'যিশু' হওয়ার ভান করেন) এবং সব সময়ই প্রাচ্যজন (অর্থাৎ বহিরাগত, কারণ তিনি কোনো কোনো দিক থেকে 'যিশুর' মতো হলেও তিনি হুবহু যিশুর মতো নন।)

প্রাচ্য–এর অদ্ভুতত্ত্ব, এর পার্থক্য, এর রহস্যময়তা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্যের তালিকা তৈরি না করেও আমরা বরং এগুলোর সাধারণীকরণ করে নিতে পারি, যেভাবে ওগুলো রেনেসাঁসের মাধ্যমে চলে এসেছে। এগুলো আত্ম-সাক্ষ্যধর্মী ও ঘোষণামূলক; এগুলোয় ব্যবহৃত কাল অনিশ্চিত; এরা পুনরাবৃত্তি ও সামর্থ্যের ছাপ ফেলে; এগুলো সকল সময়ই কখনো উক্ত কখনো বা অনুক্ত ইউরোপীয় সমরূপের সমতলে, আবার অন্যদিক থেকে নিম্নবর্গীয়ও। এসব মন্তব্যের জন্য অধিকাংশ সময় 'হয়' শব্দটিই যথেষ্ট। যেমন (মোহাম্মদ) 'হন' ভণ্ড–উক্তটি কার্যকারিতা লাভ করে ডি হালবেলটের বিবলিওথিকে, এবং এক অর্থে দান্তের রচনা লাভ করে নাটকীয়

গুরুত্ব। যেন কোনো পটভূমি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। মোহাম্মদকে (সা.) দোষী সাব্যস্ত করার সাক্ষ্য আছে 'হয়'-এ। কেউ উক্তিটিতে গুণ বা দোষারোপ করে না, বা মোহাম্মদ (সা.) 'ছিলেন' ভণ্ড এমন বলার প্রয়োজন বোধ করে না; কিংবা কারও এক মুহূর্ত চিন্তা করারও দরকার হয় না যে, উক্তিটি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে কি না। মোহাম্মদ 'ভণ্ড'–এটি পুনরাবৃত্ত হয়; প্রতিবার কেউ যখন উক্তিটি উচ্চারণ করে, তখন তিনি (মোহাম্মদ) আরেকটু বেশি ভণ্ড হন এবং উক্তিটির লেখক এ-জাতীয় ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে আরেকটু অধিকার লাভ করেন। এভাবে হামফ্রে প্রাইডেক্সের সতেরো শতকে লেখা মোহাম্মদের বিখ্যাত জীবনীর উপশিরোনামের হয় প্রতারণার আসল প্রকৃত (The true nature of Imposture)। সব শেষে, অবশ্যই ভণ্ড বা প্রতারক (বা প্রাচ্যজন) হিসেবে শ্রেণিভুক্ত-করণের এই প্রক্রিয়া বৈপরীত্যের উপস্থিতি দাবি করে, কিংবা বলা যায় প্রয়োজনীয় করে তোলে এক বিপরীত সত্তার। সেই বিপরীত হলো 'পশ্চিম' এবং মোহাম্মদের (সা.) বেলায় যিশুখ্রিষ্ট।

অতএব, যে ধরনের ভাষা, চিন্তা, দৃষ্টিকে আমি বলছি প্রাচ্যতত্ত্ব তা দার্শনিকভাবে সাধারণ অর্থে চরম বাস্তববাদ; প্রাচ্যবিষয়ক প্রশ্ন, উদ্দেশ্য গুণাগুণ, অঞ্চল নিয়ে কথা বলার অভ্যাস অনুযায়ী যে ব্যক্তিই প্রাচ্যতত্ত্ব কথাটি ব্যবহার করবে, সে-ই তার আলোচ্য বা চিন্তনীয় বিষয়টিকে পরিচিত করাবে, নাম দেবে, নির্দেশ ও নির্দিষ্ট করবে একটি শব্দ বা উক্তির দ্বারা। ওই শব্দ বা উক্তিকে বাস্তবতা বা বাস্তবতার ধারক বলে বিবেচনা করতে হবে। আলংকারিক অর্থে বলা যায়, প্রাচ্যতত্ত্ব শারীরসংস্থান বিদ্যাগত ও নামকরণগত; এর শব্দরাজি ব্যবহার করার অর্থ হলো নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি অংশে প্রাচ্যের জিনিসগুলোকে বিভক্তকরণ ও আলাদাকরণ। মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রাচ্যতত্ত্ব একধরনের আধা দৈবিকজ্ঞান, সাধারণ ঐতিহাসিক জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের জ্ঞান। এগুলোই হলো কাল্পনিক ভূগোল ও তার আঁকা নাটকীয় সীমানার ফলাফলের একাংশে। এই প্রাচ্যায়িত ফলাফলের নির্দিষ্ট কিছু অংশের আধুনিক রূপান্তরও ঘটেছে। আমি এখন ওদিকেই অগ্রসর হব।

• গ •

প্রকল্প

প্রাচ্যতত্ত্বের অত্যুজ্জ্বল প্রায়োগিক সাফল্যগুলো পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন হবে, আমরা যদি কেবল মিশেলেটের এই ভয়াবহ বিপজ্জনক (এবং একেবারেই ভুল ও সত্যের ঠিক বিপরীত) ধারণা বিচার করে দেখি, যাতে তিনি বলেন : 'অদৃশ্য, মারাত্মক প্রাচ্য তার স্বপ্নের মোহ ও চিয়ারোসকুরুর জাদুর সাহায্যে আলোর ঈশ্বরদের দিকে এগিয়ে আসে।'[৫৩] অসংখ্য স্তর পার হয়ে এসেছে ইউরোপ ও প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক, বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক, যদিও পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানের রেখাটি একটি স্থায়ী বুদ্ধিবৃত্তিক ছাপ ফেলেছে ইউরোপের ওপর। তবু সাধারণত পশ্চিমই পূর্বের ওপর আপতিত হয়েছে, উল্টোটা ঘটেনি। প্রাচ্যতত্ত্ব একটি যৌথ বা শ্রেণি নাম। এটি ব্যবহার করছি প্রাচ্যের দিকে পশ্চিমের অগ্রসর হওয়ার ঘটনাটি ব্যাখ্যার জন্য। প্রাচ্যতত্ত্ব সেই জ্ঞানক্ষেত্র, যার সাহায্যে শিক্ষা, আবিষ্কার ও অনুশীলনের একটি বিষয় হিসেবে প্রাচ্যকে আয়ত্তে আনা হয়েছে (এবং হচ্ছে) ধীরে ধীরে, বিশেষ প্রক্রিয়ায়। কিন্তু, বিভাজন রেখার পূর্বে কী আছে, সে সম্পর্কে কেউ কথা বলতে গেলে যে স্বপ্নগুচ্ছ, চিত্রকল্প ও শব্দভান্ডার হাতের কাছে প্রস্তুত পায়, তা বোঝানোর জন্যও আমি প্রাচ্যতত্ত্ব কথাটি ব্যবহার করি। তবে প্রাচ্যতত্ত্বের এই দুই চেহারা বিসদৃশ নয়। কারণ উভয় রূপ ব্যবহার করেই ইউরোপ নিরাপদে ও সরাসরি প্রাচ্যের দিকে এগিয়ে আসতে ও প্রাচ্যের ওপর আপতিত হতে সক্ষম হয়। এখানে আমি মুখ্যত সেই এগিয়ে আসার বস্তুসাক্ষ্য বিবেচনাই আগ্রহী।

ইসলাম বাদে, উনিশ শতক পর্যন্ত প্রাচ্য ইউরোপের নিকট নির্বিঘ্ন পশ্চিমা আধিপত্যের অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এক উপনিবেশ। ভারতে ব্রিটিশ অভিজ্ঞতা, প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ফরাসি ও ইতালীয় অভিজ্ঞতা এবং ইস্টইন্ডিজ, চায়না ও জাপানে পর্তুগিজ অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তা ঘোষিত সত্য। এর মধ্যে কখনো কখনো স্থানীয়দের অনাপসমূলক অবস্থান সরল, নিভাঁজ কাহিনিতে গোল পাকিয়েছে; যেমন ১৬৩৮-৩৯ সালে একদল জাপানি খ্রিষ্টান পর্তুগিজদের ওই অঞ্চল থেকে বের করে দেয়। তবে সবদিক বিবেচনায় কেবল আরব ও ইসলামি প্রাচ্যই ইউরোপকে

অমীমাংসিত রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ জানায়। তাই ইতিহাসের অধিকাংশ সময়জুড়েই প্রাচ্যতত্ত্ব ইসলামের প্রতি ইউরোপের সমস্যাজনক মনোভাবের ছাপ বহন করে এনেছে। আমার বর্তমান অধ্যয়নের আগ্রহ মোড় নিয়েছে প্রাচ্যতত্ত্বের এই বিশেষ সংবেদনশীল দিকটির প্রতি।

সন্দেহ নেই ইসলাম বিভিন্ন দিক দিয়েই ছিল এক যথার্থ প্ররোচনা। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে খ্রিষ্টধর্মের অস্বস্তিকর নৈকট্যে তার অবস্থান। এ ধর্ম ইহুদি- হেলেনিক ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করে, সৃষ্টিশীলভাবে ঋণ করে খ্রিষ্টধর্ম থেকে; এটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্যের অহংকার করতে পারে। তবে এটুকুই সব নয়। ইসলামের ভূমি বাইবেলোক্ত প্রাচীন ভূমির সংলগ্ন এমনকি এর ওপরও অবস্থিত। এ ছাড়া ইসলামের মূল এলাকা, যাকে বলা হয় নিকট প্রাচ্য, তা বরাবর ইউরোপের সবচেয়ে নিকটবর্তী। আরবি ও হিবরু সেমেটিক ভাষা; এ দুই ভাষা খ্রিষ্টধর্মকে কিছু জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রদান ও পুনঃপ্রদান করে। সাত শতকের শেষ থেকে ১৫৭১ সালের লেপান্টোর যুদ্ধ পর্যন্ত আরব, অটোমান বা উত্তর আফ্রিকান অথবা স্প্যানীয় চেহারায় ইসলাম ইউরোপীয় খ্রিষ্টধর্মের ওপর হয় আধিপত্য করে অথবা হুমকিস্বরূপ বিরাজ করে। ইসলাম যে সমৃদ্ধি ও দীপ্তিতে রোমকে পেছনে ফেলে এসেছিল, সে কথা অতীত বা বর্তমানকালের কোনো ইউরোপীয়র মন থেকে মুছে যাওয়ার কথা নয়। এমনকি গিবনও ব্যতিক্রম নয়, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল-এর নিম্নোক্ত প্যারায় :

> রোমান সাম্রাজ্যের জয়দীপ্ত যুগে সিনেটের লক্ষ্য হয় তাদের পর্ষদ ও সেনাবাহিনীকে একসঙ্গে একটিমাত্র যুদ্ধে নিয়োজিত করা এবং একজন করে শত্রু দমন করা–দ্বিতীয় কোনো শত্রুর দেখা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আরব খিলাফতের উদারতা বা উৎসাহ এই ভীরু নীতিকে ঘৃণা করে। সমান তেজ ও সাফল্যের সঙ্গে তারা অগাস্ট্যাস ও আর্টাজেরেক্সেসের উত্তরাধিকারীদের আক্রমণ করে এবং একই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যগুলোও এমন শত্রুর শিকারে পরিণত হয়, এ যাবৎ যাকে ওরা অবজ্ঞা করতেই অভ্যস্ত ছিল। ওমরের দশ বছরের শাসনকালে সারাসিনরা ছেচল্লিশ হাজার নগর বা প্রাসাদ তার পদানত করে, অবিশ্বাসীদের চার শ চার্চ বা মন্দির ধ্বংস করে, মোহাম্মদ (সা.)-এ ধর্ম অনুশীলনের জন্য নির্মাণ করে চৌদ্দ শ মসজিদ। মক্কা থেকে তার অভিযান সূচিত হওয়ার পর তার উত্তরাধিকারীদের অস্ত্র ও শাসন ছড়িয়ে পড়ে ইন্ডিয়া থেকে আটলান্টিক সাগর পর্যন্ত বিভিন্ন দূরবর্তী প্রদেশে... ।[৫৪]

যখন 'প্রাচ্য' পরিভাষাটি সামগ্রিকভাবে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের সমার্থক নয়, বা সাধারণভাবে দূর ও অচেনা অঞ্চল নির্দেশক, তখন এটি অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবেই ইসলামি প্রাচ্যকে নির্দেশ করে। এই 'জঙ্গি' প্রাচ্য বোঝায়–আঁরি বদেতের ভাষায়, 'এশীয় জোয়ারের তরঙ্গ।'[৫৫]

আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপে এ অবস্থা বজায় ছিল। এ পর্যায়ে প্রাচ্য জ্ঞানভান্ডার–যেমন ডি হারবেলটের বিবলিওথিক অরিয়েন্টাল কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ইসলাম বা আরব বা অটোমান নির্দেশ বোঝানো বন্ধ হয়। ওই যুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক স্মৃতি কনস্টানটিনোপলের পতন, জেহাদ, সিসিলি ও স্পেন বিজয়ের মতো অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ঘটনাগুলোকেও বোধগম্য প্রসিদ্ধি এনে দেয়। এগুলো যদিও ভীতিপ্রদ প্রাচ্যকে নির্দেশ করে, কিন্তু এশিয়া প্রসঙ্গে প্রাচ্য শব্দটির যে অর্থবোধ রয়েছে, তা মুছে ফেলে না।

ওদিকে ভারত রয়ে যায়। ষোলো শতকের শুরুতে পর্তুগাল ওখানে প্রথম ইউরোপীয় ঘাঁটি স্থাপন করে। অতঃপর ইউরোপ, বিশেষ করে ইংল্যান্ড বাণিজ্যিক কার্যক্রমের দীর্ঘ একটি অধ্যায়ের পর (১৫০০ থেকে ১৭৫৮ খ্রি.) দখলদার শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। অথচ ইন্ডিয়া কখনো স্থানীয়ভাবে ইউরোপের জন্য হুমকি হয়ে ওঠেনি। তবে তা হুমকি ছিল। কারণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষে এবং ইউরোপীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সামনে ওই অঞ্চলটিকে এতটাই উন্মুক্ত করে দেয় যে ব্রিটিশদের পক্ষে ইন্ডিয়ান প্রাচ্যকে দেখা সম্ভব হয় এমন মালিকসুলভ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে; ইসলামের জন্য সংরক্ষিত বিপদের অনুভূতি এখানে জাগে না।[৫৬]

যাহোক, এই ঔদ্ধত্য ও যথার্থ ইতিবাচক জ্ঞানের পার্থক্য বিপুল। ডি হারবেলটের বিবলিওথিক-এ ইন্ডিয়া ও পারস্যের বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্যাদি ইসলামি উৎস থেকে প্রদত্ত এবং এও সত্য যে উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত 'প্রাচ্য ভাষা' কথাটি ছিল 'সেমেটিক ভাষা'র প্রতিশব্দস্বরূপ। কুইনেটের কথিত প্রাচ্যের রেনেসাঁ বেশ সংকীর্ণ কিছু বিষয়ের সীমানা প্রসারণের কাজ করে : এতে ইসলাম ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন প্রাচ্য বিষয়গুলোর বর্গরূপের প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ হিসেবে।[৫৭] আঠারো শতকের শেষে স্যার উইলিয়াম জোনসের প্রচেষ্টার পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত, ভারতীয় ধর্ম ও ইতিহাস বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মর্যাদা লাভ করেনি। জোনস যে ভারতের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিলেন তাও ইসলামি জ্ঞান-ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহের সূত্রেই। তাই আশ্চর্যজনক নয় যে ডি হারবেলটের বিবলিওথিকের পর প্রাচ্যবিষয়ক পাণ্ডিত্যের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ সিমন অকলির *হিস্ট্রি অব দ্য সারাসিনস*; এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭০৮ সালে। সাম্প্রতিকালে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন : অকলি এমন মত প্রকাশ করেছেন যে দর্শন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের জন্য ইউরোপীয়রা মুসলমানদের নিকট ঋণী; অকলির এ মনোভাব তার ইউরোপীয় পাঠকদেরকে কষ্টদায়ক এক জোর ধাক্কা দেয়। তবে তা কেবল এজন্য নয় যে অকলি তার গ্রন্থে ইসলামের আদি প্রসিদ্ধি পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরেন; বাইজেন্টাইন ও পারস্য যুদ্ধ স্পর্শ করে আরব দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ইউরোপকে প্রথম সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ সন্ধান প্রদান করার কারণেও।[৫৮]

তবে, অকলি ইসলামের সংক্রামক প্রভাব থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন এবং তার সহকর্মী উইলিয়াম হুইস্টনের (ক্যামব্রিজে নিউটনের উত্তরাধিকারী) মতো না করে, তিনি সব সময়ই তার ব্যক্তিগত মত পরিষ্কার করে নিয়েছেন যে ইসলাম দৌরাত্ম্যপূর্ণ খ্রিষ্টানবিরোধিতা মাত্র। অন্যদিকে ইসলামে আগ্রহের কারণে ১৭০৯ সালে ক্যামব্রিজ থেকে বহিষ্কৃত হন হুইস্টন।

ইন্ডিয়ান (প্রাচ্য) সমৃদ্ধিতে প্রবেশ করতে হলে ইসলামিক প্রদেশগুলো পার হয়ে আসতে হতো এবং আপাতভাবে আধা-আর্য বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত একটি পদ্ধতিস্বরূপ ইসলামের বিপজ্জনক প্রভাব থেকে গা বাঁচিয়ে রাখতে হতো। অন্তত আঠারো শতকের এক বিরাট সময়জুড়ে সে কাজটি সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় ফ্রান্স ও ব্রিটেন। অনেক যুগ হয় প্রায় বার্ধক্যে পৌছে (ইউরোপের জন্য) স্বস্তিদায়ক এক অবস্থানে থিতু হয়ে বসেছে অটোমান সাম্রাজ্য–উনিশ শতকে 'পূর্বের প্রশ্ন' হয়ে ওঠার জন্য। ১৭৬৯ সালে ব্রিটেন ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইন্ডিয়ায় ১৭৪৪ থেকে ১৭৪৮ সাল এবং আবার ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। অতএব, নেপোলিয়ন কর্তৃক ব্রিটেনের প্রাচ্য-সাম্রাজ্যব্যবস্থাকে সমস্যাসংকুল করার জন্য ইসলামের প্রবেশ দ্বারস্বরূপ মিসরে বাধা সৃষ্টি করা কী অনিবার্য নয়?

যদিও এর অব্যবহিত পরবর্তীকালেই আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রকল্প স্থান করে নেয়, তবু ১৭৯৮ সালে মিসরে নেপোলিয়নের অভিযান এবং সিরিয়ায় আকস্মিক আক্রমণ আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বে অনেক বড় প্রভাবসম্পাতী ঘটনা। নেপোলিয়নের পূর্বে মাত্র দুটি চেষ্টা হয় প্রাচ্যকে তার ঘোমটা খুলে দেখার এবং বাইবেলোক্ত প্রাচীন প্রাচ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য। প্রথম চেষ্টাটি করেন আব্রাহাম-হায়াসিন্থ্ অ্যাঁকুইতিল দুপেরন (১৭৩১-১৮০৫)। এ লোকটি উৎকেন্দ্রিক সমতাবাদী তাত্ত্বিক; ইয়ানসেনবাদের সঙ্গে ক্যাথলিসিজম ও ব্রাহ্মণবাদের সমন্বয়ের উদ্ভট স্বপ্ন ছিল তার মাথায়। বাইবেলোক্ত বংশগতি বা নির্বাচিত আদি মানবগোষ্ঠী ও তাদের বংশধরদের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এশিয়ায় ভ্রমণ করেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে তিনি মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যস্থির করেন ও পূর্বে সুরাট পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। ওখানে তিনি আবেস্তার রচনাগুলোর একটি অনুলিপি সংরক্ষিত পেয়ে যান; সেখানে বসে তা অনুবাদও করে ফেলেন। রেমন্ড স্কোয়াব আবেস্তার রহস্যময় অংশবিশেষের অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন : 'পণ্ডিতগণ অক্সফোর্ডে (আবেস্তার) প্রখ্যাত অংশটি দেখেন এবং তাদের পড়ালেখায় ফিরে আসেন, অ্যাঁকুইতিলও তা দেখলেন, কিন্তু দেখেই ইন্ডিয়ায় চলে গেলেন।' স্কোয়াব আরও মন্তব্য করেছেন যে অ্যাঁকুইতিল ও ভলতেয়ার, যদিও মনন ও ভাবাদর্শের দিক থেকে দুজন মেরুদূর বৈপরীত্যময়, কিন্তু উভয়েই প্রাচ্য ও বাইবেল সম্পর্কে সমান রকম আগ্রহী ছিলেন। 'একজন বাইবেলকে

আরও প্রশ্নমুক্ত করার জন্য, অন্যজন একে আরও অবিশ্বাস্য করার জন্য।' শ্লেষাত্মক ব্যাপার হলো আবেস্তার অ্যাঁকুইতিলকৃত অনুবাদ পরে ভলতেয়ারের কাজে লাগে। কারণ, অ্যাঁকুইতিলের আবিষ্কার শিগগিরই মূল টেক্সট (প্রাচীন বাইবেল) সম্পর্কে সমালোচনা সৃষ্টি করে, এ যাবৎ যা ঐশ্বরিক রচনা হিসেবে বিবেচিত হতো। অ্যাঁকুইতিলের অভিযানের মোট ফলাফলের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন স্কোয়াব :

১৭৫৯ সালে অ্যাঁকুইতিল সুরাটে আবেস্তার অনুবাদ শেষ করেন। ১৭৮৬ সালে প্যারিসে উপনিষদের অনুবাদ। তিনি মানবীয় ধীশক্তির দুই গোলার্ধের মধ্যে একটি সংযোজক খাল খনন করলেন মেডেটেরেনিয়ান বেসিনের প্রাচীন মানবতাবাদকে সংশোধন ও বিস্তৃত করে। পঞ্চাশ বছরের কম সময় পূর্বে তার স্বদেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, পারসিয়ান হওয়ার অর্থ কী? তখন তিনি পারস্য মনুমেন্ট ও গ্রিক মনুমেন্টের তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষা দিতেন তাদেরকে। ওদের একজন প্রশ্নটির জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের জগতের দূর অতীত পর্যন্ত তথ্য সন্ধান করেন, বিশেষ করে মহান লাতিন, গ্রিক, ইহুদি ও আরবি লেখকদের মধ্যে। বাইবেল বিবেচিত হতো একাকী বিচ্ছিন্ন একটি উল্কাপিণ্ডরূপে। লিখিত একটি জগৎ হাতের কাছেই ছিল। কিন্তু মনে হয় কেউ ওই সব অজানা দেশের গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহও করেননি। এ বিষয়ে উপলব্ধির শুরু তার আবেস্তা অনুবাদের মধ্য দিয়ে, মধ্য এশিয়ায় আবিস্কৃত ভাষাসমূহের (বাবেলের পর যেগুলো বহু শাখায় বর্ধিত হয়) বদৌলতে তা তুঙ্গে পৌঁছে। তখন পর্যন্ত রেনেসাঁর গ্রিক-লাতিন ঐতিহ্যের সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ (যার বেশির ভাগটাই এসেছে ইসলাম মারফত) আমাদের চিন্তাধারায় তিনি অতীতের বহু সভ্যতা ও প্রায় অসীম সাহিত্যিক সৃষ্টির কল্পদৃষ্টি প্রবিষ্ট করিয়ে দেন; ওগুলোর প্রভাব ইতিহাসে কেবল গুটিকয় ইউরোপীয় প্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।[৫৯]

ফলে প্রাচ্য প্রথমবারের মতো তার গ্রন্থাদি, ভাষা ও সভ্যতার বস্তু-অস্তিত্ব নিয়ে ইউরোপের কাছে উন্মোচিত হয়। এশিয়াও এই প্রথম যথাযথ বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক পরিসর অর্জন করে যা তার ভৌগোলিক দূরত্ব ও বিশালত্ব বিষয়ক মিথগুলোর পেছনে ঠেকনা দিয়ে ওগুলোকে আরও শক্তিশালী করে। আকস্মিক সাংস্কৃতিক বিস্তৃতির অবশ্যম্ভাবী সংযোগকারী ক্ষতিপূরণের একটি দিয়ে অ্যাঁকুইতিলের প্রাচ্যবিষয়ক শ্রমের উত্তরাধিকারী হন উইলিয়াম জোনস; এ হলো পূর্বে উল্লিখিত প্রাক নেপোলিনীয় প্রকল্পের দ্বিতীয়টি। অথচ অ্যাঁকুইতিল যেখানে সুদূরপ্রসারী কল্পদৃষ্টি খুলে বসেছিলেন, জোনস তা বন্ধ করে দেন, সূত্রবদ্ধ করেন, তাকে তুলনা ও ছকে বাঁধেন।

১৭৮৩ সালে ভারত ছেড়ে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমানোর পূর্বেই জোনস পরিণত হন আরবি, হিব্রু ও ফরাসির মহাপণ্ডিতে। এগুলো তার কৃতিত্বের সামান্যই বলে মনে হয় : তিনি কবি, জুরি, বিচিত্র ইতিহাসকার, ধ্রুপদ রচনার বোদ্ধা এবং এক অক্লান্ত

পণ্ডিত যার ক্ষমতা তাকে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন, এডমন্ড বাক্, উইলিয়াম পিট ও স্যামুয়েল জনসনের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়। যথা সময়ে তিনি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 'একটি সম্মানজনক ও মুনাফা প্রদাক পদ প্রাপ্ত হন'। ইস্টিইন্ডিয়া কোম্পানির পদ গ্রহণের জন্য ওখানে পৌছানোর সাথে সাথেই তিনি তার ব্যক্তিগত গবেষণা শুরু করেন : প্রাচ্যকে জড় করা, রশি লাগানো এবং গৃহপারিত করা অর্থাৎ একে ইউরোপের শিক্ষার একটি প্রদেশে পরিণত করার কাজ আরম্ভ করেন। 'এশিয়ায় আমার বসবাসকালীন অনুসন্ধানের লক্ষ্যসমূহ' শিরোনাশে তার ব্যক্তিগত কাজে জোনস অনুসসন্ধেয় বিষয়সমূহে অন্তর্ভুক্ত করেন 'হিন্দু ও মোহামেডানদের আইন' 'হিন্দুস্তানের আধুনিক ভূগোল ও রাজনীতি, বাংলা শাসনের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি, এশিয়ার পাটিগণিত, জ্যামিতি ও মিশ্র বিজ্ঞান, ইন্ডিয়ানদের ওষুধ, রসায়নশাস্ত্র, শল্যচিকিৎসাবিদ্যা ও শারীরসংস্থান বিদ্যা, ইন্ডিয়ার প্রাকৃতিক উৎপাদন, এশিয়ার কবিতা, বাগবিধি ও নৈতিকতা, পূর্বের জাতিগুলোর সঙ্গীত, ইন্ডিয়ার নির্মাণ শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য, এসব। ১৭৮৭ সালের আগস্টের ১৭ তারিখে তিনি নিজের গুণ কিছুমাত্র জাহির না করে লর্ড আলথ্রপের নিকট লিখেন : আমার লক্ষ্য অন্য যে কোনো 'ইউরোপীয়'র চেয়ে প্রাচ্যকে আরও ভালো ও বেশি করে জানা'। ১৯১০ সালে বেলফোর যে একজন ইংলিশ হিসেবে প্রাচ্যকে অন্য যে কোনো মানুষের চেয়ে বেশি ও ভালো করে জানতে চান তার অস্পষ্ট আভাস এখান থেকেই পেয়ে থাকতে পারেন।

জোনসের অফিসিয়াল বিষয় ছিল আইন। প্রাচ্যবাদের ইতিহাসে এ পেশার প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। জোনসের ভারত আগমনের সাত বছর পূর্বে ওয়ারেন হেস্টিংস সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয়রা তাদের আইন দ্বারা শাসিত হবে। প্রথমে দর্শনে যতটা মনে হয়, কাজটি তার চেয়েও দুঃসাহসিক ও কঠিন ছিল। কারণ, তখন পর্যন্ত সংস্কৃত আইন পাওয়া যেতো ব্যবহারিক প্রয়োজনে কৃত ফারসি অনুবাদে। এমন কোনো ইংরেজও ছিলেন না যিনি মূল সংস্কৃত রচনার অর্থ উদ্ধারে প্রয়োজনীয় সংস্কৃত জ্ঞানসম্পন্ন। কোম্পানির কর্মচারী ইউলকিনস প্রথম সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন; এরপর হাত দেন মনুসংহিতা অনুবাদের কাজে। তাতে অচিরেই তিনি জোনস এর সহায়তা লাভ করেন। (ঘটনা ক্রমে ইউলকিনস ভাগবত গীতার প্রথম অনুবাদক)। ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে জোনস এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ইংল্যান্ডে রয়েল সোসাইটি যেমন, এশয়াটিক সোসাইটিও ইন্ডিয়ায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সোসাইটির প্রথম সভাপতি এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট জোনস প্রাচ্য ও প্রাচ্যজন সম্পর্কে কার্যকর জ্ঞান আহরণ করেন যা তাকে পরবর্তীতে সন্দেহাতীতভাবে প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতার (এ. জে. আরবেরির প্রদত্ত অভিধা) মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। শাসন করা এবং জানা, অতঃপর পাশ্চাত্যের

সাথে প্রাচ্যের তুলনা করা : এগুলো ছিল জোনসের লক্ষ্য। সর্বদা সংকেতাবদ্ধকরণের প্রবল প্রবণতা এবং প্রাচ্যের অসীম বৈচিত্র্যকে আইন, সংখ্যা, প্রথা, ও রচনার 'পূর্ণাঙ্গ একটি ডাইজেস্টে' অধীনস্থ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। তার এক প্রখ্যাত ঘোষণা নির্দেশ করে আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব–এমনকি তার দার্শনিক সূচনাক্ষণে–কতদূর তুলনামূলক বিষয় হয়ে উঠেছিল, যেহেতু এর প্রধানতম লক্ষ্য ছিল দূরবর্তী ও অক্ষতিকর প্রাচ্য উৎসে ইউরোপীয় ভাষাসমূহের শেকড় প্রতিষ্ঠার।

> সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাই হোক না কেন এর গঠন অসাধারণ; গ্রিসের চেয়ে নিখুঁত, লাতিনের চেয়ে শব্দ সম্পদ বেশি, এবং উভয়ের তুলনায় অনেক চমৎকারভাবে পরিশোধিত; তবু উভয়ের সাথে খুবই সাদৃশ্যময়–ক্রিয়ার মূল ও ব্যাকরণের রূপ এ দু'দিক থেকেই। এ সাদৃশ্য এত প্রবল যে, কোনো ভাষাতাত্ত্বিক এ তিনটি ভাষা একত্রে অধ্যয়ন করলে বিশ্বাস না করে পারবেন না যে, তিনটি ভাষাই এক উৎস থেকে সৃষ্ট।[৬০]

ইন্ডিয়ায় অনেক আদি প্রাচ্যবিদই কিন্তু জোনসের মতো আইনবিশারদ, কিংবা অন্য কিছু; এবং মজার ব্যাপার যে, এদের প্রায় প্রত্যেকে খ্রিষ্টীয় মিশনারি মনোভাব নিয়ে চিকিৎসা পেশার সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন; বলা যায় এদের অনেককেই যুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। যতদূর বোঝা যায় এদের এদেশে আগমনের পেছনে ছিল অনুসন্ধানের দ্বৈত উদ্দেশ্য : এশিয়ার বিজ্ঞান ও শিল্পে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা–এখানে এসব বিষয়ে উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে এবং নিজের দেশে জ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নয়ন সাধনের জন্য।[৬১]

হেনরি থমাস কোলব্রুকের উদ্যোগে ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির শতবার্ষিকী সংকলনে সর্বজনীন প্রাচ্যতত্ত্বের এরকম লক্ষ্যই বিবৃত হয়। আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে কাজ করার সময় জোনসের মতো পেশাজীবী প্রাচ্যবিদদের কেবল দুটো ভূমিকা পালন করার দায় ছিল। তবু প্রাচ্যে ওদের অবস্থানের পশ্চিমা ধরণ যে কঠোরতার লেবেলে এঁটে দেয় ওদের মানবিক চিন্তা চেতনায় সেজন্য আজকে আমরা তাদের দোষারোপ করতে পারি না। ওরা ছিলেন হয় বিচারক না হয় ডাক্তার। এমনকি বাস্তব দৃষ্টিকোণের পরিবর্তে অধিবিদ্যাগত মনোভাব নিয়ে লিখে গেছেন যে এডগার কুইনেট, তিনিও তার লেখার এই চিকিৎসাবিদগত রীতির ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। 'এশিয়া নবীদের, লো জিনি দজ রিলিজিয়নস-এ লেখেন তিনি 'আর ইউরোপ ডাক্তারদের জন্য'।[৬২]

প্রাচ্য সম্পর্কে মূল জ্ঞান এসেছে প্রাচীন রচনাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের মাধ্যমে, অতঃপর তার প্রয়োগ হয়েছে আধুনিক প্রাচ্যে। আধুনিক প্রাচ্যজনের অনিবার্য, জরাজীর্ণ অবস্থা ও রাজনৈতিক পঙ্গুত্ব দেখে ইউরোপীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মনে হয়েছে

বর্তমান প্রাচ্যে কিছুটা 'উন্নতি বিধানের জন্য' অতীত, ধ্রুপদ প্রাচ্যের হারানো সমৃদ্ধির কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করা তাদের দায়িত্ব। ধ্রুপদ প্রাচ্যের অতীত থেকে ইউরোপীয়রা গ্রহণ করে কেবল একটি দৃষ্টিভঙ্গি (আর হাজার হাজার ঘটনা ও শিল্পকর্ম), যা তারা তাদের সর্বোত্তম সুবিধাজনকভাবেই কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। আধুনিক প্রাচ্যজনের সামনে তারা উপস্থিত করে উন্নতি বিধানের সুযোগ এবং প্রাচ্যের কোনো জিনিসটা সর্বোত্তম সে বিষয়ে তাদের পরামর্শের সুবিধা।

প্রাক-প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রকল্পগুলোর একটি সাধারণ প্রকৃতি হলো এগুলোর সাফল্যের জন্য আগাম কিছু করা সম্ভব হয়নি। যেমন অ্যাঁকুইতিল ও জোনস ভারতে আসার পূর্বে এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নিয়ে আসতে পারেননি; যা শিখেন ও জানেন তার সবটাই এখানে আসার পর। ওরা যেন প্রথমে বিশাল এক প্রাচ্যের মুখোমুখি হন; কেবল কিছুকাল পার করে এবং কিছুটা উৎকর্ষ সাধনের পরই তারা প্রাচ্যকে কেটেছেঁটে ছোট একটা প্রদেশে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন।

অন্যদিকে, নেপোলিয়ন গোটা মিসর কব্জা করার চেয়ে কম কিছু চাননি। এ ব্যাপারে তার আগাম প্রস্তুতি ছিল তুলনাহীনভাবে বিস্তৃত, সামগ্রিক ও অনুপুঙ্খ। সে প্রস্তুতিও ছিল উত্তমরূপে ছকে বিন্যাস্ত–নতুন পরিভাষায় বলা যায়–রচনামূলক, তা সময় নিয়ে রচিত। এসব বৈশিষ্ট্যই এখানে বিশ্লেষিত হবে। ১৭৯৭ সালে ইতালিতে বসে তার পরবর্তী সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করার সময় তিনটি বিশেষ বিষয় নেপোলিয়নের মাথায় ছিল বলে মনে হয় : হুমকিস্বরূপ শক্তি ইংল্যান্ডের উপস্থিতির কারণে নেপোলিয়নের পুবমুখী হওয়ার প্রয়োজন ছিল; তারচেয়ে বড়কথা ক্যাম্পো ফরমিয়োর চুক্তির মাধ্যমে তার অর্জিত বিরাট সামরিক সাফল্যে আরও গৌরব যোগ করার জন্য পুবদিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা ছিল না তার; সেই সঙ্গে এর মধ্যে দিয়েই ব্রিটেনকে আঘাত করতে পারার সম্ভাবনা তাকে পুবমুখী করে। দ্বিতীয়ত, কৈশোর থেকেই প্রাচ্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন নেপোলিয়ন। তার তরুণ বয়সে রচিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে *ম্যারিনির ইস্তওয়ার দ্য অ্যারাবস* এর একটি সারাংশও পাওয়া গেছে। তার লেখালেখি ও আলোচনা থেকে দেখা যায় তিনি আলেকজান্ডারের প্রাচ্য এবং বিশেষভাবে মিসর বিষয়ক স্মৃতি ও জয়-গর্বে–জ্যাঁ থারির ভাষায়–উচ্ছ্বসিত ছিলেন।[৬৩] এভাবে নতুন

আলেকজান্ডাররূপে মিসর পুনর্বিজয়ের আত্মগত প্রস্তাব তার সামনে স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপিত হয়। যোগায় ইংল্যান্ডের ক্ষতির মধ্য দিয়ে একটি বাড়তি ইসলামি উপনিবেশ লাভের চিন্তাও তাতে মদদ জোগায়।

তৃতীয়ত, নেপোলিয়ন মিসরকে বিবেচনা করেন একটি সম্ভাব্য প্রকল্প হিসেবে। কারণ দেশটি সম্পর্কে তিনি সামরিক কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিকভাবে এবং

গুরুত্বপূর্ণ সব গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন; অর্থাৎ কেউ ধ্রুপদ ও সাম্প্রতিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের রচনা পাঠ করে প্রাচ্য সম্পর্কে যেরকম জানেন নেপোলিয়নও সেভাবে মিসর সম্পর্কে অবহিত হন। এ সবকিছুর মূল কথা হলো মিসর নেপোলিয়নের জন্য এমন একটি প্রকল্প যা বাস্তবতা লাভ করে তার মনে, পরীক্ষিত বস্তু থেকে নয়; বরং বাস্তবতা অর্জন করেছে গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত দারণা ও ক্পনা এবং পুরাণের জগতের অভিজ্ঞতা সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে। প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের ক্রমিক একরাশ সংঘাতের প্রথমটি হলো নেপোলিয়নের অভিযান। এতে প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান সরাসরি উপনিবেশিক প্রয়োজনে কাজে লাগানো হয়। যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তে প্রশ্ন উঠে প্রাচ্যের প্রতি না পশ্চিমের প্রতি বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল থাকেবন প্রাচ্য তাত্ত্বিকরা, তখন দেখা যায় তার বিজয়ী পশ্চিমের প্রতিই বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল থাকেন, নেপোলিয়নের সময় থেকেই। সম্রাটের নিজের বেলায় দেখা যায় তিনি প্রাচ্যকে দেখেছেন প্রথম প্রাচীন রচনা ও পরবর্তী সময়ের প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানে বিন্যস্ত অস্তিত্বরূপে; প্রাচ্যের সাথে সংঘাতের বিকল্প হিসেবে প্রাচীন রচনা-নির্ভর কাল্পনিক চিত্র বাস্তব বেশ কার্যোপযোগী মনে হয়।

মিসর অভিযানে নেপোলিয়ন যে বহু ডজন পণ্ডিতকে অন্তর্ভুক্ত করেন তা সবারই জানা, এখানে আবার খুঁটিনাটি উল্লেখ করার দরকার নেই বলে মনে হয়। তার প্রতিষ্ঠিত এঁস্তিতি দ্য ইজিপ্ট-এর মেম্বারদের দ্বারা সকল বিষয়ে গবেষণার আকারে প্রস্তুত একটা জীবন্ত আর্কাইভ অভিযানে সঙ্গী করার পরিকল্পনা ছিল নেপোলিয়নের। যে সম্পর্কে প্রচারণা কম হয়েছে তা হলো< ফরাসি পর্যটক কোঁতে ডি ভোলনির ভ্রমণকাহিনী ১৭৮৭ সালে প্রকাশিত দুই খণ্ড ভয়েজ আঁ ইজিপ্টো আঁ সিরিয়া-এর ওপর নেপোলিয়নের প্রাক-বিশ্বাস। এ রচনার ভূমিকায় পাঠককে অবহিত করা হয়েছে যে, আকস্মিকভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু অর্থ হাতে আসায় ১৭৮৩ সালে পুবে তার ভ্রমণ সম্ভব হয়। এ ব্যক্তিগত ভূমিকা বাদ দিলে ভোলনির ভয়েজ প্রায় পীড়াদায়কভাবে একটি নৈর্ব্যক্তিক দলিল। ভোলনি পরিষ্কারভাবেই নিজেকে বৈজ্ঞানিকরূপে দেখেছেন, যার কাজ হলো চোখে দেখা সকল কিছুর ইতা (অবস্থা) লিপিবদ্ধ করা। ভোলনির গ্রন্থের চরম উত্তেজনাকর অংশ দ্বিতীয় খণ্ডে, ইসলাম ধর্মের বিবরণে।[৬৪]

ধর্ম হিসেবে ইসলাম এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে ইসলামের প্রতি ভোলনির দৃষ্টিভঙ্গি অনুশাসনিকভাবেই আক্রমণাত্মক। এ সত্ত্বেও এ গ্রন্থ এবং তুর্কিদের সম্পর্কে তার রচনাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নেপোলিয়ন। বিচক্ষণ ও সতর্ক ফরাসি নাগরিক ভোলনি, তার সিকি শতাব্দি পরের শ্যাতোব্রাঁ ও ল্যামারটিনের তো, ফরাসি উপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র হিসেবে নিকট প্রাচ্যে চোখ

ফেলেন। ভোলনি থেকে নেপোলিয়ন যা লাভ করেন তা হলো ক্রমানুসারে সাজানো সমস্যা এবং ফরাসি দখলাভিযানে সেনাবাহিনীকে প্রাচ্য যেসব বাধার মোকাবিলা করতে হবে তার তালিকা।

সেন্ট হেলেনায় জেনারেল বার্ট্রান্ডকে দেয়া শ্রুতি-লিখেন মিসর ও সিরিয়া ক্যাম্পেইন ১৭৯৮-৯৯ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণ এ নেপোলিয়ন পরিষ্কারভাবে ভোলনির কথা উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন, ভোলনি প্রাচ্যে ফরাসি আধিপত্যের তিনটি বাধা বিবেচনা করতেন; অতএব কোনো ফরাসি বাহিনীকে ওখানে তিনটি যুদ্ধ করতে হবে : একটি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়টি অটোমানদের পরস্পরের সংঘাতের বিরুদ্ধে, এবং তৃতীয় ও সবচেয়ে কঠিনটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে।[৬৫]

ভোলনির বিশ্লেষণ অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং খুঁতহীন। কারণ, নেপোলিয়ন পরিষ্কার বুঝেছিলেন, ভোলনির যে কোনো পাঠকও বুঝবেন যে প্রাচ্যে বিজয় অর্জনে ইচ্ছুক যে কোনো ইউরোপীয়র নিকট ভয়েজ ও কনসিডারেশন গুরুত্বপূর্ণ রচনা। অন্যকথায়, কোনো ইউরোপীয় সরাসরি প্রাচ্যের মুখোমুখি হলে মানসিক আঘাত অনুভব করতে পারে। তা হ্রাস করার জন্য ভোলনির রচনা যেন একটি হ্যান্ড বুক : বইগুলো পড়ুন, ভোলনির অভিসন্দর্ভের সাথে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করুন প্রাচ্য কর্তৃক অচেনা পরিবেশবোধ জাগ্রত হওয়া দূরে থাকুক, আপনিই প্রাচ্যকে আপনার নিকটে আসতে বাধ্য করবেন। নেপোলিয়ন ভোলনিকে প্রায় আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন, তবে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খুবই সূক্ষ্মভাবে। সেনাবাহিনী মিসরের সীমানায় পৌঁছার পর থেকেই মুসলমানদের বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে, তারা মুসলমানদের কাছে সত্য কথাই বলবে। ১৭৯৮ এর জুলাইয়ের ২ তারিখে আলেকজান্দ্রিয়ার লোকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঘোষণায় এমন দাবিই করেন বোনাপার্ট।[৬৬]

(অরিয়েন্ট নামক ফ্লাগশিপে বসে) একদল প্রাচ্যতাত্ত্বিকের দ্বারা পরিবেষ্টিত নেপোলিয়ন মামলুক মিসরীয়দের পারস্পরিক শত্রুতা কাজে লাগান। ইসলামের বিরুদ্ধে নির্বাচিত ও দৃষ্টান্তহীন একটি যুদ্ধ শুরু করার গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সকলের জন্য সমান সুযোগের বিপ্লবাত্মক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানান। এ অভিযানের প্রথম আরব ধারা-বিবরণ লেখক আবদ-আল-রহমানকে সবচেয়ে অভিভূত করে স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগের জন্য নেপোলিয়ন কর্তৃক একদল পণ্ডিতকে নিয়োগ করার ঘটনা এবং অত্যন্ত নিকট থেকে আধুনিক ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা।[৬৭]

ইসলামের জন্যই এই যুদ্ধ–সর্বত্র তা প্রমাণের চেষ্টা করেন নেপোলিয়ন। তিনি যা বলতেন তার সবই কোরানের ব্যবহৃত আরবিতে অনুদিত হতো। ফরাসি সেনাবাহিনীর উপরস্থ কমান্ডারদের ওপর নির্দেশ ছিল যেন সকল সময় ইসলাম ধর্মীয়

আবেগের কথা মনে রাখা হয়। (প্রসঙ্গেক্রমে, মিসরে নেপোলিয়নের কৌশলের সাথে তুলনা করা যায় ১৫১৩ সালে দখলদার স্প্যানীয়দের তরফ থেকে স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের উদ্দেশ্যে পাঠ করার জন্য লিখিত স্প্যানীয় ভাষার দলিল 'রিকোয়ারিমেন্তো'র, যাতে বলা হয় : তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস বানাব এবং তাদের বিক্রয় বা বিলি বন্দোবস্ত করব–যেমন নির্দেশ দেবেন মহানুভব স্পেনের রাজা ও রানী। আমরা তোমাদের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। যে সব দাস আমাদের নির্দেশ মানবে না তাদেরকে যতটা পারি ততটাই ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত করব ইত্যাদি।[৬৮])

যখন নেপোলিয়ন পরিষ্কার উপলব্ধি করেন মিসরীয়দের ওপর বলবৎ করার জন্য তার সেনাবাহিনী খুবই ছোট তখন তিনি স্থানীয় ইমাম, কাজী, মুফতি ও উলেমাদের দ্বারা কোরআনের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করালেন যাতে মনে হয় যে, গ্র্যান্ড আর্মি মুসলমানদের পক্ষেরই শক্তি। এ পর্যায়ে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ৬০জন উলেমাকে নেপোলিয়নের নিজস্ব ডেরায় আমন্ত্রণ জানিয়ে পুরোদস্তুর সামরিক সম্মান দেখানো হয়। অতঃপর নেপোলিয়ন আলাপচারিতায় ইসলাম ও মোহাম্মদের (সা.) প্রতি তার আন্তরিক অনুরুক্তি এবং কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কথা জানিয়ে তাদের তোষামোদের ব্যবস্থা করেন; স্বাভাবিক কারণেই এ সময় তাকে কোরআনের যথেষ্ট পরিচিত বলেও মনে হয়। এবার কাজ হয়। অচিরেই দখলদারদের প্রতি তাদের ঘোরতর অবিশ্বাসের কথা ভুলে যায় কায়রোর মানুষরা।[৬৯] পরবর্তীকালে নেপোলিয়ন তার ডেপুটি ক্লেবারকে কড়া নির্দেশ দেন তিনি চলে যাওয়ার পর যেন এবং যেসব ধর্মীয় নেতার বিশ্বাস অর্জন করা যাবে তাদের এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের পরামর্শ মেনে মিসর পরিচালনা করা হয়। অন্য যেকোনো রাজনীতি খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ও মুর্খতা।[৭০] হুগো মনে করেন প্রাচ্যে নেপোলিয়নের অভিযানের কৌশলী গৌরব তিনি ধরতে পেরেছেন তার 'লু' কবিতায় :

আমি তাকে আরেকবার খুঁজে পাই
নীলনদের তীরে,
তার ভোরের আগুনে উজ্জ্বল মিসর।
প্রাচ্যে উত্থিত তার রাজদন্ড
বিজয়ী, উদ্যমী, কৃতিত্বে ফেটে পড়া
বিস্ময়কর তিনি আজ বিহ্বল করেন বিস্ময়ের ভূমিকেই।
বিচক্ষণ তরুণ আমিরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যায় প্রবীণ শেখেরা।
তার অভূতপূর্ব অস্ত্রের ভয়ে ত্রস্ত তাবত মানুষ।
মহীয়ান, তিনি। বিস্মিত উপজাতির মুখোমুখি হাজির আজ
বুঝি পশ্চিমের মেহমুত।[৭১]

কেবল সামরিক অভিযানের পূর্বেই সবকিছু পরিকল্পিত হয়ে থাকলে এ ধরনের বিজয় অর্জন সম্ভব এবং এমন কারও দ্বারা, প্রাচ্যসম্পর্কিত গ্রন্থ ও পণ্ডিতদের বক্তব্য ছাড়া যার আর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। একটি পুরাদস্তুর একাডেমী সঙ্গী করার পরিকল্পনাটিই প্রাচ্যের প্রতি তার কেতাবী মনোভাবের বিশেষত্ব। বিপ্লবাত্মক কিছু ডিক্রির দ্বারা এ ধরনের মনোভঙ্গি আরও দৃঢ় হয়। (বিশেষত মার্চ ৩০, ১৭৯৩-এ ঘোষণায় আরবি, ফারসি ও তুর্কি শিক্ষা দেয়ার জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ইকোল পাবলিক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে[৭২]), যার কাজ ছিল রহস্য উন্মোচনের মতো যুক্তিসংগত কিছু এবং সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত জ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠানিকীকরণ। জুন ১৭৯৬ থেকে ইকোল পাবলিক দজ ল্যাংগুয়েজের প্রথম এবং একমাত্র আরবি শিক্ষক ছিলেন সেসি। নেপোলিয়নের সঙ্গী অনেক প্রাচ্যতাত্ত্বিক অনুবাদকই সিলভেস্ত্র ডি সেসি'র ছাত্র। পরে সেসি ইউরোপে ভবিষ্যতের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্যতাত্ত্বিককে শিক্ষা দেয়ার সুযোগ লাভ করেন। ইউরোপে একটি শতাব্দির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সময় ধরেই এ জ্ঞান শাখাটির ওপর আধিপত্য করে তার ছাত্ররা। তাদের অনেকে রাজনৈতিকভাবেই কাজে লাগেন, এই অর্থে যে, তারা নেপোলিয়নের সাথে মিসর অভিযানে অংশ নেন।

নেপোলিয়নের মিসরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল মুসলমানদের সাথে কাজ করা, পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশটি ছিল মিসরকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করা, ইউরোপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবেশযোগ্য করা। অচেনা মিসর এবং পূর্ববর্তী পর্যটক, পণ্ডিত ও ভূমি-বিজয়ীদের মাধ্যমে মিসর সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। মিসরে এই আধা চেনা সীমিত এলাকা ও অচেনা অঞ্চল থেকে ক্রমে মিসর পরিণত হয় জানা তথ্য অনুযায়ী এর কোনো কোনো আধাচেনা এলাকা এবং বেশিরভাগ অচেনা অঞ্চল নিয়ে এখণ মিসর হয়ে ওঠে ফরাসি শিক্ষার একটি বিভাগে। এখানেও কেতাবি ও পরিকল্পিত বয়নামুখী মনোভাবের প্রমাণ মিলে। রসায়নবিদ, ঐতিহাসিক, জীববিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক, শল্য চিকিৎসক ও পুরাকীর্তি বিশেষজ্ঞদল নিয়ে গঠিত ইনস্টিটিউট সেনাবাহিনীর পণ্ডিত অংশ। আগ্রাসনের চেয়ে কম কিছু ছিল না এর দায়িত্ব : এর লক্ষ্য ছিল মিসরকে আধুনিক ফরাসিতে স্থাপন করা। নেপোলিয়নের উদ্যোগটি ছিল সর্বজনীন, অ্যাবে লো ম্যাসক্রিয়াস-এর ১৭৩৫ সালের ডিসক্রিপর্জঁ দ্য লো ইজিপ্ট-এর মতো নয়। দখলের প্রায় প্রথম দিন থেকেই নেপোলিয়ন নিশ্চিত করেন যে, ইনস্টিটিউট তার দেখা সাক্ষাৎ আলোচনা, নিরীক্ষা–অর্থাৎ সাম্প্রতিক পরিভাষায় সূত্র অনুসন্ধানের মিশন শুরু করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, যা দেখা, বলা ও পরীক্ষা করা হয় তার সবই লিপিবদ্ধ হয়ে যায় এবং ওগুলো লিপিবদ্ধ হয় একদেশ কর্তৃক আরেকটি দেশকে আমূল ধারণ করার উপযোগী বিরাট আকারের ডিসক্রিপর্জঁ দ্যা লো ইজিপ্ট-এর ২৩টি বিশাল খণ্ডে; সবক'টি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮০৯ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে।[৭৩]

ডিসক্রিপজঁ-এর মৌলিকত্ব এর আকার বা লেখকদের বুদ্ধিমত্তার নয়, বিষয়ের প্রতি লালিত মনোভঙ্গিতে। এই মনোভঙ্গির কারণেই রচনাটি আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রকল্প অধ্যয়নের কাজে এত আগ্রহব্যঞ্জক বিষয় বলে মনে হয়। ইনস্টিটিউটের সচিব জ্যাঁ বাপতিস্ত জোসেফ ফুরিয়ার কর্তৃক লিখিত ভূমিকায় একটি কথা পরিষ্কার করে নেয়া হয় যে, মিসরকে (আয়ত্ত) 'করার' মধ্য দিয়ে পণ্ডিতগণ অ-দুষিত সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সর্মার্থের সাথে সরাসরি বোঝাপড়া করছে। মিসর ছিল আফ্রিকা ও এশিয়ার, ইউরোপ ও প্রাচ্যের, স্মৃতি ও বাস্তবের সম্পর্কের দর্শন-বিন্দু :

> আফ্রিকা ও এশিয়ার মাঝখানে অবস্থিত ইউরোপের সাথে সহজেই যোগাযোগের সুবিধার কারণে মিসর প্রাচীন মহাদেশটির কেন্দ্রবিচন্দু হয়ে ওঠে। এ দেশটি কেবল মহান সব স্মৃতি তুলে ধরে; শিল্পকারখানার মাতৃভূমি এই দেশ এখনো অসংখ্য মনুমেন্ট সংরক্ষণ করে রেখেছে; এ দেশের প্রাচীন রাজারা যেসব প্রাসাদে বসবাস করে গেছে, সেসব প্রাসাদ ও মন্দির এখনো রয়ে গেছে, যদিও এর প্রাচীন অট্টালিকাগুলোর নির্মাণকাজ ট্রোজান যুদ্ধের পূর্বেই শেষ হয়েছিল। হোমার লিকারগুস, সোলোন, পিথাগোরাস ও প্লেটো সবাই মিসরে গেছেন বিজ্ঞান, ধর্ম ও আইন অধ্যয়নের জন্য। আলেকজান্ডার ওখানে একটি সম্পদশালী নগর নির্মাণ করেন, যা দীর্ঘকাল ধরে বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সেই নগর পম্পেই, সিজার, মার্ক এন্টনি ও অগাস্টাসকে দেখেছে রোম ও গোটা পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণের খেলায় মগ্ন। অতএব যেসব গৌরবোজ্জ্বল সম্রাট জাতিগুলোর ভাগ্য শাসন করেন এ দেশ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করারই কথা।
>
> প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে কোনো জাতি কর্তৃক এমন বিশেষ শক্তির সমাবেশ ঘটেনি যে শক্তি সেই জাতিকে মিসরমুখী করেনি; যে দেশটি কোনো না কোনো দিক থেকে সেই জাতির জন্য প্রাকৃতিক পুরস্কার বলে গণ্য হতো।[৭৪]

যেন শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সরকারব্যবস্থায় অর্জিত সমৃদ্ধির জন্যই মিসরের ভূমিকা হতে হবে এর মঞ্চের মতো, যাতে বিশ্ব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সংঘটিত হবে। অতএব ফ্রান্স মিসর দখল করে তার শক্তি জাহির করবে ও ইতিহাসে তা যুক্তিসংগত করে যাবে, তাই স্বাভাবিক। আর মিসরের নিজের নিয়তি হলো ইউরোপের সাথে সংযুক্তি। এ ছাড়া সেই শক্তি এমন এক ইতিহাসে প্রবেশ করবে, যার সর্বজনীন উপাদানগুলো মোহার, আলেকজান্ডার, সিজার, প্লেটো, সোলেন ও পিথাগোরাসের চেয়ে নিম্নপ্রতিভার কারও দ্বারা নিরূপিত হয়নি, যারা পূর্বে একদা প্রাচ্যে উপস্থিত হয়ে অঞ্চলটিকে দয়া দেখিয়েছিলেন। সংক্ষেপে প্রাচ্যের অস্তিত্ব একরাশ মূল্যবোধের মধ্যে; তার আধুনিক বাস্তবতায় নেই, বরং আছে ইউরোপের অতীতের সাথে তার বহুদফা সংযোগের নিরূপিত মূল্যের ভিত্তিতে; এ হলো সেই কেতাবি, ছককাটা পরিকল্পনাভিত্তিক মনোভঙ্গির খাঁটি উদাহরণ, পূর্বে যা উল্লেখ করেছি।

এভাবে ফুরিয়ার চালিয়ে যান প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে। ঘটনাক্রমে প্রতিটি পৃষ্ঠার আয়তন এক বর্গমিটারের মতো, যেন প্রকল্প ও তার বয়নের আকারের অনুপাত ঠিক রাখার চিন্তা করেই পৃষ্ঠাগুলো বড় করা হয়েছে। ফুরিয়ার-মুক্ত অতীত যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করেন যে, নেপোলিয়নের অভিযান ওই সময় খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। নাটকীয় পটভূমি কখনও পরিত্যাগ করা হয়নি। ইউরোপীয় পাঠকবর্গ ও প্রাচ্যের চরিত্রসমূহের ব্যাপারে সচেতন থেকে ফুরিয়ার সুবিধাজনকভাবে ঘটনাক্রম ব্যবহার করেছেন। লিখেছেন :

> ফ্রান্স প্রাচ্যে...এই বিস্ময়কর সংবাদে পুরো ইউরোপে যে প্রভাব পড়ে, কেউ তা মনে করে দেখুন...এ বিরাট প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে নীরবে, এমন তৎপরতা ও গোপনীয়তার সঙ্গে যে আমাদের শত্রু গোয়েন্দারা হতাশ। যখন তা ঘটেছে কেবল তখনই তারা জানতে পেরেছে যে এটি গৃহীত ও পরিকল্পিত হয়েছিল এবং এখন সফলভাবে বাস্তবায়িত হলো।

এমন একটি নাটকীয় কু দে থিয়েটার প্রাচ্যের জন্যও সুফল বয়ে আনে :

> এই দেশটি কত জাতির মধ্যে তার জ্ঞান সঞ্চারিত করেছে। এখন ডুবে আছে বর্বরতায়।

কেবল কেজন বীর নায়কের পক্ষেই এসব উপাদান সমন্বিত করা সম্ভব, যা ফুরিয়ার বর্ণনা করেন :

> ইউরোপ, প্রাচ্য এবং আফ্রিকার সম্পর্ক, ভূমধ্যসাগরে জাহাজপথ এবং এশিয়ার ভাগ্যের ওপর এ ঘটনা যে প্রভাব ফেলবে নেপোলিয়ন তাকে প্রশংসনীয় মনে করেন।...তিনি প্রাচ্যের নিকট কার্যোপযোগী একটি ইউরোপীয় উদাহরণ তুলে ধরতে চান এবং পরিশেষে আরও সুন্দর করতে চান এর অধিবাসীদের জীবন, তেমনি পরিপূর্ণ সভ্যতার সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে চান তাদের জন্য। শিল্পকল্প ও বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগ ছাড়া এর কিছুই সম্ভব হবে নয়।[৭৩]

একটি অঞ্চলকে তার বর্তমান বর্বর অবস্থা থেকে প্রাচীন মহৎ অবস্থান পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, আধুনিক পশ্চিমের কায়দায় নিজের স্বার্থের জন্য প্রাচ্যকে নির্দেশ দেওয়া, প্রাচ্যের ওপর রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে অর্জিত গৌরবময় জ্ঞানের প্রকল্পের প্রবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য সামরিক শক্তিকে হীন করা বা অধীন করা, ইউরোপের উপাঙ্গ হিসেবে এর স্বাভাবিক ভূমিকা, সাম্রাজ্যেও কূটকৌশলে এর গুরুত্ব, স্মৃতিতে এর স্থানে পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করাসহ প্রাচ্যের আকার ও পরিচয় প্রদান ও সংজ্ঞা প্রদানের নিমিত্তে একে সুনির্দিষ্টরূপে বর্ণনা করা; আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অবদান শিরোনামে ঔপনিবেশিক দখলদারত্বের সময় সংগৃহীত সব জ্ঞান মর্যাদাবান করা, যখন স্থানীয় মানুষগুলোর সাথে কোনো পরামর্শ করা হয় না

কিংবা তাদেরকে লেখালেখির পটভূমি ছাড়া আর কিছু মনে করা হয় না, যদিও সে রচনা স্থানীয়দের প্রয়োজনে নয়; ইউরোপীয় হিসেবে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেকে প্রাচ্যের ইতিহাস সময় ও ভূগোলের নিয়ন্ত্রক মনে করা; বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, নতুন জ্ঞানক্ষেত্র সৃষ্টি; বিভাজন, নিয়োজন, ছকভুক্তকরণ, বর্ণনা, সূচি প্রস্তুতকরণ এবং দৃষ্টির সামনের ও আড়ালের সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করা; প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের সাধারণীকরণ এবং একেকটি সাধারণীকৃত বিষয় থেকে প্রাচ্যজনের স্বভাব, মেজাজ, মানসিকতা, প্রথাচার বা ধরন সম্পর্কে অপরিবর্তনীয় একেকটি আইন তৈরি করা; সবচেয়ে বড় কথা জীবন্ত বাস্তবকে নির্বাক কল্পনায় রূপান্তরকরণের গ্রন্থের বিষয়ে পরিণত করা; প্রাচ্যের কিছুই যেহেতু (ইউরোপীয়) কারও ক্ষমতায় বাধা সৃষ্টি করে না, তাই যথার্থ বাস্তবকে আয়ত্তে আনা (বা আয়ত্ত আছে বলে চিন্তা করা)।

প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রদর্শনের এসব দিক অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় ডিসক্রিপজঁ দ্য লা' ইজিপ্ট-এ, যা নিজেই সম্ভাবিত ও পুনর্বলীয়ান হয় নেপোলিয়ন কর্তৃক পশ্চিমা জ্ঞান ও ক্ষমতার সাহায্যে মিসরকে প্রাচ্যতাত্ত্বিকভাবে গ্রাস করার ঘটনার মধ্য দিয়ে। এভাবে ফুরিয়ার এ ঘোষণা দিয়ে তার ভূমিকা শেষ করেন যে ইতিহাস স্মরণ করবে কীভাবে মিসর নেপোলিয়নের গৌরবের মঞ্চ হয়ে উঠল; এই অসাধারণ ঘটনাকে সে বিস্মৃতির কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।[৭৬]

অতএব, নিজস্ব সংসক্তি, আত্মপরিচয়, স্বকীয়তাবোধযুক্ত মিসরীয় বা প্রাচ্যের ইতিহাসকে ডিসক্রিপজঁ স্থানচ্যুত করে। তার পরিবর্তে ডিসক্রিপজঁ-এ বর্ণিত ইতিহাস দখল করে মিসরীয় বা প্রাচ্য ইতিহাসের স্থান, যা আসলে ইউরোপীয় ইতিহাসের সুভাষণ-স্বরূপ, বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে অব্যবহিতভাবে ও সরাসরি সংযুক্ত। একটি ঘটনাকে বিস্মৃতির প্রক্রিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা আর প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্বকরণের জন্য প্রাচ্যকে নাট্যমঞ্চে রূপান্তরিত করা সমান কথা; ঠিক এটিই বলতে চান ফুরিয়ার। তা ছাড়া প্রাচ্য পড়ে ছিল উপেক্ষিত (তার বিরাট অতীতের অচিহ্নিত বোধের গুঞ্জন বাদ দিলে) নির্বাক অস্পষ্টতায়। তাকে আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের স্পষ্টতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে পশ্চিমের আধুনিক পরিভাষায় প্রাচ্যকে বর্ণনা করার শক্তির কারণে। ওখানে এই নতুন প্রাচ্য ডিসক্রিপজঁ-এ জিওফ্রে সেইন্ট-হিলেইরের জীববিজ্ঞানবিষয়ক অভিসন্দর্ভে বাফুনের প্রাণিবিদ্যার বিশেষায়নের আইন প্রমাণ করে।[৭৭] অথবা এটি 'ইউরোপীয় জাতির মানুষের অভ্যাসের আমূল বৈপরীত্য'[৭৮] প্রদর্শনের কাজ করে, যা প্রাচ্যজনের 'উদ্ভট আনন্দ' পশ্চিমের মানুষের যুক্তিবাদী ও সংযমী স্বভাবকে বড় করে দেখাতে কাজে লাগে। অথবা প্রাচ্যের আর একটি ব্যবহার : নেপোলিয়নের বিরাট প্রাচ্য অভিযানের প্রমাণ-সাইজ রেলিকস হিসেবে সংরক্ষণের জন্য রণক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত বীরদের দেহ মমিকরণের খোঁজে ওই সব প্রাচ্য

মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিকল্প সন্ধান যারা মানুষের দেহ মমিকরণ সম্ভব করে তুলেছিল।[৭৯]

তবু নেপোলিয়নের দখলদারত্বের সামরিক ব্যর্থতা মিসর বা বাকি প্রাচ্যের জন্য প্রদর্শিত সামগ্রিক সম্ভাবনা ধ্বংস করেনি। দখলকারি আক্ষরিক অর্থেই প্রাচ্য বিষয়ে সমগ্র আধুনিক জ্ঞানগুচ্ছের জন্ম দেয়, সে জ্ঞান আসে মিসরে নেপোলিয়নের প্রতিষ্ঠিত ডিসকোর্স-বিশ্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণরূপে; ওই বিশ্বেরই এজেন্সি, আধিপত্য ও প্রচারণার জন্য পরিচালিত ইনস্টিটিউট ও ডিসক্রিপজঁ। চার্লস রক্সের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মূল ধারণা ছিল এই যে 'নেপোলিয়নের অভিযানের ফলে) মিসর 'বিচক্ষণ ও আলোকোদ্ভাসিত শাসনে উন্নয়নের মাধ্যমে পুনরায় সমৃদ্ধি লাভ করবে...তার সকল প্রাচ্য প্রতিবেশীর দিকে ছড়িয়ে দেবে সুসভ্যতার আলোক-বিচ্ছুরণ।'[৮০] সত্যি যে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি এ মিশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা করবে, ইংল্যান্ডের চেয়ে বেশি কেউ নয়। কিন্তু আন্ত-ইউরোপীয় ঝগড়া-বিবাদ, অভব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বা সরাসরি যুদ্ধ সত্ত্বেও প্রাচ্যে সাধারণ পশ্চিমা তৎপরতার নিরবচ্ছিন্ন একটি অধ্যায় হিসেবে যা ঘটবে, তা হলো বিজয়ী ইউরোপীয় প্রাণশক্তির সঙ্গে পুরাতন প্রাচ্যের অতিরিক্ত অংশগুলোর সমন্বয়ে একটি নতুন প্রকল্প, নতুন দৃষ্টি, নতুন উদ্যোগের জন্ম। তাই নেপোলিয়নের পর প্রাচ্যতত্ত্বের ভাষাতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এর বর্ণনামূলক বাস্তবতার উন্নীত হয়ে কেবল সাদামাটা প্রতিনিধিত্বেই পরিণত হয়নি, হয়ে ওঠে সৃষ্টির ভাষা, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির উপায়। এন্টয়েন ফেবার ডি অলিভেট আধুনিক ইউরোপীয় কথ্যভাষার বিস্মৃত সুপ্ত উৎসসমূহের যে নাম দিয়েছেন, প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রয়াসে সেই মাতৃভাষার সাথে সাথে প্রাচ্যও পুনর্গঠিত, পুনসংযোজিত, নির্মিত হয়–সংরক্ষপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। প্রাচ্যকে ইউরোপের আরও নিকটবর্তী করা, অতঃপর সম্পূর্ণ চুষে নেওয়া এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাচ্যের অচেনা অবস্থা–ইসলামের ক্ষেত্রে তার শত্রুতা–বাতিল করার, অন্তত দমন ও হ্রাস করার জন্য পরবর্তী সকল প্রয়াসের কেন্দ্রীয় আদর্শ হয়ে ওঠে ডিসক্রিপজঁ। তখন থেকে ইসলামি প্রাচ্য কথাটি প্রাচ্যতাত্ত্বিকের ক্ষমতা নির্দেশক একটি বর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, মানুষ হিসেবে ইসলামি জনগোষ্ঠী বা ইতিহাসরূপী ইতিহাসকে বোঝায় না।

এভাবে নেপোলিয়নের অভিযান থেকে গোটা একদল কেতাবি সন্তানসন্ততি জন্ম নেয় : শ্যাতোব্রাঁর আইটিনেরেইর থেকে ল্যামারটিনের ভয়েজ অঁ অরিঅঁ, ফ্লবেয়ারের স্যালাম্বো ও একই ধারায় লেইনের ম্যানার্স অ্যান্ড কাস্টমস গা মডার্ন ইজিপশিয়ান, রিচার্ড বার্টনের পার্সোনাল ন্যারিটিভ অব এ পিলগ্রিমেজ টাগ আল-মদিনা অ্যান্ড মক্কা। কেবল প্রাচ্যের কিংবদন্তি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক একই পটভূমির কারণেই এগুলো একসঙ্গে হয়নি, যে প্রাচ্যের জরায়ু থেকে এদের জন্ম, তার ওপর তাদের

সাধারণ পণ্ডিতি নির্ভরশীলতাও আরেকটি কারণ। যদি দ্বন্দ্বাত্মকভাবে এসব সৃষ্টি উঁচুমাত্রার রীতিদুরস্ত কল্পচিত্র–জীবন্ত প্রাচ্য যেমন হতে পারে বলে চিন্তা করা যেতে পারে, সেই চিন্তার কাঁচা অনুকরণরূপের দেখা দেয় তাহলেও তা কাল্পনিক ধারণার শক্তি বা প্রাচ্যের ওপর ইউরোপের প্রভুত্বের শক্তি থেকে মনোযোগ সরাবে না, যার আদিরূপ হলো যথাক্রমে প্রাচ্যের মহান ইউরোপীয় অনুকার ক্যাগলিয়েস্ত্রো এবং প্রাচ্যের প্রথম আধুনিক বিজেতা নেপোলিয়ন।

শিল্পকর্ম বা বইপত্র নেপোলিয়নের অভিযানের একমাত্র ফল নয়। এ ছাড়া নিঃসন্দেহে আরও প্রভাবসম্পাতী বৈজ্ঞানিক প্রকল্পগুলো রয়ে গেছে, যার প্রধানতম দৃষ্টান্ত আর্নেস্ত রেনানের সেটিটিক ভাষাবিষয়ক কাজ (System Compare et histoire general des langues semitiques) যা স্পষ্টত প্রিন্স ভোলনির জন্য ১৮৪৮ সালে সমাপ্ত হয়। আছে ভূরাজনৈতিক প্রকল্প যার মুখ্য উদাহরণ ফার্ডিন্যান্ড ডি লেসেপ্সের সুয়েজ খাল ও ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড কর্তৃক মিসর দখল। এ দুইয়ের পার্থক্য কেবল প্রকাশ্য মাত্রায় নয়, প্রাচ্যবাদী বিশ্বাসের মানেও। রেননান মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, তিনি প্রাচ্য পুনরায় সৃষ্টি করেছেন, তার কাজে আসলেই তা সত্য। অন্য দিকে, ডি লেসেপ্স তার প্রকল্পের মাধ্যমে পুরোনো প্রাচ্য থেকেই বের করে আনা নতুনত্বে বিমুগ্ধ ছিলেন এবং এ রকম বোধ নিজেই ছড়িয়ে পড়ে তাদের সবার মধ্যে, যাদের নিকট ১৮৬৯ সালে সুয়েজের উন্মোচন কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। ১ জুলাই, ১৮৬৯ তারিখে এক্সকারশনিস্ট অ্যান্ড ট্যুরিস্ট অ্যাডভারটাইজার-এ ডি লেসেপ্স বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন থমাস কুক :

> বর্তমান শতকের সবচেয়ে বড় প্রকৌশলগত অর্জন নভেম্বরের ১৭ তারিখে একট জেল্লাময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার সফলতা অর্জনের অপেক্ষায়, যাতে ইউরোপের প্রতিটি রাজকীয় পরিবারই প্রতিনিধিত্ব করবে। অনুষ্ঠানটি হবে সত্যিকার অর্থেই অনন্য। ইউরোপ ও প্রাচ্যের মধ্যে একটি জলপথ প্রতিষ্ঠার বহু শতাব্দীর চিন্তা, পর্যায়ক্রমে গ্রিক, রোমান, স্যাক্সন ও গাউলদের মন দখল করে। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর পূর্বে আধুনিক সভ্যতা প্রাচীন ফারাওদের শ্রম অনুকরণের উদ্যোগ নেয়; ফারাওরা বহু শতাব্দী পূর্বে দুই সাগরের মধ্যে একটি খাল খনন করেছিল, যার চিহ্ন এখনো আছে।...

(আধুনিক) কাজটির সঙ্গে জড়িত সবকিছুই বিরাট মাপের। শেভলিয়ার ডি সেইন্ট স্টোয়েসের কলম থেকে আসা ছোট একটি পামপলেটে খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্পটির বর্ণনা আমাদেরকে মূল পরিকল্পনাকারী এম ফার্ডিন্যান্ড ডি লেসেপসের প্রতিভায় মুগ্ধ হতে বাধ্য করে, যার সহিষ্ণুতা, প্রশান্ত সাহস ও দূরদৃষ্টির বদৌলতে শেষ পর্যন্ত বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পরিণত হয় বহুযুগের লালিত স্বপ্ন...পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোকে আরও নিকটে আনা এবং এভাবে বিভিন্ন যুগের সভ্যতাকে সমন্বিত করার প্রকল্প।[৮১]

পুরোনো ধারণার সঙ্গে নতুন পদ্ধতির সমন্বয়, উনিশ শতকের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কে জড়িত বিভিন্ন সংস্কৃতিকে এক করা। এরই মধ্যে বিভক্ত ও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব ও পশ্চিম জাতীয় ভৌগোলিক সত্তার ওপর আধুনিক কারিগরি জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইচ্ছার ক্ষমতার সত্যিকার আরোপণ : এসবই উপলব্ধি করেন কুক তার পত্রিকা, বক্তৃতা, প্রসপেক্টাস ও চিঠিপত্রে এবং ডি লেসেপস তার বিজ্ঞাপনে।

বংশগতভাবে, ফার্ডিন্যান্ডের সূচনাটাই ছিল শুভ। তার বাবা ম্যাথিউ ডি লেসেপস নেপোলিয়নের সাথে মিসরে আসেন (মারলো বলেন 'আন-অফিশিয়াল ফলাসি প্রতিনিধি হিসেবে'[৮২]) এবং ১৮০১ সালে ফরাসিরা মিসর ত্যাগ করার পর আরও চার বছর অবস্থান করেন। ফার্ডিন্যান্ড অনেক লেখাতেই একটি খাল খননের ব্যাপারে নেপোলিয়নের নিজের আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন; বিশেষজ্ঞরা তাকে ভুল তথ্য দেওয়ায় তিনি একে বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য মনে করেননি। রিশেলিউ ও সেইন্ট-সাইমনিয়ানসের মাধ্যমে ফরাসি কর্মসূচিসহ খাল খনন প্রকল্পের বিশৃঙ্খল ইতিহাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে ডি লেসেপস ১৮৫৪ সালে মিসরে ফিরে আসেন এবং প্রকল্পের সূচনা করেন, যা পরিশেষে ১৫ বছর পর সমাপ্ত হয়। প্রকৌশল বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা ছিল না তার, কেবল তার প্রায়–ঐশ্বরিক নির্মাণ দক্ষতা, পরিচালনা ও সৃজন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে তিনি প্রকল্প চালিয়ে যেতে পারেন। অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক মেধার বদৌলতে মিসরীয় ও ইউরোপীয় সমর্থন লাভ করায় হয়তো তিনি কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান আয়ত্ত করে থাকবেন। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, হয়তো তিনি শিখে নিয়েছিলেন কীভাবে তার সম্ভাব্য সাহায্যকারীদের বিশ্ব ইতিহাস থিয়েটারে স্থাপন করা যায় এবং কীভাবে তাদের দেখানো যায় যে তার প্রকল্প তার ভাষায় 'পেনসি মোরেইল আসলে কী। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার বর্ণনা দেন[৮৩]। এ ধারণা অনুযায়ী ডি লেসেপসের গঠিত বিনিয়োগ কোম্পানির নামটিও তেজি এক নাম, যা তার তেজদীপ্ত পরিকল্পনা প্রতিফলিত করে : আন্তর্জাতিক কোম্পানি। ১৮৬২ সালে একাডেমি ফ্রাঁসেজ খালের ওপর একটি কাব্য প্রতিযোগিতার ঘোষণা দিয়ে লেখা আহ্বান করে। বিজয়ী বর্নিয়ার অতিশয় অলংকারময় একটি রচনা উপহার দেন; ডি লেসেপস তার কাজ সম্পর্কে যে চিত্র তুলে ধরেন, তার সঙ্গে এ কবিতার কোনো বিরোধ নেই।

Au travail! Ouvriers que notre France envoice,
Tracez, pour l'univers, cette nouvelle voie!
Vos peres, les heros, sont venus jusqu:ci;
Soyez ferme comme aux intrepides,
Comme eux vous combattez aux pieds des pyramides,
Et leurs quatre mille ans vous contemplent aussi!
Oui, c'est pour l'nivers Pour l' Asie et l'Europe,

Pour ces climates lointain que I niit enveloppe,
Pour Ie Chinois perfide et I'Indien demi-nu;
Pour les peuples heureux, libres, humains et braves,
Pour les peuples mechants, pour less peuples esclaves,
Pour ceux a qui le Christ est encore inconnu.[84]

খাল খননের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও লোকবল প্রয়োজন, সে বিপুল খরচের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য যখন ডি লেসেপ্সকে তলব করা হলো, তখন তিনি যতটা বাগ্মী ও তথ্যপূর্ণরূপে ব্যক্ত করেন, আর কখনো কোথাও তা করতে পারেননি। তিনি এমন পরিসংখ্যান প্রদান করেন, যা যেকোনো কানকে মুগ্ধ করত; তিনি একই গতিতে হেরোডোটাস ও জলপথবিষয়ক তথ্য উল্লেখ করেন। ১৮৬৪ সালে তিনি সাময়িকীর লেখায় পূর্ব–অনুমোদনসহ কাসিমির লিকাঁত-এর পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত করেন যে উৎকেন্দ্রিক জীবন মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মৌলিকত্বের উন্নয়ন ঘটায়, আর মৌলিকতা থেকে আসে মহৎ ও অসাধারণ অর্জন।[৮৫] এ ধরনের অর্জন তাদের বৈধতা পায়। এর অবিস্মরণীয় ব্যর্থতার কুলজি, বিপুল খরচ, ইউরোপের প্রাচ্য ব্যবস্থাপনার ধরনের বিহ্বলকর পরিবর্তন আনার জন্য এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও খালটি খননের প্রচেষ্টা বিনিয়োগের যোগ্য। এটি এমন একটি প্রকল্প, যা পরামর্শকদের আপত্তি মাড়িয়ে যেতে সক্ষম এবং প্রাচ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে তা করতে পারে যা কুচক্রী মিসরীয়, বিশ্বাসঘাতক চীনা ও আধা-ন্যাংটা ভারতীয়রা নিজেদের জন্য কখনো করেনি।

নভেম্বর ১৮৬৯ সালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ডি লেসেপসের কল্পনার নিখুঁত বাস্তব রূপ দান করে, তার সারা জীবনের দুরভিসন্ধির ইতিহাসের চেয়ে কম করে তো নয়ই। বেশ কয়েক বছর ধরে তার বক্তৃতা, চিঠিপত্র ভারী হয়ে থাকে দুরন্ত প্রাণশক্তিময় ও নাটকীয় শব্দসম্ভারে। সফলতার পেছনে ছুটতে গিয়ে তাকে বলতে দেখা যায় (সব সময় উত্তম পুরুষ বহুবচনে) আমরা সৃষ্টি করেছি, যুদ্ধ করেছি, প্রবর্তিত করেছি–অর্জন, চিহ্নিতকরণ, ধৈর্য ধারণ করেছি ও এগিয়ে নিয়েছি। বিভিন্ন উপলক্ষে বহুবার পুনরাবৃত্ত করেছেন তিনি : কিছুই আমাদের থামাতে পারবে না, কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, কোনো কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেবল 'চূড়ান্ত ফলাফল ছাড়া' যা তিনি কল্পনা করেছেন, সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং পরিশেষে বাস্তবায়িত করেছেন। নভেম্বরের ১৬ তারিখে অনুষ্ঠানে আগত পোপের প্রতিনিধি সম্মিলিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উদ্দেশে কথা বলেন, ডি লেসেপসের খালটি যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কাল্পনিক দৃশ্য সৃষ্টি কওে, তার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখতে গিয়ে বেপরোয়া প্রতিযোগিতায় নামে প্রতিনিধির বক্তৃতা।

Il est permis d'affirmer que l'heure qui vient de sonner
est non seulement unc des plus solennelles de ce siccle,
mais encore une des plus grandes et des plus decisives

qu;ait vues l'humanite, depuis qu'elle a une histoire ci-bas. Ce lieu. uu confinent_sans desormais Y toucher-l' Afrique et l'Asie, Cette grande fete du genre humain, cette assistance auguste et cosmopolite, toutes les races du globe, tous les drapeaux, tou less pavillions, flottant joyeusement sous ce ciel radieux et immense, la crpix debout et respectee de tous en face du croissant, que de merveilles, que de contrastes saississants, que de reves reputes chimeriques devenus de palphables realites! et, dans cet assemblage de tant de prodiges, que de sujets de reflexions pour le penseur, que de joies dans l'heure presente et, dans les perspectives de l'avenir, que de glorieuses esperances!...

Les deux extremites du globe se rapporchent; en se rapporchant, elles se reconnaissent; en se reconnaissant, tous les hommes. enfants d'un seul et meme Dieu, eprouvent le tressaillement joyeux de jeur mutuelle fratemite! O Occident! O Orient! rapprochez, re-gardez, reconnaissez, saluez, etreignez-vous!...

Mais derriere le phenomene materiel, le regard du penseur decouvre des horizons plus vastes que les espaces mesurables, les horizons sans bornes ou mouvent les plus hautes destinees, les plus glorieuses conquetes, les plus immortelles certitudes du genre humain...

[Dueu] que votre souffle divin plane sur ces eaux! Qu'il y passe et repasse, de l'Occident a l'Orient, de l'orient a i'occident! o dieu! Servez vous de cette voie pour rapprocher les hommes les uns des autres![88]

গোটা পৃথিবী মনে হয় ভেঙে এসে জড় হয়েছিল এমন একটি প্রকল্পের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য কেবল খোদা নিজেই যাকে আশীর্বাদ করতে পারেন এবং নিজের কাজে লাগাতে পারেন। পুরোনো পার্থক্য, বাধানিষেধ মুছে যায়; ক্রস এসে উল্টে দেয় চাঁদকে। কখনো ছেড়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিম প্রাচ্যে আসেনি (জুলাই ১৯৫৬) পর্যন্ত, যখন জামাল আবদেল নাসের ডি লেসেপসের নামে মিসর কর্তৃক সুয়েজ খাল দখলের সূচনা করেন)।

সুয়েজ খালের ধারণার মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রাচ্যবাদী চিন্তা, আরও আকর্ষণীয় হলো–প্রাচ্যবাদী প্রয়াসের যৌক্তিক সমাপ্তি। পশ্চিমের নিকট এশিয়া একদা নীরব

দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার প্রতিনিধিত্ব করেছে; ইসলাম ছিল ইউরোপীয় খ্রিষ্টানত্বের মারমুখী শত্রু। এ ধরনের ভয়ংকর ধ্রুব কাটিয়ে উঠতে হলে প্রথমে দরকার প্রাচ্যকে জানা, অতঃপর আক্রমণ ও দখল।

এরপর প্রাচ্যের পুনঃসৃজন–পণ্ডিত, সৈনিক আর বিচারকদের দিয়ে। এরা খুঁড়ে তুলবে বিস্তৃত ভাষা, ইতিহাস, জাতি ও সংস্কৃতিতে–আধুনিক প্রাচ্যজনের উপলব্ধির বাইরে, প্রকৃত পুরানো প্রাচ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা আধুনিক প্রাচ্যকে বিচার-বিশ্লেষণ ও শাসন করার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। ধূসর অস্পষ্টতার পরিবর্তে প্রয়োজন সাজানো গ্রিনহাউসের মতো সত্তা। প্রাচ্য পণ্ডিতদের পরিভাষা, এটি নির্দেশ করে আধুনিক ইউরোপ উদ্ভট পূর্ব দিয়ে সম্প্রতি কী সৃষ্টি করতে পেরেছে। ডি লেসেপস ও তার খাল শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যের দূরত্ব ধ্বংস করে দেয়, দূর করে দেয় পশ্চিম থেকে এর বিচ্ছিন্ন ঘনিষ্ঠতা, এর চিরস্থায়ী বহিরাগত রূপ। ল্যান্ড ব্যারিয়ার তরলময় ধর্মীতে রূপান্তরিত করতে পারলে যেমন ঘটত, ঠিক তেমনি প্রাচ্যের দুর্দম শত্রুতাকে বিনীত ও সমর্পিত অংশীদারত্বে সংকুচিত করা হয়।

সত্যি বললে, ডি লেসেপসের পর কেউ বলতে পারবে না যে প্রাচ্য অন্য জগতের অংশ। এখানে কেবল 'আমাদের' পৃথিবী আছে, একত্রে জড়ানো 'একটি' পৃথিবী। কারণ সুয়েজ খাল ওই সংকীর্ণমনাদের হতাশ করেছে, যারা এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের পার্থক্যে বিশ্বাস করে। এ ভিত্তিতে, প্রাচ্যসম্পর্কিত বিষয়াদি বা প্রাচ্যজন জনমিতিক, আর্থ ও সামাজিক উপাদানগুলোর প্রভাবাধীন একটি প্রশাসনিক বা নির্বাহী ধারণা। সাম্রাজ্যবাদী বেলফোরের নিকট কিংবা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জে এ হবসনের নিকট প্রাচ্যজন, যেমন আফ্রিকান, উপনিবেশিত জাতির একজন সদস্য এবং বিশেষভাবে কোনো ভৌগোলিক এলাকার অধিবাসী নয়। ডি লেসেপস প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যে টেনে নিয়ে গিয়ে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ইসলামের হুমকি দূর করে প্রাচ্যের ভৌগোলিক পরিচয় (আক্ষরিক অর্থেই) গলিয়ে নিঃশেষ করে দেন। সাম্রাজ্যবাদী অভিজ্ঞতাসহ নতুন শ্রেণি ও অভিজ্ঞতা তখনো উদ্ভূত হওয়ার পথে এবং সময়ে প্রাচ্যবাদও সেগুলোকে গ্রহণ করবে, তবে খুব সহজে নয়।

• ঘ •

সংকট

এমন বললে হয়তো অদ্ভুত শোনাবে যে, কোনো বিষয় বা ব্যক্তি কেতাবি মনোভাব (Textual Attitude) পোষণ করে। তবে সাহিত্যের একজন ছাত্র সহজে বাক্যাংশটির অর্থ বুঝতে পারবেন, যদি মনে করে দেখেন ক্যাঁদিদ-এ ভলতেয়ার কী ধরনের মতামতকে আক্রমণ করেন কিংবা বাস্তবতার প্রতি কোনো ধরনের মনোভাবকে সার্ভেন্টিস ব্যঙ্গ করেন ডন কুইকজট উপন্যাসে। এসব লেখকের ব্যতিক্রমহীন সুবুদ্ধি হলো এরা মনে করেন মানুষ যে পূর্বসংকেতহীন, গাদাগাদি করা, সমস্যাময় বিশৃঙ্খল ঘটনাবলির মধ্যে বাস করে তা গ্রন্থের (বা কিতাবের) বক্তব্যের আলোকে বোঝা যাবে। কেউ আক্ষরিক অর্থে বই থেকে শেখা জিনিস বাস্তবে প্রয়োগ করতে যাওয়ার অর্থ হলো বোকামি বা ক্ষতির ঝুঁকি নেওয়া। কেউ হাউস অব কমন্সকে বোঝার জন্য যেমন বাইবেলের সহায়তা নেবে না, তেমনি ষোলো শতকের (বা সাম্প্রতিক) স্পেনকে বোঝার জন্য আমাদিস অব গাউলের (Amadis of Gaul) আশ্রয় নেবে না। কিন্তু মানুষ খুব সরলভাবে গ্রন্থকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে এবং করে, কারণ অন্যদিকে ক্যাঁদিদ ও ডন কুইকজট পাঠকদের নিকট এখনো কোনো আবেদন রাখতে পারত না। সরাসরি মানবিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার বিহ্বলকর অবস্থার চেয়ে গ্রন্থের নকশাবিন্যস্ত কর্তৃত্ব পছন্দ করার বিষয়টি সর্বজনীন মানবিক ব্যর্থতা বলেই মনে হয়। কিন্তু এ ব্যর্থতা কি অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে, নাকি কিছু বিশেষ পরিস্থিতি–অন্যসবের তুলনায় কেতাবি মনোভাব সম্ভাবিত করে তোলে?

দুটি পরিস্থিতি কেতাবি মনোভাবের অনুকূল। একটি হলো, যখন কেউ সরাসরি এমন কিছুর মুখোমুখি হয়, যা অপেক্ষাকৃত অজানা, হুমকিস্বরূপ এবং আগে দূরের ব্যাপার ছিল। এ অবস্থায় সে কেবল তার অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি এই অজানার সঙ্গে সদৃশের আশ্রয়ই নেবে না, এ সম্পর্কে যা পাঠ করেছে, তার দিকেও ধাবিত হবে। ভ্রমণসংক্রান্ত লেখা বা পর্যটন গাইড জাতীয় গ্রন্থ এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক রচনা। এগুলো রচনাভঙ্গি ও ব্যবহারেও ততটা যুক্তিআশ্রিত, একটি গ্রন্থ যতটা হতে পারে; কারণ

মানুষের প্রবণতাই এমন যেকোনো অচেনা অঞ্চলে ভ্রমণে অনিশ্চয়তা যদি তার ভারসাম্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ হয়, তাহলে সে মুখ ফিরিয়ে আশ্রয় নেয় এ-সম্পর্কিত বইপত্রের। বহু পর্যটককে নতুন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে শোনা যায় যে তিনি যেমন ভেবেছিলেন তা তেমন নয়, এর অর্থ বই যা বলেছে, এ দেশটি সে রকম নয়। পর্যটনের বই বা গাইড বইয়ের লেখকেরা এমনভাবে সেগুলো সাজিয়ে নেয়, যাতে বলা যায় একটি দেশ এমন বা আরও ভালো কিংবা এ দেশটি বর্ণময়, আকর্ষণীয়, ব্যয়বহুল ইত্যাদি। উভয় ক্ষেত্রে মূল ধারণাটি এই যে গ্রন্থ সব সময় জনগোষ্ঠী, স্থান ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারে, এত বেশি পারে যে, এমনকি গ্রন্থ-বর্ণিত বাস্তবতার চেয়েও গ্রন্থটি (বা রচনা) বেশি প্রভাবন-ক্ষমতা অর্জন করে, বেশি ব্যবহৃত হয়। ফেব্রিস ডেল দেঙ্গোর কমেডি যে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ চিত্র খোঁজে, তা এ জন্য নয় যে তিনি তা খুঁজে পান না, বরং এ জন্য যে বই তাকে এ সম্পর্কে যা অবহিত করেছে, তা খুঁজে পান না।

কেতাবি মনোভাবের অনুকূল দ্বিতীয় পরিস্থিতিটি হলো সাফল্যের আভাস। যদি কেউ বই পড়ে জানে যে সিংহ হিংস্র এবং অতঃপর একটি হিংস্র সিংহের সামনে পড়ে (অবশ্যই সরল উদাহরণ দিচ্ছি) তাহলে সম্ভাবনা আছে যে সে একই লেখকের আরও বই পড়ায় উৎসাহ পাবে এবং সেগুলো বিশ্বাস করবে। কিন্তু যদি সিংহবিষয়ক বইটিতে হিংস্র সিংহের মোকাবিলা করার উপায় সম্পর্কে নির্দেশনা থাকে এবং যদি নির্দেশনা ঠিকমতো কাজ করে, তাহলে গ্রন্থকার কেবল সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততাই অর্জন করবেন না, অন্যান্য বিষয়ে একই ধরনের গ্রন্থ রচনার প্রয়াসেও তাড়িত হবেন। আরও জটিল ব্যাখ্যা আছে জোরদারকরণের, যার প্রভাবে পাঠকের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রভাবিত হয় তার গ্রন্থ পাঠের দ্বারা। আবার লেখকও পাঠকের ওই পরিবর্তিত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আগাম সংজ্ঞায়িত বিষয় নিয়ে লিখতে প্রলুব্ধ হন। অতঃপর হিংস্র সিংহ মোকাবিলার উপায়-সম্পর্কিত একটি বই তখন সিংহের হিংস্রতা, হিংস্রতার উৎস, ইত্যাদি বিষয়ে আরও বেশ কিছু গ্রন্থ জন্ম দিতে পারে। একইভাবে রচনা যখন ঘনীভূত হয়ে মূল বিষয়ে আলোকপাত করে, যা এখন আর সিংহ নয়, হিংস্রতা–আমরা আশা করতে পারি যে উপায়ে সিংহের হিংস্রতা মোকাবিলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবে এর হিংস্রতা বাড়াবে, হিংস্র হতে বাধ্য করবে সিংহটিকে; কারণ এ আসলে তা-ই এবং এ হলো তা-ই আমরা মূলত ওর সম্পর্কে যা জানি বা কেবল যা জানতে পারি।

কোনো রচনা যদি কোনো বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান ধারণ করে বলে মনে হয় এবং সে বাস্তবতা যদি ওপরে বর্ণিত ধরনের কোনো পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে, তবে সে রচনা বাতিল করে দেওয়া দুরূহ। এতে সঞ্চারিত হয়েছে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান। বাস্তবে এ রচনার যতটা সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার অনেক বেশি মর্যাদা এর ওপর

আরোপ করে একে আরও গুণান্বিত করতে পারে একাডেমি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারের কর্তৃত্ব। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এ ধরনের রচনা শুধু জ্ঞানই সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়, নিজের বর্ণিত বাস্তবতাও সৃষ্টি করতে পারে। এ সময়ে এ ধরনের জ্ঞান ও বাস্তবতা সৃষ্টি করে ঐতিহ্য, মিশেল ফুকো যাকে বলেছেন ডিসকোর্স; লেখকের আসলত্ব নয়, এর বস্তুগত উপস্থিতি ও ভারই এ থেকে উৎপন্ন অন্যান্য রচনার পেছনের কারণ। আইডি সিরিজ-এর ক্যাটালগে ফ্লবেয়ার প্রাক-অস্তিত্ববান যেসব তথ্য-গুচ্ছ জড়ো করে রেখেছেন, তা থেকে ওই ধরনের গ্রন্থই রচিত হয়ে।

এসব কিছুর আলোকে নেপোলিয়ন ও ডি লেসেপসকে বিবেচনা করা যাক। এরা প্রাচ্য সম্পর্কে যা কিছু জানতেন, তার সবটাই এসেছে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে লেখা ও আইডি রিসিজ-এ উল্লেখিত বইপত্র থেকে; তাদের জন্য প্রাচ্য হিংস্র সিংহের মতো এমন কিছু, যার মুখোমুখি হতে হবে এবং যাকে এটা নির্দিষ্ট মাত্রায় মোকাবিলা করতে হবে; কারণ সে প্রাচ্যকে সম্ভব করে তুলেছে ওই রচনাগুচ্ছ। এই প্রাচ্য ছিল নির্বাক, বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইউরোপের কাছে সহজলভ্য। আবার এসব প্রকল্প স্থানীয়দের ব্যাপারে সরাসরি কোনো দায়-দায়িত্ব বহন করে না; সে প্রাচ্য তার জন্য পরিকল্পিত প্রকল্প, চিত্রকল্প বা বর্ণনারাশি প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমি বলেছি, পশ্চিমের লেখালেখি (ও তার পরিণতি) এবং প্রাচ্যের নিশ্চুপতার এ সম্পর্ক হলো পশ্চিমের বিশাল সাংস্কৃতিক শক্তির ফলাফল ও প্রমাণ, প্রাচ্যের ওপর তার ক্ষমতা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার পরিণতি। এ সামর্থ্যের আরেকটি দিক রয়েছে, যার অস্তিত্ব নির্ভর করে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের চাপ এবং প্রাচ্যের প্রতি তার কেতাবি দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। এ দিকটি নিজের মতো অস্তিত্ব বজায় রাখে, যেমন হিংস্র সিংহ সম্পর্কিত বই-পুস্তকও তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে–যে পর্যন্ত না সিংহ ফিরে তাকিয়ে কথা বলতে পারে। যারা প্রাচ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প তা দিয়ে ফুটিয়েছেন, তাদের মধ্যে দুজন প্রদর্শক হলেন নেপোলিয়ন ও ডি লেসেপস। এদের অভিজ্ঞতার বাইরে সৃষ্ট পরিপ্রেক্ষিত এদেরকে প্রাচ্যের মাত্রাহীন নীরবতার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে। তার প্রধান কারণ এই যে প্রতিরোধে অক্ষম প্রাচ্যকে ঘিরে থাকা প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্স তাদের তৎপরতায় লেপে দেয় অর্থবোধ, বুদ্ধিগ্রাহ্যতা ও বাস্তবতা। নেপোলিয়নের ক্ষেত্রে প্রাচ্যতাত্ত্বিক এই ডিসকোর্সকে সম্ভাবিত করেছে প্রাচ্যের তুলনায় অনেক বেশি সামরিক শক্তিধর পশ্চিমের অস্তিত্ব। অতঃপর প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্স আর সামরিক শক্তিধর পশ্চিম মিলে তাদের আয়ত্তে এনে দেয় এমন 'প্রাচ্যজন' যাকে ডিসক্রিপর্জঁ দ্য লা ইজিপ্ট-এ ইচ্ছামতো বর্ণনা করা যায়; তাদেরকে এনে দেয় কোনাকুনি কেটে যাওয়ার মতো এক প্রাচ্য, যা করে ডি লেসেপস-এর সুয়েজ খাল। এ ছাড়াও প্রাচ্যতত্ত্ব তাদেরকে দিয়েছে সাফল্য–অন্তত তাদের বিবেচনায়, এর সঙ্গে প্রাচ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এ সাফল্য সম্পর্কে

অন্যভাবে বলা যায়, ট্রায়াল বাই জুরি-এর 'আমি বলি আমাকে, বলি বলি'-এর বিচারকের পাশ্চাত্য জন এবং প্রাচ্যজনের মধ্যকার সকল প্রকৃত আদান-প্রদানের মধ্যেই সংগঠিত।

প্রাচ্যতত্ত্বকে প্রাচ্যের প্রতি এবং প্রাচ্যকে পরিচালনার উদ্দেশ্যে পশ্চিমের কল্পপ্রদর্শন বলে চিন্তা করতে শুরু করলে আমরা কিছু বিস্ময়ের মুখোমুখি হব। কারণ যদি এ মন্তব্য সত্যি হয় যে মিশেলেট, র‍্যাংক, টকোভিল, বুর্খহারডটের মতো ঐতিহাসিক তাদের বয়ান পরিকল্পনা করেছেন 'নির্দিষ্ট' একধরনের কাহিনিরূপে' ৮৭, তাহলে শত শত বছর ধরে যেসব প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রাচ্যবিষয়ক ইতিহাস, চরিত্র ও নিয়তি পরিকল্পনা করেছেন, তাদের বেলায়ও সে মন্তব্য সত্য। উনিশ ও বিশ শতকে প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা সংখ্যায় আরও উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেন। কারণ, এরই মধ্যে কাল্পনিক ও প্রকৃত ভূগোলের দূরত্ব সংকুচিত হয়েছে-বাজার, উৎস ও উপনিবেশের খোঁজে অপ্রতিরোধ্য ইউরোপীয় বিস্তারণের দ্বারা পুনর্নির্ধারিত হয়েছে প্রাচ্য-ইউরোপ সম্পর্ক এবং সবশেষে, প্রাচ্যতত্ত্ব নিজেই তার রূপান্তর সমাপ্ত করার মধ্য দিয়ে একটি পণ্ডিতি ডিসকোর্স থেকে পরিণত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানে। নেপোলিয়ন, ডি লেসেপস, বেলফোর ও ক্রোমার সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তাতে ওই রূপান্তরের চিহ্ন পরিষ্কার। কার্লাইলের মতে যে মানুষ 'হিরো'-দূরদৃষ্টি ও প্রতিভার অধিকারী, সেই মানুষের প্রয়াসরূপে প্রাচ্য প্রকল্পগুলোকে কেবল খুবই মৌলিক স্তরে বোঝা সম্ভব, যদি আমরা ডি হারবেলট ও দান্তের পরিকল্পনাগুলো স্মরণ করি এবং তাদের সঙ্গে একটি আধুনিকায়িত দক্ষ ইঞ্জিন (উনিশ শতকের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের মতো) ও একটি ইতিবাচক পাক যুক্ত করি তাহলে দেখব যে নেপোলিয়ন, ডি লেসেপস, ক্রোমার ও বেলফোর অনেক বেশি নিয়মমাফিক ও স্বাভাবিক। কারণ, যেহেতু কেউ তত্ত্ববিদ্যাগতভাবে প্রাচ্যকে মুছে ফেলতে পারে না (ডি হারবেলট ও দান্তে হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন), তাই একে দখল করা, পরিশোধন করা, বর্ণনা করা, উন্নয়ন করা ও বৈপ্লবিকভাবে এর পরিবর্তন করার ক্ষমতা তার আছে।

এখানে আমি যা বোঝাতে চাইছি, তা হলো প্রাচ্য সম্পর্কে কেবল কেতাবি আন্দাজ, সুশৃঙ্খল বর্ণনা ও সংজ্ঞায়নের স্তর থেকে খোদ প্রাচ্যে বাস্তবে এসব প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে। প্রয়োগের এই বিষয়টিকে আক্ষরিক অর্থে বলা যায় উদ্ভট রূপান্তর; এর সঙ্গে প্রাচ্যতত্ত্বের সম্পর্ক গভীর। প্রাচ্যতত্ত্বে খাঁটি পণ্ডিতি কাজ যত দূর জড়িত ছিল (আমি দেখেছি নিরপেক্ষ ও বিমূর্ত খাঁটি পণ্ডিতি রচনার ধারণাটি কৌতূহলশূন্য ও বোঝা কঠিন; তবু বুদ্ধিবৃত্তির ভাবে তা স্বীকার করে নেওয়া যায়), তত দিন প্রাচ্যতত্ত্ব বহু মহৎ কাজ করেছে। উনিশ শতকে এর স্বর্ণযুগে এটি সৃষ্টি করেছে পণ্ডিতদল; পশ্চিমে শিক্ষণীয় ভাষার সংখ্যা এবং সম্পাদিত, অনূদিত ও সমালোচিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে; বহু ক্ষেত্রে প্রাচ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ইউরোপীয় শিক্ষার্থী

সৃষ্টি করেছে, যারা সংস্কৃত ব্যাকরণ, ফিনিশীয় মুদ্রাবিদ্যা ও আরবি কাব্য সম্পর্কে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী ছিলেন। তবু এবং এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট বলতে চাই যে প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যকে মাড়িয়ে গেছে। এটি চিন্তাপদ্ধতি হিসেবে বিশেষ মানবিক অনুভব থেকে উদ্ভূত হয়ে শেষে পৌছেছে আন্তমানবিক সর্বজনীনতায়; দশ শতকের একজন আরবিভাষী কবি-সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে মিসর, ইরাক বা আরবের প্রাচ্যজনের মানসিকতাবিষয়ক নীতিতে প্রযুক্ত হয়েছে। একইভাবে কোরআনের একটি আয়াত বিবেচিত হয়েছে মুসলমানদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সর্বোত্তম সাক্ষ্যরূপে। আসলে প্রাচ্যতত্ত্ব অনুমানে ধারণ করেছে এক অপরিবর্তনীয় প্রাচ্যকে, যা পশ্চিম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন (যার কারণও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে) এবং প্রাচ্যতত্ত্ব তার উত্তর-আঠার শতকীয় রূপ থেকে কখনো পুনর্বিবেচিত হয়নি। এসব পরিস্থিতি মিলেই অনিবার্য করে তুলেছে পর্যবেক্ষক-প্রশাসক ক্রোমার ও বেলফোরের মতো ব্যক্তিত্ব। রাজনীতি ও প্রাচ্যতত্ত্বের ঘনিষ্ঠতা কিংবা আরও যথাযথভাবে বলা যায়, প্রাচ্যতত্ত্বের ধারণাগুলোকে রাজনীতিতে প্রয়োগের সম্ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অতীব স্পর্শকাতর সত্য। এটি কালো বা নারীবাদী অধ্যয়নের মতো বিষয়ে প্রযোজ্য দোষী/নির্দোষের ধারণা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই ঝোঁক সৃষ্টি, পণ্ডিতি নিরপেক্ষতা ও সুবিধাবাদী দলের চক্রান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। এটি সাংস্কৃতিক, বর্ণগত, ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ এবং এগুলোর ব্যবহার, মূল্য, উদ্দেশ্যমুখিনতার মাত্রা ও মৌলিক লক্ষ্য বিষয়ে অনিবার্য অস্থিরতা উসকে দেয় মানুষের চৈতন্যে। অন্য সব বাদ দিয়েও বলা যায় যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে পশ্চিমা প্রাচ্যতত্ত্ব সমৃদ্ধ হয়েছে তা গবেষণার বিষয়রূপী প্রাচ্যজন বা প্রাচ্যের অবমূল্যায়িত অবস্থানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আনওয়ার আবদেল মালেক প্রাচ্যায়িত প্রাচ্যের যে নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন, তা কি রাজনৈতিক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছুর সৃষ্টি হতে পারে?

> ক) সমস্যার অবস্থান এবং প্রবলেম্যাটিকের স্তরে...(প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক) প্রাচ্য ও প্রাচ্যজন অন্যতার (Otherness) চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে অধ্যয়নের বিষয়রূপে বিবেচিত হয়েছে এবং যা কিছু ভিন্ন, বিষয়ী বা বিষয় যা-ই হোক, তা-ই অপরিহার্যভাবে 'অন্যতার' প্রকৃতিসম্পন্ন...রীতি অনুযায়ী অধ্যয়নের এই (বিষয় বা) বস্তুটি হবে নিষ্ক্রিয়, অংশগ্রহণ থেকে বিরত, ঐতিহাসিক 'আনুগত্য' গুণে গুণান্বিত। সবচেয়ে বড় কথা, অক্রিয়, নিজের ব্যাপারে অসার্বভৌম : প্রাচ্য বা প্রাচ্যজন বা প্রজা, যা-ই বলা হোক না কেন– কেবল সে দার্শনিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন–চূড়ান্ত মাত্রায় বিচ্ছিন্ন। নিজের ব্যাপারে নিজে ছাড়া কেবল অন্য কারও দ্বারা স্থির, উপলব্ধ, সংজ্ঞায়িত ও কর্মমণ্ডিত হবে।
>
> খ) থেমেটিক লেবেলে গবেষণার বিষয়স্বরূপ প্রাচ্যের জনগোষ্ঠী, জাতি দেশ সম্পর্কে অনিবার্যতার ধারণা গ্রহণ করেন (প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ)। এ ধারণা প্রকাশিত

হয় বিশেষায়িত জাতিভিত্তিক বর্গায়নতন্ত্রে...এবং অচিরেই তার সঙ্গে মিলে অগ্রসর হয় বর্ণবাদের দিকে।

প্রথানুগ প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মতে, সব বিবেচ্য বস্তুর এক সাধারণ ও অবিভাজ্য ভিত্তিরূপ একটি সত্তা অস্তিত্ববান রয়েছে, যা কখনো কখনো স্পষ্ট অধিবিদ্যাগত পরিভাষায় বর্ণিত। এই সত্তা 'ঐতিহাসিক, কারণ তা ইতিহাসের সূচনাতেও ছিল; আবার তা ইতিহাস-বিলগ্নও, কারণ তা অধ্যয়নের জন্য স্থিরীকৃত সত্তাগুলোকে নিজস্ব অপরিবর্তনীয় ও বিচ্ছিন্নকরণের অযোগ্য নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থির ধরে রাখে–ঐতিহাসিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তির মিথস্ক্রিয়ার ফলস্বরূপও উদ্ভূত রাষ্ট্র, জাতি, জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি ইত্যাদি অন্যান্য সত্তার মতো ওগুলোকে বিবৃত করে না।

এভাবে আমরা উপনীত হব বর্গায়নতন্ত্রে, যার ভিত্তি হলো প্রকৃত নির্দিষ্টতা; তা অনুভবের অযোগ্য ও অনিবার্যরূপে ধারণকৃত এবং ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন; তা এরই মধ্যে ভিন্ন বস্তুতে পরিণত করেছে অধীত বস্তু বা বিষয়টিকে; ভিন্ন হয়ে ওঠা এই বস্তুর সঙ্গে অধ্যয়নকারীর সম্পর্ক হলো তুরীয় বা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের সম্পর্ক। ফলে আমরা পাব হোমো সিনিকাস, হোমো অ্যারাবিকাস, (হোমো অ্যাজিপটিকাস ইত্যাদিই বা নয় কেন), একজন হোমো আফ্রিকানাস। কারণ বোঝাই যাচ্ছে, মানুষ–সাধারণ মানুষ হলো কেবল প্রাচীন গ্রিক আমল থেকে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ ঐতিহাসিককালে অস্তিত্ববান ইউরোপীয় মানুষ। এখানে বোঝা যায়, আঠারো থেকে বিশ শতক পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাবাধিপত্যবাদ নৃতত্ত্বকেন্দ্রিকতা এবং ইউরোপকেন্দ্রিকতার মানববিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে গভীরভাবে জড়িত ছিল; বিশেষত অ-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস সংখ্যালঘুদের ওপর কার্যকর এই আধিপত্যের স্বরূপ উন্মোচিত করেন, ফ্রয়েড খুলে দেখান নৃতত্ত্বকেন্দ্রিকতার প্রকৃত চেহারার রূপ।[৮৮]

আবদেল মালেক প্রাচ্যতত্ত্বকে দেখেন একটি নির্দিষ্ট ইতিহাসসমৃদ্ধ বিষয় হিসেবে। শেষ বিশ শতকের 'প্রাচ্যজন'-এর মতে সেই ইতিহাস প্রাচ্যতত্ত্বকে ওপরে বর্ণিত অচলাবস্থার দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে। আমরা এখন সংক্ষেপে সে ইতিহাসের বহিঃকাঠামো চিহ্নিত করার চেষ্টা করব। এই ইতিহাস উনিশ শতকের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে ওজন ও দক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'সংখ্যালঘুদের নিয়ন্ত্রণ করার নিমিত্তে ভাবাধিপত্যবাদ' এবং নৃতত্ত্বকেন্দ্রিকতা ও ইউরোপকেন্দ্রিকতা আত্মস্থ করেছে। আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে পরবর্তী দেড় শতক পর্যন্ত প্রাচ্যতত্ত্বকে একটি অধ্যয়নক্ষেত্ররূপে নিয়ন্ত্রণ করেছে ব্রিটেন ও ফ্রান্স। তুলনামূলক ব্যাকরণে জোনস, ফ্রাঞ্জ বপ, জ্যাকব গ্রিম ও অন্যদের মহৎ ভাষাতাত্ত্বিক আবিষ্কার আসলে প্রাচ্য থেকে প্যারিস ও লন্ডনে নিয়ে আসা পাণ্ডুলিপিগুলোর কাছে ঋণী। প্রায় ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রত্যেক প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার জীবন শুরু করেন ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে। ভাষাতত্ত্বে

ঘটে যাওয়া বিপ্লব যা বপ, সেসি, বার্নফ ও তাদের ছাত্রদের সৃষ্টি, তা আসলে একটি তুলনামূলক বিজ্ঞান, যার ভিত্তি হলো এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত যে ভাষাসমূহ কয়েকটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত : ইন্দো-ইউরোপীয় ও সেমেটীয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। অতএব, শুরু থেকে প্রাচ্যতত্ত্ব দুটি বৈশিষ্ট্য বহন করে আনে (১) ইউরোপের নিকট প্রাচ্যের ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্বের ভিত্তিতে সদ্য অনুভূত একরকম বৈজ্ঞানিক আত্মসচেতনতা এবং (২) অপরিবর্তনীয়, একীভূত এবং মৌলিকভাবে উদ্ভট বস্তু প্রাচ্যের প্রতি মনোভাব সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখেই (পর্যবেক্ষণের) বিষয়বস্তুকে বিভাজন, উপবিভাজন ও পুনর্বিভাজনের স্বাভাবিক ঝোঁক।

ফ্রেডরিখ শ্লেগেল সংস্কৃত শিখেছিলেন প্যারিসে বসে। তিনি ওপরে বর্ণিত দুটি বৈশিষ্ট্য একত্রে বর্ণনা করেছেন। যদিও ১৮০৮ সালে তার গ্রন্থ (*Uber die Sprache and Weisheit der Indier*) বেরোবার পূর্বেই তিনি তার প্রাচ্যতত্ত্ব প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন, তবু তিনি এ মত বজায় রাখেন যে একদিকে সংস্কৃতি ও ফারসি, অন্যদিকে গ্রিক ও জার্মান ভাষা সেমেটিক, চীনা, আমেরিকান বা আফ্রিকান ভাষার চেয়ে পরস্পর অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ছাড়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবার শিল্পিত সহজ ও সন্তোষজনক, সেমেটিক ভাষা তেমন নয়। এ ধরনের বিমূর্ত বিষয় শ্লেগেলকে বিচলিত করেনি। হার্ডারের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তথাকথিত গণমুখী রাজনীতির ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসা পরিপ্রেক্ষিত থেকে রাজনৈতিক জাতি, নৃতাত্ত্বিক জাতি, মন, জনগোষ্ঠীর মতো যেসব বিষয়ে আবেগ নিয়ে কথা বলা যায়, সেগুলো সারা জীবন হেগেলকে মোহগ্রস্ত করে রাখে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে যখন তিনি ঘোষণা করেন 'আমাদেরকে উচ্চমাত্রার রোমান্টিকতা খুঁজতে হবে প্রাচ্যে', তখন তিনি নির্দেশ করেন *শকুন্তলা*, জেন্দ-আবেস্তা ও উপনিষদের প্রাচ্যকে; সেমেটিকদের ভাষা, পরস্পর আসজ্জিত, অশিল্পিত এবং যান্ত্রিক; তারা তাই ভিন্ন, নিম্নমানের, পশ্চাৎপদ। ভাষা জীবন, ইতিহাস ও সাহিত্য নিয়ে শ্লেগেলের বক্তৃতা এ-জাতীয় পক্ষপাতে পরিপূর্ণ; তিনি এসব বক্তৃতা করেন বিন্দু পরিমাণ তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই। তিনি বলেন, হিব্রু সৃষ্টি হয়েছে পয়গম্বরের বাণী আর স্বর্গীয় উচ্চারণের জন্য। মুসলমানরা জড়িয়েছে একটি মৃত ও শূন্য অস্তিত্ববাদে—বড়জোর এক নেতিবাচক একেশ্বরবাদী বিশ্বাসে।'[৮৯]

সেমেটীয় ও অন্যান্য 'নিম্ন শ্রেণির' প্রাচ্যজন সম্পর্কে শ্লেগেলের সমালোচনায় লেপ্টে থাকা বর্ণবাদের অনেকখানি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে। কিন্তু শেষ উনিশ শতকের ডারউইনীয় নৃতাত্ত্বিক ও করোটিবিদগণের উদ্যোগে তা বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে পরিণত হয়, যেমন ঘটে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বেও, অন্য কোথাও অতটা দেখা যায় না। এতে ভাষা ও জাতি যেন বিজড়িত করে বাঁধা এবং ভালো প্রাচ্য ছিল প্রাচীনকালে—বহু বহু পূর্বে গত ভারতে। কিন্তু 'খারাপ' প্রাচ্য

টিকে আছে বর্তমান সময় পর্যন্ত এশিয়া, উত্তর আফ্রিকার অংশবিশেষ এবং যেখানে ইসলাম আছে, তার সর্বত্র। আর্যরা ছিল ইউরোপ ও প্রাচীন যুগের প্রাচ্য সীমাবদ্ধ; যেমন লিওন পলিয়াকভ দেখিয়েছেন যে (যদিও একবারও উল্লেখ করেননি যে কেবল ইহুদিরাই নয়, মুসলমানরাও সেমেটীয়[৯০]), আর্য-মিথ 'নিম্ন-জাতের' মানুষদের মূল্যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে আধিপত্য করেছে।

প্রাচ্যতত্ত্বের চূড়ান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক কুলজি অবশ্যই উনিশ শতকের কয়েকটি বিখ্যাত নাম গোবিনো, রেনান, হামবল্ডট, স্টেইনাথাল, বার্নফ, রেমুসাট, পালমার, ওয়েইল, দোজি, মুইর প্রমুখকে অন্তর্ভুক্ত করে। এরা প্রায় সবাই উনিশ শতকের মানুষ। চারদিকে প্রভাব ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন পণ্ডিত সংঘও এতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত; যেমন ১৮২২ সালে প্রতিষ্ঠিত সোসিয়েত এশিয়াটিক, ১৮২৩ সালে গঠিত রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটি। কিন্তু কাল্পনিক ও ভ্রমণসাহিত্যের ভূমিকা খাটো করে দেখা অন্যায় হবে; এগুলো প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের আরোপিত বিভিন্ন ভৌগোলিক, সামাজিক ও জাতিগত বিভাজনকে আরও জোরদার করেছে। এ রকম উপেক্ষা ভুল হবে, কারণ ইসলামি প্রাচ্যের ক্ষেত্রে ওই জাতীয় সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্স গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান আছে তার। এর মধ্যে আছে গ্যোয়েটে, হুগো, ল্যামারটিন, শ্যাতব্রাঁ, কিঙ্গলেইক, নেরভাল, ফ্লবেয়ার, লেইন, বার্টন, স্কট, বায়রন, ভিনি, ডিজরাইলি, জর্জ, এলিয়ট, গোতিয়েরের কাজ। শেষ উনিশ শতক ও বিশ শতকের শুরু থেকে ডাফটি, ব্যারেস, লটি, টি.ই. লরেন্স ও ফরস্টারের নামযুক্ত করতে পারি আমরা। এ প্রয়াসে (ইউরোপীয় খননকারীদের দ্বারা) কেবল মেসোপটেমিয়া, মিসর, সিরিয়া ও তুরস্কে মৃত প্রাচ্যসভ্যতা খুঁড়ে তোলার মধ্য দিয়েই সহায়তা করা হয়নি, উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা হয়েছে প্রাচ্যের সর্বত্র পরিচালিত ভৌগোলিক জরিপের মাধ্যমেও।

উনিশ শতকের শেষে ইউরোপ কর্তৃক সব নিকট প্রাচ্য (অটোমান সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ বাদে তা গ্রাস করা হয় ১৯১৮ সালের পর) দখল করার মধ্য দিয়ে ওই অর্জনে জোগান দেওয়া হয় বস্তুভিত্তিক উৎসাহ। এ পর্যায়ে প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি হলো আবার ব্রিটেন ও ফ্রান্স। যদিও সামান্য ভূমিকা পালন করে রাশিয়া ও জার্মানি।[৯১]

ঔপনিবেশায়নের প্রথম অর্থ হলো স্বার্থ চিহ্নিতকরণ–প্রকৃত অর্থে স্বার্থ সৃষ্টি; তা হতে পারে বাণিজ্যিক, যোগাযোগ-সম্পর্কিত, ধর্মীয়, সামরিক বা সাংস্কৃতিক। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম ও ইসলামি অঞ্চলগুলোর ব্যাপারে ব্রিটেন অনুভব করে খ্রিষ্টীয় শক্তি হিসেবে তার ন্যায়সংগত স্বার্থ হলো নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এ স্বার্থ দেখার জন্য জটিল কৌশল ও সংগঠন সমবায় উদ্ভূত হয়। প্রথম দিকের সোসাইটি

ফর প্রমোটিং ক্রিশ্চিয়ান নলেজ (১৬৯৮), সোসাইটি ফর দি প্রপোগেশন অব দি গসপেল ইন ফরেইন পার্টস (১৭০১) সাফল্য অর্জন করে। তা আরও অগ্রসর হয় পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত দি ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি (১৭৯২), চার্চ মিশনারি সোসাইটি (১৭৯৯), দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেইন বাইবেল সোসাইটি (১৮০৪), দ্য লন্ডন সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যামাঙ দ্য জুজের (১৮০৮) প্রয়াসে। এসব সংগঠন 'ইউরোপের সীমানা বিস্তারের প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করে'।[৯২]

এর সঙ্গে যোগ করতে হবে বণিক সংঘ, পণ্ডিত সংঘ, ভৌগোলিক অভিযান তহবিল, অনুবাদ তহবিল, প্রাচ্য স্কুল, মিশন, দূতাবাস, কারখানা এবং কখনো কখনো গোটা একটি ইউরোপীয় সম্প্রদায় বসিয়ে দেওয়ার ঘটনা; তাহলে 'স্বার্থ'-এর ধারণাটি আরও পরিষ্কার হবে। অতঃপর স্বার্থ সংরক্ষিত হয়–প্রবল উৎসাহ ও ব্যয়ে।

এ যাবৎ আমার আলোচনায় বাইরের কাঠামো মোটা দাগে চিহ্নিত হয়েছে। প্রাচ্যতত্ত্বের পণ্ডিতি বিকাশ এবং এর সহায়তায় বাস্তবায়িত রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে জড়িত গতানুগতিক অভিজ্ঞতা ও আবেগের কী হলো? প্রথমত, এ ব্যাপারে দেখা দেয় হতাশা। কারণ আধুনিক প্রাচ্য পুরোনো প্রাচ্যের অনুরূপ নয়। আগস্ট ১৮৪৩-এ গেরার্ড ডি নেরভাল লিখেন থিওফিল গোতিয়েরকে :

> এরই মধ্যে আমি প্রদেশের পর প্রদেশ, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, বিশ্বের অধিকতর সুন্দর অর্ধাংশ হারিয়েছি এবং অচিরেই আমি জানব আমার স্বপ্ন আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো জায়গা অবশিষ্ট নেই; তবে আমার কল্পনা থেকে মিসরকে বের করে দেওয়ার ঘটনাই সবচেয়ে দুঃখজনক; এখন আমি তাকে স্থাপন করেছি আমার স্মৃতিতে।[৯৩]

এটি প্রখ্যাত গ্রন্থ *বয়াজ আঁ অরিয়ঁা*-র লেখকের বক্তব্য। নেরভালের বিলাপ রোমান্টিসিজমের সাধারণ বিষয় (বিশ্বাসঘাতক স্বপ্ন, যেমন অ্যালবার্ট বেগুইন বর্ণনা করেছেন : লা'আম রোমান্টিক লো'ই রিভ) বাইবেলোক্ত প্রাচ্যে ভ্রমণকারী শ্যাতোব্রিঁয়া থেকে মার্ক টোয়েনের ক্ষেত্রেও সত্যি। অবশ্য জাগতিক প্রাচ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এ রকম শৌর্য-আরোপণের ওপর শ্লেষাত্মকভাবে মন্তব্য করে, যেমন দেখা যায় গ্যোয়েটের রচনায় (Mahometsgesang) বা হুগোর আদিউক্স ডি লা'অতিস অ্যারাবি'-তে। আধুনিক প্রাচ্যের স্মৃতি কল্পনা বিস্তারে বাধা দেয়, মানুষকে প্রদত্ত প্রাচ্যের বদলে ইউরোপীয় সংবেদনশীলতার জন্য উপযোগী কল্পজগতে ফিরিয়ে দেয়। নেরভাল একদা গোতিয়েরকে বলেছিলেন : যে কখনো প্রাচ্য দেখেনি তার কাছে পদ্ম তখনো পদ্ম, আমার কাছে তা এ রকম পেঁয়াজ। আধুনিক প্রাচ্য সম্পর্কে লেখার অর্থ হলো বইপত্র থেকে সংগ্রহ করা একরাশ চিত্রকল্পের রহস্যময়তা ভেঙে দেওয়া অথবা নিজেকে সেই প্রাচ্যে আবদ্ধ রাখা, যাকে হুগো বলেছেন 'চিত্রকল্প' বা 'চিন্তা'–এ রকম সাধারণ মোহাবেশ।[৯৪]

যদি ব্যক্তিগত জাদুমুক্তি ও সর্বজনীন মোহাবেশ প্রাচ্যতাত্ত্বিক সংবেদনশীলতাকে যথাযথ চিহ্নিত করে, তাহলে এগুলো সঙ্গী করে আনে আরও কিছু পরিচিত চিন্তার অনুভূতি, উপলব্ধির অভ্যাসও। মন প্রাচ্যবিষয়ক বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে এ-সম্পর্কিত সাধারণ উপলব্ধিগুলোকে আলাদা করতে শেখে। বলা যায়, এ দুইয়ের প্রত্যেকটি নিজ নিজ পথে চলে। স্কট-এর উপন্যাস *তালিসম্যান*-এর (১৮২৫) স্যার কেনেথ (হামুগুড়ি দেওয়া লিওপার্ড) এক আরব বেদুইনের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধ করেন ফিলিস্তিনি মরুভূমির কোনো এক জায়গায়। পরে কথাবার্তা শুরু করেন ক্রুসেডার ও তার শত্রু ছদ্মবেশী সালাদিন। খ্রিষ্টান যোদ্ধা বুঝতে পারেন তার মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বী তেমন খারাপ লোক নয়। তবু তিনি মন্তব্য করেন :

> আমি ভাবছি তোমার অন্ধ জাতি নিশ্চয়ই বিকৃত দানবের বংশধর, ওদের সাহায্য ছাড়া তোমরা ঈশ্বরের এতসব বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের এই পবিত্র ভূমি দখলে রাখতে পারতে না। আমি এই নির্দিষ্ট বেদুইনের কথাই বলছি না, সাধারণভাবে গোটা জনগোষ্ঠী ও ধর্মের কথা বলছি। তোমরা যে শয়তানের বংশধর সে জন্য আমার অবাক লাগছে না, বরং তোমরা যে সে জন্য গর্ববোধ কর, তাতে আমার অবাক লাগে।[১৫]

কারণ, প্রকৃতপক্ষে আরব বেদুইনরা তাদের জাতির রক্ত উর্ধ্বক্রমে মুসলমানদের লুসিফার ইবলিশ পর্যন্ত চিহ্নিত হওয়ার গর্ববোধ করে। তবে দুর্বল ঐতিহাসিকতা এনে স্কট যেভাবে দৃশ্যটিকে 'মধ্যযুগীয়' করেছেন এবং খ্রিষ্টানদের দ্বারা মুসলমানদেরকে ঈশ্বরতত্ত্বের দিক থেকে আক্রমণ করিয়েছেন, উনিশ শতকের ইউরোপীয়রা হয়তো তা করত না (কিংবা করত, যদিও); তবে এগুলো আমার কাছে সত্যিকার কৌতূহলোদ্দীপক নয়। মূলত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো স্কট কর্তৃক হালকা মহত্ত্বের সঙ্গে 'সাধারণভাবে' পুরো জাতিকে কলঙ্কিত করার কায়দা: সেই সঙ্গে আমি ঠিক 'তোমাকে বোঝাচ্ছি না' বলে আঘাত লঘু করার চেষ্টা।

যাহোক, স্কট ইসলামে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না (যদিও ইসলাম বিশেষজ্ঞ এইচ এ আর গিব *তালিসম্যান*-এর প্রশংসা করেছেন ইসলাম ও সালাদিন সম্পর্কে লেখকের যথাযথ অন্তর্দৃষ্টির জন্য[১৬])। তিনি ইবলিসের ভূমিকার ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে ইবলিসকে রূপান্তরিত করেছেন বিশ্বাসী এক জাতির (মুসলিম) বীর নায়কে। সম্ভবত স্কটের জ্ঞানের উৎস বায়রন ও বেকফোর্ড। কিন্তু প্রাচ্যের বিষয় বা বস্তুতে আরোপিত সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে কতটা জোরালভাবে স্পষ্ট ব্যতিক্রমের অস্তিত্বগত ও ভাষিক শক্তি সামাল দিতে পারে, তা বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। ব্যাপারটি যেন অনেকটা এমন : একদিকে 'প্রাচ্যদেশীয়' বলে একটি আবর্জনার ঝুড়ি রয়েছে, যাতে কোনো চিন্তাভাবনা না করেই প্রাচ্যের প্রতি পশ্চিমের সব কর্তৃত্বপরায়ণ, বেনামি ও প্রথাগত মনোভাব ছুড়ে ফেলা হয়েছে; আবার অন্যদিকে, যে কেউ প্রাচ্য সম্পর্কে বা প্রাচ্যে

অর্জিত এমন অভিজ্ঞতার গল্প বলতে পাওে, যা কেবল লোক কাহিনির জগতেই সত্য বলে মনে হবে; তা ছাড়া সর্বজনীনভাবে ব্যবহারযোগ্য আবর্জনার ঝুড়িটির সঙ্গে এসব গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু স্কটের গদ্যের গঠনই দেখায় যে তাতে ওই দুটি দিক গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। কারণ সাধারণ শ্রেণি বা ধরন আগাম দেখিয়ে দেয় নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত, সীমাচিহ্নিত স্থান, যার মধ্যে কাজ করতে হবে; কোন ব্যতিক্রম কতটা গভীরভাবে ব্যতিক্রম, তা কোনো ব্যাপারই নয়, একা কোনো 'প্রাচ্যজন' তার চারদিকে দেওয়া বেড়া কতটা ডিঙিয়ে গেল তাতে কিছু যায়-আসে না; সে প্রথমে প্রাচ্যজন, দ্বিতীয়ত, একজন মানুষ এবং শেষে আবার প্রাচ্যজন।

খুবই সর্বজনীন বর্গ 'প্রাচ্যজন' যথেষ্ট আগ্রহব্যঞ্জক বৈচিত্র্য ধারণে সক্ষম। প্রাচ্য সম্পর্কে ডিজরাইলির উৎসাহ প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৩১ সালে পুবে ভ্রমণকালে। কায়রোয় তিনি লেখেন : আমার চোখ ও মন জ্বলছে বিরাট সমৃদ্ধির ছোঁয়ায় যার সঙ্গে আমাদের নিজেদের সাদৃশ্য নেই-ই প্রায়।[৭৭] সাধারণ সমৃদ্ধির আবেগ বিভিন্ন বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে তুরীয়বোধ এবং প্রকৃত বাস্তবের জন্য ধৈর্যের অভাব। তার উপন্যাস *ট্যানক্রেড* বর্ণবাদী ও ভৌগোলিক মন্তব্যে ভরা, যদিও সেসব মন্তব্যের বাইরের ভাবটাই কেবল গুরুগম্ভীর; সবকিছুই জাতি বা বর্ণের ব্যাপার; এত বেশি যে সমাধান পাওয়া যাবে কেবল প্রাচ্য ও তার জাতিগুলোর ভেতরেই।

ওখানে দ্রুজ, খ্রিষ্টান, মুসলমান, ইহুদি সহজেই মেলামেশা করে। কারণ, একজন পরিহাস ছলে বলেছিলেন, আরব হলো ঘোড়ার পিঠে ইহুদি, আর ওদের সবাই অন্তরের অন্তস্তলে প্রাচ্যদেশীয়। মিলন ঘটানো হয়েছে সাধারণ বর্গে, বর্গ ও তার অন্তস্থ উপাদানের মধ্যে নয়। প্রাচ্যজন প্রাচ্যে বাস করে, সে প্রাচ্যদেশীয় আরাম-আয়েশে জীবন কাটায়–প্রাচ্যদেশীয় স্বেচ্ছাচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মধ্যে, প্রাচ্যদেশীয় অদৃষ্টবাদের অনুভবে প্রাণিত হয় সে মানুষ। মার্ক, ডিজরাইলি, বার্টন প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের লেখক কোনো প্রশ্ন না করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এসব সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতেন। মোহমুক্তি এবং প্রাচ্যের প্রতি সাধারণীকৃত–অবশ্য বলা যায় না যে সিজোফ্রেনিক, দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অন্য একটি অদ্ভুত বিশেষত্বও রয়েছে। যেহেতু একে সাধারণ লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, তাই সমগ্র প্রাচ্যই নির্দিষ্ট এ ধরনের খামখেয়ালিপনার উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ব্যক্তি প্রাচ্যজনের অদ্ভুতত্বকে অর্থপূর্ণ করে যে সাধারণ বর্গ, তাকে সে ঠেলে ফেলতে পারে না বা ক্ষতিগ্রস্ত পারে না। তবে অদ্ভুত অবস্থা উপভোগ্য হতে পারে অবস্থার দোহাই পেড়েই। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্লবেয়ার কর্তৃক বর্ণিত প্রাচ্যের এ দৃশ্য তুলে দেওয়া যায় :

> জনতার মনোরঞ্জনের জন্য একদিন মোহাম্মদ আলীর সভার এক ভাঁড় একটি মেয়েকে নিয়ে এল কায়রোর এক বাজারে। একটি দোকানের কাউন্টারে বসাল

এবং সবার সামনেই তার সঙ্গে সঙ্গম করল। দোকানি তখন নিরুদ্বেগে পাইপ টানছিল।

কিছুদিন পূর্বে কায়রো থেকে শব্রার পথের এক স্থানে এক তরুণ একটি বিরাট গাধার দ্বারা ধর্ষিত হলো, ওপরের ঘটনাটির মতোই কেবল নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা গড়ে তোলা এবং মানুষকে হাসানোর জন্য। একটি ম্যারাবাউট কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। সে একটি বোকা, দীর্ঘকাল ঈশ্বরের চিহ্নিত সাধক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করে। সব মুসলমান রমণী তাকে দেখতে আসে এবং তাকে হস্তমৈথুন করায়। শেষে ক্লান্তিজনিত কারণে সে মৃত্যুবরণ করে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সে ছিল যেন অনন্ত হস্তমৈথুন। কিছুদিন আগে এক আধ্যাত্মিক সাধক সম্পূর্ণ নগ্নদেহে কায়রোর রাস্তায় হাঁটত, কেবল তার মাথায় থাকত একটি টুপি আর পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে আরেকটি। প্রস্রাব করার জন্য সে তার পুরুষাঙ্গের টুপিটি সরাত, আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁজা মেয়েরা দৌড়ে গিয়ে তার মূত্রের বৃত্তীয় রেখার নিচে বসত, সে মূত্র লেপে নিত দেহময়।[৯৮]

ফ্লবেয়ার নিজেই স্বীকার করেছেন যে এ হলো বিশেষ ধরনের অত্যন্ত অদ্ভুত কিছু ঘটনা। 'সব পুরোনো ভাঁড়ামির ব্যাপার' বলে ফ্লবেয়ার বোঝাতে চেয়েছেন যে বহুদিনের প্রচলিত রীতির 'মুগুর পেটা করা দাস...রুক্ষ নারী পাচারকারী...ঠগী সওদাগর' প্রাচ্য লাভ করেছে নতুন, তাজা, খাঁটি ও আকর্ষণীয় অর্থ। এই অর্থ পুনঃসৃজন সম্ভব নয়, কেবল অকুস্থলেই উপভোগ করা যায় এবং অংশবিশেষ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। প্রাচ্যকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। কারণ, এক সীমাহীন অদ্ভুত ব্যাপারের বিশাল সঞ্চয় থেকে উদ্ভূত হয় এর প্রায়-আক্রমণাত্মক আচরণ। ইউরোপীয় মানুষের সংবেদনশীলতা প্রাচ্য ভ্রমণ করে। ইউরোপীয়রা এখানে পর্যবেক্ষক, কোনোভাবেই জড়িত নয়, সর্বদা বিচ্ছিন্ন, সর্বদা ডিসক্রিপর্জঁ দ্য লা ইজিপ্ট-এ বর্ণিত অদ্ভূত আনন্দের নতুন দৃষ্টান্তের জন্য তৈরি। প্রাচ্য পরিণত হয় অদ্ভুত বিষয়ের জীবন্ত মূকাভিনয়ে।

অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে এই মূকাভিনয়ই হয়ে ওঠে রচনার বিশেষ বিষয়বস্তু। এভাবে বৃত্তের সমাপ্তি; গ্রন্থ আসলে পাঠককে যা বলেনি, সেরূপে দৃষ্টিগোচর হওয়া থেকে প্রাচ্য ফিরে আসতে পারে এমন কোনো রূপে, যা খুবই সুশৃঙ্খল উপায়ে লেখা হয় : এর অচেনা অবস্থা রূপান্তরিত করা যায়, উদ্ধার করা যায় এর অর্থ, বশে আনা যায় এর শত্রুতা। এ সত্ত্বেও প্রাচ্যের ওপর আরোপিত সর্বজনীনতা, প্রাচ্যের মুখোমুখি হলে অনুভবে আসে যে মোহমুক্তি, এর দ্বারা প্রদর্শিত অদূরীভূত উৎকেন্দ্রিকতা–সবই প্রাচ্যসম্পর্কিত লেখা বা বক্তব্যে পুনরায় ভাগে ভাগে সঞ্চারিত হয়ে যায়। যেমন শুরুর প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের নিকট ইসলাম ছিল গতানুগতিকভাবে প্রাচ্যদেশীয়। কার্ল বেকার মন্তব্য করেন : 'ইসলাম' (বিশাল সর্বজনীনতা লক্ষণীয়) যদিও হেলেনিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার পেয়েছে, তা গ্রিক মানবিক ঐতিহ্য উপলব্ধি ও প্রয়োগে

সক্ষম নয়। এ ছাড়া ইসলামকে বোঝার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন একে দেখা– আসল ধর্মরূপে নয়, ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের মতো সৃজনশীল প্রেরণা ছাড়াই প্রাচ্যজনদের দ্বারা গ্রিক দর্শন আত্মীকৃত করার ব্যর্থ প্রয়াস হিসেবে।[৯৯]

আধুনিক ফরাসি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বিখ্যাত লুইস ম্যাসিগননের নিকট ইসলাম খ্রিষ্টীয় মূর্ততার সুশৃঙ্খল প্রত্যাখ্যান এবং এর প্রধান নায়ক মোহাম্মদ (সা.) বা আভিরইস নন, মুসলিম সাধক আল হেলাজ; ব্যক্তিগত অনুমানের ভিত্তিতে ইসলামকে বিকৃত করার অভিযোগে রক্ষণশীল মুসলমানরা আল হেলাজকে হত্যা করে।[১০০]

বেকার ও ম্যাসিগনন স্পষ্টত যে বিষয়টি তাদের অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করেননি তা হলো, প্রাচ্যজনদের খামখেয়ালিপনা বা উৎকেন্দ্রিকতা। পরে তারা এ বিষয়টিকে পশ্চিমা পরিভাষায় নিয়মিত করে নেওয়ার জন্য খুবই চেষ্টা করেন। মোহাম্মদ (সা.)-কে ছুড়ে ফেলা হয়, আল হেলাজকে নিয়ে আসা হয় সামনে। কারণ তিনি যিশুখ্রিষ্টের মতো হতে চেয়েছিলেন।

প্রাচ্যের বিচারক হিসেবে আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন ও মুখে বলেন, কিন্তু বস্তুগতভাবে প্রাচ্য থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারেন না। সহানুভূতির পরিবর্তে তার পেশাগত জ্ঞান প্রমাণ করে তার মানবিক বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাও সব রক্ষণশীল মনোভাব, পরিপ্রেক্ষিত এবং আমার বর্ণিত প্রাচ্যতত্ত্বের ধরন দ্বারা খুবই প্রভাবিত। তার প্রাচ্য অস্তিত্বশীল প্রকৃত প্রাচ্য নয়, তা হলো প্রাচ্যায়িত প্রাচ্য। জ্ঞান ও ক্ষমতার একটি অভগ্ন বৃত্তাংশ ইউরোপ বা পশ্চিমা রাষ্ট্রনায়ক ও পশ্চিমা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সংযুক্ত করে; এটি গঠন করে মঞ্চের কানা, যার ভেতরে আছে তাদের প্রাচ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে আফ্রিকা ও প্রাচ্য পশ্চিমের সামনে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তেমন দর্শনীয় হয়ে উঠতে পারেনি, যেমন মনে হয়েছে একটি সুবিধাজনক এলাকা হিসেবে। এ সময় প্রাচ্যতত্ত্বের পরিধি আর সাম্রাজ্যবাদের পরিধি একত্রে মিলে যায়। প্রাচ্যবিষয়ক ও প্রাচ্যকে মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমা চিন্তাভাবনার ইতিহাসে একমাত্র সংকটের উদ্ভব হয় এই দুইয়ের অভিন্নতা থেকে। এ সংকট এখনো অব্যাহত।

বিশ শতকের শুরুতে তৃতীয় বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া ছিল দ্বান্দ্বিক। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত বান্দুং সম্মেলন নাগাদ সমগ্র প্রাচ্য পশ্চিমা সাম্রাজ্য থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পায়, কিন্তু মুখোমুখি হয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নতুন বিন্যাস–যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের। নতুন তৃতীয় বিশ্বে 'তার' প্রাচ্যকে চিনতে না পেরে প্রাচ্যতত্ত্ব এখন প্রতিদ্বন্দ্বী,

রাজনৈতিক অস্ত্রসজ্জিত প্রাচ্যের সামনে উপস্থিত। প্রাচ্যতত্ত্বের সামনে এখন দুটি পথ খোলা : এক. যেন কিছুই ঘটেনি এমনভাবে তার চর্চা অব্যাহত রাখা; দুই. পুরোনো কৌশলগুলো নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। কিন্তু প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন, প্রাচ্য কখনো পরিবর্তিত হয় না, নতুন প্রাচ্য হলো নতুনের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার পুরোনো প্রাচ্য। তিন পুনর্বিবেচনার বিকল্প, প্রাচ্যতত্ত্বকে একেবারে বিদায় জানানো; কেবল ক্ষুদ্র একটি দল এমন চিন্তাভাবনা করছে।

আবদেল মালেকের মতে, সংকটের একটি মাপক কেবল এই নয় যে, 'প্রাক্তন উপনিবেশ প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন' সংগঠিত হয়ে প্রাচ্যতত্ত্বের নিষ্ক্রিয়, নিয়তিবাদী 'প্রজার জাত'-এর ধারণা গোলমাল করে দিচ্ছে; এ ছাড়াও বিশেষজ্ঞগণ এবং সাধারণ পাটক প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিজ্ঞান ও তার অধীত বিষয়বস্তুর মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। তেমনি তাদের নজরে এসেছে প্রাচ্যতত্ত্ব এবং মানববিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ধারণা, পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে সূচিত কালিক ব্যবধানও, যা বিশেষ প্রভাবসম্পাতী।[১০১] রেনান থেকে গোলজিহার, ম্যাকডোনাল্ড থেকে ভন গ্রুনেভোম, গিব থেকে বার্নার্ড লুইস প্রমুখ প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইসলামকে দেখেছেন সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণরূপে (পিএম হল্টের পরিভাষা), যা ইসলামি জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতি থেকে আলাদা করে অধ্যয়ন করা সম্ভব।

প্রাচ্যতত্ত্বের নিকট ইসলামের একটি অর্থ আছে, যার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট রূপটি পাওয়া যাবে রেনানের প্রথম প্রবন্ধের বক্তব্যে : ভালো বুঝতে হলে ইসলামকে সংকুচিত করে আনতে হবে 'তাঁবু ও উপজাতি'র মধ্যে। উপনিবেশবাদের প্রভাব, জাগতিক পরিস্থিতি, ঐতিহাসিক বিবর্তন–এগুলো প্রাচ্যতত্ত্বের কাছে তেমনই খেয়ালি বালকদের নিকট মাছি যেমন–তাদের খেলার জন্য হয় মৃত, না-হয় উপেক্ষিত; প্রয়োজনীয় ইসলামকে জটিলভাবে বোঝার জন্য এগুলোকে কখনো গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়নি।

প্রাচ্যতত্ত্ব যে দুটি বিকল্প পথে আধুনিক প্রাচ্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া করেছে, তার প্রকাশ দেখা যায় এইচএআর গিবের পেশাগত তৎপরতায়। ১৯৪৫ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসকেল বক্তৃতা প্রদান করেন গিব। তিনি যে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করেন তার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ক্রোমার ও বেলফোর যে পৃথিবীকে জানতেন তা এক নয়। বহু বিপ্লব দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, অসংখ্য আর্থরাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ১৯৪৫ সালের পরিস্থিতিতে নিশ্চিত–এমনকি বিপর্যয়করভাবে নতুন জিনিসে পরিণত করে। তবু আমরা দেখি, গিব মডার্ন ট্রেন্ড ইন ইসলাম শিরোনামে তার বক্তৃতা শুরু করেন এভাবে :

> আরব সভ্যতার ছাত্ররা অবিরাম একটি তীব্র সংঘাতময় অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে : এ সংঘাত হলো আরবি সাহিত্যের কোনো কোনো শাখায় প্রকাশিত কল্পনাশক্তির ক্ষমতা এবং যুক্তিবিন্যাস ও প্রদর্শনে প্রকাশিত যথার্থের প্রবণতার মধ্যে, এমনকি যখন তা এসব বিষয় উৎপাদনেই প্রযুক্ত। এ কথাও সত্যি যে মুসলমানদের মধ্যে অনেক বড় বড় দার্শনিক আছেন, যাদের কিছুসংখ্যক আরব। এটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। বাইরের পৃথিবী কিংবা অন্তর্গত চিন্তনপ্রক্রিয়া যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, আরব মন তার বিচ্ছিন্নতার তীব্র আবেগ এবং নিরেট ঘটনার স্বাতন্ত্র্যের দিকটি পরিহার করতে পারে না। আমি মনে করি, এটিই প্রাচ্যদেশীয়দের 'আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব'-এর পেছনের প্রধান নিয়ামক উপাদান, যাকে অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড ভাবেন প্রাচ্যজনের চরিত্রগত পার্থক্য।
>
> এটি যৌক্তিক শৃঙ্খলভিত্তিক চিন্তাপদ্ধতির প্রতি মুসলমানদের অনীহার ব্যাপারটিও ব্যাখ্যা করে, যা পশ্চিমের ছাত্রদের নিকট অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার (যদি না মুসলমানরা তাদেরকে ব্যাখ্যা করে দেয়)।... যৌক্তিক চিন্তাপদ্ধতি ও উপযোগবাদের প্রত্যাখ্যান, যা ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, তার মূল মুসলমান ধর্মতাত্ত্বিকদের চিন্তায় নয়, নিহিত রয়েছে আরব কল্পনার অণুমুখিনতা ও স্বাতন্ত্র্যে।[১০২]

এ অবশ্যই খাঁটি প্রাচ্যতত্ত্ব। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম-সম্পর্কিত গভীরতর জ্ঞানের প্রকাশ বইটির বাকি অংশের উল্লেখযোগ্য বিশেষজ্ঞ হলেও গিবের উদ্বোধনী পক্ষপাতিত্ব আধুনিক ইসলাম বুঝতে আশান্বিত যে কারও জন্য মারাত্মক বাধা। পদান্বয়ী অব্যয় 'থেকে' বাদ দেওয়ায় কী অর্থ দাঁড়ায় 'পার্থক্য' শব্দটির? আমাদেরকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে না যে মুসলিম প্রাচ্যজনকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করো, যেন তার জগৎ 'আমাদের' জগতের মতো নয়, সে জগৎ কখনো সপ্তম শতক থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়নি? গিবের আইনগত উপলব্ধি প্রক্রিয়ার জটিলতা সত্ত্বেও কেন তার মতো করে আধুনিক ইসলামকে এমন অপ্রশমনীয় শত্রুতার সঙ্গে জড়িত করে দেখতে হবে? স্থায়ী অক্ষমতার কারণে ইসলাম যদি শুরু থেকেই খুঁতযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে ইসলামের তরফ থেকে যেকোনো সংস্কারের চেষ্টাকে বাধা দেবে প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা; কারণ তার মতে, সংস্কার হলো ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা–এই হলো গিবের বক্তব্য। কী করে একজন মুসলমান এই হাতকড়া পিছলিয়ে আধুনিক পৃথিবীতে আসবে, যদি না সে *কিং লিয়ারের* বোকা চরিত্রটির মতো পুনরাবৃত্তি করে, 'ওরা সত্য বলার কারণে চাবুক মারবে, ওরা মিথ্যা বলার জন্য চাবুক মেরেছে এবং কখনো কখনো শান্তি বজায় রাখার কারণেও চাবুক মারে।'

আঠারো বছর পর গিব একদল ইংরেজ স্বদেশবাসী শ্রোতার মুখোমুখি হন; এখন তিনি হার্ভার্ডের সেন্টার ফর মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজের ডাইরেক্টর হিসেবে কথা

বলছেন। তার বিষয় 'এরিয়া স্টাডিজ রিকনসিডারড' অন্যান্য বিষয়ের মতো তিনি এ বিষয়েও একমত হন যে 'প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের হাতে ন্যস্ত করার জন্য প্রাচ্য একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' তখন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের নতুন বা দ্বিতীয় বিকল্প ঘোষিত হচ্ছিল, যেমন মডার্ন ট্রেন্ড প্রথম বা প্রথানুগ আলোচনার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। 'এরিয়া স্টাডিজ রিকনসিডারড'-এ গিবের সূত্র খুবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের যতটা করার প্রয়োজন পড়ে; তাদের কাজ হলো ছাত্রদেরকে 'সামাজিক জীবন ও জীবিকায়' পেশা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা। গিব বলেন, এখন আমাদের দরকার একত্রে কাজ করার জন্য প্রথানুগ প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও ভালো সমাজবিজ্ঞানীর। এ দুজন একত্রে আন্তবিষয়ভিত্তিক কাজগুলো সম্পাদন করবেন। প্রথানুগ প্রাচ্যতাত্ত্বিক মেয়াদোত্তীর্ণ জ্ঞান নিয়ে প্রাচ্যের মুখোমুখি হবেন না। তার বিশেষজ্ঞতা অঞ্চল অধ্যয়নে কর্মরত তার সহকর্মীদের এই মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে যে 'এশিয়া বা আরব পরিস্থিতিতে পশ্চিমা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মনস্তত্ত্ব ও কর্মকৌশল ব্যবহার একেবারে ওয়াল্ট ডিজনি জাতীয় ব্যাপার।'[১০৩]

বাস্তবে এ ধারণার অর্থ হলো প্রাচ্যের মানুষেরা যখন ঔপনিবেশিক দখলদারির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তখন আপনারা অবশ্যই বলবেন যে 'আমরা' যেভাবে বুঝেছি প্রাচ্যের মানুষেরা কখনো সেভাবে স্বশাসনের অর্থ বুঝতে পারেনি। যখন কিছু লোক বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদ করে আর কিছু লোক তা অব্যাহত রাখে, তখন আপনারা বলেন, 'শেষ পর্যন্ত এরা সবাই প্রাচ্যজন' এবং এখানে শ্রেণিস্বার্থ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক নিয়ামক সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। অথবা বার্নার্ড লুইসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেন, আরব ফিলিস্তিনিরা যদি তাদের ভূমিতে ইসরায়েলি দখলদারির ও আবাসনের বিরোধিতা কওে, তা হলে তা 'ইসলামের প্রত্যাবর্তন,' কিংবা জনৈক প্রাচ্যতাত্ত্বিকের ভাষায় 'অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ'[১০৪]–যা সপ্তম শতকে ইসলামের সঙ্গে জড়িত একটি নীতি। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি কোনো ব্যাপার নয়। ইসলাম ইসলামই, প্রাচ্য প্রাচ্যই। অনুগ্রহ করে বাম ও ডান পথ, বিপ্লব সম্পর্কে আপনার সকল ধারণা স্থির করুন, অতঃপর ডিজনিল্যান্ডে বদলে নিন।

এসব অনুলাপ, দাবি, প্রত্যাখ্যানের জন্য জ্ঞানক্ষেত্রের ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ মানবতাবাদীদের নিকট অপরিচিত মনে হয়ে থাকলে তার কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। এর অনুমিত বিষয়বস্তুর মতো প্রাচ্যতত্ত্বও তার নির্মেঘ আকাশে কোনো অবাঞ্ছিত ধারণাগুচ্ছকে প্রবেশ করতে দেয় না। কিন্তু আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিক–কিংবা নতুন নামে বলা যায় 'অঞ্চল বিশেষজ্ঞগণ' নিজেদের ভাষাগত বিভাগে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন না। বরং তারা গিবের উপদেশ থেকে লাভবান হন। তাদের অনেকেই এখন, হ্যারল্ড লাসওয়েলের ভাষায়, নীতিনির্ধারণ বিদ্যার অন্যান্য 'বিশেষজ্ঞ' ও 'পরামর্শকদের সঙ্গে অভিন্ন।[১০৫] এভাবে জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষক ও একজন ইসলাম

বিশেষজ্ঞের একরকম জোটবদ্ধ অবস্থানের সামরিক-জাতীয় নিরাপত্তার সম্ভাবনা স্বীকৃত হয়, আর কিছু না হোক অন্তত উপযোগিতার দোহাই দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিম এমন এক চতুর ও কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদী শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে যে তার মিত্র সংগ্রহ করেছে সহজেই প্রতারিত হয় এমন প্রাচ্য জাতিসমূহ থেকে (আফ্রিকা, এশিয়া, অনুন্নত বিশ্ব থেকে)। সে ক্ষেত্রে এই শত্রুকে কবজা করার জন্য আর কী উপায় আছে, প্রাচ্যজনের যুক্তি-বিরহিত মনকে খেলানো ছাড়া যা সাজাতে জানে প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা?[১০৬] এভাবে উদ্ভূত হয় মুলো ঝোলানোর মতো ওস্তাদি কর্ম : উন্নতির জন্য জোট, সিয়াটো ইত্যাদি। এসব গঠিত হয়েছে প্রাচ্যতত্ত্বের ধরে নেওয়া লক্ষ্যবস্তুকে ঠিকমতো পরিবর্তন করার জন্য নতুন অস্ত্র সজ্জিত প্রথাগত জ্ঞানের পুরোনো রূপের ভিত্তিতে।

এভাবে বৈপ্লবিক উত্তেজনা যখন ইসলামি প্রাচ্যকে পেঁচিয়ে ধরে, তখন প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা আমাদের মনে করে দেন যে আরবরা 'কেবল মুখের কথায়' আসক্ত।[১০৭] উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন যখন ধেয়ে আসে আরব জাহানকে একসূত্রে গেঁথে নেয়, তখন প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা পুরো ব্যাপারটিকেই উৎকট ঝামেলা বলে মনে করেন; ধরে নেয়, এ হলো পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রতি অপমান। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, সম্পদের পরিমাণ মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়া, সমতা, ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য পৃথিবীতে অভূতপূর্ব দাবি ইত্যাদি যখন দেখা দিচ্ছে, তখন রাজনীতিবিদেরা উপভোগ করেন প্রাচ্যের জনপ্রিয় ক্যারিকেচার; তাদের মতাদর্শের উৎস কেবল অর্ধশিক্ষিত আমলারাই নয়, অতিশিক্ষিত প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণও। আরব অঞ্চল কর্তৃক সমগ্র পৃথিবী দখলের পরিকল্পনার ব্যাপারে সতর্ক করেন স্টেট ডিপার্টমেন্টে কর্মরত কিংবদন্তির আরব বিশেষজ্ঞ। বিশ্বাসঘাতকতা চীনা, আধা-ন্যাংটা ইন্ডিয়ান ও নিষ্ক্রিয় মুসলমানদের বর্ণনা করা হয় আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বার্থের ওপর শকুনরূপে। যখন তাদেরকে কমিউনিজম অথবা প্রাচ্যদেশীয় মূল প্রবৃত্তির নিকট হারিয়ে ফেলি, তখন অভিসম্পাত দিই; এ দুইয়ের পার্থক্য অতি সামান্য।

এ প্রাচ্যতাত্ত্বিক মনোভাব সয়লাব করে ফেলে সমকালীন গণমাধ্যম ও গণমানস। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আরবদের ধরে নেওয়া হয়েছে উটের পিঠে সওয়াররূপে–সন্ত্রাসী মনোভাবাপন্ন, লম্বা-নাক, ধর্মত্যাগী, যাদের অবাঞ্ছিত সম্পদ সভ্যতার মুখে একটি বিরাট বাধার মতো। এখানে সব সময় এই অনুমান ঘাপটি মেরে থাকে যে যদিও পশ্চিমা ভোক্তারা সংখ্যায় কম, তবু তারা পৃথিবীর সম্পদের উৎসসমূহের বেশির ভাগের মালিক হবে অথবা ব্যয় করবে। কেন? কারণ সে আসল মানুষ, প্রাচ্যজনের মতো নয়। আনওয়ার আবদেল মালেকের 'সংখ্যালঘু নিয়ন্ত্রণের আধিপত্যবাদ' এবং তার সঙ্গে ইউরোপকেন্দ্রিকতা ও নৃতত্ত্বকেন্দ্রিকতার সমন্বয়ের এর চেয়ে ভালো

উদাহরণ আর নেই : মধ্যবিত্ত শ্রেণির একদল সাদা পশ্চিমা মনে করে, অশ্বেতাঙ্গ জগৎকে কেবল পরিচালনা করা নয়, তারা মালিকানা অর্জন করাও একরকম মানবিক স্বাধীনতা। কারণ, সংজ্ঞা অনুযায়ী 'এ' (প্রাচ্যজন) ঠিক 'আমাদের' মতো একই মানুষ নয়। অমানবিক চিন্তার এর চেয়ে খাঁটি উদাহরণ আর কী হতে পারে!

পূর্বেও বলেছি, এক অর্থে প্রাচ্যতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা অন্য অঞ্চল, জনগোষ্ঠী বা সংস্কৃতির মানুষদের মানবিকতাকে অশ্রদ্ধা করা, নগ্ন করা, অনিবার্য করার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্ব এর চেয়ে একধাপ এগিয়ে যায় : তা প্রাচ্যকে এমন কিছু মনে করে, যার অস্তিত্ব পশ্চিমের সামনে কেবল প্রদর্শিতই হয়নি, পশ্চিমের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে স্থির রয়ে গেছে। প্রাচ্যতত্ত্বের এত চমৎকার বর্ণনামূলক ও কেতাবি সাফল্য রয়েছে যে প্রাচ্যের বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস পশ্চিমের প্রতি প্রতিক্রিয়ামাত্র বলে বিবেচিত হয়। পশ্চিম ক্রিয়াশীল, প্রাচ্য অক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকারী। প্রাচ্যজনের সব ধরনের ব্যবহারের দর্শক, বিচারক, জুরি হলো পশ্চিম। বিশ শতকে ইতিহাস যদি প্রাচ্যে এবং প্রাচ্যের জন্য গুরুতর পরিবর্তন উসকে দিয়ে থাকে, প্রাচ্যতাত্ত্বিক তাতেও হতবাক; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি তা বুঝতে পারেন না।

প্রাচ্যের নতুন নেতারা, বুদ্ধিজীবী, নীতিনির্ধারকগণ অনেক শিক্ষা লাভ করেন অগ্রজদের শ্রম-ঘাম থেকে। তেমনি নিজ দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে তারা যে এখন অনেক দূর স্বাধীন, সে উপলব্ধিও সহায়ক ভূমিকা রাখে। মধ্যবর্তী কালপর্বে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরের আনুকূল্য লাভ করে ওরা, অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী আর কিছুটা আগ্রাসীও হয়ে ওঠে। ওরা এখন আর পশ্চিমের অদৃশ্য জুরির অনুকূল রায় অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে না। পশ্চিমের সঙ্গে তাদের সংলাপও শেষ; ওদের আলোচনা এখন স্বদেশবাসীর সঙ্গে।[১০৮]

প্রাচ্যতাত্ত্বিক ধরে নেয়, তাদের কিতারগুচ্ছে যে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করেনি, তা বাইরের আলোড়ন অথবা প্রাচ্যের বিপথগামী বোকামির ফল। ১৯৪৮ সাল থেকে মিসর, ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন বা ইয়েমেনে যা ঘটেছে, তার জন্য অসংখ্য প্রাচ্যতাত্ত্বিক রচনা, এমনকি ওসবের সারাংশ দ্য ক্যামব্রিজ হিস্টরি অব ইসলামও তাদের পাঠকদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেনি। যখন ইসলাম-সম্পর্কিত অন্ধ মতবাদ আর কাজে লাগে না, এমনকি সবচেয়ে প্যানগ্লোসিয়ান প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের জন্যও না, তখন দেখা যায় প্রাচ্যায়িত সমাজ-বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় প্রত্যাবর্তন বাজারজাতযোগ্য কিছু বিমূর্তায়ন যেমন—এলিট, রাজনৈতিক ভারসাম্য, আধুনিকায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ইত্যাদি ধারণায় প্রত্যাবর্তন, যার সবই প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের দাগ-মারা। এরই মধ্যে ক্রমশ বর্ধিষ্ণু এবং আরও ভয়াবহ একটি চিড় আলাদা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে। বর্তমান সংকট

রচনা ও বাস্তবতার মধ্যকার পার্থক্যকে নাটকীয়রূপ প্রদান করে। তবু আমি বর্তমান অধ্যয়নে কেবল প্রাচ্যতত্ত্বের মতামতের উৎসগুলোই চিহ্নিত করার চেষ্টা করিনি, এর গুরুত্ব নির্দেশেরও চেষ্টা করেছি; কারণ সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা ঠিকই অনুভব করছেন যে স্পষ্টত তাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসা একাংশ পৃথিবীকে উপেক্ষা করার অর্থ হলো বাস্তবকে অস্বীকার করা। মানবতাবাদীরা প্রায়ই বিভাগ-বণ্টিত বিষয়ে তাদের গবেষণা পরিচালনা করেন। তারা প্রাচ্যতত্ত্বের মতো বিষয় পর্যবেক্ষণ করেননি, তা থেকে শিক্ষাও গ্রহণ করেননি, যার নিরবচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষা হলো গোটা একটি পৃথিবীর প্রভু হওয়া–সহজে সীমানা চিহ্নিতকরণের যোগ্য কোনো অংশ, যেমন গ্রন্থকার বা রচনাগুচ্ছ নয়। যাহোক, তার বিপুল-বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও 'ইতিহাস, সাহিত্য, কলা' ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা পর্দার পাশাপাশি প্রাচ্যতত্ত্বও পার্থিব, ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সাথেও জড়িত। এই পরিস্থিতিকে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞানবাদ ও যুক্তিবাদের দোহাই দিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টাও আছে। সমকালীন বুদ্ধিজীবীগণ প্রাচ্যতত্ত্ব থেকে দুটি জিনিস শিখতে পারেন : এক, বাস্তবসম্মতভাবে তার বিষয়ের দাবিকে সীমিত অথবা বিস্তৃত করা; দুই, মানবীয় রঙ্গভূমিকে (ইয়েটসের ভাষায় হাড়–মাংসের বিপণি) দেখা ও উপলব্ধি করা– যেখানে রচনা, দৃষ্টি, পদ্ধতি ও বিষয় উদ্ভূত, বিকশিত, প্রবাহিত ও লুপ্ত হয়। প্রাচ্যতত্ত্বকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের অর্থ হলো ইতিহাস কর্তৃক তার বিষয়বস্তুতে অর্থাৎ প্রাচ্যে আনীত পদ্ধতিগত সমস্যা মোকাবিলার বুদ্ধিবৃত্তিক উপায় প্রস্তাব করা। তার আমাদের পরিষ্কারভাবে দেখতে হবে প্রাচ্যতত্ত্ব তার পরিধি, অভিজ্ঞতা ও কাঠামো দ্বারা কোনো কোনো মানবিক মূল্যবোধ চিরতরে মুছে দিয়ে গেছে।

অধ্যায় দুই

প্রাচ্যতাত্ত্বিক কাঠামো ও কাঠামো-পুনর্গঠন

এখন থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে যখন নকীব আল আশরাফ বা নবীর বংশধরগণের প্রধান ওমর বিয়ে করেন তখন মিছিলের একেবারে অগ্রভাগে হেঁটে যাচ্ছিল এক তরুণ। তার তলপেট কাটা, সে দিক দিয়ে তার নাড়িভুঁড়ির বড় একটা অংশ বের করে এনে সে নিজেই রুপার থালায় করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। মিছিল শেষ হওয়ার পর ওগুলো সে যথাস্থানে স্থাপন করে। তার বোকাসুলভ ও রুচিগর্হিত এ কাজের পরিণামে সুস্থ হতে অনেক দিন ধরে তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়।

এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেইন
এন অ্যাকাউন্ট অব দ্য ম্যানার্স অ্যান্ড
কাস্টমস অব দ্য মডার্ন ইজিপশিয়ানস

• ক •

নতুন টানা সীমান্ত, পুনঃসংজ্ঞায়িত বিষয়াবলি ও অসম্প্রদায়ীকৃত ধর্ম

জ্ঞানের অধোগতি ও মানুষের প্রয়াসের অসাড়তা সম্পর্কে রসধর্মী মহাকাব্যিক উপন্যাস *বোভার* ও *পিকুশে* শেষ করার পূর্বেই ১৮৮০ সালে মৃত্যুবরণ করেন গুস্তাব ফ্লবেয়ার। যাহোক, তার কল্পদৃষ্টির মৌলিক বহিঃকাঠামো পরিষ্কার এবং উপন্যাসটি প্রচুর খুঁটিনাটি বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার সমর্থিত। বুর্জোয়া সমাজের সদস্য দুই পেশাদার করণিকের একজন মোটা সম্পদের একটি উইলের অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তরাধিকারী হওয়ায় শহর ছেড়ে পল্লি এলাকার এক জমিদার বাড়িতে চলে যায়–নিজেদের যা খুশি তাই করে জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে। ফ্লবেয়ার তাদের অভিজ্ঞতার চিত্র বর্ণনা করে দেখান ওই দুজনের যা খুশি করা আসলে কৃষ্টি, ইতিহাস, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে এলোমেলো ঘোরাফেরায় পরিণত হয় এবং সব সময় সফলতার চেয়ে কম কোনো ফলাফল নিয়ে। তারা শিক্ষণের ক্ষেত্রগুলোর মধ্য দিয়ে এমনভাবে অগ্রসর হয় যেন সময় ও জ্ঞানের বিস্তৃতিতে দুই পর্যটক বিরক্তি, বিপর্যয় এবং অনুপ্রাণিত শৌখিনের হালছাড়া প্রবণতার অভিজ্ঞতা লাভ করতে করতে। যার মধ্যে দিয়ে গমন করে ওরা, প্রকৃতপক্ষে তাহলো সমগ্র উনিশ শতকের বিভ্রম থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতা যাতে, চার্লস মোরেজের ভাষায়, বুর্জোয়ারা তাদের অযোগ্যতা ও গড়পড়তা মেধার শিকার। প্রতিটি আগ্রহী প্রয়াস সেখানে নিজেই জীর্ণ ব্যাপারে পরিণত হয়, প্রতিটি বিষয় বা অধ্যয়নক্ষেত্র আশা ও ক্ষমতা থেকে বিশৃঙ্খলা, ধ্বংসস্তূপ ও গভীর দুঃখে রূপান্তরিত। ফ্লবেয়ারের প্রদত্ত বর্ণনায় হতাশার দৃশ্যাবলির মধ্যে আমাদের বিশেষ আগ্রহের জিনিস দুটি। লোক দুজন মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তর্ক করে। পিকুশে কাচের ভেতর দিয়ে মানবজাতির ভবিষ্যৎকে দেখতে পায় অস্পষ্ট। অথচ বোভার তাকে দেখে উজ্জ্বল :

> আধুনিক মানুষ উন্নতি করছে। এশিয়ার দ্বারা ইউরোপ পুনরুজ্জীবিত হবে। ইতিহাসের নিয়ম যে সভ্যতা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের দিকে সরে যাবে, শেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে মানবতার দুই রূপ।[১]

এটি অবধারিতভাবে কুইনেটের প্রতিধ্বনি। তা আরেক দফা উৎসাহ এবং বিভ্রম বিলোপের আরেক বৃত্তের শুরুর প্রতিনিধিত্ব করে; যার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে ওই দুজন ফ্লবেয়ারের উল্লেখ ইঙ্গিত করে যে, বোভার-এর অন্যান্য আগাম প্রকল্পের মতো এটিও বাস্তবতার দ্বারা রুক্ষভাবে বাধাপ্রাপ্ত—এবার জেন্ডার্মেসের আকস্মিক আবির্ভাবে, যে তার বিরুদ্ধে মাত্রাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অভিযোগ তোলে। কয়েক ছত্র পরে আমাদের আগ্রহের দ্বিতীয় ব্যাপারটি দেখা দেয়। বোভার ও পিকুশে দুজনই পরস্পরের নিকট স্বীকার করে যে তাদের উভয়েরই গোপন আকাঙ্ক্ষা হলো পুনর্বার নকলনবিশ হওয়া। তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য একটা ডাবল টেবিল বানায়, বই-পুস্তক, পেনসিল ও ইরেজার কিনে আনে এবং পুরানো কাজেই ফিরে যায়। সরাসরি জ্ঞান প্রয়োগ ও তার মধ্যে জীবনযাপনের পরিবর্তে তারা শেষ পর্যন্ত সাদামাটাভাবে এক পুস্তক থেকে অন্য পুস্তকে জ্ঞান স্থানান্তরিত করার সরল কাজে সংকুচিত ও স্থিত হয়।

যদিও বোভারের ভবিষ্যৎ কল্পচিত্রে এশিয়া কর্তৃক ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি পুরোপুরি প্রকাশিত হয়নি, তবু একে এবং নকলনবিশের ডেস্কে যা আসে তাকেও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে উজ্জ্বল করা সম্ভব। দুই ভদ্রলোকের অন্যান্য ভবিষ্যৎ কল্পচিত্রের মতো এ চিত্রও বিশ্বজনীন এবং পুনর্গঠনমূলক : একটি নির্দিষ্ট কাল্পনিক ভবিষ্যৎ-দর্শন অনুযায়ী কখনো কখনো বিশেষ বৈজ্ঞানিক কৌশলে পৃথিবী পুনর্গঠনের দিকে উনিশ শতকের যে পক্ষপাতমূলক অনুরাগ অনুভব করেছেন ফ্লবেয়ার এটি তারই প্রতিনিধিত্ব করে। ফ্লবেয়ারের মনের মধ্যে ছিল সেইন্ট-সাইমন ও ফোরিয়ারের উদ্ভট কল্পনা, কোঁতের মানবজাতির বৈজ্ঞানিক পুনরুজ্জীবন, আদর্শবাদী, বাস্তববাদী, অধ্যাত্মসাধক, ঐতিহ্যবাদী ও দেসুত দ্য ট্রেসি, ক্যাভানিস, মিশেলেট, কজিন, প্রধুন, কর্নেট, ক্যাবেই, জ্যানেট ও লামেনেইজের মতো ভাববাদীদের দ্বারা প্রচারিত কৌশলগত ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মমত।[২] উপন্যাসে বোভার ও পিকুশে একের পর এক এসব ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন হেতু অবলম্বন করে; তা শেষ করার পর নতুন আরেকটার খোঁজ শুরু করে। তবে কখনো ভালো ফলাফল জোটে না।

এ-জাতীয় পুনর্বিবেচনাভিত্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূল বিশেষ দিক থাকে রোমান্টিক। এখানে স্মরণ করা দরকার, শেষ আঠারো শতকের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকল্পগুলো একটি বিশেষ মাত্রা পুনর্জাগ্রত ঈশ্বরতত্ত্ব—এম এইচ অব্রাহামের ভাষায়—প্রাকৃতিক অতিপ্রাকৃতবাদ হয়ে দেখা দেয়। এ ধরনের চিন্তাভাবনা সামনে নিয়ে আসে উনিশ শতকের যে গতানুগতিক মনোভাব, ফ্লবেয়ার তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন তার উপন্যাসে। অতএব, পুনরুজ্জীবনের ধারণা পেছন ফিরে ডেকে আনে :

> সুস্পষ্ট রোমান্টিক প্রবণতা, যুক্তিবাদ ও আলোক পর্বের শিষ্টতার পর...পুরোদস্তুর নাটক, খ্রিষ্টীয় গল্পকথা ও মতবাদের রহস্যের দিকে ভয়ংকর সংঘাত ও খ্রিষ্টীয়

> অন্তর্জীবনের দ্রুত বিশৃঙ্খল প্রত্যাবর্তন, চরম ধ্বংস ও পরম সৃষ্টি, দোজখ ও বেহেশত, পরবাস ও পুনর্মিলন, দুঃখবোধ ও আনন্দ, হারানো বেহেশত ও ফিরে পাওয়া বেহেশত-এর দিকে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু যেহেতু তারা আলোকপর্বের পরে জীবনধারণ করেছেন, তাই রোমান্টিক লেখকগণ ওই সব প্রাচীন বিষয়গুলো পুনরুজ্জীবিত করেন একটু ভিন্নভাবে। এরা মানব ইতিহাস ও নিয়তির সামগ্রিক মতামত, অস্তিত্ববাদী দ্বৈততা, তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য, মৌলিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পুনর্জাগ্রত করার মধ্য দিয়ে এগুলো বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৩]

এশিয়া কর্তৃক ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের ধারণাটি বোভারের মন অধিকার করে ছিল, যা খুবই প্রভাবশালীভাবে রোমান্টিক। ফ্রেডরিক শ্লেগেল ও নোভালিস তার দেশবাসী এবং সামগ্রিকভাবে সকল ইউরোপীয়কে আহ্বান জানান ভারত সম্পর্কে বিস্তৃত অধ্যয়নের জন্য। কারণ, তারা বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মই পশ্চিমা সংস্কৃতির বস্তুবাদ ও যান্ত্রিকবাদ (প্রজাতন্ত্রবাদকে) পরাভূত করতে পারে এবং এই পরাজয় থেকে জন্ম নেবে নতুন, নবপ্রাণাবেগে জাগ্রত ইউরোপ; মৃত্যু, পুনর্জন্ম, সংশোধন প্রভৃতি বাইবেলীয় বিষয়ও এ পরামর্শে উপস্থিত। এ ছাড়া রোমান্টিক সাম্যবাদী প্রকল্প কোনো সাধারণ প্রবণতার তুচ্ছ উদাহরণমাত্র নয় বরং এটি প্রবণতার শক্তিশালী গঠনকারক–যা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন রেমন্ড স্কোয়াব লা রেনেসাঁ অরিয়েন্টাল গ্রন্থে। কিন্তু এশিয়া নিজে জরুরি ব্যাপার নয়। জরুরি হলো আধুনিক ইউরোপ কর্তৃক এশিয়াকে ব্যবহার করার ব্যাপারটি। শ্লেগেল বা ফ্রাঞ্জবপ-এর মতো যে কোনো প্রাচ্য ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে, সেই পরিণত হয় আধ্যাত্মিক গুরু, অভিযানকারী নাইটে, যে ইউরোপে নিয়ে আসবে হারিয়ে যাওয়া পবিত্র মিশনের বোধ। ফ্রবেয়ার কর্তৃক চিত্রিত পরবর্তীকালের অসাম্প্রদায়িক ধর্মমত ওই বোধই বহন করেছে উনিশ শতকে। শ্লেগেল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শ্যাতোব্রাঁর চেয়ে কিছু কম যাননি। অগাস্ট কোঁতে, বোভারের মতোই তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক উত্তর-আলোকপর্ব মিথের প্রতি আসক্ত, যার বহিরেখা নির্ভুলভাবেই খ্রিষ্টীয়।

বোভার ও পিকুশেকে শুরু থেকে নিম্নমানের সমাপ্তি পর্যন্ত হাস্যকরভাবে পুনর্বিবেচনার ধারণার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে দিয়ে ফ্লবেয়ার আসরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্বাভাবিক মানবিক ত্রুটির প্রতি। তিনি পরিষ্কার দেখতে পান যে 'এশিয়া কর্তৃক উজ্জীবিত ইউরোপ'–এর আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে গুপ্ত ও অত্যন্ত ক্ষতিকর আত্ম-অহমিকা। এক বিশাল ভৌগোলিক উপনিবেশের সঙ্গে লেনদেন করা এবং একে ব্যবস্থাপনাযোগ্য সত্তায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে কল্প-দৃষ্টিভিত্তিক কৌশল ছাড়া 'ইউরোপ' বা 'এশিয়া' আর কিছুই নয়। অতএব, ইউরোপ ও এশিয়া হলো 'আমাদের' ইউরোপ 'আমাদের' এশিয়া। শোপেন হাওয়ারের ভাষায়–আমাদের 'ইচ্ছা' ও 'প্রতিনিধিত্ব'।

ইতিহাসের নিয়ম বাস্তবে ঐতিহাসিকের নিয়ম; ঠিক যেমন 'মানবতার দুই রূপ' প্রকৃত বাস্তবতার প্রতি ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, যতটা করে মানবসৃষ্ট পার্থক্যকে অলঙ্ঘনীয় করার ব্যাপারে ইউরোপের ক্ষমতার প্রতি। 'শেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে' বাক্যাংশটির শেষ অংশের ক্ষেত্রে বলা যায়, ওখানে ফ্লবেয়ার ব্যঙ্গ করেছেন বাস্তবতার সঙ্গে বিজ্ঞানের উল্লসিত একাত্মতাকে; এ হলো সেই বিজ্ঞান, যা মানবীয় সত্তাকে ব্যবচ্ছেদ করে গলিয়ে ফেলে যেন তা কোনো নিশ্চল বস্তু। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানকে ব্যঙ্গ করেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন অত্যুৎসাহী ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে, যার বিজয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ব্যর্থ বিপ্লব, যুদ্ধ, দমন এবং কুইকজোটীয় ধরনে বিরাট বিরাট কেতাবি কল্পচিন্তা ত্বরিতে কাজে নামিয়ে দেওয়ার অশিক্ষণীয় আকাঙ্ক্ষাকে। এ-জাতীয় বিজ্ঞান বা জ্ঞান তার নিজস্ব গভীরতর শেকড়ের কু-সারল্য এবং বাস্তবের বাধাকে কখনো হিসেবে আনেনি। বোভার যখন বিজ্ঞানীর ভূমিকা নেন, তখন তিনি আন্দাজ করেন যে বিজ্ঞান কেবল বাস্তবতা, বিজ্ঞানী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নাকি বোকা, তা কোনো ব্যাপার নয় তার কাছে। তিনি (এবং যারা তার মতো ভাবে তাদের কেউ) চিন্তা করেন না যে প্রাচ্য ইউরোপকে পুনর্জাগ্রত নাও করতে পারে, কিংবা ইউরোপও হলুদ বা বাদামি এশিয়ার রঙে প্রজ্জ্বলিত নাও হতে পারে। মোটকথা, এ রকম একজন বিজ্ঞানী, তার বিজ্ঞানে আত্মকেন্দ্রিক ইচ্ছার ক্ষমতা মানতে চান না। এ অবস্থাটি তার ধৈর্য বাড়ায়, দূষিত করে উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে।

এখানে ফ্লবেয়ার দেখেন, তার বোকা চরিত্রগুলো সৃষ্টি হয়েছে এ জটিলতায় নাক ঘষার জন্য। বোভার ও পিকুশে এ শিক্ষাই লাভ করে যে ভাব-কল্পনা ও বাস্তবতা একসঙ্গে আনা-নেওয়া না করাই ভালো। উপন্যাসের সমাপনী দৃশ্যে দেখা যায়, ওরা দুজন এখন গ্রন্থ থেকে তাদের প্রিয় ভাবকল্পনাগুলো কাগজে নকল করার কাজ নিয়ে পূর্ণ তৃপ্ত। জ্ঞান আর বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে না। জ্ঞান হলো যা এক গ্রন্থ থেকে অন্য গ্রন্থে নিঃশব্দে, মন্তব্য ছাড়া স্থানান্তরিত। কল্পনা বা ধারণা প্রজননে বাড়ে এবং নামহীন ছড়িয়ে পড়ে, কোনো ফলোৎপাদন ছাড়াই পুনরাবৃত্ত হয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ওগুলো ওখানে আছে, পুনরাবৃত্ত হওয়ার জন্য, সমালোচনাহীন, প্রতিধ্বনিত হওয়ার জন্য।

বোভার এ পিকুশে-এ জন্য ফ্লবেয়ারের নোট বই থেকে নেওয়া ওপরের ঘনীভূত পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে আভাসিত করে আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের কাঠামো, যা অসাম্প্রদায়িক (ও আধা-ধর্মীয়) উনিশ শতকীয় ইউরোপীয় বিশ্বাসের একটি অধ্যয়নক্ষেত্র। মধ্যযুগ ও রেনেসাঁর মাধ্যমে হস্তান্তরিত প্রাচ্যতত্ত্বের সুযোগ-সুবিধাদি এরই মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ইসলামই ছিল অনিবার্য প্রাচ্য। আঠারো শতকে কিছুসংখ্যক নতুন, পরস্পর আবদ্ধ উপাদান আগত গসপেলীয় পর্বে আভাসিত হচ্ছিল। এ কারণে প্রাচ্য উল্লেখযোগ্যভাবে উন্মোচিত হচ্ছিল ইসলামি

অঞ্চলের বাইরের পৃথিবীর নিকট। পৃথিবীব্যাপী ইউরোপীয় অভিযানসমূহই এই গুণগত পরিবর্তনের প্রধানতম কারণ। ভ্রমণসাহিত্য, কাল্পনিক রচনা, নৈতিক অভিযান, বৈজ্ঞানিক তথ্য অবহিতকরণ-প্রক্রিয়া প্রাচ্যকে আরও তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করে। প্রাচ্যতত্ত্ব যদি শতকের শেষ তৃতীয়াংশে অ্যাঁকুইতিল ও জোনসের প্রাচ্যবিষয়ক ফলপ্রসূ আবিষ্কারসমূহের কাছে ঋণী হয়ে থাকে, তাহলে একে বিস্তৃত পটভূমিতে বিবেচনা করতে হবে কুক ও বুগেইন ভিল, টর্নফোর্টে ও এন্ডারসনের অভিযান এবং প্রেসিডেন্ট ডি ব্রসেসের নৌ অভিযানবিষয়ক রচনা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্যবসায়ী, আমেরিকা ও চায়নায় জেসুইট মিশনারি, উইলিয়াম ড্যামপিয়েরের আবিষ্কার ও রিপোর্ট এবং ইউরোপে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে দৈত্য, দানব, আদিম, বর্বর স্থানীয়দের অস্তিত্ব সম্পর্কে অসংখ্য অনুমান আখ্যানের সৃষ্টিরূপে।

তবে এসব উন্মোচিত দিগন্ত কেবল সুবিধাজনক কেন্দ্রে স্থিত মূল পর্যবেক্ষক (অথবা গোল্ড স্মিথের–প্রধানত পর্যবেক্ষিত 'পৃথিবীর নাগরিক') ইউরোপের অধিকার। কারণ ইউরোপ যতই বাইরের দিকে প্রসারিত হচ্ছিল, ততই রক্ষণশীল হচ্ছিল তার সাংস্কৃতিক বোধ। কেবল বড় বড় ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমেই নয়, পর্যটকদের কাহিনি থেকেও উপনিবেশ সৃষ্টি হয়, জাতিগত অহংকারকেন্দ্রিক পরিপ্রেক্ষিত হয় সুরক্ষিত।[৪] কেবল পর্যটক ও আবিষ্কারকেরাই নয়, ঐতিহাসিকেরাও বিচ্ছিন্ন ও অজানার প্রতি আরেকটি জ্ঞানাহরণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি প্ররোচিত করে; তাদের কৃতিত্বের কারণেই ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা লাভ-ক্ষতির হিসেবেও অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে তুল্য হতে পারে। আঠারো শতকের ঐতিহাসিক নৃতত্ত্বের এই শক্তিশালী প্রবাহ ও পণ্ডিতদের বর্ণনায় ঈশ্বরদের সংঘাত, নির্দেশ করে যে গিবন ইসলামের উত্থানে রোমের অধঃপতনের মধ্যে নিহিত শিক্ষা পাঠ করতে পেরেছিলেন। যেমন আধুনিক সভ্যতাকেও বুঝতে পারেন তাদের বর্বর, কাব্যিক, চটকদার পূর্ববর্তী সূচনাসমূহ থেকে। অথচ রেনেসাঁর ইতিহাসকারেরা কঠোর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচ্যকে শত্রুজ্ঞান করেন; বিশেষত যারা আঠারো শতকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থেকে প্রাচ্যের বস্তু-বিষয়াদি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রাচ্যের উদ্ভট্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে এর ফলে নিজেদের ভালো করে জানার সুযোগ পায় ইউরোপীয়রা। জর্জ সেলেসের কোরআন অনুবাদ এবং সংযোজিত প্রাথমিক আলোচনা এ পরিবর্তনের পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে। তার পূর্বসূরিদের মতো না করে সেলেস আরব ইতিহাস বিচারের চেষ্টা করেন আরব উৎসের আলোকে। এ ছাড়া তিনি পবিত্র গ্রন্থের মুসলিম ভাষ্যকারদের নিজেদের কথা বলারও সুযোগ করে দেন।[৫]

আসলে গোটা আঠারো শতকে কেবল সেলেসের সরল তুলনা প্রক্রিয়াই তুলনামূলক অধ্যয়নের (ভাষাতত্ত্ব, শারীরসংস্থান বিদ্যা, আইন ও বিচার, ধর্মতত্ত্ব) আদি ধাপ, যা উনিশ শতকের তুলনামূলক পদ্ধতিতে প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়।

কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদদের ঝোঁক ছিল তুলনামূলক আলোচনা এবং এর মধ্য দিয়ে পেরু থেকে চীন পর্যন্ত মানবজাতিকে ন্যায়সংগতভাবে পর্যবেক্ষণের পরিবর্তে সহানুভূতির সঙ্গে চিহ্নিতকরণের প্রতি। আমরা এখন যাকে হিস্টরিসিজম বলি তা আঠারো শতকের ধারণা। ভিকো, হার্ডার, হামনি ও অন্যরা বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি সংস্কৃতি উপাদানের দিক থেকে ও অভ্যন্তরীণভাবে সংসক্তিসম্পন্ন–এক রকম প্রেরণা, বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ও ভাবাদর্শ দ্বারাগ্রন্থবদ্ধ। ঐতিহাসিক সহানুভূতি লালন করলেই একজন বহিরাগতের পক্ষে ওই প্রাণশক্তি বা ভাবাদর্শের ভেতরে প্রবেশ সম্ভব। তাই হার্ডারের গ্রন্থ (*Ideen zur philosophie der Geschichte der menscheit*; ১৭৮৪-১৭৯১) হয়ে ওঠে বিভিন্ন সংস্কৃতির মনোরম চিত্রবৎ প্রদর্শনী। তার প্রতিটিতে প্রবেশ করা হয়েছে বিরোধাত্মক, সৃজনশীল মনোভাব নিয়ে; প্রতিটি কেবল সেই পর্যবেক্ষকের পক্ষেই প্রবেশযোগ্য, যিনি তার সংস্কার ত্যাগ করেছেন। হার্ডার ও অন্যান্যদের প্রভাবে জনপ্রিয় ও বহুত্ববাদী ইতিহাসবোধে উদ্বুদ্ধ যে কেউ পশ্চিম ও ইসলামের মাঝখানে দাঁড় করানো মতবাদের দেয়ালটি অমান্য করতে পারেন এবং প্রাচ্যের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কের অনেক লুক্কায়িত উপাদান প্রত্যক্ষ করতে পারেন।[৬] সহানুভূতির সঙ্গে চিহ্নিতকরণের বিখ্যাত উদাহরণ নেপোলিয়ন নিজেই। আরেক উদাহরণ মোজার্ট; দি ম্যাজিক ফ্লুট ও অ্যাবডাকশন ফ্রম দ্য সেরিগ্লিওতে প্রাচ্যে সহজ মানবতাবাদের বিকাশ চিহ্নিত করা যায়। ফ্যাশনেবল প্রকৃতির তুর্কি মিউজিকের চেয়ে এটিই প্রাচ্যের দিকে অধিক আকর্ষণ করে মোজার্টকে।

প্রাচ্যকে অদ্ভুত রহস্যময়তার দেশরূপে প্রতিনিধিত্ব করার প্রাক-রোমান্টিক ও রোমান্টিক ধারার গোটা স্রোত থেকে মোজার্টের প্রাচ্যের ওই রকম সংজ্ঞাকে আলাদা করা নিতান্তই দুরূহ। শেষ আঠারো শতক ও উনিশ শতকের শুরুর পর্বে জনপ্রিয় প্রাচ্যতত্ত্ব উল্লেখযোগ্য তীব্রতার চলতি রীতি অর্জন করে। কিন্তু উইলিয়াম বেকফোর্ড, বায়রন, থমাস, মুর, গ্যোয়েটের মধ্যে সহজেই শনাক্তযোগ্য ওই চলতি রীতিকেও গথিক কাহিনি, আধা-মধ্যযুগীয় রাখালিয়া কাব্য, বর্বর জাঁকজমক ও নিষ্ঠুরতার প্রতি আগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। এভাবে প্রাচ্যতত্ত্বকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিরানেসির কারাগার, অন্য ক্ষেত্রে টিওপোলোর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ, আবার অন্য কোনো ক্ষেত্রে আঠারো শতকের অদ্ভুত উৎকর্ষময় চিত্রকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যায়।[৭] পরে উনিশ শতকে ডেলাক্রোয়ের রচনা এবং অন্যান্য বহু ফরাসি ও ব্রিটিশ চিত্রকরের কাজে প্রাচ্যবিষয়ক সাধারণ তথ্য-ছকের তথ্য দর্শনযোগ্যতা লাভ করে। (এ গ্রন্থে সে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি)। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভীতি, মহত্ত্ব, কাব্যিক আনন্দ, নিবিড়শক্তি; শেষ আঠারো শতকের ইউরোপে প্রাক-রোমান্টিক, প্রাক-টেকনিক্যাল প্রাচ্যতাত্ত্বিক কল্পনার অস্তিত্ব হিসেবে প্রাচ্যদেশীয় ছিল সত্যিই বর্ণচোরা গিরগিটির প্রকৃতির সমতুল্য।[৮] কিন্তু এই মুক্ত প্রাচ্য অচিরেই আবৃত হয়ে পড়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যতত্ত্বের দ্বারা।

আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিক কাঠামোর প্রস্তুতিস্বরূপ চতুর্থ উপাদানটি ছিল প্রকৃতি ও মানুষকে বিভিন্ন আদর্শে বিভাজিত করার সামগ্রিক তাড়না। এ পর্যায়ের বিখ্যাত নাম লিনিয়াস ও বাফুন। তবে যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ায় দৈহিক (এবং অচিরেই নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক) বিস্তার– কোনো বস্তুর আদর্শ বস্তুত্বকে কেবল দৃশ্যগ্রাহ্য ব্যাপার থেকে এর প্রকৃতিগত উপাদানের যথাযথ পরিমাপে রূপান্তর করা সম্ভব নয়, তা ছড়িয়ে পড়েছিল বিস্তৃতভাবে। লিনিয়াস বলেন, কোনো আদর্শ বা শ্রেণি সম্পর্কে যেকোনো উল্লেখ 'হওয়া উচিত কোনো সংখ্যা, আকার, হার ও অবস্থার উপাদান'। প্রকৃতপক্ষে কান্ট বা ডিডেরট বা জনসনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নাটকীয় মধ্য দিয়ে করার বিপুলসংখ্যক বস্তুপুঞ্জকে অল্প কিছু বিন্যাসযোগ্য ও বর্ণনাযোগ্য নমুনা বা শ্রেণিতে সংকুচিত করে আনার প্রবণতা সর্বত্র সক্রিয়। প্রকৃতির ইতিহজাস, নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সাধারণীকরণে শ্রেণি বা নমুনার আছে একটি নির্দিষ্ট চরিত্র, যা পর্যবেক্ষককে সরবরাহ করে একটি আখ্যা বা নাম এবং ফুকোর ভাষায়–'একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যুৎপত্তি'। এসব আদর্শ বা শ্রেণি বা নমুনা ও চরিত্র একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও সাধারণীকরণের একটি নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত।

এভাবে সব আখ্যা সম্ভাব্য অন্য সব নাম বা আখ্যার সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কের মাধ্যমে অর্জিত হতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি (বা বস্তুতে) কী আছে, তা যদি কেউ জানতে চায় তবে তার সামনে থাকে অন্য সবকিছুর শ্রেণিবিভাজন বা শ্রেণিবিভাজনের সম্ভাবনা।[৯]

দার্শনিক, ঐতিহাসিক, জ্ঞানকোষ লেখক ও প্রাবন্ধিকদের লেখায় আমরা দেখি মনস্তাত্ত্বিক- নৈতিক শ্রেণিবিভাজনে আখ্যারূপ চরিত্র ব্যবহৃত হয় : যেমন পাগলা মানুষ, ইউরোপীয়, এশীয় ইত্যাদি। লিনিয়াসে তা সুলভ তো বটেই, এমনকি মন্টেস্কু, জনসন, ব্লুমেনবাখ, সোয়েমারিং, কান্টেও এর দেখা মেলে। মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য কমবেশি সমানভাবে বণ্টিত হয়। আমেরিকানরা 'লালচে, মেজাজি, ঋজু', এশীয়রা 'হলুদ, বিষণ্ন, একগুঁয়ে', আফ্রিকানরা 'কালো, নিরাবেগ, নীতিবোধহীন' ইত্যাদি। কিন্তু উনিশ শতকে এগুলো উৎপত্তিগত জেনেটিক বৈশিষ্ট্যরূপে চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করে। যেমন–ভিকো ও রুশোর মধ্যে নৈতিক সাধারণীকরণের শক্তি বৃদ্ধি পায় যথার্থের দ্বারা; এর সঙ্গে বর্তমান নৈতিক, দার্শনিক এমনকি ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাপারগুলোর উৎপত্তি হিসেবে দেখানো হয় নাটকীয়, প্রায় প্রত্ন-চরিত্র যেমন–আদিম মানুষ, দৈত্য, বীর নায়ক ইত্যাদিকে। তাই যখন কোনো প্রাচ্যদেশীয়র কথা বলা হয়, তখন তা বলা হয় তার 'আদিম' অবস্থা, তার মূল চরিত্র, তার বিশেষ আত্মিক পটভূমি হিসেবে বিবেচিত ওই সব উৎপত্তিগত সর্বজনীনের আলোকে।

বিস্তৃতি, ঐতিহাসিক সংঘাত, সহানুভূতি, শ্রেণিবিন্যাস আমার আলোচিত এ চারটি উপাদান আঠারো শতকের চিন্তাস্রোতের ব্যাপারে; এগুলোর উপস্থিতির ওপরই নির্ভর

করে আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। আমরা এখন দেখাব যে এগুলো ছাড়া প্রাচ্যতত্ত্ব সম্ভব হতো না। এর আগে সামগ্রিকভাবে প্রাচ্য, বিশেষভাবে ইসলাম পশ্চিমা খ্রিষ্টীয় সমাজের সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের বিচার-বিবেচনায় বন্দী ছিল। এই সংকীর্ণতা থেকে প্রাচ্যের মুক্তির ক্ষেত্রেও ওই সব উপাদান ভূমিকা রেখেছে। অন্য কথায়, আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব বিকশিত হয়েছে আঠারো শতকের ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিসাম্প্রদায়িকীকরণের মধ্য দিয়ে। এক, প্রাচ্যতত্ত্ব ভৌগোলিকভাবে আরও পুবের দিকে এবং জাগতিকভাবে আরও অতীতের দিকে সরে যাওয়ায় তার প্রাচীন কাঠামো উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি লুপ্ত হয়ে যায়। তথ্যসূত্র হিসেবে এখন আর সংযত ক্যালেন্ডার ও ম্যাপসমৃদ্ধ ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম নয় বরং ইন্ডিয়া, চীন, জাপান, সুমেরু, বৌদ্ধধর্ম, সংস্কৃত, জুরস্ত্রিয়ানবাদ ও মনু প্রভৃতি উল্লিখিত হয়। দুই, ইতিহাস নিজে পূর্বের চেয়েও বিপ্লবাত্মক হয়ে ওঠায় অ-ইউরোপীয় ও অখ্রিষ্টান, ইহুদি সংস্কৃতির সঙ্গে লেনদেন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; ইউরোপকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধির অর্থ হলো ইউরোপ ও তার প্রবেশ অযোগ্য পার্থিব ও সাংস্কৃতিক সীমান্তসমূহের মধ্যকার উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক অনুধাবন করা। এক অর্থে জন অব সেগোভিয়ার সম্মিলনের ধারণা বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তবে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িকভাবে। গিবন অবশ্য মোহাম্মদকে (সা.) ইউরোপকে প্রভাবিত করেন–তবে জাদু ও ভূত-ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা শয়তান, দুর্বৃত্তরূপে নয়। তিন, বাছাইকৃত কিছু ভিন্ন অঞ্চল ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ আত্ম ও আত্মপরিচয়কেন্দ্রিক একগুঁয়ে মনোভাব ক্ষয় করে আনে, যা শেষ পর্যন্ত জড়ো হয় বর্বরের দঙ্গলের বিরুদ্ধে লড়াকু এক সম্প্রদায়ে। খ্রিষ্টীয় ইউরোপের সীমান্ত এখন আর কোনো আবগারি অফিসের মতো নয়। মানুষের সঙ্গ ও মানুষের সম্ভাবনা প্রাদেশিকতার বিপরীতে অর্জন করে খুবই বিস্তৃত সর্বজনীন বৈধতা। চার, আখ্যা ও উৎস–ভিকোর ভাষায়–খ্রিষ্টীয় ও পবিত্র জাতির বর্গীয় গণ্ডির বাইরে পরিশোধিত হওয়ায় মানবজাতির শ্রেণিবিভাজন পদ্ধতিভিত্তিকভাবেই বহুগুণে বেড়ে যায়; জাতি, বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক উৎস, মেজাজ-মানসিকতা, চরিত্র ও আদর্শ নমুনা প্রচলিত খ্রিষ্টান ও অন্য সবার মধ্যে পার্থক্য গ্রাস করে ফেলে।

কিন্তু যদি এই আন্ত-সম্পর্কিত উপাদানসমূহ অসাম্প্রদায়িকীকরণ প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব কওে, তবে এর অর্থ এই নয় যে মানবীয় ইতিহাস ও নিয়তির পুরোনো ধর্মীয় ধরন এবং 'অস্তিত্ববাদী প্যারাডাইম' একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে বরং উল্টো ওগুলো সদ্য প্রতিষ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক কাঠামোয় পুনর্জীবিত, পুনর্বণ্টিত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়। যিনি প্রাচ্যতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছেন, তারই প্রয়োজন হয়েছে ওই কাঠামোর সঙ্গে মানানসই শব্দভান্ডার। তবে প্রাচ্যতত্ত্ব যদি ওই শব্দভান্ডার, ধারণাগুচ্ছ এবং কৌশল সরবরাহ করে থাকে তাহলে তার কারণ এই যে আঠারো শতকের শেষ থেকে

প্রাচ্যতত্ত্ব ছিল ওই শব্দভান্ডার, ধারণাগুচ্ছ ও কৌশলই এবং এ তত্ত্ব যুগে তা-ই করে। প্রাচ্যতত্ত্ব তার ডিসকোর্সে ধরে রাখে একটি অবিচ্যুত স্রোত, একটি পুনর্গঠিত ধর্মীয় তাড়না, প্রাকৃতায়িত অতিপ্রাকৃত আবহ। আমি দেখানোর চেষ্টা করব প্রাচ্যতত্ত্বের এই তাড়নার বাস প্রাচ্যতাত্ত্বিকের আত্মধারণা, প্রাচ্যসম্পর্কিত ধারণা ও তার রীতিনীতি-সম্পর্কিত উপলব্ধিতে।

আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিক মনে করেন, তিনি প্রাচ্যকে অস্পষ্টতা, বিচ্ছিন্নতা ও অচেনা অবস্থা থেকে উদ্ধারের নায়ক। এগুলোর ওপর তিনিই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করেন। তার গবেষণা প্রাচ্যের হারানো ভাষা, এমনকি মানসিকতাও পুনর্গঠিত করে, যেমন– রোসেটা স্টোন থেকে মিসরীয় হায়রোগ্লিফিক লেখা পুনর্গঠিত করেন শ্যাঁপোলিয়ঁ। অভিধানবিদ্যা, ব্যাকরণ, অনুবাদ, সংস্কৃতির অর্থবিশ্লেষণ প্রভৃতি প্রাচ্যতাত্ত্বিক কৌশল প্রাচীন ধ্রুপদ প্রাচ্য এবং ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, বাগ্মিতা, বিতর্কমূলক নীতিতত্ত্ব জাতীয় প্রথাগত জ্ঞান শাখা–এই উভয়ের মূল্যবোধকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, পুনরায় তা ঘোষণা করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বিকভাবে পরিবর্তিত হয় প্রাচ্য ও প্রাচ্যতত্ত্ব; কারণ এগুলো তাদের আসলরূপে টিকতে পারত না। প্রাচ্যকে এমনকি সচরাচর প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা যে ধ্রুপদ প্রাচ্যকে অধ্যয়ন করেন, তাকেও আধুনিকায়িত করে বর্তমান সময়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়, প্রথাগত বিষয়গুলোকে নিয়ে আসা হয় সমকালীন সংস্কৃতিতে। উভয়ই বহন করে ক্ষমতার অনিবার্য ছাপ, প্রাচ্যকে পুনর্জন্ম প্রদানের এমনকি সৃষ্টির ক্ষমতা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসর ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক কৌশলসমূহে মিশে থাকা সাধারণীকরণের অপার ক্ষমতা। সংক্ষেপে, প্রাচ্যকে আধুনিকতার মধ্যে টেনে আনার পর অসাম্প্রদায়িক স্রষ্টা হিসেবে তার পদ্ধতি ও অবস্থানকে উদ্‌যাপন করতে পারেন প্রাচ্যতাত্ত্বিক–নতুন পৃথিবীর স্রষ্টা প্রাচ্যতাত্ত্বিক, একদা যেমন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন পুরোনো পৃথিবী। এই পদ্ধতিকে ব্যক্তি প্রাচ্যতাত্ত্বিকের জীবনকাল পার হয়ে পরবর্তী প্রজন্মেও আসতে হয় বলে তার পরম্পরার একটি অসাম্প্রদায়িক ভিত্তি থাকবে, যার বংশপরম্পরা রক্তের সম্পর্ক নয় বরং সর্বজনীন ডিসকোর্স, একটি লাইব্রেরি, গৃহীত একগুচ্ছ ভাবাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফ্লবেয়ার বুঝতে পেরেছিলেন, প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা একদা নকলনবিশ হয়ে উঠবে, বোভার ও পিকুশের মতো। কিন্তু প্রথম যুগে সিলভেস্ত্রা ডি সেসি ও রেনানের সময় এ রকম বিপদ স্পষ্ট ছিল না।

আমার বক্তব্য এই যে আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকের তত্ত্ব ও চর্চা (যা থেকে আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের উদ্ভব) কোনো আকস্মিক উদ্দেশ্যমুখী জ্ঞান নয়; একে অতীত থেকে চলে আসা কাঠামোগুচ্ছ হিসেবে বোঝা সম্ভব, যাকে অভিযোজিত, সংস্কারকৃত ও অসাম্প্রদায়িক চেহারা দেওয়া হয় ভাষাতত্ত্বের মতো বিষয়ের সহায়তায়; এর বদলে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও খ্রিষ্টীয় অতিপ্রাকৃতবাদের বিকল্পরূপে (বা সংস্করণরূপে)

প্রাকৃতায়িত ও আধুনিক হয়। এই কাঠামোর সঙ্গে খাপখাইয়ে নেওয়া হয় নতুন রচনাগুচ্ছ ও ভাবাদর্শরূপী প্রাচ্যকে।

আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের উদ্ভবে বিশেষ অবদান রাখেন জোনস ও অ্যাঁকুইতিলের মতো ভাষাতাত্ত্বিক ও অভিযানকারীরা। তবে আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বকে একটি জ্ঞান ক্ষেত্র, একগুচ্ছ আদর্শ ও একটি ডিসকোর্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা পরবর্তী প্রজন্মের কাজ। যদি নেপোলিয়নের অভিযানকে (১৭৯৮-১৮০১) আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব সম্ভব করে তোলার সূচনাকারী অভিজ্ঞতা হিসেবে বিচার করি তা হলে এর উদ্বোধক নায়ক সেসি, রেনান ও লেইনকে অভিহিত করা যায় এই জ্ঞান ক্ষেত্রের নির্মাতা, একটি ঐতিহ্যের স্রষ্টা, প্রাচ্যতাত্ত্বিক ভ্রাতৃত্ববোধের পূর্বপুরুষরূপে। রেননা, সেসি ও লেইন প্রাচ্যতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। তাদের অবদান কেবল তাদের কাজে নয়, তাদের গড়ে তোলা শব্দভান্ডার ও সৃষ্ট ধারণাগুচ্ছেও; প্রাচ্যতাত্ত্বিক হতে ইচ্ছুক এমন যে কেউ সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। প্রাচ্যতত্ত্বের এমন উদ্বোধন এক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এটি বৈজ্ঞানিক শব্দভান্ডার সম্ভব করে তোরে, অস্পষ্টতা দূর করে প্রাচ্যকে বিশেষ ধরনের এক দ্যুতি দেয়; প্রাচ্যতাত্ত্বিককে প্রাচ্যের অভিভাবক-স্থানীয় একটি অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে; বিশেষ ধরনের পস্পর সংসক্ত প্রাচ্যতাত্ত্বিক কাজের বৈধতা প্রদান করে; সাংস্কৃতিকভাবে ছড়িয়ে দেয় একধরনের আলোচনামূলক রীতি, যা এরপর থেকে প্রাচ্যবিষয়ক আলোচনার প্রাক-শর্ত বলে বিবেচিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, উদ্বোধকদের কাজ কেটে-ছেঁটে একটি অধ্যয়ন ক্ষেত্র ও একগুচ্ছ ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যা পরে সৃষ্টি করে একটি প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিত সম্প্রদায়। একদিকে এ সম্প্রদায়ের পরম্পরা, ঐতিহ্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রাচ্যতত্ত্বের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, আবার সর্বজনীন মর্যাদার প্রয়োজনে একই সঙ্গে তা হয়ে ওঠে বাইরের ব্যাপারও। উনিশ শতকে ইউরোপ প্রাচ্যের ওপর যত বেশি আধিপত্য বিস্তার করে, প্রাচ্যতত্ত্ব অর্জন করে তত বেশি গণবিশ্বাস। যদি এই অর্জনে তার আসলত্ব হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ শুরু থেকে প্রাচ্যতত্ত্বের মূল সুরই হলো পুনর্গঠন ও পুনরাবৃত্তি।

একটি চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ : আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের যেসব ব্যক্তিত্ব ধারণা ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমি কাজ করব, এই অধ্যায়ে তা সবচেয়ে ব্যাপকহারে ভূখণ্ড দখলের যুগের প্রথমবপর্বের বিস্তৃত বিবরণ–তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে পৃথিবীর ৮৫ শতাংশ ভূমিজুড়ে তার উপনিবেশ কায়েম করে ইউরোপ। এমন বললে ভুল হবে না যে আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদেরই একটি দিক মাত্র। তবু এটুকু বললেই বলা শেষ হয় না তা বলা প্রয়োজন বিশ্লেষণাত্মক ও ঐতিহাসিকভাবে। আমি দেখাতে চাই, কীভাবে প্রাক-ঔপনিবেশিক কালের দান্তে ও ডি হারবেলটের সচেতনতার মতো না করে, আধুনিক

প্রাচ্যতত্ত্ব স্তূপকরণের পদ্ধতিনির্ভর একটি উপায় বের করে। তার চেয়ে বড় কথা, এটি প্রাচতত্ত্বকে দেখায় মানুষ ও ভূখণ্ড দখলে বিপজ্জনকভাবে আগ্রহী সুশৃঙ্খল বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক প্রয়াসরূপে। লুপ্ত বা মৃত কোনো প্রাচ্য ভাষা পুনর্গঠনের অর্থ শেষ পর্যন্ত লুপ্ত বা উপেক্ষিত এক প্রাচ্যের পুনর্গঠন; এবং এর অর্থ এও যে পরবর্তীকালে প্রাচ্যের ভূমিতে সেনাবাহিনী, প্রশাসক ও আমলারা যা করবে, তার পথ তৈরি করা–পুনর্গঠনমুখী ওই যথার্থ, বিজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিক ও শৈল্পিক সাফল্যই নয়...এ প্রসঙ্গে এর পরবর্তীকালীন প্রায়োগিক ক্ষমতা এর প্রয়োজনীয়তা ও কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ। এ আলোচনা অবশ্যই ওই সব ব্যাপারেও গভীর মনোযোগ দাবি করে।

• খ •

সিলভেস্ত্র ডি সেসি ও আর্নেস্ত রেনান
যুক্তিনির্ভর নৃতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বের গবেষণাগার

সিলভেস্ত্র ডি সেসির জীবনে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মহতী উদ্যোগ এবং শিক্ষামূলক ও যৌক্তিক উপযোগিতার প্রতি নিবেদিত মনোভাব। ১৭৫৭ সালে নামকরা এক ইয়ানসেনিস্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এন্টনি-আইজাক সিলভেস্ত্র। প্রথম জীবনে এক বিডিস্টাইন মঠে প্রথমে আরবি; পরে সিরীয়, ক্যালডীয় ও হিব্রু ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ করে আরবি ভাষাই তার নিকট প্রাচ্যের দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়, যেহেতু জোসেফ রাইনোর মতে, তখন পর্যন্ত পবিত্র-অপবিত্র সব প্রাচ্যদেশীয় দলিলপত্র-নিদর্শনাদির সবচেয়ে প্রাচীন ও অবিকৃত রূপ পাওয়া যেত কেবল এ ভাষাতেই।[১১] ১৭৬৯ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য ভাষাবিষয়ক স্কুলে আরবির প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন সেসি। ১৮০৬ সালে কলেজ ডি ফ্রান্সের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, যদিও ১৮০৫ সাল থেকে ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবাসিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকের দায়িত্ব পালন করছিলেন (১৮১১ সাল পর্যন্ত বিনা বেতনে)। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তিনি গ্র্যান্ড আর্মির বুলেটিন ও নেপোলিয়নের ১৮০৬ সালের মেনিফেস্টো অনুবাদ করেন। ধারণা করা হয়েছিল, এসব লেখাজোখা পড়ে রুশ অর্থোডক্সের বিরুদ্ধে খেপে উঠবে গোঁড়া মুসলমানরা।

এর পর থেকে অনেক বছর ধরে সেসি প্রচুর অনুবাদক ও ভবিষ্যৎ পণ্ডিত তৈরি করেন। ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া দখলের পর স্থানীয়দের উদ্দেশে প্রদত্ত ফরাসি ঘোষণা অনুবাদ করেন তিনি। ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী প্রায়ই তার সাথে পরামর্শমূলক আলোচনা করতেন। পঁচাত্তর বছর বয়সে সেসি ইনস্ক্রিপশন একাডেমির সেক্রেটারি এবং রয়েল বিবলিওথিকের প্রাচ্যদেশীয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কিউরেটর নিযুক্ত হন। আধুনিক ফরাসি শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্গঠনের সাথে যথার্থেই সেসির নাম যোগ করা হয় তার জীবনব্যাপী অবদানের ভিত্তিতে।[১২] ১৮৩২ সালে কুভিয়েরের সাথে ফ্রান্সের নতুন পিয়ের ঘোষিত হন এন্টনি-আইজাক সিলভেস্ত্র ডি সেসি।

১৮২২ সালে প্রতিষ্ঠিত ফরাসি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন সিলভেস্ত্র ডি সেসি। তবে কেবল এ কারণে নয়, প্রাচ্যতাত্ত্বিক পেশার ক্ষেত্রে

প্রথমবারের মতো একরাশ পদ্ধতিভিত্তিক গ্রন্থ, শিক্ষামূলক রীতি, পণ্ডিতি ঐতিহ্য এবং পাণ্ডিত্যের সাথে রাষ্ট্রীয় নীতির একটি স্পষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার কারণেও সেসি আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের সূচনাকারী বলে অভিহিত হন। ভিয়েনের কাউন্সিলের পর ইউরোপে প্রথম তার লেখাতেই একটি পণ্ডিতি বিষয়ে আত্মসচেতন পদ্ধতিভিত্তিক নীতি কার্যকর হয়। তিনি সচেতন ছিলেন যে বিষয়টির পুনর্মূল্যায়নমুখী পণ্ডিতি কর্মসূচির সূচনাপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি–এক আত্মসচেতন উদ্বোধক। তিনি কাজ করেছেন অসাম্প্রদায়িক একজন ধর্মযাজকের মতো। তাই তার নিকট প্রাচ্য একটি মতবাদ আর তার ছাত্ররা এক একটি অঞ্চল (প্যারিস)-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ। সমকালীন ভক্ত ডুক ডি ব্রজলি মন্তব্য করেন, সেসির রচনা প্রাচীন বাইবেলবিষয়ক শিক্ষকের সাথে বৈজ্ঞানিকের কর্মপদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়েছে এবং সেসিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি–'বসেইর প্রয়াসের সাথে লাইবনিজের লক্ষ্য সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।'[১৩]

ঘটনাক্রমে তার সব রচনা ছাত্রদের সম্বোধন করে লেখা (১৭৯৯ সালে সমাপ্ত প্রথম কাজ প্রেঁইসিসড ডি গ্রামেইর জেনেরাল-এর বেলায় ছাত্র তার ছেলে), যার প্রথম লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ পর্যন্ত কৃত গুরুত্বপূর্ণ কাজের পুনর্মূল্যায়িত নির্যাস তুলে ধরা।

শিক্ষামূলক উপস্থাপনরীতি এবং পুনর্মূল্যায়ন ও সংক্ষেপণের মধ্য দিয়ে পুনরাবৃত্তি–এই দুই বৈশিষ্ট্য সেসির প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেসির লেখা সব সময় এমন অনুভূতি দেয় যেন একটি কণ্ঠ কথা বলছে। তার রচনা উত্তম পুরুষের সর্বনাম, আর ব্যক্তিক উপস্থিতিতে ভরা। এমনকি তৃতীয় শতকের সাসানিদ মুদ্রাবিজ্ঞান সম্পর্কে গভীরতর পণ্ডিতি মন্তব্য লেখার ধরন যেন পাঠকের কাছে সকণ্ঠ ঘোষণার মতো। প্রেঁইসিসড ডি গ্রামেইর জেনেরাল-এর ভূমিকায় তিনি ছেলের উদ্দেশে লিখেন : তোমার এসব জিনিস জানা দরকার বলে আমি এগুলো লিখছি (বা তোমাকে বলছি); যেহেতু এগুলো কোনো গ্রহণযোগ্যরূপে পাওয়া যায় না, তাই আমি নিজেই তোমার জন্য কাজটি করলাম। সরাসরি সম্বোধন, ব্যবহার উপযোগিতা, অব্যবহিত ও সহযোগিতার যুক্তিবোধ। কারণ সেসি বিশ্বাস করতেন বিষয় যত কঠিন ও অস্পষ্টই হোক সবকিছু স্পষ্ট ও যুক্তিসংগত করে তোলা সম্ভব। এখানে বসেইর দৃঢ়তা, লাইবনিজের বিমূর্ত মানবতাবাদ ও রুশোর টোন চমৎকার সমন্বিত।

সেসির কণ্ঠের এই প্রভাব তাকে ও তার পাঠককে একটি বলয়ে ঘিরে নিয়ে বাইরের পৃথিবী থেকে আলাদা করে রাখে, যেমন শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে বন্ধ শ্রেণিকক্ষ তৈরি করে একটি বিচ্ছিন্ন জগৎ। পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন বা ধ্রুপদ সাহিত্যের মতো নয় প্রাচ্যতত্ত্ব। এটি রক্ষণশীল অধ্যয়নক্ষেত্র; যারা এরই মধ্যে প্রাচ্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এ বিদ্যা কেবল তাদের জন্য–প্রাচ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে ভালো করে বোঝার প্রয়োজনে; এখানেই শিক্ষামূলক নীতি বেশি কার্যকর, আকর্ষণীয় হোক বা

না হোক। শিক্ষক বক্তা তার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন শিষ্যদের নিকট; শিষ্যদের কাজ হলো সতর্কতার সাথে নির্বাচিত ও সাজানো বিষয়বস্তুরূপে তা গ্রহণ করা। প্রাচ্য যেহেতু প্রাচীন ও দূর তাই শিক্ষকের উপস্থাপন হলো বৃহত্তর পরিসর থেকে হারিয়ে যাওয়া বিষয়ের পুনর্মূল্যায়ন ও একরকম পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তেমনি প্রাচ্য যেহেতু (পরিসর, সময় ও সংস্কৃতিতে) বিশাল সমৃদ্ধ তাই একে সমগ্ররূপে প্রদর্শন সম্ভব নয়, কেবল তার নির্বাচিত অংশ উপস্থাপন করা প্রয়োজন। সেসির মূল লক্ষ্য হয় নির্বাচিত সংগ্রহ, ক্রেস্তোম্যাথি, বর্গীয় উপস্থাপন, সাধারণ নীতির জরিপ; যার মধ্য দিয়ে গোটা কয়েক প্রভাবশালী উদাহরণ ছাত্রদের কাছে প্রাচ্যকে উপস্থাপন করে। এ ধরনের উদাহরণ দুই কারণে শক্তিশালী: এক. এগুলোয় রয়েছে প্রাচ্যের ওপর পশ্চিমা কর্তৃত্বের প্রতিফলন, যা পশ্চিম সুপরিকল্পিত উপায়ে প্রাচ্যের নিকট থেকে আদায় করেছে; তবে প্রাচ্যের দূরত্ব ও উৎকেন্দ্রিকতা কর্তৃত্বের বিষয়টি আড়াল করে রাখে। দুই. প্রাচ্যকে নির্দেশ করার জন্য এগুলোর কিছু ভাষাতাত্ত্বিক ক্ষমতা আছে (অথবা প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা তা আরোপ করেছে)।

সেসির সকল কাজই সংকলন জাতীয়, অতএব, শিক্ষামূলক ও কষ্টকর পুনরাবৃত্তি। প্রেঁইসিসড ডি গ্রামেইর জেনেরাল ছাড়াও তিনি তিন খণ্ড ক্রেস্তোম্যাথি অ্যারাবি (১৮০৬ ও ১৮২৭), এন এন্থোলজি অব অ্যারাব গ্রামারিটিক্যাল রাইটিংস (১৮২৫), এন অ্যারাবিক গ্রামার অব ১৮১০, ট্রিটিজ অন অ্যারাবিক প্রসোডি অ্যান্ড দি দ্রুজ রিলিজিয়ন প্রভৃতি গ্রন্থ এবং প্রাচ্য মুদ্রাবিজ্ঞান, শিলালিপি, ভূগোল, ইতিহাস ও মাপনপদ্ধতির ওপর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। বহু অনুবাদ করেছেন সেসি, কালিলা ও দুমনা এবং আল হারিরির মাকামাত-এর বিস্তৃত সমালোচনা লিখেছেন। সম্পাদক, স্মৃতিচারক ও ইতিহাসকার হিসেবেও তিনি সমান উৎসাহী। অন্যান্য বিষয়ে তার কৃত কাজ সম্পর্কে তথ্য কম। অবশ্য তার রোখ ছিল একমুখী।

এ সত্ত্বেও ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে উন্নতি বিষয়ে একটি টেবলিউ জেনারেল প্রস্তুত করার জন্য ১৮০২ সালে নেপোলিয়ন যখন 'ইনস্টিটিউট ডি ফ্রান্স'-এর সূচনা করেন তখন সেসিও নির্বাচিত লেখকদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি ছিলেন অপরিসীম ধৈর্যশীল বিশেষজ্ঞ, সাধারণীকরণে সবচেয়ে ইতিহাসনির্ভর। ডেসিয়ার রিপোর্টে সেসির অনেক প্রবণতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, উচ্চমূল্যে সম্মানিত করা হয় প্রাচ্যতাত্ত্বিক অধ্যয়নে তার অবদানকে। এর শিরোনাম–টেবলিউ ইস্তরিক ডি লা'ইরোডিজঁ ফ্রাঁসেজ–(পবিত্র চৈতন্যের বিপরীতে) ঘোষণা করে নতুন চৈতন্যের উত্থান। এই চৈতন্য নাটকীয় : শিক্ষা একটি প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে প্রদান করা সম্ভব, যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্বে প্রস্তুতকৃত প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রদান করা হবে। রাজাকে সম্বোধন করে লিখিত এই রচনার ভূমিকায় বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয় যে এটি সকল মানবীয় জ্ঞানকে একত্রে স্থাপন দেওয়ার প্রয়াস। ডেসিয়ার বলেন, যদি পূর্বে এ রকম

টেবলিউ ইস্তরিক প্রস্তুত করা হতো তাহলে হয়তো আজ আমাদের দখলে থাকত ধ্বংসপ্রাপ্ত বা হারিয়ে যাওয়া বহু মহান সৃষ্টিকর্ম। ডেসিয়ার এও দাবি করেন যে টেব্‌লিউ রচনার কাজটি সহজ করে তুলেছে প্রাচ্যে নেপোলিয়নের অভিযান, যার লক্ষ্যই ছিল আধুনিক ভূগোলসম্পর্কিত জ্ঞানের উন্নয়ন।[১৪]

প্রাথমিক পর্যায়ের প্রাচ্যতত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রে টেবলিউর ভূমিকা হলো–এটি প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের ধরন ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি স্পষ্টরূপ প্রদান করে, বিবৃত করে বিষয়বস্তুর সাথে প্রাচ্যতাত্ত্বিকের সম্পর্কও। সেসি প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও অন্যান্য লেখায় নিজের রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তা উন্মোচন ও উদ্ধার করে আলোতে এনেছে বহু অস্পষ্ট বিষয়। কেন? ছাত্রদের সামনে তুলে ধরার জন্য। কারণ, জ্ঞান হলো বিভিন্ন বিষয় দৃশ্যমান করা। অতএব, পণ্ডিতি বিষয় ক্ষমতার বিশেষ প্রকৌশলী। এটি তার ব্যবহারকারীকে (ও ছাত্রদের) হারানো জ্ঞান ও হাতিয়ার পুনরুদ্ধার করে দেয়।[১৫] মহান নায়ক হিসেবে সেসির কৃতিত্ব সাফল্যের সাথে দুর্লঙ্ঘনীয় বাধা পার হয়ে যাওয়া। যে অধ্যয়ন ক্ষেত্রটিতে আক্ষরিক অর্থেই কেউ ছিল না, তিনি সেখানে প্রয়োজনীয় অবলম্বন ও উপায় প্রস্তুত করে উপস্থাপিত করেন তার ছাত্রদের সামনে। ফলাফল হলো প্রাচ্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উৎপাদন, তার অধ্যয়নপদ্ধতি গঠন, এমন সব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি, যা প্রাচ্যদেশীয়দেরও ছিল না।[১৬]

হেলেনিস্টিক বা লাতিন যুগের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো একটি দলের কাজের শ্রমের সাথে সেসির তুলনা করলে বলতে হয় সেসির বিনিয়োগকৃত শ্রম এককথায় অবিশ্বাস্য। ওদের হাতে ছিল বইপত্র, রীতিনীতি, মতধারা; সেসিকে সব তৈরি করে নিতে হয়েছে। সেসির অবদান হলো গোটা একটি অধ্যয়নক্ষেত্র সম্পূর্ণ সৃষ্টি করে উপস্থাপন করা। একজন ইউরোপীয় হিসেবে তিনি প্রাচ্যদেশীয় আর্কাইভ তছনছ করে ফেলেন, তা করতে পারেন ফ্রান্সে বসেই। একসময় এমন হয় যে প্রাচ্যতাত্ত্বিকের কৃত কাজ মূল প্রাচ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এভাবে, সেসি কর্তৃক শিক্ষামূলক টেবলিউয়ের বদ্ধ পরিসরে আটকানোর পর থেকে প্রাচ্যতাত্ত্বিকের প্রাচ্য আর বাস্তবতায় ফিরে আসতে আগ্রহী হয়নি।

সমর্থক যুক্তি ছাড়াই যাতে তার মতো টিকে যেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেসি খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আরব কবিতায় আগ্রহ প্রকাশ করেও মন্তব্য করেন যে একে যথাযথভাবে গ্রহণ করার জন্য প্রথমে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের দ্বারা রূপান্তর করে নিতে হবে। কারণ, আরবি কবিতা (ইউরোপীয়দের) সম্পূর্ণ অচেনা এক জনগোষ্ঠী কর্তৃক রচিত; স্বাভাবিকভাবেই সে রচনা ভিন্ন মত, সংস্কার, বিশ্বাস ও কুসংস্কারে পরিপুষ্ট বলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার অধিকাংশ বর্ণনা 'উন্নত সভ্যতার' ইউরোপীয়দের অনধিগত থেকে যাবে। অতএব, প্রাচ্যতাত্ত্বিকের কাজ হলো যথাযথ উপায়ে তার স্বদেশবাসীর কাছে বিপুল এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা সহজলভ্য করা

এবং এমন এক সাহিত্যভান্ডার অধিগত করা, যা হিব্রু ভাষার খাঁটি ঐশ্বরিক উপলব্ধির সহায়ক হবে।[১৭]

যেহেতু প্রাচ্যতাত্ত্বিকের মধ্যস্থতা ছাড়া প্রাচ্যকে জানা সম্ভব নয়, তাই এও সত্যি যে প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যকে একত্রে নেওয়া উচিত নয়। এটিই সেসির রোমান্টিক মতাদর্শের 'খণ্ড তত্ত্ব'-এর সূচনা। প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য ইউরোপীয়দের কাছে অচেনাই নয় কেবল, তা তাদের যোগ্য রুচি ও বিশ্লেষণাত্মক মানসিকতায় সমৃদ্ধ নয়।[১৮] তাই প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রাচ্যকে উপস্থাপন করবেন একেকটি প্রতিনিধিত্বশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে, পুনঃপ্রকাশিত অংশে; তাকে ঘিরে থাকবে আরও সব খণ্ড। এ ধরনের উপস্থাপনের জন্য নতুন একটি শ্রেণি প্রয়োজন হয় যার নাম ক্রেস্তোম্যাথি; সেসির ক্ষেত্রে ওখানেই প্রাচ্যতত্ত্বের ব্যবহারযোগ্যতা ও স্বার্থ সবচেয়ে পরিস্ফুটিত। সেসির সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ হলো তিন খণ্ডের ক্রেস্তোম্যাথি অ্যারাব, যা শুরুতেই এই ছন্দময় আরবি চরণ জোর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; কিতাব আল-আনিস, আল মুফিদ লিলতালিব আল-মুস্তাফিদ/ওয়া গামি আল শাখুর মিন মানতুম ওয়া মানতুর (অধ্যবসায়ী ছাত্রের জন্য একটি পুস্তক আনন্দময় ও লাভজনক/যদি তা গদ্য ও পদ্যের খণ্ড খণ্ড ধারণ করে থাকে)।

ইউরোপে কয়েক প্রজন্ম ধরে সেসির সংকলন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও বলা হয়ে থাকে তার সংকলন প্রথাগত বিষয়ে ভরা, তবু এগুলো প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের দ্বারা আরোপিত প্রাচ্যবিষয়ক পরীক্ষণে উত্তীর্ণ। এ ছাড়া এগুলোর আন্তর্বিন্যাস, বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক বা খণ্ডের পছন্দকরণে কোথাও এগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ রহস্য উন্মোচিত করেনি।

ক্রমে পাঠকেরা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রচেষ্টার কথা ভুলে যায়; ক্রেস্তোম্যাথির দ্বারা চিহ্নিত পুনর্গঠন মেনে নেয়। উদ্দেশ্যমূলক কাঠামো (প্রাচ্যতত্ত্বের আখ্যা) এবং আত্মগত কাঠামো পুনর্গঠন (প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব) পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য হয়ে ওঠে। প্রাচ্যকে ভাঁজ খুলে বিছিয়ে দেওয়া প্রাচ্যতত্ত্বের যুক্তি অনুযায়ী। প্রাচ্যতাত্ত্বিকের নীতিবোধ পরিণত হয় প্রাচ্যের নীতিতে। প্রাচ্য দূরস্থিত হওয়ার বদলে এখন সহজলভ্য। সেসির সংকলন কেবল প্রাচ্যের নতুন সংস্করণই প্রদান করে না, তা পশ্চিমের কাছে প্রাচ্যদেশীয় উপস্থিতি হিসেবে প্রাচ্যকে সরবরাহও করে।[১৯] সেসির কাজ প্রাচ্যকে পরিণত করে মতবাদগত বিষয়ে, তা বয়নী উদ্দেশ্যের মতবাদ হিসেবে এক প্রজন্মের শিক্ষার্থীর নিকট থেকে অন্য প্রজন্মের শিক্ষার্থীর নিকট হস্তান্তরিত হতে থাকে।

সেসির শিষ্যের দলও অবিশ্বাস্য। উনিশ শতকের সকল গুরুত্বপূর্ণ আরবি বিশেষজ্ঞ কোনো না কোনোভাবে তার সাথে সম্পৃক্ত। ফ্রান্স, স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন,

ডেনমার্ক ও বিশেষ করে জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এমন সব ছাত্রে ভরে যায় যারা সরাসরি তার পদতলে ও সংকলনের মাধ্যমে নিজেদের গঠন করেছে।[২০] বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার হস্তান্তরিত হওয়ার পাশাপাশি এদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তার সমৃদ্ধি ও রক্ষণশীলতাও। প্রত্যেক প্রাচ্যতাত্ত্বিক সর্বপ্রথম সেসি কর্তৃক সরবরাহকৃত ও প্রয়োগকৃত ত্যাগ ও অর্জনের জ্ঞানতাত্ত্বিক নীতি অনুযায়ী গড়ে নেয় তাদের নিজ নিজ প্রাচ্য। সেসির সূচিত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। তবে বিকশিত পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা হিসেবে ভাষাতত্ত্বকে কাজে লাগাননি সেসি। এটি রেনানের কৃতিত্ব–অতি সাম্প্রতিক তুলনামূলক বিষয়সমূহের সাথে প্রাচ্যতত্ত্বকে সম্পৃক্ত করা, যার মধ্যে ভাষাতত্ত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সেসি ও রেনানের পার্থক্য উদ্বোধক ও নির্বাহীর পার্থক্যের মতো। সেসি হলেন বিষয়টির উদগাতা, প্রতিষ্ঠাতা, যার রচনা বিষয়টির উনিশ শতকীয় মর্যাদার প্রতিনিধিত্ব করে; এর মূল অবশ্য বিপ্লবী রোমান্টিসিজমে। রেনানের উদ্ভব প্রাচ্যতত্ত্বের দ্বিতীয় প্রজন্মে। তার দায়িত্ব হলো অফিশিয়াল ডিসকোর্সরূপে প্রাচ্যতত্ত্বের নিরেট ভিত্তি রচনা, এর অন্তর্দৃষ্টিসমূহকে পদ্ধতিগত স্থান ও শৃঙ্খলা প্রদান এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ। সেসির নিকট যা ছিল ব্যক্তিগত তৎপরতা, রেনানের কাছে তা প্রাচ্যকে ভাষাতত্ত্বের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কিত করে উভয়কে সমকালীন সংস্কৃতিতে সম্পৃক্তকরণ।

রেনানের ব্যক্তিত্ব এমন যে তাকে শতভাগ মৌলিক দাবি করা যাবে না, আবার সম্পূর্ণত উৎপাদন বলেও চালানো যাবে না। রেনানকে সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে বিচিত্রমুখী এক শক্তি হিসেবে, যার জন্য সুযোগ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন সেসির মতো অগ্রজেরা। রেনানকে বুঝতে হবে সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চারূপে–ফুকো যাকে বলেন সময়ের আর্কাইভ, তার মধ্যে থেকে প্রাচ্যবিষয়ক ভাষ্য-বিবৃতি প্রদানের রীতিরূপে। একটি নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানগত পরিসর ও সাংস্কৃতিক আবহে বর্ণনাযোগ্য রচনার লেখক হিসেবে রেনানকে পাঠ করা প্রয়োজন।

রেনান প্রাচ্যতত্ত্বে আসেন ভাষাতত্ত্ব থেকে। এ বিষয়টি প্রাচ্যতত্ত্বকে তার গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত চরিত্রে সমৃদ্ধ করেছে। ভাষাতত্ত্ব যার কাছে শব্দ অধ্যয়নের মতো খটখটে শুকনো বিষয় তিনি হয়তো নিটশের এই ঘোষণার কথা জেনে অবাক হবেন যে, উনিশ শতকের মহৎ সব ব্যক্তিত্বের মতো তিনিও ভাষাতাত্ত্বিক; যদিও তার কাছে বালজাকের দুই ল্যামবার্টের এ বক্তব্য বিস্ময়কর মনে হবে না :

> একটি শব্দের জীবন ও অভিযানসমূহ নিয়ে কেউ একজন লিখলে কী চমৎকার একটি গ্রন্থই না হয়! যেসব ঘটনা বা বাস্তবতার জন্য একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় নিঃসন্দেহে তাদের ছাপ পড়ে থাকে শব্দটির ওপর। ব্যবহৃত হওয়ার স্থানের ওপর নির্ভর করে শব্দটি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভিন্ন ধরনের ছাপ পুনর্জাগ্রত

> করে: তবে কোনো শব্দকে তার তিন দিক–আত্মা, দেহ ও চলনের দিক–থেকে বিবেচনা করা কি আরও চমৎকার নয়?[২২]

কোন সে বর্গ–পরবর্তীকালে প্রশ্ন করেন নিটশে–যা ওয়াগনার, শোপেনহাওয়ার, লিওপার্ডিসহ তাকেও ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে? পরিভাষাটির মধ্যেই যেন রয়েছে ভাষা বিষয়ে ব্যতিক্রমধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি এবং সৌন্দর্যতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চারণসমৃদ্ধ কিছু রচনার জন্ম দেওয়ার সক্ষমতা। যদিও পেশা হিসেবে ভাষাতত্ত্বের জন্ম হয় ১৭৭৭ সালের সেই দিনটিতে, যেদিন এফ এ উলফ তার নিজের জন্য স্টাড, ফিলল, নামটি আবিষ্কার করেন। ধ্রুপদ গ্রিক ও রোমান-এর ছাত্ররা নিজেরাই তাদের অধ্যয়নের বিষয় উপলব্ধি করতে পারে না দেখে নিটশে আহতবোধ করেন–'এরা কখনো বিষয়টির মূলে পৌছে না। এরা কখনো ভাষাতত্ত্বকে সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে না।' সহজ কারণ–'প্রাচীন পৃথিবীর জ্ঞান হিসেবে ভাষাতত্ত্ব চিরদিন টিকে থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু ফুরিয়ে যাওয়ার মতো।'[২৩]

ভাষাতত্ত্ব নিজেকে, এর ব্যবহারকারী ও বর্তমানকেও সমস্যাগ্রস্ত করে। এটি নিজের সাথে যুক্ত করে নেয় আধুনিক ও ইউরোপীয় হওয়ার শর্ত। কিন্তু অন্য কোনো পূর্বকালীন সংস্কৃতি ও সময়ের সাথে সম্পর্কিত না হলে এ দুটোর একটিও অর্থবোধক হতে পারে না। আবার নিটশে মনে করেন ভাষাতত্ত্ব মানবীয় উদ্যোগের ফলস্বরূপ উদ্ভূত, নির্মিত মানবীয় আবিষ্কার, আত্ম-আবিষ্কার এবং অকৃতিক্রম অবস্থা আবিষ্কারের একটি ধরন।

১৭৭৭ সালের ফ্রেডরিখ অগাস্ট উলফ ও ১৮৭৫-এর নিটশের মাঝখানে আর্নেস্ত রেনান–প্রাচ্য ভাষাতাত্ত্বিক, যিনি মনে করেন ভাষাতত্ত্ব ও আধুনিক সংস্কৃতি পরস্পর বিড়জিত। লা'অভেনির ডি লা সায়েঁস-এ (১৮৪৮ সালে লিখিত হলেও ১৮৯০ সালের পূর্বে প্রকাশিত হয়নি) তিনি লিখেন, 'ভাষাতত্ত্ব আধুনিক মনের প্রতিষ্ঠাতা।' এবং যুক্তিবোধ, সমালোচনা ধর্ম ও উদারতা–যার সবই ভাষাতত্ত্বের সাথে একই দিনে প্রতিষ্ঠিত–সেগুলো ছাড়া আধুনিক মনের আর অর্থ কী। ভাষাতত্ত্ব, তিনি যোগ করেন, আধুনিকদের দখলে আধুনিকতা ও আধুনিক (ইউরোপীয়) শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীকও; পনেরো শতকের পর থেকে মানবজাতির অর্জিত সকল অগ্রগতির কৃতিত্ব যে মনের তাকে বলা যায় ভাষাতাত্ত্বিক মন। আধুনিক সংস্কৃতিতে (রেনানের ভাষায় ভাষাতত্ত্বীয় সংস্কৃতিতে) ভাষাতত্ত্বের দায়িত্ব ছিল বাস্তবতা ও প্রকৃতিতে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষণ অব্যাহত রাখা, এভাবে অতিপ্রাকৃতকে তাড়িয়ে দেওয়া এবং বস্তুর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নব আবিষ্কারের সাথে খাপ খাইয়ে চলা। তবে, এসব কিছুর চেয়েও তার বড় অবদান হলো মানবীয় জীবন ও বস্তু বিষয়াদির বিন্যাস সম্পর্কে একটি সর্বজনীন মত সম্ভব করে তোলার মধ্যে। তার বক্তব্যে ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রকাশ্য এক ক্ষমতার জ্যোতি স্পষ্ট। রেনান ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন :

> দর্শন চর্চা করার অর্থ হলো বিষয়সমূহ জানা; কুভিয়েরের চমৎকার বাকভঙ্গিতে দর্শন পৃথিবীকে তাত্ত্বিক নির্দেশনা প্রদান করে। কান্টের মতো আমিও বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি খাঁটি অনুমানমূলক ব্যাখ্যা গাণিতিক ব্যাখ্যার চেয়ে অধিক বৈধ নয়। তা চলমান বাস্তবতা সম্পর্কে কিছু শেখাতেও পারে না। ভাষাতত্ত্ব মানসিক বিষয়বস্তুর সঠিক বিজ্ঞান। দেহের দার্শনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র যেমন, তেমনি মানব প্রকৃতির বেলায় ভাষাতত্ত্ব।[২৪]

মানব প্রকৃতির যথার্থ বিজ্ঞান হয়ে ওঠার জন্য ভাষাতত্ত্বের প্রত্যাশার ব্যাপারে রেনান স্পষ্টত ভিকো, হার্ডার, উলফ, মন্টেস্কু এবং ভাষাতত্ত্বের জগতে প্রায় সমকালীন উইলহেলম ভন হামবলডট, বপ ও মহান প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইউজিন বার্নঅফের অবস্থান সমর্থন করেন। রেনান সমকালের যে প্রবণতাকে অভিহিত করেছিলেন জ্ঞানের বেগবান যাত্রা হিসেবে, তার কেন্দ্রীয় অংশের সাথে চিহ্নিত করেন ভাষাতত্ত্বকে। ১৮৯০ সালের ভূমিকায় মন্তব্য করেন যে, তিনি একজনমাত্র মানুষ হিসেবে সকল মানুষের প্রতি বক্তব্য দেননি। বরং অল্পসংখ্যক মানুষের দ্বারা বিরাট সংখ্যক মানুষের ওপর আধিপত্যকরণ এবং তাদের অসমতার বিষয়টিকে প্রকৃত ও সমাজের অগণতান্ত্রিক কিন্তু বৈধ আইনরূপে চিহ্নিত করে এর বিশেষায়িত কণ্ঠস্বর হিসেবে কথা বলেন।[২৫]

কিন্তু রেনানের পক্ষে এমন পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব হলো কী করে? কারণ, একদিকে ভাষাতত্ত্ব সকল মানুষের বিজ্ঞান, যার ভিত্তিই হলো মানব প্রজাতির ঐক্যবদ্ধ রূপ। আবার অন্যদিকে, ভাষাতাত্ত্বিক রেনান নিজেই কীভাবে প্রাচ্য সেমেটিকদের বিপরীতে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বকে সমর্থন করেন? কীভাবে এ-সম্পর্কিত অধ্যয়নই তাকে পেশাগত খ্যাতি এনে দেয়?[২৬] অর্থাৎ ব্যক্তি ভাষাতাত্ত্বিক রেনান কী করে গোটা পৃথিবীর 'শ্রেষ্ঠ' ও 'নিকৃষ্ট' দুই জাতির রূঢ় বিভাজকে পরিণত হন?

এর আংশিক উত্তর মিলবে প্রথম জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভিক্টর কজিন, মিশেলেট ও আলেকজান্ডার ভন হামভলডটকে লেখা[২৭] রেনানের চিঠিতে। ওতে দেখা যায়, রেনানের মধ্যে একটি প্রবল পেশাগত সংঘবোধ ছিল, যা তাকে আলাদা করে রাখত সাধারণ জনতার দল থেকে। আমাদের নিকট হয়তো পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে যে, এই অবস্থায় কীভাবে রেনান ভাষাতত্ত্ব, এর ইতিহাস ও প্রথম যুগের আবিষ্কারসমূহের জগতে নিজের সাম্রাজ্যিক অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ভাষাতত্ত্বে বিশেষ অবদান রাখেন। আমাদের দেখতে হবে এভাবে যে রেনান ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কথা বলেননি, বরং সূচনা পর্যায়ের সকল শক্তি নিয়ে একটি নতুন মর্যাদাকর বিজ্ঞানের সংকেতাবদ্ধ ভাষার সাহায্যে ভাষাতাত্ত্বিকভাবে কথা বলেছেন। ভাষা সম্পর্কে সেই নতুন বিজ্ঞানের ঘোষণা বা দাবি তখন পর্যন্ত সরাসরি বা প্রকাশ্য বর্ণনা করা সম্ভব ছিল না।

তখন ভাষাতাত্ত্বিক হওয়ার অর্থ ছিল একরাশ পুনর্মূল্যায়নধর্মী সাম্প্রতিক আবিষ্কারের দ্বারা নিজের কর্মতৎপরতার বৃত্তে পরিচালিত হওয়া। এসব আবিষ্কারই ভাষাতত্ত্বের সূচনা করে এবং তাকে জ্ঞানগত ভিত্তি প্রদান করে–আমি মোটামুটি ১৭৮০-এর দশক থেকে ১৮৩০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলছি, যার শেষভাগে রেনান পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতেন তার নিজের জীবন ভাষাতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক জীবন প্রতিফলিত করে। নিজের জীবনে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে একদা তিনি যেমন খ্রিষ্টান ছিলেন, এখন তেমনি খ্রিষ্টানত্ত্বের বাইরে অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানে আস্থা রাখবেন।[২৮]

কিন্তু রেনানের রচনা প্রমাণ করে ভাষাতত্ত্বের কথা বলার সময়ও তার মনে ধর্ম বিরাজ করে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকের মতো। যেমন তার ধারণা ছিল ভাষাতত্ত্ব মানব জাতির উৎপত্তি, সভ্যতা ও ভাষা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দেয়, তবে কেবল এই প্রমাণ করার জন্য যে এসব বিষয়ে ধর্মের শিক্ষা অনেক বেশি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও ইতিবাচক বোধসম্পন্ন।[২৯] তবু তার চিন্তা 'একটি পেশাই আমার জীবনকে পূর্ণ করার মতো', তা হলো অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত কৌশলে খ্রিষ্টধর্মের সমালোচনামুখী গবেষণা'।[৩০] রেনান ভাষাতত্ত্বে আসেন তার উত্তর-খ্রিষ্টীয় আবেগের তাড়নায়।

রেনানের জানা ছিল খ্রিষ্টধর্ম কর্তৃক অভ্যন্তরীণভাবে প্রদত্ত ইতিহাস আর ভাষাতত্ত্ব কর্তৃক প্রদত্ত ইতিহাসের পার্থক্যই ভাষাতত্ত্বকে সম্ভব করে তোলে। ওই সময়ে ভাষাতত্ত্ব বলতে বোঝাত নতুন ভাষাতত্ত্ব, যার প্রধান অবদান হলো তুলনামূলক ব্যাকরণ, ভাষাসমূহকে নতুন রীতিতে ভাষা-পরিবার অনুযায়ী শ্রেণিকরণ এবং ভাষার ঐশ্বরিক সৃষ্টিতত্ত্বকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান। অতএব, ফুকো যাকে বলেন ভাষার আবিষ্কার তা ধর্মবিযুক্ত ঘটনা। এ ঘটনা স্থানচ্যুত করে পূর্ববর্তী এ ধারণাকে যে ঈশ্বর এডেনে মানুষকে ভাষা প্রদান করেন।[৩১] ১৭৭০-এর দশকে জন হার্ডার ভাষার উৎপত্তিবিষয়ক প্রবন্ধের জন্য বার্লিন একাডেমি থেকে মেডেল লাভ করেন (১৭৭২), তখন সবার আবেগ ছিল ভাষার উৎপত্তিবিষয়ক আলোচনার দিকে। নতুন শতাব্দীর শুরুর দশকেই এ-সম্পর্কিত ঐশ্বরিক তত্ত্ব ইউরোপে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বিষয় হিসেবে প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেহেতু, বস্তুগত প্রমাণের ভিত্তিতে তার সকল প্রাচীন রচনার ঈশ্বরত্ব হারানোর ধাক্কা খ্রিষ্টধর্ম সামলাতে পারবে না বলে মনে হয়, তাই নতুন ঐতিহাসিক ধারণার প্রয়োজন দেখা দেয়। অবশ্য, শ্যাতোব্রোঁ যেমন মন্তব্য করেন, কেউ কেউ হিব্রুর তুলনায় সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হওয়ার পরও তাদের বিশ্বাস অটুট রাখেন।[৩২] কিন্তু বপের মতো ভাষাতাত্ত্বিকদের নিকট ভাষার অধ্যয়ন এডেনে ঈশ্বর প্রদত্ত আদি ভাষার ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে নিজস্ব ইতিহাস, দর্শন ও শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে সূচিত হয়। এ প্রসঙ্গে কোলরিজ মন্তব্য করেন,

'ভাষা হলো মানব মনের অস্ত্রভান্ডার, তা ধারণ করে আছে অতীতের বিজয়ের পুরস্কার আর ভবিষ্যৎ বিজয়ের অস্ত্রাদি'।[৩৩]

আদি এডেনীয় ভাষার বিশ্বাস লুপ্ত হয়, কিন্তু যৌক্তিক কারণে তা একটি প্রত্নভাষার ধারণার জন্য জায়গা করে দিয়ে যায় (ইন্দো-ইউরোপীয়, সেমেটিক)। প্রত্নভাষার অস্তিত্ব নিয়ে কোনো বিতর্ক হয় না; কারণ সর্বসম্মতভাবেই মেনে নেওয়া হয় যে, এ ধরনের ভাষা পুনরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, কেবল ভাষাতাত্ত্বিক উপায়ে তার এক সময়ের অস্তিত্ব পুনঃপ্রদর্শন করা যেতে পারে। একটি প্রাচীন ভাষাকে অন্যান্য ভাষার কষ্টিপাথররূপে কল্পনা করা হয়; সেই কষ্টিপাথরের মর্যাদা লাভ করে প্রাচীনতম ইন্দো-ইউরোপীয়রূপের সংস্কৃত। তখনো কিছুসংখ্যক পণ্ডিত, যেমন বেঞ্জামিন কনস্ট্যান্ট, বিস্মিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতেন যে সংস্কৃত এবং ভারত কী করে হিব্রু ও এডেন কাহিনির স্থান লাভ করবে! এরপর নেপোলিয়ন ও শ্যাপোলিয়ঁর-পরবর্তী ফরাসি পণ্ডিতবর্গ মিসরকেই সকল প্রাচীনতম ঘটনার উৎস ও রঙ্গভূমি বলে ঘোষণা করেন।[৩৪]

১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে শিক্ষাপ্রাপ্ত রেনানের প্রজন্ম এসব নতুন চিন্তাভাবনা ও আগ্রহে উদ্বুদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এখন বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে প্রাচ্যের প্রয়োজন ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ে তাদের অর্থাৎ পশ্চিমের পাণ্ডিত্য। এই আগ্রহ থেকে সৃষ্ট রচনারাজির গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো এডগার কুইনেটের লা জিনি দেস রিলিজিয়ঁ (১৮৩২), যা প্রাচ্য-রেনেসাঁর ঘোষণা দেয় এবং কার্যকর একটি সম্পর্কে স্থাপন করে পুব ও পশ্চিমকে। কুইনেটের বক্তব্যের সারকথা হলো পুব প্রস্তাব করে আর পশ্চিম বিষয়গুলো সংগঠিত করে : এশিয়ার কাছে নবীগণ, ইউরোপের পণ্ডিতেরা (জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক, বিজ্ঞানীরা)। এই নতুন সম্পর্ক থেকে জন্ম নেয় নতুন ঈশ্বর; তবে কুইনেটের কথা হলো এই সম্পর্কের মধ্য দিয়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েই নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে এবং আত্মপরিচয় নিশ্চিত করে। জ্ঞানগর্ভ পশ্চিমা মানুষ পণ্ডিতি মনোভাব হিসেবে তার উদ্ভট সুবিধাজনক দৃষ্টিকোণ নিয়ে যে প্রাচ্যকে জরিপ করে তা যেন নিষ্ক্রিয়, রমণীয়, এমনকি নির্বাক পড়ে থাকা এক প্রাচ্য। পশ্চিম অতঃপর ভাষাতাত্ত্বিকের কর্তৃত্ব নিয়ে পুবকে শব্দে মূর্ত করে, তার যাবতীয় গোপন জিনিসকে পশ্চিমের ভাষাতাত্ত্বিকদের নিকট উন্মোচিত করতে বাধ্য করে। সেই ভাষাতাত্ত্বিকের ক্ষমতার উৎস হলো গোপনকে উন্মোচিত করা এবং দুর্বোধ্যকে পাঠ করার দক্ষতা। এ প্রবণতা রেনানে অক্ষুণ্ন থাকে। রেনান যা বর্জন করেন তা হলো পূর্ববর্তীদের নাটকীয়তা; তার বদলে তিনি অর্জন করেন বিজ্ঞানীর মনোভাব।

এ সময় ইউরোপের রোমান্টিক প্রবণতা ছিল–'সমকালের ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে মহাকাব্য বা নাটক, রোমান্সধর্মী গদ্য বা কল্পিত মহত্ত্বের কাব্য ইত্যাদি গুরুত্বপুর্ণ রূপকল্পে খ্রিষ্টধর্ম কর্তৃক বর্ণিত অধঃপতন, পুনরুজ্জীবন ও

নতুন পৃথিবী উদ্ভবের মধ্য দিয়ে স্বর্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাহিনিকে পুনর্গঠিত করা'।[৩৫] মিশেলেট ও কুইনেট ছিলেন এই রোমান্টিক প্রবণতার অংশীদার। অন্যদিকে, রেনানের মতে, ভাষাতাত্ত্বিক হওয়ার অর্থ হলো পুরানো খ্রিষ্টীয় ঈশ্বরের সাথে সকল বন্ধন ছিন্নকরণ, যাতে নতুন কোনো মতবাদ–সম্ভবত বিজ্ঞান–নতুন অবস্থানে মুক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই অগ্রগতির পেছনে নিবেদিত ছিল রেনানের সমগ্র পেশাগত জীবন। ভাষার উৎপত্তিসম্পর্কিত একটি সাদামাটা নিবন্ধে তিনি বিবৃত করেন : মানুষ এখন আর উদ্ভাবক নয় এবং সৃষ্টি যুগ নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ।[৩৬]

আমরা এমন একটা সময়ের অনুমান করতে পারি যখন মানুষ আক্ষরিক অর্থেই প্রথমবারের মতো নীরবতা থেকে শব্দে পরিবাহিত হয়। প্রকৃত বিজ্ঞানের কাজ ভাষা কী তা বিবৃত করা, ভাষা উদ্ভবের প্রক্রিয়াকে নয়। রেনান যদিও আদিম যুগের সৃষ্টির কথা বলেন, কিন্তু তা আসলে নতুন উদ্দেশ্যমূলক কৃত্রিম সৃষ্টিমাত্র, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফসল। ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে কলেজ ডি ফ্রান্সে প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি দাবি করেন তার বক্তৃতা যেন সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয়, যাতে তারা ভাষাতত্ত্বীয় বিজ্ঞানের গবেষণাগার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে।[৩৭] রেনান তখন হিব্রু ভাষার চেয়ার অলংকৃত করতে যাচ্ছেন। পবিত্র ইতিহাসের জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের স্থলে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে বেশি অপমানজনক আর কী হতে পারে এবং প্রাচ্যের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতাকে কেবল ইউরোপের অনুসন্ধানের বিষয়রূপে বর্ণনা করার পর আর কী বলার বাকি থাকে?[৩৮] সেসি কর্তৃক ছকবদ্ধ, তুলনামূলকভাবে প্রাণহীন খণ্ডসমূহের স্থান দখল করে ভিন্ন জিনিস।

রেনানের পূর্বে হিব্রুর চেয়ার অলংকৃত করেছিলেন এটিয়েন কোয়ার্টারমেয়ার। ১৮৫৭ সালে এক আবেগহীন স্মৃতিচারণে রেনান বলেন, কোয়ার্টারমেয়ার মনে করতেন ভাষাতাত্ত্বিক হলেন একজন অত্যন্ত পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল এক শ্রমিক, তিনি যা নির্মাণ করছেন তার পুরো চেহারা এক সাথে দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও নিরলস শ্রম দিয়ে যান। তবে এ সময়ই সেই বিষয়টি তিল তিল করে নির্মিত হচ্ছিল।[৩৯] পূর্বে চীন ও ভারত প্রাচ্যের সাথে একীভূত হয়ে যাওয়ায় নিজের জন্য একটি নতুন প্রাচ্য প্রদেশ–সেমেটিক প্রাচ্য কেটেছেঁটে সাজানোর আশা করেন রেনান। তখনো আরবি ও সংস্কৃত ভাষাকে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা ছিল (যা করেছেন বালজাক)। রেনান ১৮৫৫ সালের কম্পারেটিভ সেমেটিক ট্রিটিজ[৪০]-এর ভূমিকায় ইঙ্গিত দেন যে, বপ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জন্য যা করেছেন, তিনি তা করবেন সেমেটিকের জন্য। তিনি বিভিন্ন উপলক্ষে কয়েকবার প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে, 'সেমেটিক' ও 'সেমেটীয়' প্রাচ্য ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়নের সৃষ্টি।[৪১] যেহেতু, তিনি নিজেই সেই অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন, সুতরাং, তিনি ওই সৃষ্টির পেছনে নিজেকে কেন্দ্রীয় আসনে স্থান দেন।

কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, রেনান এ প্রসঙ্গে সৃষ্টি শব্দটি ব্যবহার করেন কী করে? এ ব্যাপারে খানিকটা আন্দাজের সাহায্য নিতে হবে আমাদের। সমগ্র পেশাগত জীবনে রেনান কল্পনা করেছেন মানুষের জীবনে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা হলো, 'মানুষকে বস্তুর শব্দসমূহ (জ্ঞান) সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা (অবহিত করা)'।[৪২] সুতরাং নতুন ভাষাতত্ত্ব শব্দকে মনে করে প্রাকৃতিক জিনিস–ভাষার বাইরে নিশ্চুপ, নিজের গোপনীয়তা ব্যক্ত করার জন্য তৈরি। হায়ারোগ্লিফিক ও খোদাই লিপি অধ্যয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছিল শ্যাপোলিয়ঁরের এই আবিষ্কার যে, রোসেটা স্টোনের খোদাই লিপির উচ্চারণগত ও অর্থগত এই উভয় মাত্রাই রয়েছে।[৪৩]

বস্তুকে বলতে বাধ্য করার বিষয়টি শব্দকে কথা বলানোর মতগুলোকে পরিস্থিতিগত গুরুত্ব এবং নিয়মের বিন্যাসে একটি নির্দিষ্ট স্থান প্রদান। প্রথমত, রেনানের সৃষ্টির অর্থ হলো শব্দটির উচ্চারণ চিহ্নিত করা, যার ফলে সেমেটিকের মতো বিষয়বস্তুকে একরকম সৃষ্টিরূপে দেখা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় অর্থে সৃষ্টি হলো বিজ্ঞানীদের দ্বারা নীরব অস্তিত্বময়তা থেকে সামনে নিয়ে আসা এর আলোকিত পরিপার্শ্ব-বিন্যাস; যেমন সেমেটিকের ক্ষেত্রে প্রাচ্যদেশীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, জাতি, মানসিকতা। সবশেষে, সৃষ্টি নির্দেশ করে শ্রেণিকরণের একটি প্রক্রিয়া প্রস্তুতকরণ, যার সাহায্যে প্রাসঙ্গিক বস্তু বা বিষয়টিকে অন্যান্য সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু-বিষয়াদির সাথে তুলনামূলকভাবে দেখা সম্ভব হয়। তুলনামূলকভাবে বলতে রেনান বোঝাতে চেয়েছেন সেমেটিক ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে বৈপরীত্যের সুতোয় বিন্যস্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে।

খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস হারানোর পরপরই সেমেটিক ভাষা অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন রেনান। এটিই প্রাচ্য সম্পর্কে তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন (১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত হলেও প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) এবং খ্রিষ্টধর্মের উৎপত্তি ও ইহুদিদের ইতিহাস বিষয়ে তার পরবর্তী কাজের ভূমিকাস্বরূপও। এ রচনায় রেনান প্রাচ্য বা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসসম্পর্কিত সমকালীন বা পূর্ববর্তী রচনাসমূহ কদাচিত উদ্ধৃত করেন।[৪৪] তবু এ রচনাকে তিনি দার্শনিকভাবে যুগান্তকারী ব্যাপার বলে অভিহিত করেন এবং এ সূত্রেই তিনি পরবর্তী সময়ে নানা উপলক্ষে ধর্ম, জাতি ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে নিজের কর্তৃত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।[৪৫] তার বিবেচনায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বিকাশ এবং প্রাচ্যতত্ত্বের বিভাজন উভয় ক্ষেত্রে সেমেটিকের অবদান আছে। ইন্দো-ইউরোপীয়র তুলনায় সেমেটিক নৈতিক ও জৈব মানদণ্ডে একটি অধঃপতিত রূপ, অথচ দ্বিতীয় বিষয়ে তা স্থিতিশীল সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের একটি ধরন। সবশেষে, সেমেটিক হলো রেনানের প্রথম সৃষ্টি, তার গণ-লক্ষ্যের বোধের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এক কল্পকাহিনি। আমাদের এও ভুলে গেলে চলবে না যে রেনানের অহংয়ে সেমেটিক হলো প্রাচ্য ও সমকালের ওপর ইউরোপীয় আধিপত্যের প্রতীক। অতএব, প্রাচ্যের একটি শাখা হিসেবে সেমেটিক কোনো প্রাকৃতিক বস্তু নয়, যেমন নির্দিষ্ট প্রজাতির

কোনো বানর একটি প্রাকৃতিক সৃষ্টি। আবার তা সম্পূর্ণ কৃত্রিমও নয়। সেমেটিক মাঝামাঝি এক অবস্থান গ্রহণ করে, স্বাভাবিক ভাষার (ইন্দো-ইউরোপীয়) তুলনায় অন্তর্মুখী সম্পর্কের সূত্রে বৈধতা পায়–উপলব্ধ হয় একটি খামখেয়ালি, আধা-বর্বর এক প্রপঞ্চরূপে, যার একটি কারণ হলো গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ও জাদুঘরে এর হামেশা প্রদর্শন ও বিশ্লেষণ। ধারণামূলক কর্মকাঠামো হিসেবে এটি রেনানের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, যা দিয়ে ভাষাকে জাদুঘরের পাশাপাশি বুঝতে হবে; আর জাদুঘর হলো প্রদর্শন, অধ্যয়ন ও শিক্ষা প্রদানের জন্য গবেষণাগারের পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ।[৪৬] সর্বত্র তিনি ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, মন, কল্পনা ইত্যাদি স্বাভাবিক মানবীয় বিষয়সমূহকে এমনভাবে বর্ণনা করেন যেন এগুলো অন্য কিছুতে রূপান্তরিত। এভাবে সেমেটীয়রা হয়ে ওঠে উন্মত্ত একেশ্বরবাদীর অর্থবোধক, যাদের কোনো পুরাণ নেই, শিল্পকলা নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য বা সভ্যতাও নেই; তাদের চৈতন্য সংকীর্ণ ও একগুঁয়ে। সব মিলিয়ে ওরা স্বাভাবিক মানুষের নিকৃষ্টরূপের প্রতিনিধিত্ব করে।[৪৭] আবার তিনি চান যেন এ রকম মেনে নেওয়া হয় যে, তিনি একটি প্রত্নভাষা সম্পর্কে কথা বলেছেন, কোনো প্রকৃত ভাষা সম্পর্কে নয়।[৪৮]

অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক উভয়েই এমন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে কথা বলেন যা সরাসরি প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। একটি কঙ্কাল বা মাংসপেশির নিখুঁত রেখাচিত্র এবং ভাষাতাত্ত্বিকের প্রদর্শিত প্রত্ন-সেমেটিক বা প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয়র উদাহরণরাশি উভয়েই গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারের উৎপাদন। মুদ্রিত পৃষ্ঠায় এবং জাদুঘরে যা প্রদর্শন করা হচ্ছে তা আসলে এ রকম বিকৃত অতিরঞ্জন; ঠিক যা করা হয়েছে সেসির প্রাচ্যদেশীয় সম্পর্কিত সার-আলোচনায়। এর লক্ষ্য হলো বস্তু ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন–বস্তু ও প্রকৃতির পার্থক্য নয়। আরবি, হিব্রু ও অ্যারামিক বিষয়ে রেনানের যেকোনো একটি পৃষ্ঠা পড়লে মনে হবে যেন ক্ষমতার একটি চুক্তি পাঠ করছি। সে চুক্তির বলে প্রাচ্যতাত্ত্বিকের ভাষাতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব গ্রন্থাগার থেকে বের হয়ে এসে মানুষের বক্তব্যের স্বেচ্ছাকৃত নমুনাকে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে স্থাপন করে সীমানা চিহ্নিত করে দেয়, আর তার চারদিকে থাকে মসৃণ, সংযত ইউরোপীয় গদ্য এবং সেই গদ্য কর্তৃক সংশ্লিষ্ট (নমুনার সাথে সম্পর্কিত) ভাষা, জনগোষ্ঠী ও সভ্যতায় নির্দেশিত খুঁত, গুণ, বর্বরতা, ক্রটি-বিচ্যুতি। গদ্যের সুর ও কাল-নির্দেশ খুব চমৎকারভাবে সমকালের সাথে মানিয়ে যায় যাতে পাঠকের মনে একরকম শিক্ষামূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অনুভূতি জাগে; তখন পণ্ডিত-বিজ্ঞানীরা আমাদের সামনে বক্তৃতা-গবেষণাগারের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ান, সৃষ্টি করেন, আবদ্ধ করেন এবং আলোচিত বিষয়বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণ করেন।

তাৎক্ষণিক ঘটছে এমন প্রদর্শন কর্ম-সম্পর্কিত বোধের জানান দিতে গিয়ে রেনানের উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়, বিশেষত যখন তিনি প্রকাশ্য মন্তব্য করেন যে অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ

স্থিতিশীল ও দর্শনযোগ্য চিহ্ন ব্যবহার করেন, যার দ্বারা বস্তুকে তার যথার্থ শ্রেণিতে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়; কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী তা করেন না।[৪৯] ভাষাবিজ্ঞানের ঘটনা-সংঘটন সরলরৈখিক নয়, আবার সময়ের দিক থেকে পরস্পরবিচ্ছিন্নও। এই বিচ্ছিন্নতায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণ থাকে ভাষাবিজ্ঞানীর। এ জন্য রেনান সেমেটিক ভাষার আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেন: ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাকে তিনি গ্রহণ করেন জীবন্ত, জৈব আদর্শরূপে, তার সাথে তুলনা করেন প্রাচ্য ভাষাসমূহকে; তার মতে, যেগুলো তুলনামূলকভাবে অজৈব।[৫০] সময় এখানে তুলনামূলক শ্রেণিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিসরে রূপান্তরিত, যার ভিত্তি হলো জৈব-অজৈব ভাষার কঠোর বৈপরীত্য। একদিকে আছে জীবন্ত বলে ধরে নেওয়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জৈবিক পুনরুৎপাদন ক্ষমতার ধারণা; তার তুলনায় ও বিপরীতক্রমে রয়েছে সেমেটিক ভাষার অজৈবিক বন্ধ্যাত্ব। এ সম্পর্কে রেনানের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত হলো ভাষাতাত্ত্বিক তার গবেষণাগারে এ ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ যা করেছেন তা কোনো পেশাজীবী পণ্ডিত ছাড়া আর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। (দেখা যায় রেনান সেমেটিক ভাষাসমূহের জৈবিক পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অস্বীকার করেন, কিন্তু ওগুলোকে পরিবর্তন ও পরিশোধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেন।)[৫১]

এ সত্ত্বেও এই মৌলিক বিরোধিতার তলে তলে রেনানের মনে আরেকটি বৈপরীত্য সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়; বিশেষ করে তিনি যখন সেইন্ট হিলারির 'নমুনা অধঃপতন'[৫২]-এর ধারণাটির পরিচয় দেন। রেনান যদিও পরিষ্কার করে বলেননি কোন সেইন্ট হিলারির কথা তিনি বলছেন, আমরা বুঝতে পারি এটেনে ও তার ছেলে ইসিডোরকেই নির্দেশ করেছেন; দুজনই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ফ্রান্সে সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের জগতে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। ফ্লুবেয়ার পিতা-পুত্র দুজনের লেখাই পাঠ করেছেন এবং তার নিজের রচনায় ব্যবহার করেছেন।[৫৩] এ দুজন কেবল রোমান্টিক জীববিজ্ঞান, সাদৃশ্য ও অনুরূপতার প্রবণতার একচ্ছত্র উত্তরাধিকারই গ্রহণ করেননি–তারা দর্শন, বিকটাকৃতির অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা ও অঙ্গবিকৃতিবিদ্যায়ও বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। অঙ্গবিকৃতিবিদ্যা বলে কথিত বিষয়েই পিতা-পুত্র সবচেয়ে ভয়াবহ শারীরবৃত্তীয় বিকৃতিকে প্রজাতির অভ্যন্তরীণ ক্ষয় বা পতনের ফল বলে ধরে নেন।[৫৪]

এটেনে মনে করেন বিকটাকৃতি হলো অনিয়ম বা ব্যত্যয়; অনুরূপভাবে, শব্দসমূহ পরস্পরের সাথে অনুরূপতা ও ব্যত্যয়ের নিয়মে আবদ্ধ। কোনো অনিয়মই স্বাধীন কোনো ব্যতিক্রম নয়, বরং তা নিশ্চিত করে যে, একই শ্রেণিভুক্ত সকল সদস্যকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো একীভূত করে রাখে। অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যায় এ রকম ধারণা রীতিমতো দুঃসাহসিক। এটেনে তার ফিলসফি এনাটমিকে বলেন :

> আমাদের যুগের স্বভাবই এ রকম যে, কারও পক্ষে কোনো একক চিন্তাধারার কাঠামোয় সীমাবদ্ধ থাকা অসম্ভব। একটি বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে পর্যবেক্ষণ করুন,

> ফলস্বরূপ আপনি তাকে কেবল এর নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে সমর্থ হবেন; আপনি এর সম্পর্কে কখনো পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন না। কিন্তু একে তার পারিপার্শ্বের অন্যান্য বস্তুর মাঝখানে দেখুন, যেগুলো আবার নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন উপায়ে সম্পর্কযুক্ত ও সম্পর্ক বিযুক্তও। দেখবেন আপনি ওই বস্তু বা বিষয়টির জন্য সম্পর্কের বৃহত্তর এক সম্ভাবনার ক্ষেত্র উপলব্ধি করবেন। আপনি একে আরও ভালোভাবে জানতে পারবেন, এমনকি এর বিশেষত্বের মধ্যেও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো একে আপনি এর নিজস্ব তৎপরতার কেন্দ্রে বিবেচনা করে বুঝতে পারবেন যে, বস্তু বা বিষয়টি তার অব্যবহিত বাইরের জগতের সাথে কী রকম আচরণ করে। এমনকি আপনি জানতে পারবেন পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে প্রকাশিত।[৫৫] তিনি আরও বলেন যে, বিজ্ঞানীর নিকট এমন কোনো প্রপঞ্চ নেই–যত অনিয়মিত ও ব্যতিক্রমীই হোক যাকে অন্য কোনো প্রপঞ্চের সাথে তুলনাক্রমে বিশ্লেষণ করা যাবে না। বিজ্ঞানীর রয়েছে একরকম স্বাধীনতা, যার বলে সবচেয়ে অস্বাভাবিক বিষয়কেও স্বাভাবিক আর বৈজ্ঞানিকভাবে জানা বিষয় বলে দেখতে পারেন তিনি; এ ক্ষেত্রে তা নির্দেশ করে দায়হীন অতিপ্রাকৃতকে এবং বিজ্ঞানীর দ্বারা আলোকিত দায়যুক্ত পরিপার্শ্বকে।[৫৫]

এভাবে রেনানের নিকট সেমেটিক হলো পূর্ণ বিকশিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতি এবং এমনকি, অন্যান্য সেমেটিক ভাষার তুলনায় এক বিকাশরুদ্ধ প্রপঞ্চ।[৫৬] এখানে রেনান স্ববিরোধিতা এড়াতে পারেননি : তিনি একদিকে ভাষাকে প্রাকৃতিক ব্যাপার বলে দেখতে উৎসাহিত করেন, আর সর্বত্র বলেন, তার প্রাচ্য ভাষা সেমেটিক ভাষা অজৈব, বিকাশরুদ্ধ, ফসিলীভূত, আত্মপ্রজননে অক্ষম; সে জন্য সেমেটীয়রা জীবন্ত সৃষ্টি নয়। এ ছাড়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা জীবন্ত, কিন্তু নিজের গুণে নয়, গবেষণাগারের সিদ্ধান্তের বদৌলতে। এই স্ববিরোধিতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে রেনানের সারা জীবনের কাজে; এমনকি তার সময়ের সংস্কৃতিতে তার নিজের আর্কাইভাল অবস্থানেও। সেই সংস্কৃতিতে রেনানের নিজের অবদানও বিরাট। তিনি নির্মাণ করেন এবং নির্মাণক্রিয়াতেও প্রকাশ পায় অবাধ্য প্রপঞ্চের ওপর সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা, তেমনি তা নিশ্চিত করে আধিপত্যশীল সংস্কৃতি ও তার 'প্রাকৃতিকীকরণ'। এমন বলা অতিরঞ্জন হবে না যে, রেনানের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাগার আসলে তার ইউরোপীয় জাত্যভিমানের মূল আখড়া।

রেনানের পরবর্তী কালের সমগ্র পেশাগত জীবনই ছিল ইউরোপীয় ও সাংস্কৃতিক। তার সবচেয়ে বিখ্যাত ভি ডি জেসাস খ্রিষ্টধর্ম ও ইহুদিদের ইতিহাস নিয়ে অসাধারণ রচনা। তবে আমাদের বুঝতে হবে ভি ডি জেসাস ও হিস্টয়ের জেনারেল একই ধরনের রচনা–ঐতিহাসিকের দক্ষতা ও ক্ষমতার সাহায্যে পুনরায় নির্মিত মৃত (রেনানের জন্য, যেহেতু এটি প্রাচ্যের কাহিনি এবং তিনি নিজের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস

পরিত্যাগ করেছেন) প্রাচ্য আত্মজীবনীর পুনর্নির্মাণ, এখানেই রেনানের স্ববিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে–যেহেতু মনে হয় তা কোনো প্রাকৃতিক জীবনের সত্য ইতিহাস। রেনান যাই বলে থাকুন তাই ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাগারের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে যায়; যখন তা মুদ্রিত টেক্সটের বুননে আবির্ভূত হয় তখন তাতে জড়িয়ে থাকে সমকালীন সাংস্কৃতিক চিহ্নসমূহের প্রাণসঞ্চারক ক্ষমতা, যে সংস্কৃতি আধুনিকতা থেকে তার সকল বৈজ্ঞানিক শক্তি ও সমালোচনাহীন অনুমোদন অর্জন করে নেয়। এ-জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শাসকবংশ, ঐতিহ্য, ধর্ম, জাতিগত সম্প্রদায়ের কুলজি আসলে একটি বিশেষ তত্ত্বের অবদান, যার কাজ হলো সমগ্র পৃথিবীকে নির্দেশ করা।

সংস্কৃতির ইতিহাসকার হিসেবে রেনান তুর্গত, কনর্ডসেট, গুইজট, কজিন, জোফ্রয় ও ব্যালেন্সের চিন্তাধারার মানুষ; পণ্ডিতির বিচারে সেসি, কজিন ডি পার্সিভাল, অজানন, ফুরিয়েল ও বার্ন-অফ প্রমুখের সাথে আলোচ্য। এ সত্ত্বেও রেনানের পৃথিবী ইতিহাস ও শিক্ষার পৌরুষময় এক জগৎ। প্রকৃতপক্ষে সেটি পিতা, মাতা বা সন্তানের জগৎ নয়, পুরুষের জগৎ–তার যিশু বা মার্কুস অরেলিয়াস বা ক্যালিবান, কিংবা তার সূর্যদেবতার মতো এক পুরুষের পৃথিবী (ডায়ালগ ফিলসফিক[৫৭])।

রেনান মনে করতেন ভাষাতাত্ত্বিকের উচিত ভোগের আনন্দের বদলে প্রকৃত সুখকে বেছে নেওয়া: তার পছন্দের প্রকৃত সুখ, যৌন-আনন্দের চেয়ে উন্নত, কিন্তু নির্জীব। আমি যতদূর জানি, রেনানের সারা জীবনের রচনায় কদাচিৎ নারীকে কোনো ফলপ্রসূ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়–যখন রেনান প্রস্তাব করেন যে, বিজয়ী নরম্যানদের শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব দিতে হবে বিদেশি নার্সদের হাতে, যাতে ভাষায় কী পরিবর্তন ঘটে তার একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও কেবল অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ওপর নারীর সামান্য ভূমিকা কামনা করা হয়েছে। ওই রচনার শেষ অংশে তিনি বলেন 'মানুষ' (যে মানুষ পুরুষ) 'তার জাতি বা ভাষা কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়, সবকিছুর পূর্বে সে নিজের; সবার আগে সে এক নৈতিক ও মুক্ত সত্তা'।[৫৮] মানুষ মুক্ত নৈতিক সত্তা; কিন্তু জাতি, ইতিহাস বিজ্ঞানের শেকলে বাঁধা, তার ওপর পণ্ডিতদের আরোপিত শর্তের বন্দী–রেনান তাকে এভাবেই দেখেন।

প্রাচ্য ভাষাবিষয়ক অধ্যয়ন রেনানকে ওই সব শর্তের কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। এবং ভাষাতত্ত্ব এই প্রত্যয় স্পষ্ট করে যে, মানুষের জ্ঞান কাব্যিকভাবে রূপান্তরমুখী[৫৯], যদি সেই জ্ঞানকে তার অপ-পরিশোধিত বাস্তবতা থেকে আগেই বিচ্ছিন্ন করে (যেমন সেসি তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরবি খণ্ডসমূহ ওগুলোর বাস্তবতা থেকে আলাদা করে নেন) বিকাশ-রোধক মন্ত্রের আলখাল্লা পরিয়ে দেওয়া হয়। ভিকো, হার্ডার, রুশো, মিশেলেট ও কুইনেট একদা শব্দের নাটকীয় উপস্থাপন ক্ষমতাকে নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চর্চা শুরু করেছিলেন, তা নতুন করে ভাষাতত্ত্ব হয়ে ওঠার কারণে সেই গুণ হারিয়ে যায়। তার বদলে ভাষাতত্ত্ব জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবেই জটিলরূপ ধারণ করে : শব্দ আর দৈহিক

অনুভূতির প্রতি অতটা বিশ্বস্ত থাকে না; বরং গোত্র, মানসিকতা, সংস্কৃতি, জাতি প্রভৃতি কৃত্রিম বাতাবরণযুক্ত আবহের অদৃশ্য, দৃশ্যকল্পহীন, বিমূর্ত কল্পজগতের প্রতিই বেশি ঝুঁকে পড়ে। যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য নামের এই কল্পজগৎ সম্পর্কে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, ওগুলোর প্রতিটিই একই সাধারণত্ব ও সাংস্কৃতিক বৈধতায় প্রতিষ্ঠিত। কারণ রেনানের প্রয়াসের সবটাই ছিল প্রাচ্য সংস্কৃতির আত্ম-পুনরুৎপাদনের অধিকার অস্বীকার করা; কেবল তার গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশ ছাড়া। মানুষ সংস্কৃতির সন্তান নয়–এ রাজকীয় ধারণা ভাষাতত্ত্বের দৃঢ় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ভাষাতত্ত্ব শেখায় কীভাবে সংস্কৃতি আসরে এক নির্মাণ মাত্র, এক রকম উচ্চারণ, এমনকি সৃষ্টি; কিন্তু আধাজৈবিক কাঠামোর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

রেনান সম্পর্কে আগ্রহব্যঞ্জক বিষয় হলো তিনি কী পরিষ্কারভাবেই না জানতেন যে তিনি আসলে তার যুগ ও তার জাত্যভিমানকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরই সন্তান। ১৮৮৫ সালে ফার্ডিনান্ড ডি লেসেপের একটি বক্তৃতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রেনান বলেন, 'নিজের জাতির চেয়ে বেশি জ্ঞানী হওয়াটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার...কেউ তার মাতৃভূমির প্রতি তো তিক্ততা বোধ করতে পারে না। যারা একে বলে কঠিন সত্য, তাদের চেয়ে নিজ জাতি ভুল বুঝলে তাও ভালো।'[৬০] এ ধরনের বিবৃতির প্রকৃত অর্থ বোঝার জন্য খুব সহজ। কারণ রেনানই তো বলেন যে, কারও সর্বোত্তম সম্পর্ক হলো তার সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের সাথে এবং অবশ্যই সেই রাজকীয় সম্পর্ক নয় যার বলে মানুষ হয় তার সংস্কৃতির সন্তান না হলে পিতামাতা হয়ে ওঠে। এখানে আমরা আবার গবেষণাগার প্রসঙ্গে ফিরে আসছি–ওখানেই মানুষ তার সামাজিক দায়বোধ হারিয়ে ফেলে, তাকে অধিগ্রহণ করে বৈজ্ঞানিক ও প্রাচ্যতাত্ত্বিকের দায়বদ্ধতা। তার গবেষণাগার হলো প্ল্যাটফর্ম, যার ওপর দাঁড়িয়ে পৃথিবীর উদ্দেশে বিবৃতি দেন তিনি; প্ল্যাটফর্মটি প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যস্থতা করে, ওতে সঞ্চার করে আত্মবিশ্বাস–তেমনি সাধারণ যথার্থ ও ধারাবাহিকতাও। এভাবে রেনানের জানা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাগার কেবল তার কাল ও সংস্কৃতিকেই পুনরায় সংজ্ঞায়িত, যুগে বিন্যস্ত ও নির্দিষ্ট রূপ প্রদান করে না, এটি তার প্রাচ্যদেশীয় বিষয়বস্তুকে পাণ্ডিত্যময়, পরস্পর আসঞ্জিত অবস্থাও প্রদান করে এবং এ ছাড়াও তাকে (ও পরবর্তী প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের) প্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞের মর্যাদাও এনে দেয়। আমরা কেবল ভাবি সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই যে নতুন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, তা কি রেনানের সেই মুক্তি, যা ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচ্যবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে বলে কল্পনা করেন তিনি; নাকি তা প্রাচ্যতত্ত্বের জটিল ইতিহাসকার হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ব ও তার অনুমোদিত মানবীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে জটিল পারস্পরিক সংযুক্ত প্রতিষ্ঠা করে, যা আগ্রহহীন উদ্দেশ্যমূলকতায় নয়, চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে ক্ষমতার ওপর?

• গ •

প্রাচ্যে বসতি ও পাণ্ডিত্য
অভিধানবিদ্যা ও কল্পনার প্রয়োজনীয়তা

প্রাচ্যদেশীয় সেমেটিকদের সম্পর্কে রেনানের মতামত বৈজ্ঞানিক প্রাচ্যভাষাতত্ত্বের প্রভাবে উদ্ভূত; এতে জনপ্রিয় সংস্কার ও সেমেটিক-বিরোধী মনোভাবের ভূমিকা সামান্যই। রেনান ও সেসি পাঠ করার সময় আমরা বুঝতে পারি কী উপায়ে সাংস্কৃতিক সাধারণীকরণ বৈজ্ঞানিক বিবৃতি ও সংশোধনমূলক অধ্যয়নের রক্ষাবর্ম পরিধান করতে শুরু করে। অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় প্রাথমিক স্তরে যে প্রবণতা দেখায়, আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বও সাঁড়াশির দৃঢ়তার সাথে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে এর বিষয়বস্তুকে এবং তা ধরে রাখার জন্য সম্ভব সকল কিছুই করে। এভাবে জানার পরিভাষার একটি ভান্ডার বিকশিত হয় এবং তার কাজ ও রীতি প্রাচ্যকে একটি তুলনামূলক কর্মকাঠামোয় স্থাপিত করে, যাকে নিজের মতো করে কিছুটা বদলে নিয়ে প্রয়োগ করেন আর্নেস্ত রেনান। এ ধরনের তুলনা কদাচিৎ বিবরণধর্মী; সচরাচর তা মূল্যায়নমুখী ও প্রদর্শক–উভয়ই। এখানে রেনানের প্রথানুগ তুলনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় :

> দেখা যায় সেমেটিক মানবগোষ্ঠী সবদিক থেকেই একটি অসম্পূর্ণ মানবগোষ্ঠী, এর সরলতার বৈশিষ্ট্যে। একটি চিত্রের পাশে পেনসিলের স্কেচ যেমন ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের তুলনায় সেমেটিক, তেমনই। এতে সে বৈচিত্র্য নেই, নিখুঁত হওয়ার জন্য যেগুলো জরুরি। কম প্রাণশক্তির অধিকারী কিছু লোক যেমন অনুকূল ছেলেবেলা কাটিয়ে একেবারেই গড়পড়তার পৌরুষত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে, তেমনি সেমেটিক মানবগোষ্ঠী তার প্রথম যুগে প্রাচুর্যময় বিকাশ দেখেছিল, কখনো প্রকৃত পূর্ণতা লাভ করেনি।[৬১]

ইন্দো-ইউরোপীয় মানবগোষ্ঠী এখানে মাপ; রেনান যখন বলেন ইন্দো-জার্মানীয় জাতি যে উৎকর্ষ অর্জন করে, প্রাচ্যদেশীয় যুক্তিবোধ তেমন বিকশিত হয়নি, তখনো আদর্শ ওরাই।

এই তুলনামুখী মনোভাব মুখ্যত পণ্ডিতি প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে, নাকি জাতিগত অহংবোধের ছদ্মবেশ তা নিশ্চিত বলা অসম্ভব। আমরা এটুকু বলতে পারি দুটো

একত্রে ক্রিয়াশীল এবং পরস্পরের সমর্থক। রেনান ও সেসি প্রাচ্যকে সংকুচিত করতে চেয়েছেন মানবীয় সাদামাটা অবস্থায়, যা তার জটিল মানবিকতা বাদ দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো মেলে ধরবে সহজ পর্যবেক্ষণের জন্য। রেনানের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রয়াসের বৈধতা দিয়েছে ভাষাতত্ত্ব, যার ভাবাদর্শিক মতামত ভাষাকে তার মূল পর্যন্ত ছিলে নামানোয় উৎসাহ দেয়; অতঃপর ভাষাতাত্ত্বিক সেই ভাষাগত মূল্যের সাথে জাতি, মন, স্বভাব ও মেজাজের সম্পর্ক দেখান। তা-ই করেছেন নেনান, গোবিনিউ ও অন্যরা। রেনানই স্বীকার করেন যে তার আর গোবিনিউর সাদৃশ্য একই ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে।[৬২] ইস্তওয়ার জেনারেলের পরবর্তী সংস্করণগুলোয় তিনি গোবিনিউর কিছু রচনা অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে প্রাচ্য ও প্রাচ্যদেশীয় বিষয় অধ্যয়নে তুলনাবাদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তত্ত্ববিদ্যাগত আপাত-অসমতার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

এ অসমতার বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করার মতো নয়। আগে আমি ভারতের প্রতি শ্লেগেলের আগ্রহ, অতঃপর ভারত এবং অবশ্যই ইসলামের প্রতি তার বিরূপ হয়ে ওঠার কথা উল্লেখ করেছি। প্রথম যুগের অনেক শৌখিন প্রাচ্যতাত্ত্বিক তাদের ইউরোপীয় মন ও মননের অভ্যাস আকাঙ্ক্ষিত বিশৃঙ্খলারূপে প্রাচ্যকে সাদরে গ্রহণ করেন। প্রাচ্য তার সর্বেশ্বরবাদ, আধ্যাত্মিকতা, স্থিতিশীলতা, স্থায়িত্ব, আদিমতা ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত মূল্যায়িত হয়। যেমন শ্বেলিং প্রাচ্যের বহু-ঈশ্বরবাদে ইহুদি-খ্রিষ্টীয় একেশ্বরবাদের প্রস্তুতি দেখতে পান। আব্রাহাম হন ব্রহ্মার পূর্বরূপ। এই অতিমূল্যায়নের পরপরই আসে প্রতিক্রিয়া–সহসাই প্রাচ্য দুঃখজনক রকম নিম্ন মানবিক, গণতন্ত্রবিরোধী, পশ্চাৎপদ, বর্বর ইত্যাদিরূপে আবির্ভূত হয়। দোলকের এক দিকের দোলন ঠিক বিপরীত দিকে সমান আরেকটি দোলনের জন্ম দেয়–প্রাচ্য অবমূল্যায়িত হয়। পেশাগত প্রাচ্যতত্ত্বের উদ্ভব ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনমূলক এই বিপরীত দোলন থেকে, যার ভিত্তি সংস্কৃতিতে পুষ্টিপ্রাপ্ত (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের) অসমতার ধারণা: এ ধারণা আবার সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিতে জন্ম দেয় সমধর্মী ধারণাসমূহ। অসমতার ধারণার ভিত্তিতে প্রাচ্যের দারিদ্র্য (বা সম্পদ)-এর বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয় ভাষাতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান, দর্শন বা অর্থশাস্ত্রে অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে। সরাসরি এই অসমতার ধারণারই মধ্যেই চিহ্নিত করা যাবে প্রাচ্যতত্ত্বের রক্ষণশীল ও পুনর্গঠনের কর্মসূচি।

এর ফলে প্রাচ্যতাত্ত্বিকের প্রকৃত পেশা এই অসমতা ও এর দ্বারা প্রাণিত বিশেষ কূটাভাসকে সাদরে গ্রহণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি এ পেশায় প্রবেশ করে এই ধরে নিয়ে যে প্রাচ্যের অবস্থা তার এ ভূমিকা দাবি করছে। আবার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ তার চোখ খুলে দেয়; তিনি উপনীত হন একরকম রহস্য-মোচন কর্মসূচিতে, যার দ্বারা প্রাচ্যকে পূর্বের দেওয়া গৌরবময়রূপ থেকে অনেক

সংকুচিত করে আনা হয়। এছাড়া আর কীভাবে উইলিয়াম মুইর বা রেইনহার্ট দোজির বিরাট কাজের শ্রম কিংবা প্রাচ্য, ইসলাম ও আরবদের প্রতি তাদের যথেষ্ট ক্ষোভকে ব্যাখ্যা করা যায়? রেনান দোজির একজন সমর্থক। আবার দোজির ইস্তওয়ার ডি মুসলমানস ডিএস্পেনে (১৮৬১) রেনানের অনেক সেমেটিক-বিরোধী ধারণা উদ্ধৃত হয়েছে; ১৮৬৪ সালে একটি পুস্তকে সেগুলো একত্র করে তর্ক তোলা হয় যে ইহুদিদের আদি ঈশ্বর জাহবেহ্ নয় বা'আল, যার প্রমাণ পাওয়া যাবে মক্কায়। মুইরের লাইফ অব মাহমেত (১৮৫৮-১৮৬১) ও কালিফাত, ইটস রাইজ, ডিক্লাইন অ্যান্ডকে (১৮৯১) এখনো পাণ্ডিত্যের বিশ্বস্ত স্তম্ভ ভাবা হয়; তিনি যখন বলেন, 'মোহাম্মদের (সা.) তলোয়ার ও কোরআন সভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের এ যাবৎ জানা সবচেয়ে দুর্মর শক্র'[৬৩] তখন এমনিতেই গ্রন্থ দুটোর বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ হয়ে যায়। আলফ্রেড লাইয়ালের রচনাতেও এ-জাতীয় বহু ধারণা পাওয়া যাবে; ক্রোমার অনুরাগের সাথে যাদের উদ্ধৃত করেছেন লাইয়াল তাদের অন্যতম।

প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা যদি দোজি বা মুইরের মতো নিজেদের কাজের স্পষ্ট মূল্যায়ন নাও করেন, তবু অসমতার নীতি তার প্রভাব যথারীতিই অব্যাহত রাখে। প্রাচ্যদেশীয়দের প্রাচ্যের খণ্ডবিখণ্ড জোড়া লাগিয়ে একটি চিত্র তৈরি বা যেমন ছিল সেইরূপে পুনর্গঠন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সেসির খুঁড়ে তোলা খণ্ডগুলো প্রাথমিক উপাদান সরবরাহ করে; কিন্তু আখ্যানধর্মী চেহারা প্রদান, পারম্পর্য, অবয়ব তৈরি ইত্যাদি সম্পন্ন করেন পণ্ডিতবর্গ। এ জন্য পাণ্ডিত্য গড়ে ওঠা প্রাচ্যের অন্যায় (কারণ অ-পশ্চিমা) অ-ইতিহাসকে সুশৃঙ্খল সময়পঞ্জি, চিত্র ও কাহিনি দ্বারা আকারবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। কজিন ডি পার্সিভালের এসেই সার লা'ইস্তয়ার ডি আরবস আভান্ট লা ইসলামিজম (তিন খণ্ড, ১৮৪৭-৪৮) একটি পেশাদার কাজ, যা তার তথ্যের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে নির্ভর করে অন্যান্য প্রাচ্যতাত্ত্বিক (প্রধানত সেসি) বা দলিলপত্র কর্তৃক সরবরাহকৃত জিনিসের ওপর; যেমন ইবনে খালদুনের রচনার ওপর খুব বেশি নির্ভর করেন কজিন, যেগুলো মূলত ইউরোপের প্রাচ্যতাত্ত্বিক গ্রন্থাগারসমূহে নতুনরূপে শোভা পাচ্ছে। কজিনের তত্ত্ব হলো আরবদের মানুষ বানিয়েছেন মোহাম্মদ; ইসলাম একটি রাজনৈতিক কৌশল– কোনোভাবেই আধ্যাত্মিক কোনো ব্যাপার নয়। বিপুল খুঁটিনাটি সরবরাহ করলেও কজিনের চেষ্টা ছিল বক্তব্যে পরিচ্ছন্নতা ও স্পষ্টতা প্রদানের। এভাবে ইসলামসম্পর্কিত এই অধ্যয়ন থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হলো মোহাম্মদের (সা.) একটি পার্শ্বিক চিত্র; রচনার শেষে (তার মৃত্যু বর্ণিত হওয়ার পর) আলোকচিত্রধর্মী খুঁটিনাটি বিবরণে আবির্ভূত হন মোহাম্মদ (সা.)[৬৪] কজিনের মোহাম্মদ দৈত্য নন, ক্যাগলিয়েস্ত্রোর পূর্বরূপও নন, তিনি বিশেষভাবে এক রাজনৈতিক আলোড়ন; অসংখ্য উদ্ধৃতি দ্বারা কেন্দ্রে আবদ্ধ মোহাম্মদকে (সা.) শেষ পর্যন্ত সেসব উদ্ধৃতিই ঠেলে ওপরে তুলে দেয়, এক অর্থে,

গ্রন্থের ঊর্ধ্বে নিয়ে আসন দেয়। কজিনের উদ্দেশ্য ছিল মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে যা বলা প্রয়োজন তার সবই বলা ফেলা। এভাবে মোহাম্মদের (সা.) ব্যক্তিত্ব থেকে ইউরোপের জন্য ভীতিকর ধর্মীয় ও অন্যান্য শক্তি আলাদা করে তাকে দেখা হয় শীতল চোখে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, মোহাম্মদকে (সা.) একটি ক্ষুদ্র মানবীয় মূর্তিরূপে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে তাকে তার সময় ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়।

কজিনের মোহাম্মদের (সা.) একটি অপেশাদার তুলনা কার্লাইলের অঙ্কিত চিত্র-এ মোহাম্মদকে (সা.) তার সময় ও স্থান-সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি তত্ত্বের প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে ভূমিকা পালনে বাধ্য করা হয়। কার্লাইল যদিও সেসিকে উদ্ধৃত করেছেন, তবু তার প্রবন্ধ এমন চিন্তার ফসল যার লক্ষ্য হলো আন্তরিকতা, বীরত্ব ও নবুয়্যত সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা প্রতিষ্ঠা। তার মনোভাব সুস্থতাব্যঞ্জক : এখানে মোহাম্মদ (সা.) কিংবদন্তি নন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ নন, কিংবা হাস্যাম্পদ সামান্য জাদুকরও নন যিনি তার কান থেকে মোটর দানা ঠুকরে আনার শিক্ষা দেন তার পোষা কবুতরকে। বরং তিনি প্রকৃত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মপ্রত্যয়ী, একটি গ্রন্থের রচয়িতা যার নাম কোরআন 'একটি গোলমেলে, ক্লান্তিকর, অপরিশোধিত ও এলোমেলো জিনিস; সীমাহীন পুনরাবৃত্তি, ভীষণ প্যাঁচানো, জটিল, অত্যন্ত অপরিশোধিত–এক কথায় বিশৃঙ্খল, সমর্থন অযোগ্য মূর্খতা'।[৬৫] এখানে কার্লাইলের নিজের রচনারীতি আহামারি কিছু নয়; তিনি এমনভাবে মন্তব্যগুলো করেছেন যেন তার লক্ষ্য ছিল বেন্থামীয় আদর্শ কর্তৃক কলঙ্ক আরোপের আশঙ্কা থেকে মোহাম্মদ (সা.) এবং নিজেকেও রক্ষা করা। এ সত্ত্বেও মোহাম্মদ (সা.) নায়ক সেই বর্বর প্রাচ্য থেকেই ইউরোপে পুনঃস্থাপিত, যে প্রাচ্যে অভাবের চিহ্ন দেখেন লর্ড মেকলে এবং তার ১৯৩৫ সালের বিখ্যাত কার্যবিবরণীতে দাবি করেন, আমাদের নিকট থেকে অনেক শেখার আছে 'আমাদের স্থানীয় প্রজাদের', সে তুলনায় ওদের নিকট থেকে আমাদের শেখার বিশেষ কিছু নেই।[৬৬]

অন্যদিকে, কজিন ও কার্লাইল আমাদের দেখান যে, পশ্চিমের অর্জনের তুলনায় প্রাচ্য এত নগণ্য যে তাকে আমাদের এত ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এখানে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও অপ্রাচ্যতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত মিলে যায়। কারণ উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভাষাতাত্ত্বিক বিপ্লবের ফলে তুলনামূলক অধ্যয়নক্ষেত্রে পরিণত হওয়া প্রাচ্যতত্ত্বে এবং এর বাইরে কার্লাইলের মতো দার্শনিকদের সৃষ্ট অবয়ব কিংবা ম্যাকলের মতো লোকদের তৈরি ছাঁচে প্রাচ্য এমনিতেই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পশ্চিমের অধীন হয়ে পড়ে। অধ্যয়ন বা প্রাথমিক আলোচনার বিষয় হিসেবে প্রাচ্য প্রদর্শন করে প্রজন্মক্রমিক দুর্বলতা। প্রাচ্য হরেক রকম তত্ত্বের খামখেয়ালিপনার শিকারে পরিণত হয়; ওই সব তত্ত্বের প্রয়োজনীয় উদাহরণ সরবরাহ করার দরকার হয় প্রাচ্য থেকে। মাঝারি

আকারের প্রাচ্যতাত্ত্বিক কার্ডিনাল নিউম্যান বক্তৃতা করার সময় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশের হস্তক্ষেপ বৈধ বলে ঘোষণা করেন।[৬৭] কুভিয়ের তার রচনা লা রেনে এমিনেল (১৮১৬)-এর জন্য প্রাচ্যকে খুব ব্যবহার উপযোগী বলে আবিষ্কার করেন। প্রাচ্যকে বেশ দরকারি বলে মনে হয় প্যারিসে বিভিন্ন সেলুনে দৈনন্দিন আলোচনাতেও।[৬৮] প্রাচ্যদেশীয় ধারণাকে গ্রাস করে যেসব উল্লেখ ঋণ ও রূপান্তর তার তালিকা বিরাট। তবে তার নিচেই আছে প্রথম যুগের প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অর্জন এবং পশ্চিমের অপ্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ব্যবহৃত প্রাচ্য–প্রচলিত আধিপত্যশীল সংস্কৃতির ও তার জরুরি তাত্ত্বিক (তাত্ত্বিকের পর প্রায়োগিক) অবস্থার উপযোগী প্রশমিত ও সংকুচিত প্রাচ্য।

পুব ও পশ্চিমের এই অসম সম্পর্কে ব্যতিক্রম বা জটিলতার দেখা পাওয়া যায় কখনো কখনো। কার্ল মার্ক্স ১৮৫৩ সালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিশ্লেষণে এশীয় অর্থনীতির ধারণা তুলে ধরেন এবং ব্রিটিশের নিষ্ঠুরতা, শোষণ ও ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে এ পদ্ধতিতে সূচিত মানবসম্পদ শোষণের বিষয়টি পরিষ্কার করেন। নিবন্ধের পর নিবন্ধ লিখে মার্ক্স বলেন যে এমনকি এশিয়াকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়েও ব্রিটেন ওই সব অঞ্চলে প্রকৃত সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা তৈরি করছে। মার্ক্সের বলার ধরন সমপ্রজাতির সৃষ্টি প্রাচ্যদেশীয়দের দুর্দশার প্রতি আমাদের বিরূপ মনোভাব মোচনের কঠিন কাজটির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, ঠিক যখন এ ঐতিহাসিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার তাড়নায় প্রবলভাবে রূপান্তরিত হচ্ছিল প্রাচ্যদেশীয় সমাজও :

> এখন, প্রজন্মক্রমে চলে আসা ওই সব অসংখ্য নিরীহ সামাজিক প্রতিষ্ঠান যখন বিশৃঙ্খল ও বিলুপ্ত হয়ে যায়, চরম দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয় বাসিন্দারা এবং একই সময়ে সে সমাজের প্রতিটি সদস্য হারাতে থাকে তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকা তখন তা আমাদের মানবিক অনুভূতিতে পীড়াদায়ক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখা দরকার সুন্দর, সহজ-সরল এই গ্রামসমাজকে যতই নিরীহ মনে হোক না কেন এগুলো ছিল প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের শক্ত ভিত, এগুলো মানব মনকে সম্ভাব্য সবচেয়ে ছোট এক বৃত্তে বন্দী করে রাখে, প্রথাগত রীতিনীতির দাস বানায় আর জীবনের সব ধরনের সমৃদ্ধি ও ঐতিহাসিক শক্তি থেকে বঞ্চিত করে...।
>
> এ কথা সত্য যে ইংল্যান্ড তার স্বার্থসিদ্ধির প্রক্রিয়ায় হিন্দুস্থানে সমাজবিপ্লবের কারণ সৃষ্টি করেছে এবং জোর করে তা ঘটানোর ধরনটাও বোকামি ছাড়া কিছু নয়। তবে তা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এশিয়ায় একটি মৌলিক সমাজবিপ্লব ছাড়া মানবসভ্যতা কি তার লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে? যদি না পারে তাহলে সেই বিপ্লব বহন করে আনার অচেতন ঐতিহাসিক হাতিয়ার হয়ে উঠলে যা খুশি অপরাধ হোক না ইংল্যান্ডের!

অতঃপর প্রাচীন একটি পৃথিবীর দুমড়েমুষড়ে যাওয়ার দৃশ্য আমাদের ব্যক্তিক অনুভূতিতে যেমনই লাগুক, ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা গ্যোয়েটের সাথে

বলতে পারি :

> এই নির্যাতন কি পোড়াবে না আমাদের
> যদি তা নিয়ে আসে মহৎ আনন্দ?
> আত্মা যে সীমাহীন মোহে ডুবেছিল
> ঘটেনি তা তৈমুরের শাসনে?[৬৯]

যন্ত্রণা আনন্দ নিয়ে আসে বলে যে যুক্তি দেন মার্ক্স তার উৎস ওয়েস্টসটলিচার দিওয়ান, গ্রন্থটি মার্ক্সের প্রাচ্যবিষয়ক ধারণার উৎস। এগুলো রোমান্টিক, এমনকি কিছুটা মেসিয়ানিকও। মানবীয় বস্তু হিসেবে প্রাচ্যের যা মূল্য, সে তুলনায় তা অধিক মূল্যবান পশ্চিমের রোমান্টিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচির উপাদান হিসেবে। মার্ক্সের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও প্রাচ্যতত্ত্বের লক্ষ্যের সাথে চমৎকার এক হয়ে যায়, যদিও তার মধ্যে ব্যক্তির দুঃখ-দুর্দশার বোধ কিছুটা সক্রিয়। এ সত্ত্বেও জয়ী হয় প্রাচ্যের প্রতি রোমান্টিক মানসিকতাই, যখন তাত্ত্বিক আর্থসামাজিক মনোভাব মিশে যায় এই আদর্শ কল্পচিত্রের সাথে :

> ভারতে ইংল্যান্ডকে দুটো দায়িত্ব পালন করতে হবে: একটি ধ্বংসাত্মক, আরেকটি পুনরুৎপাদন জাতীয়—অর্থাৎ একটি হলো এশীয় সমাজের বিলোপন, আর অন্যটি হলো এশিয়ায় পশ্চিমা সমাজের বস্তুভিত্তি প্রতিষ্ঠা।[৭০]

মৌলিকভাবে প্রাণহীন এক এশিয়ার পুনরুজ্জীবন নিঃসন্দেহে খাঁটি রোমান্টিক প্রাচ্যতত্ত্বের উদাহরণ; কিন্তু তা লিখছেন এমন এক লেখক যিনি মানুষের দুর্দশার কথাও ভুলতে পারছেন না—এ কারণেই বিবৃতিটিকে ধাঁধার মতো লাগে। তাই, আমাদের প্রশ্ন করা দরকার নিন্দিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে এশিয়ার ক্ষতির সমতুল্য না কি করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পুরোনো অসমতার ধারণার দিকে অগ্রসর হয়, যে সম্পর্কে আমরা এ যাবৎ আলোচনা করেছি? দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রশ্ন করা প্রয়োজন এখন সেই মানবীয় সহানুভূতি কোথায়—কোন ধরনের চিন্তাজগতে তা হারিয়ে গেছে যখন তার স্থান দখল করে নেয় প্রাচ্যতাত্ত্বিক দৃষ্টি? আমরা অচিরেই এই সত্যে উপনীত হই যে, উনিশ শতকের প্রথম দিকের অনেক চিন্তাবিদের মতো প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরাও মানবতাকে হয় বিরাট যৌথ অর্থ নির্দেশকরূপে অথবা বিমূর্ত সাধারণরূপে ব্যবহার করেছেন। প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা ব্যক্তির আলোচনায় আগ্রহী বা যোগ্য কোনোটাই নন। বরং কৃত্রিম বিষয়, হয়তো যার ভিত্তিই অভিভাবকসুলভ রাজনীতি, প্রভাবশালী থেকে যায়। এগুলো হলো প্রাচ্যদেশীয়, এশীয়, মুসলিম, আরব, ইহুদি, গোত্র, বর্ণ, মানসিকতা, জাতি ইত্যাদি; এর কিছু কিছু উৎপাদিত হয়েছে এক বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায়, রেনানের রচনায় যার নমুনা দেখা যায়। একইভাবে, 'ইউরোপ' ও 'এশিয়া'; 'পাশ্চাত্য' ও 'প্রাচ্য' প্রভৃতি বিভাজনের মূল নিহিত ছিল মানুষের আরও বিস্তৃত ও বিচিত্র রকমের সম্ভাব্য বৈচিত্র্যে বা

পার্থক্যবোধে; ক্রমে বহু বিভাজন হ্রাস পেয়ে একটি বা দুটো বিমূর্ত যূথের ধারণায় স্থিত হয়। মার্ক্স এর ব্যতিক্রম নন। তত্ত্ব দাঁড় করানোর জন্য ব্যক্তির অস্তিত্বের চেয়ে যূথ হিসেবে প্রাচ্য অনেক সুবিধাজনক। কারণ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ধারণার মধ্যে কেবল বিপুল, বেনামি যূথবদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও অন্যান্য ধরনের বিনিময়, অত্যন্ত সংকুচিত অবস্থায় হলেও কার্যকর ছিল।

তবু, নতুন স্তরায়ন সব দখল করার পূর্বে এবং প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞানের জন্য গ্যোয়েটের কাছে ধরনা দেওয়ার আগে মার্ক্স বেচারী প্রাচ্যদেশীয়র জন্য কিছুটা সমবেদনা বোধ করেছেন। যেন ব্যক্তি মন (এখানে মার্ক্সের মন) এশিয়ার প্রাক-যৌথতা বা প্রাক-অফিশিয়াল ব্যক্তি অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে। তার অনুভূতিবোধ ও আবেগে সেই ব্যক্তি অস্তিত্বের চাপও গ্রহণ করতে পারে কিন্তু যখনই তিনি প্রাপ্ত ধারণা ভান্ডারের প্রচণ্ড শক্তিধর নিরীক্ষার মুখোমুখি হন তখন তিনি ওই ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতি সম্পূর্ণ পরিহার করতে বাধ্য হন। নিরীক্ষা সহানুভূতিকে তাড়িয়ে দেয়, একটি বিশেষ সংজ্ঞার দ্বার : নিরীক্ষা বলে ওই লোকগুলো আসলে দুর্দশাগ্রস্ত নয়, ওরা হলো প্রাচ্যদেশীয়, অতএব অন্যদের যে চোখে বিচার করা হয় এদের সেভাবে বিচার করা যাবে না। তাই প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় আবেগের জোয়ার অদৃশ্য হয়ে যায়, তার সমর্থনে থাকে প্রাচ্যদেশীয় 'কাহিনি' (যেমন গ্যোয়েটের দিওয়ান)। প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অভিধানবিদ্যার পলিসি তৎপরতায় আবেগের শব্দভান্ডার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অভিজ্ঞতা স্থানচ্যুত হয় অভিধানের সংজ্ঞার দ্বারা : মার্ক্সের ইন্ডিয়াবিষয়ক প্রবন্ধে তা পরিষ্কার ধরা পড়েছে, যেখানে শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যায়িত প্রাচ্যের নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছেন কার্ল মার্ক্স।

মার্ক্স তার তত্ত্ব অংশত আর্থসামাজিক বিপ্লবের ওপর কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন। আবার তিনি তথ্যের সহজ উৎসের খোঁজে প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত এবং নিজ বৃত্তের বাইরেও ছড়িয়ে দেওয়া বিপুল রচনাকে ব্যবহার করেন; এ রচনা ভান্ডার নিয়ন্ত্রণ করে প্রাচ্যসম্পর্কিত ভাষা-বিবৃতি। প্রথম অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছি কীভাবে এই নিয়ন্ত্রণ ইউরোপে প্রাচীনকাল থেকে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করেছে। এ অধ্যায়ে আমি দেখাতে চাই কোন উপায়ে উনিশ শতকে এমন এক আধুনিক পেশাগত পরিভাষা বলয় সৃষ্টি হয়, যা প্রাচ্যসম্পর্কিত ডিসকোর্স নিয়ন্ত্রণ করে, প্রাচ্যতাত্ত্বিক বা অপ্রাচ্যতাত্ত্বিক যা-ই তাতে অংশগ্রহণ করুন না কেন। প্রাচ্যতত্ত্ব একধরনের একগুচ্ছ রচনা ও ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর সৃষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রাচ্যকে এমন এক পরিচয় প্রদান করে, যা একে পশ্চিমের তুলনায় নিকৃষ্ট করে দেখায়। সেসি ও রেনান যথাক্রমে সেই রচনারাজি ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার উদাহরণ। মার্ক্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়েছি যে প্রথম অপ্রাচ্যতাত্ত্বিক বিচারবোধ বিলুপ্ত করা হয়, অতঃপর প্রাচ্যতাত্ত্বিক সাধারণীকরণ তাকে নিশ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে; তাই প্রাচ্যতত্ত্বে কিছুটা

অদ্ভুত আভিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মিলন পরীক্ষা করে দেখা উচিত আমাদের। যখনই কেউ প্রাচ্য নিয়ে আলোচনা করতে যাবে তখনই ওই সংজ্ঞার ভয়াবহ প্রক্রিয়াটি এমনরূপে আবির্ভূত হয় যেন এটিই এই আলোচনার জন্য একমাত্র বৈধ ও গ্রহণযোগ্য আদর্শ? কোনো ভয়ংকর শক্তিধর প্রক্রিয়ায় তা ঘটে? এবং আমরা যেহেতু দেখাব কোনো নির্দিষ্ট উপায়ে তা ব্যক্তির ওপর কাজ করে, তাই সেগুলো দীর্ঘদিন টিকে থাকার জন্য কোন আশ্রয় গ্রহণ করে, তাও খুঁজে দেখা দরকার।

কাজটি খুবই দুরূহ। অন্তত অতটা দুরূহ যেভাবে একটি বিকাশমান বিষয় উচ্চস্বরের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রতিযোগীদের হটিয়ে জায়গা করে নেয়, তার ঐতিহ্য, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব এবং ভাষ্য-বিবৃতি, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিনিধির জন্য সাধারণ সাংস্কৃতিক বৈধতা অর্জন করে। এ দুরূহ কাজটিকে সহজে করা সম্ভব যদি প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক নিজের জন্য ব্যবহৃত এবং সাধারণ পাঠকের নিকট উপস্থাপিত অভিজ্ঞতারাজি আমরা বর্ণনা করতে পারি। মূলগত দিক দিয়ে এগুলো সেই অভিজ্ঞতাই, যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেসি ও রেনান-সম্পর্কিত আলোচনায়। কিন্তু এই দুই পণ্ডিত কেবল কেতাবি প্রাচ্যতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন বিধায় প্রাচ্যতত্ত্বের অন্য একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে, যা প্রাচ্যে বসবাসসূত্রে অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতায় নির্ভর করে বৈধতা দাবি করে। অ্যাঁকুইতিল, জোনস ও নেপোলিয়নের অভিযান আভাসিত করে এই ঐতিহ্যের সূচনার চেহারাটি। এটিই টিকে থাকে এবং পরবর্তী প্রজন্মের সব প্রাচ্যবাসী পশ্চিমা মানুষদের ওপর আরোপ করে দুর্দম প্রভাব। এই চেহারা ঔপনিবেশিক ইউরোপের চেহারা–প্রাচ্যবাস করার অর্থ হলো সুবিধাপ্রাপ্ত জীবন ভোগ করা; সাধারণ নাগরিকের মতো নয়, প্রতিনিধিত্বশীল ইউরোপীয় হিসেবে, যার দেশ (ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স) প্রাচ্যকে সামরিক, আর্থ ও সবচেয়ে বড় কথা–সাংস্কৃতিক অস্ত্রে ধারণ করে আছে। প্রাচ্যে আবাসিক অবস্থান ও তার পণ্ডিতি কাজের ফলাফল সেসি ও রেনানের সূচিত দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকার প্রতিফলন–এই দুই ধরনের অভিজ্ঞতা সমন্বিত হয়ে এমন এক দুর্মর গ্রন্থ জগৎ গড়ে তুলেছে, যা কেউ এড়াতে পারে না বা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারে না, এমনকি মার্ক্সও না।

কারও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সাক্ষ্যকে কতদূর প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সহায়ক সংকেতে রূপান্তরিত করা যাবে তার ওপর নির্ভর করে প্রাচ্যতাত্ত্বিক গ্রন্থ জগৎ ও তার ঐক্য প্রদানে এ ব্যক্তির অবদানের মাত্রা। অর্থাৎ বয়নের ব্যক্তিক বিবৃতিকে রূপান্তরিত হতে হবে অফিশিয়াল বিবৃতিতে। প্রাচ্যে কোনো ইউরোপীয়র প্রভাব ও অভিজ্ঞতাকে অবশ্যই এর আত্মজৈবনিক চারিত্র ছেড়ে এমন বর্ণনায় রূপান্তরিত হবে যার ওপর নির্ভর করে পরবর্তী প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা তাদের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বর্ণনা গড়ে নিতে সক্ষম হন। পুরো উনিশ শতক ধরে ইউরোপীয়দের নিকট প্রাচ্য ছিল ভ্রমণ ও লেখালেখির সবচেয়ে প্রিয় এলাকা। এর ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়।

এ ছাড়া তখন প্রাচ্যে অর্জিত ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে ইউরোপে প্রাচ্যরীতির সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এ ধরনের সাহিত্যের উৎস হিসেবে ফ্লবেয়ারের কথা প্রথমেই মনে আসে। এ ছাড়া আছেন ডিজরাইলি, মার্ক টোয়েন ও কিঙলেইক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রাচ্যতাত্ত্বিক হয়ে ওঠা সাহিত্য এবং প্রাচ্যে প্রবাসের একান্ত ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক রচনা, যা বিজ্ঞান না হয়ে সাহিত্যই রয়ে যায়, এ দুইয়ের পার্থক্যের ওপরই এখন নজর দেব আমরা।

প্রাচ্যে একজন ইউরোপীয় হওয়ার অর্থ হলো আশপাশের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা একরকম সার্বক্ষণিক সচেতনতা বহন। এখানে মূলকথা হলো কেন এই সচেতনতা? কেন তা প্রকৃত অর্থে ইউরোপকে না ছেড়েও খাঁটি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রাচ্যে ভ্রমণ করে, যেমন স্কট, হুগো ও গ্যোয়েটের বেলায় যা ঘটেছে? এ প্রসঙ্গে দেখা যায় ছককাটা পরিকল্পনা অনুযায়ী সীমিত সংখ্যক উদ্দেশ্যমুখী ছাঁচ নিজ থেকে আবির্ভূত হয় : যেমন এক. সেসব লেখক যারা প্রাচ্যে তাদের অবস্থান কাজে লাগায় পেশাদার প্রাচ্যতত্ত্বকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক মালমসলা সরবরাহ করার জন্য, তিনি তার প্রাচ্যবাসকে মনে করেন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। দুই. সেসব লেখক যারা তাদের ব্যক্তিচরিত্র খুব একটা নমনীয় করতে রাজি নন। তিন. যাদের নিকট প্রাচ্যে বাস্তব বা প্রতীকী ভ্রমণ হলো হৃদয়ের গভীরে লুক্কায়িত কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ। আমরা যদি উইলিয়াম লেইনের ম্যানার্স অ্যান্ড কাস্টমস অব দ্য মডার্ন ইজিপশিয়ানকে প্রথমোক্ত, বার্টনের পিলগ্রিমেজ টু আল-মদিনা অ্যান্ড মক্কা দ্বিতীয় এবং নেরভালের ভয়েজ অঁ অরিঅঁকে তৃতীয় ছাঁচে রচনা ধরে নিই তাহলে রচনার অভ্যন্তরে লেখক-কর্তৃত্ব প্রকাশের সুযোগ ও পরিসর পরিষ্কার বোঝা যাবে।

পার্থক্য সত্ত্বেও এই তিনটি ধরন কিন্তু পরস্পর থেকে ততটা বিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিটির কেন্দ্রে আছে ইউরোপীয় অহংবোধের শক্তি। প্রতিটি ছাঁচেই প্রাচ্য ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য উন্মুক্ত এবং প্রাচ্যে ভ্রমণ তীর্থযাত্রার মতো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সব কটা ছাঁদের রচনার অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে মনে হয় প্রাচ্যের সামগ্রিক ভাষ্য নির্মাণের সমার্থক কোনো ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই ভাষ্য হলো প্রাচ্যের রোমান্টিক পুনর্গঠন, পুনর্মূল্যায়ন। অতএব, প্রাচ্যের জন্য সৃষ্ট প্রতিটি ভাষ্য, প্রতিটি কাঠামোই আসলে প্রাচ্যের পুনর্বিবেচিত ভাষ্য সৃষ্টি, প্রাচ্যকে পুনর্নির্মাণ করা মাত্র।

এখানে আমরা ছাঁচগুলোর পারস্পরিক পার্থক্য প্রসঙ্গে ফিরে এসেছি। মিসরীয়দের সম্পর্কে লেইনের বইটি অত্যন্ত গঠিত এবং উদ্ধৃত, এ সূত্রে এটি তার লেখককে এনে দেয় প্রাচ্যতাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বের খ্যাতি ও কর্তৃত্ব। অন্য কথায় লেইনের কর্তৃত্ব অর্জিত হয় : গ্রন্থটির গুণে নয়, বরং প্রাচ্যতত্ত্বের সাথে এর খাপ খাইয়ে যাওয়ার গুণে। তিনি প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞানের উৎস হিসেবে উদ্ধৃত। কিন্তু ফ্লবেয়ার ও বার্টন প্রচারিত হয়েছেন অন্য গুণে, প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞানের উর্ধ্বে ও বাইরে তারা নিজেদের

সম্পর্কে কী বলেন সে বিষয়ক কৌতূহলের কারণে। ফ্লবেয়ার বা বার্টনের রচনায় গ্রন্থকারের তৎপরতা যতটা শক্তিশালী, লেইনের রচনায় ততটা নয়। দেখা যায়, প্রাচ্যতত্ত্বের মতো পেশাদার জ্ঞানক্ষেত্রের ও তার বিষয়বস্তুর দাবির নিকট হার মানে লেখকের স্বাতন্ত্র্যিক পরিচয়।

লেইনের ধ্রুপদ রচনা ম্যানার্স অ্যান্ড কাস্টমস অব দ্য মডার্ন ইজিপশিয়ান (১৮৩৬) বেশ কিছু সচেতন কাজ ও প্রাচ্যে দুই দফা অবস্থানের (১৮২৫-২৮ এবং ১৮৩৩-৩৫) ফসল। লেইন গ্রন্থটির নিরপেক্ষতা দাবি করলেও আমরা জানি গ্রন্থটি রচনার পর কয়েকবার রদবদল করে সেটি প্রকাশ করা হয়। তার জন্ম বা বিকাশের পটভূমিও তাকে প্রাচ্যমুখী বলে প্রমাণ করে না। তিনি আরবি অধ্যয়নের জন্য মিসরে যান। পরে কার্যোপযোগী জ্ঞান প্রকাশের জন্য গঠিত একটি কমিটির উৎসাহে মিসরের ওপর সুশৃঙ্খল ও পদ্ধতিভিত্তিক কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন।

ভূমিকায় ড. রাসেলের 'অ্যাকাউন্ট অব দ্য পিপলস অব আলেপ্পা'র প্রতি শ্লেষ নিয়ে শুরু করেন লেইন। কিন্তু তার মূল প্রতিযোগী ডিসক্রিপজঁ দ্য লা ইজিপ্ট। এ গ্রন্থটিকে তিনি 'মহৎ ফরাসি কাজ' বলে উল্লেখ করেও মন্তব্য করেন যে এটি দার্শনিকভাবে খুব বেশি সাদামাটা এবং খুব খেয়ালি। জ্যাকব বুরখহারডটের কাজকে বলেন মিসরের কিছু জ্ঞানগর্ভ প্রবাদবাক্য মাত্র। তিনি মিসরীয়দের সাথে মিশেছেন, তাদের মাঝে থেকে তাদের সমাজকে উপলব্ধি করেছেন। এমনকি তিনি দাবি করেন যে তিনি কেবল কোরআনের শব্দের সাথে সংগতি রক্ষা করেছেন, আবার একটি অচেনা সংস্কৃতি থেকে তার নিজের পার্থক্য সম্পর্কেও সচেতন থেকেছেন।[৭১] এভাবে লেইনের একাংশ যখন মুসলিম জনসমুদ্রে মিশে যায় তখন আরেক অংশ আবার তার ইউরোপীয় ক্ষমতাবিশিষ্ট সত্তা ধরে রাখে, যাতে তার চারপাশের সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করা যায়, সে সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়, তা অধিকার করা যায়। প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রাচ্যকে নকল করতে পারেন, কিন্তু তার উল্টোটা ঘটে না। কাজেই লেইন প্রাচ্য সম্পর্কে যা বলেন তা একমুখী বিনিময় : ওরা কথা বলে ও আচরণ করে, তিনি তা লিখেন এবং তিনি যা লিখেন তা ইউরোপীয়দের জন্য কার্যোপযোগী জ্ঞান, ওদের জন্য নয়। তিনি উত্তম পুরুষের সর্বনামে মিসরীয় সমাজের প্রথা, আচার-উৎসব, জন্ম, বিকাশ, সমাহিত করার রীতি বর্ণনা করে যান। এখানে লেইন প্রদর্শক, আবার প্রদর্শিতও। আর প্রাচ্যজন সঙ্গ দেওয়ার জন্য, কিন্তু পাশ্চাত্যজন জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে তৎপর।

এ বিষয়টি সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় ভূমিকার শেষ অংশে। ওখানে দেখা যায় লেইন তার সঙ্গী শেখ আহমদের সাথে মুসলিম সেজে মসজিদে নামাজ পড়েন এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরেফিরে মুসলিম সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। আহমদের চরিত্রের যে দিকটি তুলে ধরা হয়েছে তা একজন বহুগামী কাচখেকোর। লেইন যে

তার মুসলিম সঙ্গী ও অন্য মুসলমানদের প্রতারিত করে তাদের সম্পর্কিত তথ্য আহরণ করছেন সে বিষয়টি লেইনের লেখায় একেবারেই অনুপস্থিত। তিনি আসলে ইংরেজ পাঠকদের দেখাতে চেয়েছেন যে তার রিপোর্ট বৈজ্ঞানিক উপায়ে গৃহীত তথ্যের ওপর দাঁড়ানো এবং তিনি যে অবিশ্বাসীদের সাথে চলাফেরা করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হননি।

গ্রন্থটিতে লেইনের মূল অর্জন হলো এটি প্রাচ্যতাত্ত্বিক কাঠামোর দ্বারা আত্মীকৃত। তিনি পঁচিশটি অধ্যায়ে ব্যক্তিক প্রকৃতি, জন্ম ও শৈশবকালীন শিক্ষা, উৎসব, আইন, চরিত্র, শিল্পকারখানা, জাদু, গৃহ-জীবন ইত্যাদি আলোচনা করেছেন উনিশ শতকীয় আখ্যানের রীতিতে। এর সাথে মিল আছে টম জোনসের, যেখানে নায়কের জীবন জন্ম থেকে শুরু করে ধারাক্রমে বর্ণিত। তার আখ্যানের স্বর কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পটভূমিতে চিহ্নিত নয়। এভাবেই তিনি ভিন্ন দেশসম্পর্কিত একটি রচনাকে অদ্ভুত বিষয়াদির শিল্পবোধহীন জ্ঞানকোষ এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের ক্রীড়াভূমিতে রূপান্তরিত করেন।

বিষয়ের ওপর লেইনের নিয়ন্ত্রণের কারণ এই নয় যে, তিনি দ্বিবিধ সত্তা (ভুয়া মুসলমান ও খাঁটি পশ্চিমা ব্যক্তিত্ব) নিয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা পান, বরং এ জন্য যে তিনি খুঁটিনাটি বর্ণনা করেন এবং প্রতিটি বিষয়ে একটি সাধারণ মন্তব্য দিয়ে আরম্ভ করেন। যেমন 'সচরাচর দেখা যায় একটি জাতির আচার-ব্যবহার, প্রথা ও চরিত্র দেশটির অদ্ভুত ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের ফল।'[৭২] তবে তার বর্ণনায় তিনি অবিরামভাবে প্রসঙ্গ পাল্টান। দেখা যায়, কোনো একটি সর্বজনীন অভ্যাসের বর্ণনা থেকে চলে গেছেন মিসরীয় সমাজে শৈশব সম্পর্কে, সেখান থেকে বাজে সুমেরীয় আবহাওয়ায়। এভাবে বর্ণনার মসৃণতা নষ্ট করেছেন লেইন।

মূল প্রতীকী ব্যাপার দেখা দেয় ছয় নম্বর অধ্যায় 'গার্হস্থ্য জীবন–চলমান'-এর শুরুতে। এর মধ্যে লেইন মিসরীয় জীবনযাপনের পদ্ধতি সম্পর্কে আখ্যানরীতি গ্রহণ করেছেন এবং গার্হস্থ জীবনের শেষদিকে পৌঁছেছেন। এখন তিনি একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের অংশ হিসেবে 'অবশ্যই বিয়ে ও বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বর্ণনা প্রদান' করবেন। স্বাভাবিকভাবেই বর্ণনা শুরু হয় সর্বজনীন পর্যবেক্ষণ দিয়ে–'যদি একজন পুরুষ যথেষ্ট বয়সপ্রাপ্ত হয়, এবং কোনো বাধা না থাকে, মিসরীয়দের বিবেচনায় খুবই অন্যায়, এমনকি কলঙ্কজনক মনে করা হয়'; যদি তখন সে বিয়ে না করে। এ বিষয়টি শেষ না করেই তিনি তার ব্যক্তিগত কাহিনিতে চলে যান যে তাকেও বিয়ে করার জন্য চাপ দেওয়া হয় কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্তও বিয়ে করেননি, এমনকি উপযুক্ত মেয়ে এনে দেওয়ার কথা বলার পরও। এখানে এসেই তিনি পুরো ধারাক্রমটি একটি পিরিয়ড ও একটি ড্যাসের মধ্য দিয়ে শেষ করেন।[৭৩] তিনি অতঃপর যথারীতি তার সামগ্রিক আলোচনা আরম্ভ করেন।

বিয়ের মাধ্যমে মিসরীয় সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটিকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি আর মানবীয় বিষয় থাকেননি, হয়ে ওঠেন সে সমাজে অংশগ্রহণের ভানকারী, যার উদ্দেশ্য আখ্যান রচনা। অর্থাৎ প্রাচ্যজন হওয়ার বদলে প্রাচ্যতাত্ত্বিক হওয়ার জন্য তিনি মানুষের একান্ত যৌনানন্দকেও বিসর্জন দেন। তিনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপ্ত মানবীয় জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে প্রবেশেও অস্বীকৃতি জানান। কেবল এই নেতিবাচক উপায়েই তিনি বজায় রাখতে সক্ষম হন তার সময়চিহ্নহীন পর্যবেক্ষকের ভূমিকা।

অতএব, লেইন তার পণ্ডিতি বিশ্বস্ততা ও বৈধতা অর্জন করেন দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে : এক. মানব জীবনের দৈনন্দিন আখ্যানধর্মী প্রবাহে হস্তক্ষেপ করে; এখানেই তার বিরাট অনুপুঙ্খ বর্ণনা, যাতে এক বিদেশি পর্যবেক্ষক সত্তার বুদ্ধিমত্তা অসংখ্য তথ্য জড়ো করে সমন্বিত রূপ দেয়। আর মিসরীয়রা তাদের পাকস্থলী উগরে দেয় তার পর্যবেক্ষণের জন্য, অতঃপর লেইন আগ্রহের সাথে ওগুলো একত্র করেন। দুই. মিসরীয় সমাজের প্রজননপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে। এখানে তিনি ইউরোপীয়দের জন্য তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে তার জান্তব চাহিদা দমন করেন। সুতরাং লেইনের মতে, কার্যোপযোগী জ্ঞানপ্রাপ্তি, বিন্যস্তকরণ ও প্রচার কেবল ওই রকম প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়েই সম্ভব। লেইনের অন্য দুটো রচনা হলো অসমাপ্ত আরবি অভিধান এবং অ্যারাবিয়ান নাইটসের অনুবাদ। এসব কাজে সৃষ্টিশীল লেইন অনুপস্থিত। তার সমকালীন বিষয়ের গ্রন্থকার থেকে তিনি পরিণত হন প্রাচীন আরবি ও প্রাচীন ইসলাম বিষয়ে টিকে থাকা পণ্ডিতে।

আমরা যদি মডার্ন ইজিপশিয়ানকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যতত্ত্ব বিকাশের দিকে রচিত একটি রচনা হিসেবে পাঠ করি, সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে গ্রন্থটি অনেক উজ্জ্বল। পণ্ডিতি কর্তৃত্বের নিকট জিনগত অহং বিসর্জন দেওয়ার ব্যাপারটি সেকালে বর্ধিষ্ণু প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞানের বিশেষায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় এক যুগ পূর্বে স্থাপিত দ্য রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির 'লক্ষ্য হয় (প্রাচ্য সম্পর্কে) শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রাচীন নিদর্শনসম্পর্কিত খবর ও অনুসন্ধান গ্রহণ।'[৭৪] এর মধ্যে প্রাচ্যের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য গৃহীত আসল প্রাচ্যতত্ত্ব জীর্ণ হয়ে যায়। তার বদলে বিশেষ পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক ইতিমধ্যে আগ্রহহীন হয়ে পড়া পণ্ডিতি গবেষণা সম্পর্কে সম্ভাব্য নতুন মূল্য নির্ধারণ শুরু হয়। তাই সোসিয়েতে এশিয়াটিক এর কর্মসূচি হয় :

> (প্রাচ্যভাষাবিষয়ক) অধ্যাপকদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া এসব ভাষা অধ্যয়নের জন্য অনিবার্য, ব্যবহার উপযোগী ও অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ, অভিধান, ব্যাকরণ রচনা ও মুদ্রিত করা। ফ্রান্সে বা অন্যত্র এ-জাতীয় পুস্তক প্রকাশনার উদ্যোগে ক্রয়সূত্রে বা

> অন্য কোনো উপায়ে সহায়তা প্রদান। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা কিংবা ইউরোপে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের অনুবাদ ও সারমর্ম প্রস্তুত, এগুলো খোদাই করে বা ধাতব পাতে লিখে অনুলিপির সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ভূগোল, ইতিহাস, শিল্পকলা বা বিজ্ঞানবিষয়ক লেখকদের জন্য এসব জিনিস সুলভ করা, যাতে সাধারণ মানুষ তাদের শ্রমের সুফল ভালোভাবে ভোগ করতে পারে। সাধারণ পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য এশীয় সাহিত্য নিয়ে সাময়িক সংকলন প্রকাশ—যার মধ্যে থাকবে প্রাচ্যের বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কাব্যজাতীয় রচনা এবং ইউরোপের সমধর্মী রচনাসমূহ, প্রাচ্যের এমনসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা ইউরোপের সাথে সম্পর্কিত, এ বিষয়ক আবিষ্কার কিংবা প্রাচ্যদেশীয়দের সম্পর্কে যেকোনো রচনা; এগুলোই সোসিয়েত এশিয়াটিক কর্তৃক প্রস্তাবিত ও গৃহীত লক্ষ্যসমূহ।

প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যসম্পর্কিত রচনাসমূহ পদ্ধতিগতভাবে সংগ্রহ করে বিশেষায়িত জ্ঞান হিসেবে। ব্যাকরণ মুদ্রণ ও অনুলিপি তৈরি, মূল টেক্সট সংগ্রহ, অনুলিপির মাধ্যমে তার সংখ্যা বাড়ানো এবং প্রচার করা, এমনকি সাময়িকীর আকারে জ্ঞান বিতরণও এর মধ্যে পড়ে। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই এবং এর জন্যই সেসি তার গ্রন্থ রচনা করেন, তার অহংকে বিসর্জন দেন। সেসি বলেন এ বিষয়ে একটি জাদুকর থাকতে হবে :

> সব ধরনের জিনিসের একটি বিরাট ভান্ডার গড়ে উঠবে—মূল গ্রন্থাদি, চিত্র, মানচিত্র, অভিযানের বর্ণনা—সবই তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যারা নিজেদের (প্রাচ্য) অধ্যয়নে উৎসর্গ করতে চায়, এমনভাবে, যাতে প্রতিটি ছাত্রই মনে করে যে সে কোনো জাদুবলে মঙ্গোলীয় বা চীনা কোনো উপজাতির মাঝখানে এসে পড়েছে, যেটিই তার অধ্যয়নের বিষয় করে থাকুক।...বলা যায়...প্রাচ্যভাষা বিষয়ে...প্রাথমিক গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে এই জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, যাকে আমি অভিধানসমূহের ওপর একটি প্রাণবন্ত ভাষ্য (ট্রুচমেন্ট) বা তার ব্যাখ্যা বলে মনে করি।[৭৫]

ট্রুচমেন্ট শব্দটি আরবি তুরজামানের চমৎকার রূপান্তর, যার অর্থ দোভাষী বা মধ্যস্থতাকারী বা মুখপাত্র। একদিকে প্রাচ্যতত্ত্ব যতটা সম্ভব বিস্তৃতভাবে ও আক্ষরিক অর্থেই অর্জন করেছে প্রাচ্যকে। অন্যদিকে তা এই জ্ঞানকে রীতিনীতির সংকেতমালা, শ্রেণিবিন্যাস, বিশেষ নমুনা, সাময়িক পুনর্বিবেচনা, অভিধান, ব্যাকরণ, ভাষ্য, সংস্করণ, অনুবাদ ইত্যাদির ছাঁকনিতে বাছাই করে নিয়ে পশ্চিমের গার্হস্থ্য জ্ঞানে পরিণত করেছে। এসব কিছু মিলে প্রাচ্যের একটি প্রতিমূর্তি নির্মিত হয় এবং বস্তুগতভাবে পশ্চিমে ও পশ্চিমের প্রয়োজনে তা পুনরুৎপাদিত হয়। মোটকথা প্রাচ্য ভ্রমণ, অভিযান ও প্রবাসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিবরণ থেকে একদল বৈজ্ঞানিক শ্রমিকের দ্বারা রূপান্তরিত হতো নৈর্ব্যক্তিক সংজ্ঞায়। ব্যক্তির গবেষণার চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা থেকে তা পরিণত হয় দেয়ালবিহীন কাল্পনিক জাদুঘরে, যেখানে

প্রাচ্যদেশীয় হয়ে ওটা প্রাচ্য সংস্কৃতির সমস্ত কিছু এনে জড়ো করা হয়। অভিযান, অনুসন্ধান কর্মসূচি, কমিশন, সেনাবাহিনী, ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ে আসা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের বিরাট স্তূপ থেকে প্রাচ্যকে পুনর্নির্মাণ ও পুনর্কাঠামোবদ্ধ করা হয় শব্দকোষগত, আত্মজৈবনিক, বিভাগীয় ও বয়ানি প্রাচ্যদেশীয় বোধে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ–যেমন ডিজরাইলির ভাষায়–প্রাচ্য পরিণত হয় একটি পেশায়, যার অবলম্বনে কেউ কেবল প্রাচ্যকেই নয়, নিজেকেও গড়ে নেওয়ার সুযোগ পায়।

• ঘ •

তীর্থযাত্রী ও তীর্থযাত্রা ব্রিটিশ ও ফরাসি

প্রাচ্যে অবস্থানকালে প্রতিটি ইউরোপীয় পর্যটক ও প্রবাসীকে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হয় অঞ্চলটির অস্থির প্রভাববলয় থেকে। প্রাচ্য বিষয়ে লিখতে গিয়ে যথারীতি একে নিয়ে পুনরায় পরিকল্পনা সাজাতে হয়, চিন্তা পুনর্বিন্যস্ত করতে হয় লেইনের মতো ব্যক্তিত্বকেও। প্রাচ্যদেশীয় জীবনের খামখেয়ালি প্রকৃতি, দিকঘুটে দিনপঞ্জি, অচেনা পরিসরগত বিন্যাস, হতাশাব্যঞ্জক অদ্ভুত ভাষাসমূহ, বিকৃত মনে হয় এমন নৈতিকতা ইত্যাদি অনুপুঙ্খ বিষয়াদি ধারাক্রমে স্বাভাবিক ইউরোপীয় গদ্যরীতিতে প্রকাশিত হওয়ার সময় উল্লেখযোগ্য রকম হ্রাস পায়। প্রাচ্যের প্রাচ্যায়নে লেইন প্রাচ্যের কেবল সংজ্ঞাই প্রদান করেন না, এর সম্পাদনাও করেন। তিনি এর থেকে তার সহানুভূতি সরিয়ে নেন। এ ছাড়া যেসব উপাদান ইউরোপীয় সংবেদনশীলতায় গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে সেগুলোও বর্জিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হয় প্রাচ্যের যৌন সংযম আঘাতপ্রাপ্ত : প্রাচ্যের সবকিছু, বিশেষত লেইনের মিসর ছড়িয়ে দেয় বিপজ্জনক যৌনতা; মাত্রাতিরিক্ত 'সঙ্গমের স্বাধীনতা' স্বাস্থ্যবিষয়ক রীতিনীতি ও ঘরোয়া পরিবেশ হুমকিস্বরূপ করে।

তবে যৌনতা ছাড়া অন্য হুমকিও ছিল। প্রাচ্যে যে কেউ সহসাই মুখোমুখি হতে পারে অকল্পনীয় প্রাচীনতা, অমানবীয় সৌন্দর্য বা অসীম দূরত্বের। এগুলো যেহেতু ভাবনা এবং লেখার বিষয়–প্রকৃত অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত নয়, তাই কেউ সরল মনে এগুলো প্রয়োগের চেষ্টাও করতে পারে। বায়রন ও হুগোতে প্রাচ্য একরকম মুক্তি, প্রকৃত সুযোগের স্থান, যার মূল সুরটি বাজে গ্যোয়েটের 'হেজির'-এ :

উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ খণ্ড-বিখণ্ড
বিস্ফরিত সিংহাসন, সাম্রাজ্য কাঁপছে আজ।
উড়ে যাও–আসল প্রাচ্যে
নাও পূর্বপুরুষের হাওয়ার আস্বাদ।

প্রত্যেকেই প্রাচ্যে ফিরে যায়–'ওখানে বিশুদ্ধতা, ন্যায়ের বৃত্তে আমি ফিরে যাব/মানুষের উৎপত্তির প্রকৃত উৎসমুখে'।–একে সব সম্ভাব্য কল্পনার পূর্ণতা ও সত্যতা মনে করার কারণে :

ঈশ্বর হলেন প্রাচ্য!
ঈশ্বর হলেন পাশ্চাত্য!
উত্তর ও দক্ষিণের ভূমি
প্রশান্ত স্থাপিত তার হাতে।[৭৬]

প্রাচ্য, তার কাব্যকলা, তার পরিবেশ ও সম্ভাবনাকে হাফিজ উপস্থাপিত করেছেন 'অসীম' বলে, গ্যোয়েটের ভাষায় 'ইউরোপীয়দের চেয়ে প্রবীণ ও নবীন'। এবং হুগোর জন্য, প্রাচ্যের তেজস্বিতা ও অস্বাভাবিক বিষণ্নতাকেও পরিবর্তিত করা হয়[৭৭] : ভোলনি ও জর্জ সেলেস বর্বর সমৃদ্ধিকে রূপান্তরিত করেন মহৎ প্রতিভাবান কবির ব্যবহার উপযোগী তথ্যে।

লেইন, সেসি, রেনান, ভোলনি, জোনস (ডিসক্রিপজেঁর কথা না হয় থাকলই) যা করেছেন তা হলো ব্যবহৃত সাহিত্যের গাদাগাদি সমাবেশ। আমরা পূর্বে আলোচিত তিন ধরনের কাজের কথা স্মরণ করতে পারি, যেগুলো প্রাচ্যে অবস্থানের ভিত্তিতে রচিত। জ্ঞানের অপরিমেয় গুরুত্বের সূত্রে প্রাচ্যতাত্ত্বিক রচনা থেকে ছড়িয়ে পড়া সংবেদনশীল, গ্রন্থকারসুলভ পরিশীলতা–এটিই লেইনের আত্মকর্তন, যা আমাদের আলোচ্য প্রথম ধরনের রচনার প্রকৃতি। দ্বিতীয় ধরনে অহং উপস্থিত, যার কাজ হলো প্রকৃত জ্ঞান বিতরণ; তৃতীয় ধরনের কাজে মুখ্য ব্যাপার হলো প্রাচ্য সম্পর্কে আমাদের যা বলা হয়েছে তার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা ও পরিবর্তন করা। তবে উনিশ শতকের শেষ অর্থাৎ নেপোলিয়নের পর থেকে প্রাচ্যের প্রতি তীর্থযাত্রার মনোভাব প্রবল ছিল। এ সময়ের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য প্রাচ্যতাত্ত্বিক কাজ তীর্থযাত্রার বিবরণীর ভঙ্গিতে রচিত। প্রাচ্যতত্ত্বের অন্যান্য রীতির মধ্যে আলোচ্য এই রীতির প্রধান উৎস হলো পুনঃপ্রতিষ্ঠামুখী পুনর্গঠনের রোমান্টিক ভাবধারা (অর্থাৎ প্রাকৃতিক অতিপ্রাকৃত)।

প্রতিটি তীর্থযাত্রী নিজের মতো করে বিষয়সমূহ দেখেন। কিন্তু কেন, কোথায়, কোন সত্যের জন্য তীর্থযাত্রা, সে কথায় সীমাবদ্ধতা আছে। প্রাচ্যে প্রায় সব তীর্থযাত্রীকেই বাইবেলের অঞ্চলটিকে অতিক্রম করতে হয়েছে। এসব তীর্থযাত্রীর নিকট প্রাচ্যায়িত প্রাচ্য বা প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের বানানো প্রাচ্য লোহার একটি দস্তানার মতো। তীর্থযাত্রীদের কল্পনায় একটি পণ্ডিতি প্রাচ্য কেবল অস্তিত্ব রক্ষা করেই ক্ষান্ত হয় না, সমকালীন তীর্থযাত্রী ও তার লেখার মধ্যে বাধা সৃষ্টির চেষ্টাও করে। এ প্রসঙ্গে নেরভাল বা ফ্লবেয়ারের কথা আলাদা, এরা লেইনকে লাইব্রেরি থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে সৌন্দর্যতাত্ত্বিক প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। ম্যাতেব্রাঁর মতো তীর্থযাত্রী দাবি করেছেন তিনি তার নিজের প্রয়োজনে তীর্থযাত্রায় গেছেন।[৭৮]

ফ্লবেয়ার, ভিনি, নেরভাল, কিঙলেইক, ডিজরাইলি, বার্টন প্রত্যেকে তীর্থযাত্রা করেছেন প্রাক-অস্তিত্ববান প্রাচ্যদেশীয় আর্কাইভের ছাতাপড়া ভাব দূর করার উদ্দেশ্যে; প্রাচ্যবিষয়ক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে তাদের লেখা নতুন সঞ্চয় হিসেবে যুক্ত হবে। এ সত্ত্বেও এদের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রাচ্যদেশীয় বস্তুবিষয়াদিকে হ্রাস করা বা সংকুচিত করার প্রবণতা বিদ্যমান। তীর্থযাত্রার ধরন, লেখার রীতি এবং তাদের লেখার আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি এর জন্য দায়ী।

উনিশ শতকে ব্যক্তি তীর্থযাত্রীর নিকট প্রাচ্য কী? প্রথমে ইংরেজ ও ফরাসিদের বক্তব্যের পার্থক্য বিচার করা যাক। ব্রিটিশের নিকট প্রাচ্য হলো ভারত, তাদের পরিপূর্ণ দখলে অস্তিত্বশীল দেশ। সে কারণে তাদের প্রাচ্যবিষয়ক কল্পনা প্রশাসনিক দায়িত্ব, সীমান্তসংক্রান্ত ঘটনা ও নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। স্কট, কিঙলেইক, ডিজরাইলি, ওয়ারবার্টন, বার্টন এমনকি জর্জ এলিয়ট প্রমুখ ব্যক্তিত্ব লেইন ও তার পূর্ববর্তী জোনসের মতো লেখদের ন্যায় প্রাচ্যকে বিচার করেছেন বস্তুকেন্দ্রিক কল্পনা ও বস্তুকেন্দ্রিক মালিকানার ভিত্তিতে। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর গোটা প্রাচ্য ব্রিটিশের দখলে আসে। এ প্রাচ্য অর্থাৎ মিসর, তুরস্ক, সিরিয়া সম্পর্কে লিখতে যাওয়ার অর্থ হলো এসব দেশ ভ্রমণ করা অর্থাৎ রাজনৈতিক ইচ্ছা, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক বর্ণনা ইত্যাদির অভিজ্ঞতা অর্জন। এমনকি অপেক্ষাকৃত মুক্ত লেখক ডিজরাইলির ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি।

বিপরীতক্রমে, ফরাসি তীর্থযাত্রীর মনে হারানোর ব্যথা। তিনি এমন এক জায়গায় এসেছেন যেখানে ব্রিটেনের মতো ফ্রান্সের কর্তৃত্ব নেই। ভোলনি থেকে শুরু করে আর সব ফরাসি তীর্থযাত্রীর যাত্রা আসলে কল্পিত, পরিকল্পিত, স্মৃতিতাড়িত–এমন এক দেশে যার অবস্থান মুখ্যত তাদের মনে। তাদের প্রাচ্য স্মৃতিচারণের, কথিত ধ্বংসাবশেষের, ভুলে যাওয়া গোপন রহস্যের, লুকানো যোগাযোগের প্রাচ্য–সম্পূর্ণ কল্পিত এক সত্তা, যার উৎকৃষ্টতর সাহিত্যিক রূপ পাওয়া যায় নেরভাল ও ফ্লবেয়ারে : দুজনের দৃষ্টিই কাল্পনিক, বাস্তবায়ন-অযোগ্য দিগন্তে নিবদ্ধ।

ফরাসি পণ্ডিত ও পর্যটকদের ক্ষেত্রেও এ কথা কিছুটা সত্যি। ওদের অধিকাংশই বাইবেলীয় অতীত বা ক্রুসেড সম্পর্কে আগ্রহী, যেমন বর্দেক্স লিখেছেন তার ভয়েজার্স ডি অরিয়ঁ-এ।[৭৯] এর সাথে আমরা আরও কিছু নাম যুক্ত করতে পারি : ডেভ সিতে অভিযানকারী সলসি; প্রত্নতাত্ত্বিক রেনান; ফিনিশীয় ভাষার ছাত্র জুডাস; আনসারি, ইসমাইলি ও সেরজুক সম্পর্কে গবেষক ক্যাতাফ্যাগো ও ডিফ্রেমারি; ক্লারমেন্ট-গ্যানিউ; মার্কুস ডি ভগ। এ ছাড়া আছে মিসরবিদ্যার বিরাট পণ্ডিত দল। এদের মধ্যে কেবল বাস্তবমুখী বর্ণবাদী রেনানই ব্রিটেন কর্তৃক আরব জাতীয়তাবাদীদের দমনের বিষয়টি সম্পর্কে নীরব থাকেন; তার উচ্চাঙ্গের জ্ঞান থেকে শুধু মন্তব্য করেন এ ঘটনা 'সভ্যতার প্রতি নিষ্ঠুরতা'।[৮০]

উনিশ শতকে ভোলনি বা নেপোলিয়নের মতো ফরাসি তীর্থযাত্রীরা বৈজ্ঞানিক বাস্তবতায় অতটা আগ্রহী ছিলেন না, যতটা ছিলেন অদ্ভুত ও আকর্ষণীয় জিনিসের প্রতি। শ্যাতোব্রাঁ থেকে শুরু হওয়া ফরাসি তীর্থযাত্রীরা স্থানীয় পুরাণ, অবদমন, উক্ত বিষয়ে সহানুভূতির ঐতিহ্য স্থাপন করেন। লক্ষণীয় যে প্রাচ্যে ফরাসিদের অবস্থানগত শূন্যতা ঢাকার জন্য ফরাসি লেখায় প্রাচ্য থেকে দ্রুত আহরণের একটি জরুরি ভাব প্রভাব ফেলেছে। ফরাসি বা ইংরেজ কোনো তীর্থযাত্রীই তাদের রচনায় লেইনের মতো নির্মমভাবে তার অহংকে দমন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। এমনকি বার্টন, টি ই লরেন্সও না। এ কারণেই বার্টন, লরেন্স ও চার্লস ডাফটিকে স্থান দেয় হয় লেইন ও শ্যাতোব্রাঁর মাঝখানে।

শ্যাতোব্রাঁর আইটিনেরিয়ার ডি প্যারিস অ জেরুসালেম এট ডি জেরুসালেম অ প্যারিস গ্রন্থটি ১৮০৫ থেকে ১৮০৬ সালে সংঘটিত তার ভ্রমণের বিবরণ। স্তাঁদালের মতো লেখক মনে করেন শ্যাতোব্রাঁ জ্ঞানী পর্যটক নন; ব্যর্থতার কারণ তার 'ফালতু অহংবোধ'। শ্যাতোব্রাঁ মনে করেন 'ধর্ম এমন একটি বিশ্বজনীন ভাষা যা যেকোনো মানুষ বুঝতে পারে' এবং প্রাচ্য হচ্ছে ধর্ম বিকাশের উৎকৃষ্ট স্থান, যেখানে এমনকি ইসলামের মতো একটি নিম্নমানের ধর্মও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কোরআন বিষয়ে তার উদ্ভাবন হলো এ গ্রন্থ 'দমন-পীড়নের ঘৃণা বা মুক্তির প্রেম কোনোটাই শিক্ষা দেয় না'।[৮১] তিনি বলেন যে ক্রুসেড আগ্রাসন নয়, ওমরের ইউরোপ আগমনের জবাব। এমনকি ক্রুসেড যদিও তার আদি বা আধুনিক রূপে আগ্রাসনও হয় তবু তাদের উত্থাপিত প্রসঙ্গটি এ রকম সাধারণ নশ্বরতাবিষয়ক প্রশ্নের চেয়ে উৎকৃষ্ট :

> ক্রুসেড কেবল পবিত্র সমাধি উদ্ধারের নয়, তার চেয়ে বেশি এ তথ্য জানা যে, পৃথিবীতে কোনটি বিজয়ী হবে, যা সভ্যতার শত্রু এক ধর্ম [অর্থাৎ ইসলাম] বিজয়ী হবে– যে ধর্ম মূর্খতা, দাসপ্রথা, স্বেচ্ছাচারিতার অনুকূলে কাজ করে: নাকি সেই ধর্ম যা মানুষকে আধুনিকতায় সচেতন করেছে, প্রাচীন সাধকের প্রতিভা দিয়েছে এবং মুছে দিয়েছে মৌলিক দাসত্ব?[৮২]

এই ধারণাই পরবর্তীকালের লেখালেখিতে প্রভাব ফেলেছে–ইউরোপ কর্তৃক প্রাচ্যকে স্বাধীনতার অর্থ শেখানো। শ্যাতোব্রাঁ থেকে পরবর্তী সব লেখকই মনে করেছেন প্রাচ্য, বিশেষত মুসলমানরা স্বাধীনতার অর্থ বোঝে না।

> স্বাধীনতা সম্পর্কে ওরা কিচ্ছুকে জানে না, সম্পদ–ওদের তা নেই–শক্তি হলো ওদের ঈশ্বর। যখন দীর্ঘদিন ওরা কোনো ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারক বিজেতার মুখ দেখে না তখন ওদের মধ্যে দেখা দেয় নেতাবিহীন সৈনিক, শাসক ছাড়া নাগরিক ও পিতাহীন পরিবারের ভাব।[৮৩]

অতএব, ক্রোমারের ১৯১০ সালের বক্তব্যের পূর্বেও ১৮১০ সালেই প্রাচ্য বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা ওঠে। তবে সে বিজয় বিজয় নয়, স্বাধীনতা প্রদান।

শ্যাতোব্রাঁ খ্রিষ্টীয় ধর্ম প্রচারণার আবহে একটি মৃত পৃথিবী জীবিত করার এই রোমান্টিক ধারণা ছড়িয়ে দেন। এ ধারণা অনুযায়ী কেবল ইউরোপই প্রাণহীন ও বন্ধ্যা প্রাচ্য সমতলের ভেতর জাগাতে পারে সম্ভাবনার বোধ। এর অর্থ হলো ইউরোপীয় পর্যটক ফিলিস্তিন ভ্রমণে অবশ্যই ওল্ড টেস্টামেন্ট ও গসপেলকে তার পর্যটক গাইডরূপে ব্যবহার করবে।[৮৪]

আসলে শ্যাতোব্রাঁর ভ্রমণ তাকে দিয়েছে তার আত্মাকে ইচ্ছামতো কাজ করার সুযোগ, তার নিজেকে, তার ধারণা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা। শ্যাতোব্রাঁর আগ্রহের স্বাধীনতা, প্রাচ্যের আগ্রাসী ধ্বংসস্তূপ তার নিজের মুক্তি প্রতীকায়িত করে। তিনি মুক্তি খুঁজে নেন কল্পনা ও কাল্পনিক ভাষ্য সৃষ্টিতে। প্রাচ্যসম্পর্কিত বর্ণনা মুছে ফেলে জায়গা করে নেয় সাম্রাজ্যবাদী অহংয়ের নকশা ও বিন্যাস। লেইনে যদি কল্পিত প্রাচ্য অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে শ্যাতোব্রাঁয় তা নিজের সৃষ্টির বিস্ময়ে গলে গিয়ে আবার জন্ম নেয়–আরও শক্তিশালী হয়ে, তার শক্তির স্বাদ নেওয়া ও তার সৃষ্ট ভাষ্য উপভোগ করার আরও সক্ষমতা নিয়ে :

> কেউ যখন জুড়ি ভ্রমণ করবে তখন প্রথমে মারাত্মক বিরক্তিবোধ তাকে গ্রাস করবে। ক্রমে এক নির্জন স্থান থেকে অন্য নির্জন স্থানে যেতে যেতে–পরিসর আপনার সামনে অসীম বিস্তৃত হবে, বিরক্তি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। বোধ করবেন গোপন ভীতি যা আত্মাকে বিষণ্ন করার পরিবর্তে সাহসী করবে, তার স্থানীয় প্রতিভাকে উন্নত করবে। পৃথিবীর সকল অংশে উন্মোচিত অসাধারণ সব জিনিস দৈবের সাহায্যে এখানে পুনর্নির্মিত; জ্বলন্ত সূর্য, ক্ষিপ্র ঈগল, বন্ধ্যা ডুমুর বৃক্ষ–সকল কবিতা, সকল ধর্মীয় লিখন এখানে উপস্থিত; প্রতিটি নামেই আছে রহস্য, প্রতিটি গুহায় নির্দেশ করে কোনো ভবিষ্যৎ, প্রতিটি চূড়া বহন করে নবীর অবরোহণের ছাপ। এর তীরভূমি থেকে ঈশ্বর নিজে কথা বলেছেন। বানের শুকনো কাদা, খণ্ডিত পাথর, খোলা মন্দির। মরুভূমি যেন এখনো ভীতির ধাক্কায় মূক হয়ে আছে: কেউ হয়তো বলবে যে এটি কখনো কথা বলার শক্তি ফিরে পায়নি, যেহেতু সে শুনেছে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।[৮৫]

এই অনুচ্ছেদে চিন্তার প্রক্রিয়াটি উন্মোচক ধরনের। প্যাসক্যালীয় ভয়ের অভিজ্ঞতা এখানে ভীতি সঞ্চারের বদলে উজ্জীবিত করে। উন্মুক্ত ভূদৃশ্যাবলি এক শক্তিশালী অহংয়ের পর্যবেক্ষণের জন্য অপেক্ষমাণ। অনুচ্ছেদটির শেষদিকে এসে তিনি আর আধুনিক মানুষ থাকেননি, হয়ে ওঠেন কল্পদৃষ্টির অধিকারী কোনো সাধকে–কমবেশি ঈশ্বরেরই সমকালীন। এখানে লেখক আর আদিম বা রোমান্টিক আবেগ নিয়ে কাজ করছেন না, ঐশ্বরিক সৃষ্টিশীলতা ও আসল অবস্থা নিয়ে লিখছেন। লেইনের মতো নয়, শ্যাতোব্রাঁ প্রাচ্যকে আত্মীকৃত করে নেন এবং একে উপস্থাপন ও বর্ণনা করেন ইতিহাসের সীমানা ছাড়িয়ে সময়হীন মাত্রায়, যেখানে ভূমি ও মানুষ, মানুষ ও ঈশ্বর এক হয়ে আছে। জেরুজালেমে এসে তিনি নিজেকে প্রাচ্যের সাথে একাত্ম হওয়ার কৃতিত্ব প্রদান করেন। তিনি ইহুদিদের দুর্দশায় দুঃখগ্রস্ত হন, তবে এরা তার খ্রিষ্টীয়

হিংসা প্রজ্বলনে প্রয়োজনীয় আবেগ সরবরাহ করে। তিনি বলেন 'ঈশ্বর! তুমি নতুন জনগোষ্ঠী নির্বাচিত করছ এবং তারা ইহুদি নয়'।[৮৬]

জেরুজালেম তার ভ্রমণ পরিকল্পনার সর্বশেষ গন্তব্য হলেও মিসর-সম্পর্কিত ধারণা তার তীর্থযাত্রায় চমৎকার বাড়তি সমৃদ্ধি যোগ করে। নীল নদের অসাধারণ বদ্বীপ তাকে মুগ্ধ করে :

> আমি কেবল আমার গর্বিত দেশের স্মৃতি খুঁজে পাই। আমি দেখি ফ্রান্সের প্রতিভা কর্তৃক নীল নদের তীরে আনীত এক সভ্যতার অবশিষ্ট চিহ্ন।[৮৭]

মিসর থেকে তিউনিসে যাওয়ার পূর্বে শ্যাতোব্রাঁ সাধারণ পর্যটকসুলভ আবেগে একজন প্রতিনিধিকে পিরামিডে পাঠান স্থাপত্যটির গায়ে তার নাম লিখে আসার জন্য। আমরা এ ঘটনায় খুব একটা নজর দিতাম না যদি গ্রন্থের শেষ অংশ রচনার প্রস্তুতিস্বরূপ এ ঘটনাটিকে খুব গুরুত্ব না দেওয়া হতো। তার চব্বিশ বছরের অধ্যয়ন প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, তার প্রতিটি গ্রন্থই তার অস্তিত্বের সম্প্রসারণ মাত্র। যদি ঈশ্বর তাকে পারলৌকিক শান্তি মঞ্জুর করেন, তাহলে তিনি নিজের নিকট নীরবে প্রতিজ্ঞা করেন, নিজেকে দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গ করবেন। পৃথিবীতে তিনি যা রেখে যান তা হলো তার রচনা; যদি তার নাম বেঁচে থাকে, তাহলে ওগুলো যথেষ্ট, আর যদি না থাকে–তাহলে ওগুলোই খুব বেশি।[৮৮]

সমাপনী এই ছত্রগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় পিরামিডের গায়ে নাম লেখানোর জন্য শ্যাতোব্রাঁর আকুলতা। আমরা বুঝতে পারি প্রাচ্যবিষয়ক স্মৃতিচারণা আমাদের তার যাপিত অভিজ্ঞতার বয়ান শোনায়। লেইন যেখানে প্রাচ্যতাত্ত্বিক রীতিনীতিতে তার অহং উৎসর্গ করেন, শ্যাতোব্রাঁ তার বক্তব্যের জন্য নির্ভর করেন অহংয়ের ওপর। এ সত্ত্বেও দুজনের কেউই হয়তো জানতেন না যে, তারা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবেন। লেইন প্রবেশ করেন একটি বিষয়ের অভ্যন্তরে, যেখানে তার লেখাজোখা ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হবে, কোনো মানবিক দলিল হিসেবে নয়। কিন্তু শ্যাতোব্রাঁ দেখেন তার লেখা, পিরামিডের গায়ে লেখা নামের মতো, তাকেই তুলে ধরবে; আর যদি তা নয় তবে এগুলোই হবে অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয়।

এই দুই ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব প্রাচ্যতত্ত্বের পরবর্তী গতিপ্রকৃতির মূর্তিমান রূপ হয়ে দেখা দেয়। পরবর্তীকালের প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা হয় লেইনের মতো বিজ্ঞান রচনা করেন অথবা শ্যাতোব্রাঁর মতো উচ্চারণ করেন ব্যক্তিগত স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচ্য কীভাবে বর্ণিত হবে এবং কোন বৈশিষ্ট্যে, সে বিষয়ে প্রাচ্যতত্ত্ব ভোগ করে ক্ষমতা। কিন্তু এ প্রভাব এখন পর্যন্ত সব সময় যা প্রতিরোধ করে আসছে তা হলো সেই প্রাচ্যের বোধ যা খুব সাধারণ নয়, আবার নিরুপদ্রব ব্যক্তিগতও নয়। ফলে সমকালীন আধুনিক পৃথিবীর বাসিন্দারূপী প্রাচ্যদেশীয় মানুষ বা সমাজের বাস্তবতার সন্ধানে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সেই প্রাচ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার অর্থ হলো শূন্যতায় দৃষ্টি ফেলা।

লেইন ও শ্যাতোব্রাঁর অপরিমেয় প্রভাবই এই ভুলের কারণ। জ্ঞানের বিকাশ অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া, যার সাথে জড়িয়ে আছে নির্বাচিত গ্রহণ, স্থানবদল, অবলোপন, পুনর্বিন্যাস ও জোরপ্রয়োগ প্রভৃতি ব্যাপার। প্রাচ্যতত্ত্বের মতো জ্ঞানের বৈধতার উৎস ধর্ম নয়, বরং পূর্বসূরিদের কাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠামুখী উল্লেখের মধ্য দিয়ে। সেসি শুরু করেন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, কিছু গ্রন্থের অবশেষ জোড়া দিয়ে তিনি সেগুলো সম্পাদন করেন, পুনর্গঠন করেন এবং একত্রে তুলে ধরেন; যাতে এগুলোতে উপস্থাপিত তথ্য মিলে একটি সামগ্রিক ছবি ফুটে ওঠে। এর পর থেকে প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা এভাবেই নিজেদের মধ্যে পরস্পরের রচনা থেকে উল্লেখ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বার্টন অ্যারাবিয়ান নাইটস বা মিসর সম্পর্কে কাজ শুরু করেন লেইনের রচনা দিয়ে। যদিও তিনি কখনো কখনো তাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, তবু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাকে মহৎ পণ্ডিতি অবস্থান প্রদান করছেন। নেরভালের নিজের ভ্রমণ কোনোভাবে ল্যামারটিনের ভ্রমণে পরিণত হয়। সংক্ষেপে বর্ধনশীল জ্ঞানক্ষেত্ররূপে প্রাচ্যতত্ত্ব তার পুষ্টির জন্য পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের কাছ থেকে গ্রহণ করে। কড়াকড়ি হিসেবে সেসি ও লেইনের পরবর্তী প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা সেসি ও লেইনেরই পুনর্লিখন। শ্যাতোব্রাঁর পুনর্লিখন করেন পরবর্তী তীর্থযাত্রীরা। এ ধরনের জটিল পুনর্লিখন পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে বাদ পড়ে যায় আধুনিক প্রাচ্যের আসলত্ব। ল্যামারটিন, নেরভাল ও ফ্লবেয়ারে প্রাচ্য মতাদর্শিক বিষয়বস্তুর প্রতিনিধিত্ব মাত্র; সৌন্দর্যতাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক ইচ্ছার সংমিশ্রণে পরিচালিত সে প্রতিনিধিত্ব পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম। এ সত্ত্বেও এ তিন লেখকের প্রত্যেকের লেখায় প্রাচ্যতত্ত্ব বা তার কিছু দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যদিও তাদের আখ্যানমুখী চেতনাকে অনেক বড় ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়া হয়। আমরা দেখতে পাব এই আখ্যানমুখী চেতনা তার খেয়ালি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও বোভার ও পিকুশের মতো এই উপলব্ধিতে ক্রমশ থিতু হয় যে তীর্থযাত্রা আসলে নকলনবিশির একটি রূপমাত্র।

ল্যামারিটনও তাই করেন যখন ১৮৩৩ সালে প্রাচ্যের দিকে তার যাত্রা শুরু হয়। তখন তিনি এক গাদা প্রাক-ধারণা, সহানুভূতি, পক্ষপাতিত্বের একটি স্তূপ। তিনি রোমান ও কার্থেজদের ঘৃণা করেন, ভালোবাসেন ইহুদি, মিসরীয় ও হিন্দুদের। প্রথমে তিনি যাই দেখেন তাতেই তার কাব্যিক আগাম-বাণী পূরণ হয় নতুবা তার সাদৃশ্যের প্রবণতা বাস্তবায়িত হয়। লেডি হেস্টার স্ট্যানহোপ তার কাছে মরুভূমির সার্সি; আরবরা আদিম মানুষ; লেবাননে বাইবেলীয় কবিতা খোদাই করা; প্রাচ্য এশিয়ার বিরাটত্ব এবং গ্রিসের ক্ষুদ্রত্বের প্রমাণ। কিন্তু ফিলিস্তিনে পৌঁছেই এই ল্যামারটিন কল্পিত এক প্রাচ্যের বেপরোয়া স্রষ্টায় রূপান্তরিত হন। আগে তিনি বলেছেন, তার ভ্রমণ হলো অনুবাদ, এখন তা প্রার্থনা যা তার স্মৃতি, আত্মা-হৃদয়ের অনুশীলনে পরিণত হয়–যদিও চোখ, মন ও প্রাণশক্তির অনুশীলন ততটা নয়।[৮৯]

খ্রিষ্টান ধর্ম স্মৃতিজাগরণ ও কল্পনার ধর্ম। ল্যামারটিন নিজেকে পবিত্র ধর্মভীরু ভেবে সে পথেই অগ্রসর হন–তার দেখা এক মহিলা তাকে ডন জুয়ানের হাইদির কথা মনে করিয়ে দেয়: ফিলিস্তিন ও যিশুর সম্পর্ক তার কাছে রুশো ও জেনেভার সম্পর্কের মতো; আসল জর্ডান নদীর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এ নদীর দ্বারা সৃষ্ট রহস্য। তিনি আরবি ভাষা না জানা সত্ত্বেও আরবি কবিতা তাকে সন্তুষ্ট করে। তিনি নিজেকে পশ্চিমে নিয়োজিত প্রাচ্যের কবি বলে মনে করেন। কোনো শ্লেষের আভাস না দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন :

> আরব ভূমি প্রতিভা জন্মানোর স্থান; এখানে সবকিছুই অঙ্কুর ছাড়ে এবং প্রতিটি সাদামাটা বা উন্মাদ মানুষই তার পালা এলে নবী বনে যেতে পারে।[৯০]

ভ্রমণ শেষে ল্যামারটিন প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে তার তীর্থযাত্রার অভীষ্ট অর্জন করেন। তিনি যথেষ্ট বাস্তবতা অন্তর্গত করেন এবং এখন তা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আশ্রয় নিতে চান পর্যবেক্ষণ, শান্তি, দর্শন ও কাব্যের জগতে।[৯১]

ল্যামারটিন এমনভাবে পুবকে পর্যবেক্ষণ করেন যেন তা তার (বা ফরাসিদের) একটি প্রদেশ–ইউরোপীয় ক্ষমতার সামনে উন্মুক্ত। এভাবে ল্যামারটিনের দৃষ্টিতে প্রাচ্য ইউরোপের শাসনের অধিকারের মধ্যে আবার জন্ম গ্রহণ করে :

> এভাবে সংজ্ঞায়িত সার্বভৌমত্ব ও শ্রদ্ধাকৃত ইউরোপীয় অধিকার এক বা একাধিক এলাকাসহ তীরভূমি দখলের অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যাতে ওখানে মুক্ত শহর বা ইউরোপীয় উপনিবেশ কিংবা বন্দর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়।

ল্যামারটিন এখানেই থামেন না। তিনি আরও এগিয়ে তার দেখা ও বসবাস করা প্রাচ্য সম্পর্কে বলেন যে, তা 'কোনো নির্দিষ্ট সীমানা, দেশ, আইন বা নিরাপত্তাহীন এক জাতি–আশ্রয়ের নিমিত্তে উদ্বেগাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে' ইউরোপীয় দখলদারির জন্য।[৯২]

ল্যামারটিনের শ্রেষ্ঠত্বমুখী আধা জাতীয়তাবাদী অহংবাদের বিপরীতে আমাদের অবশ্যই নেরভাল ও ফ্লবেয়ারকে বিচার করে দেখতে হবে। এ দুজনের সমগ্র কৃতিত্বের এক বড় অংশ তাদের প্রাচ্যসম্পর্কিত কাজ, ল্যামারটিনের সাম্রাজ্যবাদী ভয়েজের চেয়ে অনেক বড়। এ সত্ত্বেও দুজনই ল্যামারটিনের মতো প্রচ্যে এসেছেন ধ্রুপদ, আধুনিক সাহিত্য ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক পড়াশোনা করে। ফ্লবেয়ার যদিও বলেছেন প্রাচ্য সম্পর্কে তার জ্ঞান প্রায় ভুলে যাওয়া বিদ্যালয়-শিক্ষা পর্যন্ত।[৯৩] উভয়ই প্রাচ্য ভ্রমণকে (নেরভাল ১৮৪২-১৮৪৩, ফ্লবেয়ার ১৮৪৯-১৮৫০ সালে) ব্যক্তিগত ও সৌন্দর্যতাত্ত্বিক কাজে প্রচুর ব্যবহার করেছেন, অতটা করতে পারেননি উনিশ শতকের আর কোনো লেখক। নেরভাল ও ফ্লবেয়ার সেই সমাজের চিন্তা ও অনুভূতির মানুষ যার বর্ণনা দিয়েছেন মারিও প্রাজ রোমান্টিক এগোনিতে। সে সমাজে অচেনা স্থানের

কল্পচিত্র, ম্যাকাবার সম্পর্কে অত্যুগ্র আবেগ, ভয়ংকর রমণীর ধারণা, গুপ্ত ও রহস্যময় ধর্মচর্চা সব মিলে গ্যোটিয়ার, সুইনবার্ন, বোদলেয়ার, হায়াসমান জাতীয় লেখকের বিপুল সৃষ্টি সম্ভব করেছে।[৯৬] নেরভাল ও ফ্লবেয়ারের কাছে ক্লিওপেট্রা, সালোম ও আইসিস প্রমুখ নারী বিশেষ অর্থবহ। তাই এটি দুর্ঘটনা নয় যে এ দুজনই তাদের প্রাচ্যসম্পর্কিত লেখায় এজাতীয় নারী চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করেছেন। তাদের সাংস্কৃতিক পটভূমি ছাড়াও উভয়ই তাদের ব্যক্তিগত পুরাণ সঙ্গে করে এনেছিলেন প্রাচ্যে। ফ্লবেয়ার ধর্মের উৎসস্থল ও ধ্রুপদ প্রাচীন ঘটনাবলির জায়গা প্রাচ্যে খুঁজেছেন একটি 'পিতৃভূমি'[৯৭]; নেরভাল চলেছেন তার ব্যক্তিগত আবেগের পেছনে।

উনিশ শতকীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মনে নেরভাল ও ফ্লবেয়ারের এমন আকাশছোঁয়া গুরুত্বের কারণ হলো এদের রচনা একই সাথে আমার আলোচিত প্রাচ্যতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ধারায় রচিত, আবার তা থেকে স্বাধীনও। নেরভাল ভয়েজ অঁ অরিয়ঁ লিখেছেন কিছু ভ্রমণ-নথি, টোকা, গল্প ও খণ্ডিত আখ্যান আকারে। তার অন্যান্য লেখাতেও প্রাচ্য ভ্রমণের প্রতিফলন পাওয়া যায়। ভ্রমণের আগে ও পরে ফ্লবেয়ারের লেখা যেন প্রাচ্যকে চুষে নিয়েছে। তার কার্নেট ডি ভয়েজ, লা ট্যান্টেশান ডি সেইন্ট এন্টনিও, হেরোডিয়াস, সালামবো, বহু পাঠ্য টোকা, অসমাপ্ত গল্প-কাহিনিতে প্রাচ্য এসেছে ঘুরেফিরে; যা চমৎকার অধ্যয়ন করেছে, ব্রুনো।[৯৮] মোটকথা, নেরভাল এবং ফ্লবেয়ার উভয়েই অবিরামভাবে প্রাচ্যের বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন লেখায়, তাদের ব্যক্তিগত সৌন্দর্যবোধের প্রয়োজনে ও রূপে। কিন্তু অন্যদের যেমন: লেইন, শ্যাতোব্রাঁ, ল্যামারটিন ও রেনানে প্রাচ্যকে সম্পূর্ণ উপলব্ধির প্রকাশ নেই; তারা প্রাচ্যকে সম্পূর্ণ আত্মীকৃত করতে পারেননি।

অতএব একদিকে, এ দুজনের প্রাচ্যতাত্ত্বিক কাজের আওতা প্রাচ্যতত্ত্বের সীমানা-চিহ্ন ছাড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে, এদের রচনার বিষয়ও প্রাচ্যদেশীয় বা প্রাচ্যের চেয়ে বেশি কিছু। যেমন নেরভাল মনে করতেন তিনি যা দেখেছেন তা ছড়িয়ে দিতে হবে, কারণ :

> আকাশ ও সমুদ্র এখনো ওখানে রয়েছে: প্রাচ্যদেশীয় আকাশ ও আয়োনীয় আকাশ প্রতি ভোরে পরস্পরকে পবিত্র প্রেমের চুম্বন এঁকে দেয়; কিন্তু পৃথিবী মৃত, কারণ মানুষ তাকে হত্যা করেছে; এবং ঈশ্বর পলাতক।

তাই প্রাচ্যকে বাঁচাতে হবে তার উর্বরতা দিয়ে। তিনি প্রাক-ধারণা থেকে প্রাচ্যের মধ্যে এক সমৃদ্ধ রমণীয় যৌনতা আন্দাজ করেন, যা তার কাছে কায়রোয় দেখা ঘোমটার নিচে সুপ্ত বলে মনে হয়। নেরভাল আসলে লেইন কর্তৃক ইসলামি সমাজে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কারের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করেন। তবে লেইনের মতো নারীবিবর্জিত থাকেননি। জয়নাবের সাথে তার সম্পর্ক সামাজিক প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু :

আদি-পিতৃভূমি এই পবিত্র মাটির কোনো সৎ রমণীর সাথে মিলিত হতে হবে আমাকে। আমাকে মানব প্রজাতির সপ্রাণ উৎস-ঝরনায় অবগাহন করতে হবে, যা থেকে কাব্যকলা ও আমাদের পিতৃপুরুষের বিশ্বাস প্রবাহিত হয়েছিল!... আমাকে উপন্যাসের মতো জীবন ধারণ করতে হবে। আমি স্বেচ্ছায় সক্রিয় ও দৃঢ়চিত্ত নায়কদের অবস্থায় নীত হব, যারা যেকোনো মূল্যেই হোক তাদের চারপাশে সৃষ্টি করতে চায় একটি নাটকীয় পরিবেশ, জটিলতার একটা গেরো—এক কথায়, ক্রিয়াশীলতা।[৯৭]

অবশ্য নেরভাল তার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তেমন নাটকীয় আখ্যান রেখে যেতে পারেননি। দৈহিক ক্রিয়াশীলতা দিয়ে মনকে প্রজ্বলিত করার ধারণাটিও ততটা আখ্যানধর্মী নয়। দৈহিক ও সহানুভূতির সূত্রে সম্পর্কিত হয়ে নেরভাল প্রাচ্যের সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক (বিশেষ করে রমণীয়) আবহের খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছেন; মিসরে শনাক্ত করেছেন এক রহস্যময় কিন্তু প্রবেশযোগ্য মাতৃকেন্দ্র যেখান থেকে উদ্ভূত হয় সকল জ্ঞান।[৯৮] তার অভিব্যক্তি, স্বপ্ন ও স্মৃতি কখনো কখনো অলংকৃত, সুলিখিত প্রাচ্যরীতির আখ্যানের কোনো কোনো অংশকে স্থানচ্যুত করে জায়গা করে নিয়েছে। মিসরে, লেবননে, তুরস্কে ভ্রমণের রূঢ় বাস্তবতা মিশে অদৃশ্য হয়ে গেছে প্রশমক উদ্দেশ্যের পরিকল্পনার সাথে। মনে হবে নেরভাল বুঝি অনেক কম সাম্রাজ্যবাদী ও অনিবার্য এক সুড়ঙ্গপথ ব্যবহার করে শ্যাতোব্রাঁর আইটিনেরিয়ারের পুনরাবৃত্তি করছেন। এ দিকটি চমৎকারভাবে আলোচনায় এনেছেন মিশেল বিউটর :

নেরভালের চোখে শ্যাতোব্রাঁর ভ্রমণ মাটির সমতলে, কিন্তু তার নিজের ভ্রমণ অঙ্ক-কষা—বাড়তি কেন্দ্রগুলো কাজে লাগানো হয়েছে, প্রধান কেন্দ্রসমূহ ঘিরে থাকা উপবৃত্তের প্রবেশপথ ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে তিনি সাধারণ কেন্দ্রসমূহের সকল মাত্রার ফাঁদগুলো প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন। কায়রো, বৈরুত, কনস্টান্টিনোপলের রাস্তায় বা পরিবেশে হাঁটার সময় কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করেছেন তিনি যা তাকে রোম, এথেন্স ও জেরুজালেমের নিচ দিয়ে বিস্তৃত কোনো গুহাপথের সন্ধান দেবে।...ঠিক যেমন শ্যাতোব্রাঁর তিনটি শহর পরস্পর সংযুক্ত : রোম তার সম্রাট ও পোপ নিয়ে এথেন্স ও জেরুজালেমের ঐতিহ্যও টেস্টামেন্টের সাথে সাদৃশ্যময়; এই হলো নেরভালের গুহাপথ।[৯৯]

ভ্রমণ শেষে নেরভাল যখন ইউরোপের ফিরতি পথে মালটায় পৌছেন তখন তার মধ্যে কাজ করে স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হওয়ার অনুভূতি।[১০০]

ভয়েজের জন্য ব্যবহৃত নেরভালের নোটবুক আমাদের অন্তত দুটো বর্ণনা সরবরাহ করে, যার সহায়তায় বোঝা যায় যে তার প্রাচ্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রাচ্য থেকে ভিন্ন, এমনকি যদিও তার রচনা প্রাচ্যতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের ওপর বেশ নির্ভরশীল। প্রথমটি হলো তার রুচি প্রায় সকল অভিজ্ঞতাকেই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে তাড়িত হয়েছে।

দ্বিতীয়টি, প্রথমটিরই বিশদ বিস্তৃতি–প্রাচ্য নেরভালের স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে, যার কেন্দ্রে আছে পালিয়ে যাওয়া নারী।[১০১]

নেরভালের শূন্য-প্রাচ্যের নেতিবাচক চিত্রের বিপরীতে ফ্লবেয়ার বিশেষভাবেই মূর্তিমান। তার নোট ও চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় একজন মানুষ সঠিকভাবে ঘটনা, ব্যক্তিবৃন্দ, বিন্যাস বর্ণনা করে যাচ্ছেন: ওদের বিশ্রী জিনিসগুলোও উপভোগ করছেন। তিনি কখনো তার অভিজ্ঞতায় আসা অসংগতিকে ঢাকার চেষ্টা করেননি। তিনি যে বিষয়েই লেখেন তার উৎকৃষ্ট অংশটি গঠিত হয় সহসাই নজরে আসা বিষয়সম্পর্কিত উক্তিতে। যেমন 'খোদিত লিপি ও পাখির ঝাঁক নামা–কেবল এ দুই জিনিস থেকে মিসরে প্রাণের উপস্থিতি বোঝা যায়।'[১০২] তার রুচিবিকৃতি পর্যন্তও যেতে পারে, তবে তাতে থাকে প্রাণময়তার ছাপ এবং কখনো কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশোধন। ফ্লবেয়ারের লেখার যত্রতত্র ছড়ানো পরিচিতি বৈপরীত্য–রক্ত-মাংস বনাম মন, সারোম বনাম সেইন্ট জন, সালামবো বনাম সেইন্ট এন্টনিও[১০৩] প্রাচ্যে তার অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশেষ বৈধতা লাভ করে। উত্তর মিসরে তিনি প্রাচীন মিসরীয় চিত্রকলার স্বাতন্ত্র্য এবং কামনার অভিব্যক্তির সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন; অত অতীতেও এমন অশ্লীল চিত্র ছিল? ভ্রমণ সম্পর্কে ফ্লবেয়ার তার মাকে লিখেন :

> তুমি জানতে চেয়েছ প্রাচ্য আমার কল্পনার মতো কি না। হ্যাঁ, তা-ই। তার চেয়ে বেশি, এটি আমার সংকীর্ণ পূর্ব ধারণার চেয়ে অনেক বিস্তৃত। আমার মনের সব অস্পষ্ট জিনিস আমি এখানে স্পষ্ট দেখতে পাই। ঘটনা জায়গা নিয়েছে অনুমানের–এত চমৎকারভাবে যে প্রায়ই মনে হয় আমি বুঝি কোনো বিস্তৃত স্বপ্নের জগতে এসে হাজির হয়েছি।[১০৪]

ফ্লবেয়ারের লেখা এত বিস্তৃত, এত জটিল যে তার কোনো সহজ বিবরণ হবে খুবই ভাসা ভাসা ও হতাশাব্যঞ্জকভাবে অসম্পূর্ণ। এ সত্ত্বেও অন্য লেখকদের সৃষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রাচ্যবিষয়ক লেখার কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যায়। ফ্লবেয়ারের প্রাচ্য পরিপ্রেক্ষিতের মূল নিহিত রয়েছে বিকল্প দৃষ্টিকল্পের জন্য তার পুব ও দক্ষিণমুখী সন্ধানে। তা বোঝায় 'ফ্রান্সের ধূসর প্রাদেশিক রঙের বিপরীতে জমকালো রং, নিরুদ্বেগ দৈনন্দিনতার পরিবর্তে উত্তেজক দৃশ্যাবলি, জীর্ণ পরিচিত পরিবেশের বদলে অবিচ্ছিন্ন রহস্যময়তা।'[১০৫] তিনি যখন প্রাচ্যে ভ্রমণ করেন তখন তা সত্যিই তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। অন্য প্রাচ্যতত্ত্বের মতো ফ্লবেয়ারের প্রাচ্যতত্ত্বও পুনর্জাগরণমুখী–প্রাচ্যকে তার জীবনে ফিরিয়ে আনতেই হবে–তার নিজের জন্য, পাঠকদের জন্য। তার প্রাচ্যবিষয়ক উপন্যাসগুলো শ্রমসাপেক্ষ ঐতিহাসিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুনর্গঠন। তার নিখুঁত বর্ণনা প্রাচ্যের ধর্ম, যুদ্ধ, প্রথাচার সম্পর্কে তার ব্যাপক পড়াশোনার ফসল।

বিবলিঘিক দ্য আইডিজ রিসিজের মত হলো, প্রাচ্যতাত্ত্বিক এমন এক মানুষ যে ভ্রমণ করেছে।[১০৬] ফ্লবেয়ার এ-জাতীয় অন্য মানুষদের চেয়ে আরও মেধাবী, শিল্পিত উপায়ে

প্রকাশ করেন তার ভ্রমণকে। তিনি যা দেখেছেন কেবল তাই বর্ণনা করেন না, রেনানের মতো যেভাবে দেখেছেন তাও বলেন :

> কাসর আল আইনি হাসপাতাল। সুব্যবস্থিত। ক্লট বে'র কাজ–তার হাত এখনো দেখা যায়। সিফিলিসের অনেকগুলো কেস। আব্বাস মামলুকের ওয়ার্ডে অনেকের গুহ্যদ্বারে এই অসুখ। ডাক্তারের নির্দেশে সবাই বেডে দাঁড়িয়ে তাদের প্যান্টের বেল্ট খুলে ফেলে এবং তাদের পায়ুপথ উন্মুক্ত করে। বিরাট স্ফীতি; একজনের পায়ুর ভেতরে লোম গজিয়েছে, একজন বয়স্ক লোকের পুরুষাঙ্গের চামড়া একেবারে নেই হয়ে গেছে; আমি বদগন্ধ থেকে পিছিয়ে আসি। একটি লোক দুবলা-পাতলা, হাত পেছনের দিকে বেঁকে গেছে, নখগুলো জন্তুর থাবার নখের মতো, দেহকাণ্ড কঙ্কালের মতো; তার শরীরের অন্যান্য অংশ চমৎকার মানানসইভাবে পাতলা, আর তার মাথার চারদিকে সাদাটে কুষ্ঠর বৃত্ত। শব-ব্যবচ্ছেদ কক্ষ...টেবিলে একটি আরব মৃতদেহ, খোলা; চমৎকার কালো চুল...।[১০৭]

এ দৃশ্যের খুঁটিনাটি বর্ণনা ফ্লবেয়ারের অনেক রচনার বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে অসুস্থতা আমাদের নিকট ক্লিনিক্যাল থিয়েটারের ভঙ্গিতে উপস্থাপিত। শব-ব্যবচ্ছেদ ও সৌন্দর্য বিষয়ে তার আগ্রহ সালামবোর শেষ দৃশ্যটি মনে করিয়ে দেয়। এ ধরনের দৃশ্যে প্রতিক্রিয়া বা সহানুভূতির আবেগ দমিত, নিখুঁত অনুপুঙ্খই মুখ্য।

ফ্লবেয়ারের ভ্রমণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ বিখ্যাত মিসরীয় নর্তকী ও বারাঙ্গনা কুচুক হানেমকে নিয়ে। লেইন থেকে তিনি জেনেছিলেন আলমাহ্ ও নওল–স্ত্রী নর্তকী ও বালক নর্তক সম্পর্কে। আরবিতে আলেমাহ্ অর্থ জ্ঞানী রমণী। আঠারো শতকে কবিতা পড়া মেয়েদের এই নাম রাখার চল ছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এ নামটি নর্তকী বেশ্যাদের সংঘ নামে পরিণত হয়। কুচুক হানেমের সাথে শোয়ার পূর্বে ফ্লবেয়ার তার বিখ্যাত নাচ 'লা অ্যাবেইল' উপভোগ করেন। ফ্লবেয়ারের বহু উপন্যাসের অনেক নারী চরিত্রের প্রত্নরূপ এই কুচুক হানেম। ভ্রমণ শেষে ফ্লবেয়ার লুইস কোলেটকে লিখেন, 'প্রাচ্যের নারীরা যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়, এরা পুরুষে পুরুষে কোনো পার্থক্য করে না'। কুচুক হানেমের নির্বাক ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় লা এডুকেশঁ সেঁটিমেঁতাল-এর এই অনুচ্ছেদটি :

> আমি নামমাত্র চোখ বন্ধ করেছি। এই নিদ্রিত সুন্দর জীব দেখতে দেখতে (সে নাক ডাকছে, তার মাথা আমার বাহুর ওপর, আমার তর্জনী তার হারের নিচে)–আমার রাত অনেক দীর্ঘ, অনিশ্চিত রকম দীর্ঘ এক দিবাস্বপ্ন–এ কারণেই আমি থেকে যাই। প্যারিস বেশ্যালয়ে কাটানো আমার রাতগুলোর কথা ভাবি আমি–গোটা একগুচ্ছ স্মৃতি ফিরে আসে এবং আমি তার কথা ভাবি, তার নাচ, গানে তার কণ্ঠস্বর, যে গান আমার নিকট অর্থহীন, এমনকি কোনো অর্থযুক্ত শব্দও নয়।[১০৮]

কুচুক ফ্লবেয়ারের সালামবো ও সালোম-এর আদিরূপ। সেবার রানির মতো সেও বলত যদি সে কথা বলতে পারত।[১০৯] অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কুচুক উর্বরতার

গোলমেলে প্রতীক, তার বিলাসী ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনতা নিয়ে অদ্ভুত রকম প্রাচ্যদেশীয়। কুচুকের বাড়ি নীল নদের তীরে এমন এক স্থানে যেখানে সালামবোর তানিতের ঘোমটা লুকিয়ে রাখা হয়।[১১০] এই কুচুক ও তার প্রাচ্য কীভাবে ফ্লবেয়ারের মধ্যে বন্ধ্যাত্বের বোধ প্রতীকায়িত করে তার ইঙ্গিত মেলে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে :

> আমাদের কাছে বিরাট অর্কেস্ট্রা, প্যালেট, বিচিত্র উৎস। আমরা অনেক ফাঁকিজুঁকি জানি, হয়তো এত বেশি যা কেউ জানেনি। আমাদের অভাব হলো আত্মগত নীতির–জিনিসের আত্মা, আত্মার মূল ধারণার। আমরা নোট নিই, ভ্রমণ করি : শূন্যতা! শূন্যতা! আমরা পণ্ডিত, প্রত্নতাত্ত্বিক, ডাক্তার, রুচিমান মানুষ হই। এসবের কোনটি উত্তম? হৃদয় কোথায়, প্রাণশক্তি, সঞ্জীবনী প্রাণরস? কোত্থেকে শুরু করতে হবে? কোথায় যেতে হবে? আমরা কেবল ভালোভাবে চুষতে জানি? আমরা অনেক জিহ্বা খেলা খেলি, আর ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরে নারী-পুরুষ হাতাহাতি করি। কিন্তু আসল কাজ! বীর্যপাত করা, সন্তান লাভ![১১১]

ফ্লবেয়ারের উত্তেজনাকর-অনুত্তেজনাকর সকল অভিজ্ঞতাতেও আমরা পাই প্রাচ্যের সাথে যৌনতার গভীর সম্পর্ক। ফ্লবেয়ারই এতে প্রথম নন বা তার মধ্যে তুলনামূলক কোনো বাড়াবাড়িও নেই। বরং প্রতিভার কারণে তিনি এ প্রবণতায় শিল্পিত মর্যাদা যুক্ত করেন। আসলে প্রাচ্য তাকে তার নিজের মানবিক ও কারিগরি সম্বলের উৎসে ফিরিয়ে দেয়। তা ফ্লবেয়ারের উপস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া করে না। এর চলন্ত জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে ফ্লবেয়ার, লেইনের মতো, প্রাচ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করেন; তেমনি অনুভব করেন এতে অংশগ্রহণকারী একজন হয়ে উঠতে তার অনিচ্ছাও। এটিই ফ্লবেয়ারের অবিচ্ছিন্ন সমস্যা। ফ্লবেয়ারের সকল শিক্ষাই কাঠামোগত, যেমন বলেছেন মিশেল ফুকো : মঞ্চসদৃশ গ্রন্থাগার–সাধকের দৃষ্টির সামনে দিয়ে প্যারেড করে যাচ্ছে।[১১২]

বুদ্ধির অপরিমেয় শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মীকরণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ফ্লবেয়ার প্রাচ্যে গিয়ে বোধ করেন : প্রথমত 'এতে (প্রাচ্যে) যত বেশি খুঁটিনাটির ওপর নজর দেবে, সামগ্রিক মূর্তিটি একসাথে উপলব্ধির সম্ভাবনা তত কম'। দ্বিতীয়ত, 'জিনিসগুলো তাদের নিজ নিজ জায়গায় নিজেরাই পতিত হয়েছে'।[১১৩] সাধারণ স্তরে এটি জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা। ভ্রমণের একপর্যায়ে তিনি ভেবেও দেখেন কী ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। একবার তিনিই মন্তব্য করেন, আত্মা ও রীতি ছাড়া মন 'প্রত্নতত্ত্বে হারিয়ে যেতে পারে'। এ ধরনের চাপের প্রভাবে 'পৃথিবী পরিচালিত হবে কলেজের মতো। আইন হবে শিক্ষক। প্রত্যেকের থাকবে পেশাগত পোশাক।'[১১৪]

সংগঠিত জ্ঞানচর্চা, এর উৎপাদন ও পরিণতি সম্পর্কে অন্য যেকোনো ঔপন্যাসিকের তুলনায় বেশি সচেতন ছিলেন ফ্লবেয়ার। এ ধরনের উৎপাদনের পরিণতি পিকুশে ও

বোভারের দুর্ভাগ্যে পরিষ্কার প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব, ওই সময় দ্বিবিধ স্রোত সামনে আসে : কেউ চাইলে সৃজনশীল প্রাণশক্তি ও রীতির সমন্বয়ে পৃথিবী নতুন করে গড়ে নিতে পারে অথবা নৈর্ব্যক্তিক প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম মেনে অবিরামভাবে তার অনুলিপি প্রস্তুত করে যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে এই কর্মকাঠামো বহাল থাকে যে, প্রাচ্য এক দূরবর্তী পৃথিবী; আমাদের পশ্চিমের দৈনন্দিন ঘটনা, আবেগ, মূল্যবোধ থেকে তা ভিন্ন।

ফ্লবেয়ার তার সকল উপন্যাসে প্রাচ্যকে ব্যবহার করেছেন অবাধ যৌনকল্পনার অনুষঙ্গে। ব্যভিচারের স্বাধীনতা ও প্রাচ্যের সম্পর্ক সেখানে পরিষ্কার। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে উনিশ শতকের ইউরোপে যৌনতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় বাঁধা পড়ে। ওখানে অবাধ যৌনতা বলে কিছু ছিল না। সমাজে যৌনতার সাথে জড়িয়ে ছিল একরাশ আইন, প্রথা, নৈতিক এমনকি রাজনৈতিক পরিস্থিতি। তাই প্রাচ্য হয়ে ওঠে সেই জায়গা যেখানে যে কেউ তার সব রকমের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করতে পারে। ১৮০০ সালের পর থেকে এমন একজন লেখক পাওয়া ভার যিনি প্রাচ্য সম্পর্কে লিখেছেন কিন্তু এ সুযোগটি গ্রহণ করেননি। ওখানে তারা যা খোঁজেন তা হলো নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অন্য রকম যৌনতা। ক্রমে প্রাচ্যদেশীয় যৌনতা পরিণত হয় আদর্শ পণ্যে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সেও সেই জ্ঞানসাধনার বিকাশ ঘটে, যার ভয় করেছিলেন ফ্লবেয়ার। গবেষণা নিয়মিত চর্চায় পরিণত হয়। তথ্যের আদান-প্রদান এবং সমস্যাসমূহ ও গবেষণার বিষয় ও ফলাফল সম্পর্কে ঐকমত্য দেখা দেয়।[১১৫]

এর মধ্যে প্রাচ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ফ্রান্সের চেয়ে ব্রিটেনের আগ্রহ ছিল বেশি; তবে ভুললে চলবে না যে রাশিয়া ১৮৬৮ সালে সমরখন্দ ও বোখারা দখল করে নেয়। প্রাচ্য পরিণত হয় সংখ্যালঘুর ইস্যুতে। প্রতিটি বৃহৎ শক্তি এক একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী–ইহুদি, অর্থোডক্স খ্রিষ্টান, গ্রিক, দ্রুজ, আরমেনীয়, কুর্দ প্রভৃতির স্বার্থরক্ষা ও প্রতিনিধিত্ব করার দাবি উত্থাপন করে। এমনকি এ সময় শতকের মধ্যভাগ পেরিয়ে রচিত সবচেয়ে নিরীহ-দর্শন বহুসংখ্যক ভ্রমণকাহিনিও এই নবজাগ্রত গণমানসের পরিণতিতে ভূমিকা রাখে।[১১৬] (কিছু মার্কিন পর্যটক যেমন মার্ক টোয়েন ও হারম্যান মেলভিলও এতে অন্তর্ভুক্ত[১১৭])।

বায়রন ও স্কটের মতো এ যুগের রোমান্টিক লেখকদের নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিকট প্রাচ্য সম্পর্কে। স্কটের ইতিহাস-চেতনা তার তালিসমান ও কাউন্ট রবার্ট অব প্যারিসকে যথাক্রমে ক্রুসেডার ফিলিস্তিন ও একাদশ শতকের বাইজেন্টাইন পটভূমিতে স্থাপন করে। এমনকি যিনি কখনো প্রাচ্য ভ্রমণ করেননি

সেই জর্জ এলিয়টও এই প্রবণতা থেকে দূরে থাকতে পারেননি (দ্র. ডেনিয়েল দেরোন্দা, ১৮৭৬)।

ইংরেজিতে শ্যাতোব্রাঁ, ল্যামারটিন, নেরভাল ও ফ্লবেয়ার এ চার ফরাসি লেখকের রচনার সমান্তরাল তুলনা নেই। ব্রিটিশদের মধ্যে কিঙলেইকের ইয়োথেন (১৮৪৪) ও বার্টনের পার্সোনাল ন্যারেটিভ অব এ পিলগ্রিমেজ টু আল মদিনা অ্যান্ড মক্কা (১৮৫৫-৫৬) খুব বেশি ধারাবিবরণী ধরনের এবং দায়িত্বগত একরৈখিক। কিঙলেইক যে মনোভঙ্গি প্রকাশ করেছেন তা মতাদর্শের দ্বারা শাসিত; তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো প্রাচ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতা তার প্রাক-ধারণার ওপর কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি। মরুভূমি পার হয়ে সুয়েজ যাওয়ার পথে তিনি লিখছেন, 'আমি এখানে, এই আফ্রিকান মরুতে এবং কেবল আমি, অন্য কেউ নয়, আমার জীবনের দায়বাহী'।[১১৮]

পূর্ববর্তী ল্যামারটিনের মতো কিঙলেইকও নিজের জাতির শ্রেষ্ঠত্বকেন্দ্রিক আত্মশ্লাঘায় উদ্দীপ্ত। দুজনের মধ্যে পার্থক্য কেবল এটুকু যে ইংরেজ ভদ্রলোকের দেশ প্রাচ্যের অন্যান্য অংশ দখলের দিকে ফ্রান্সের তুলনায় এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে, বিষয়টি নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ফ্লবেয়ারও।[১১৯] অন্যদের মতো গর্বিত ব্যক্তিত্বের কারণে কিঙলেইকের মনোভঙ্গিও শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যের ওপর তাদের জাতীয় ও গণমানুষের ইচ্ছার প্রতিফলনে পরিণত হয়।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে বার্টনের কাজ একদিকে লেইন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রাচ্যতাত্ত্বিক রীতি, অন্যদিকে ফরাসি রীতির মাঝবরাবর একটি অবস্থান গ্রহণ করে। তার প্রাচ্যবিষয়ক বিবরণও তীর্থযাত্রার ঢঙে লেখা। একদল তেজোদীপ্ত ভিক্টোরীয় পর্যটকের রচনাসম্পর্কিত আলোচনায় থমাস আসাদ সঠিকভাবেই বার্টনকে প্রথম স্থান দেন। আসাদ বিভিন্ন মনোভঙ্গি ও বোধবুদ্ধির লেখকের রচনার সাথে অস্টিন লেয়ার্ডের ডিসকভারি ইন দ্য রুইনস অব নিনেভাহ অ্যান্ড বেবিলন (১৮৫১), এলিয়ট ওয়ারবার্টনের দ্য ক্রিসেন্ট অ্যান্ড ক্রসও (১৮৪৫) অন্তর্ভুক্ত করেন।[১২০] তবে বার্টনের বিষয়টি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ইস্যুর চেয়ে জটিলতর। কারণ তার লেখায় আমরা পাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইউরোপের (বিশেষত ইংল্যান্ডের) সাথে একাত্মতায় উদ্দীপ্ত তার জাতীয়তাবাদী বোধের সংঘাতের চিহ্ন। আসাদ সংবেদনশীল আলোচনায় দেখিয়েছেন বার্টন আসলে সাম্রাজ্যবাদী, আরবদের সাথে তার সহানুভূতিশীল একাত্মতা সত্ত্বেও।

অতএব, সমস্যাটি শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের সমস্যায় স্পষ্ট সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এ কারণে বার্টনের প্রাচ্যতত্ত্বের পর্যবেক্ষণ দিয়েই উনিশ শতকের অধিকাংশ সময় জুড়ে সংগঠিত প্রাচ্যতাত্ত্বিক গঠন ও পুনর্গঠন-সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করা উচিত। ভ্রমণকারী হিসেবে বার্টন নিজেকে প্রাচ্যদেশীয় বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি

যে কেবল অনর্গল আরবি বলতে পারতেন তা-ই নয়, ইসলামের অন্তস্তলেও প্রবেশ করতে সক্ষম হন এবং ভারতীয় মুসলিম ডাক্তারের ছদ্মবেশে মক্কায় তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করেন। তবে বার্টনের চরিত্রের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি জানতেন প্রাচ্য–বিশেষত ইসলাম তথ্য, আচরণ ও বিশ্বাসের সমাহারে এক পদ্ধতি; সুতরাং একজন প্রাচ্যদেশীয় বা একজন মুসলমানকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নির্দিষ্ট উপায়ে অবহিত থাকতে হয় এবং এগুলো সংশ্লিষ্ট সমাজের পরিস্থিতির পটভূমিতে ইতিহাস, ভূগোল ও সামাজিক উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল।

তাই আমরা দেখি প্রাচ্যে বাস করে, সরাসরি তাকে দেখে, সেই সমাজের একজনরূপে আবির্ভূত হয়ে অর্জন করা জ্ঞানের সহায়তায় যে সাধারণীকরণ করেছেন বার্টন তা অন্য কোনো লেখকের বেলায় দেখা যায় না, যেমন আরবদের জন্য কায়েফের ধারণার ওপর রচনাংশ বা প্রাচ্যদেশীয় মানসিকতার সাথে শিক্ষা কতটা খাপ খাবে তার আলোচনায় (যা পরিষ্কারভাবে ম্যাকরেল সরল শিক্ষানীতির জবাব)।[১২] তার পিলগ্রিমেজ বা অ্যারাবিয়ান নাইটসের অনুবাদের বেলায় (এবং 'টারমিনাল এসে'-এর ক্ষেত্রে)[১২২] প্রতিটি টীকায় ধরা পড়েছে 'একদা কলঙ্কজনক পদ্ধতির' প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর তার অসাধারণ দখলের উল্লাস। প্রাচ্যের ব্যাপারে প্রতিটি জিনিসই আমাদের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে বার্টনের জ্ঞানগর্ভ হস্তক্ষেপের পর। তাই বার্টন যখন আমাদের বলেন, 'মিসর এক ধনাগার–বিজয়ের জন্য' অর্থাৎ 'এটি ইউরোপের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সামনে প্রাচ্যের বাড়িয়ে দেওয়া সবচেয়ে প্রলুব্ধকর পুরস্কার'[১২৩], তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের এক গুরু প্রাচ্যকে দখলের ইউরোপীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কীভাবে তথ্য মদদ সরবরাহ করেন।

বার্টনের দুই স্বর অবশেষে এক হয়ে প্রাচ্যতাত্ত্বিক-কাম-সাম্রাজ্যবাদী প্রতিনিধির কণ্ঠে পরিণত হয়, যেমন ঘটে টি ই লরেন্সে, এডওয়ার্ড হেনরি পালমার, ডি জি গোহার্থ, গার্ট্রুড বেল, রোনাল্ড স্টরস, সেন্ট জন ফিলবি এবং উইলিয়াম গিফোর্ড পালগ্রেভের বেলায়।

জীবন ও জ্ঞানের বিভিন্ন প্রদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনর্গঠন ও পুনরায় আলোকিত করার যে প্রয়াস দেখা দেয় উনিশ শতকের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে তাতে অন্যান্য রোমান্টিক বিষয়ের মতো প্রাচ্যতত্ত্বও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রোমান্টিকতায় উদ্দীপ্ত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি থেকে তা হয়ে ওঠে ফ্লবেয়ারের ভাষায়, নীতিশাসিত শিক্ষা পদ্ধতি; কেবল তা-ই নয়, বার্টনের মতো দুর্ধর্ষ শ্রেণির ব্যক্তিদেরও তা সাম্রাজ্যবাদের নথি লেখককে সংকুচিত করে আনে। প্রাচ্য আর স্থান থাকে না, পরিণত হয় প্রকৃত পণ্ডিতি মতাদর্শের শাসনাধীন এক উপনিবেশ–সম্ভাবনাময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে। রেনান, সেসি ও লেইনের মতো আদি প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখকদের দায়িত্ব ছিল একই সাথে তাদের রচনা ও প্রাচ্যকে দৃশ্যের জোগান দেওয়া। এর পরবর্তী পর্যায়ের

প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা কেবল দৃশ্যকেই আঁকড়ে ধরেন। আরও পরে যখন দৃশ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন বোঝা যায় এ কাজে ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান ও সরকার অনেক বেশি উপযোগী। এই হলো উনিশ শতকীয় প্রাচ্যতত্ত্বের অবদান, যার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে বিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্ব। আমরা এখন খুঁজে দেখব ঠিক কোন উপায়ে বিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্ব–১৮৮০ সাল থেকে পশ্চিম কর্তৃক প্রাচ্য দখলের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সূচনা থেকে–সফলতার সাথে জ্ঞান ও স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে; সংক্ষেপে, কীভাবে প্রাচ্যতত্ত্ব পৌনঃপুনিক আত্ম-অনুকরণের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে কাঠামোবদ্ধ রূপ।

অধ্যায় তিন

বর্তমান প্রাচ্যতত্ত্ব

on les apercivait tenant leurs idoles entre leurs bras comme de grands enfants paralytiques.

-Gustave Flaubert

La Tentation de Saint Antoine

বিশ্বজয়-যা প্রধানত বোঝায় আমাদের চেয়ে ভিন্ন গাত্রবর্ণের অথবা একটু চ্যাপ্টা নাকের মানুষদের নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া-যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে দেখলে ভালো কিছু বলে মনে হয় না। এর সাথে জড়িয়ে আছে একটা ভাবাদর্শ মাত্র-পেছনে সক্রিয় একটা ভাবাদর্শ; আবেগী ভান নয়, ভাবাদর্শ : এবং ভাবাদর্শে একটি আত্মস্বার্থহীন বিশ্বাস যে : তুমি কিছু একটা প্রতিষ্ঠা করতে পারো, তার সম্মানে মাথা নত করতে পারো এবং উৎসর্গ করতে পারো কোনো আত্মত্যাগ...।

জোসেফ কনরাড

হার্ট অব ডার্কনেস

• ক •

প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য প্রাচ্যতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়ে আমি নিকটপ্রাচ্য, ইসলাম ও আরবদের ব্যাপারে ব্রিটিশ ও ফরাসি অভিজ্ঞতার সযত্নলালিত ধরন হিসেবে 'প্রাচ্যতত্ত্ব' পরিভাষাটির নির্দেশিত চিন্তা ও তৎপরতার ব্যাপ্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছি। ওই সব অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছি প্রাচ্য প্রাশ্চাত্যের একটি ঘনিষ্ঠ–সম্ভবত সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই অভিজ্ঞতা প্রাচ্যের সাথে পশ্চিম বা ইউরোপের আরও অনেক বিস্তৃত সম্পর্কের একটি অংশ। তবে প্রাচ্যতত্ত্বকে যা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় তা হলো প্রাচ্যের কারবারি পশ্চিমাদের মনে প্রাচ্যের সাথে একটি অবিরাম সংঘাতের বোধ। পূর্ব-পশ্চিম সীমানার ধারণা, বিভিন্ন মাত্রার প্রদর্শিতহীনতা ও শক্তি, সম্পাদিত রচনাদির আওতা, প্রাচ্যের ওপর আরোপ করা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যসমূহের ধরন–এই সবকিছুই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে ইচ্ছাকৃত কাল্পনিক ও ভৌগোলিক বিভাজন এবং বহু শতাব্দী ধরে তা মেনে চলার সাক্ষ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমার দৃষ্টি যথেষ্ট সরু হয়ে পড়ে। যাকে বলছি আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব, তার আদি পর্যায়ে আগ্রহী ছিলাম আমি। এর শুরু অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রারম্ভিক বছরগুলোয়।

আমার বর্তমান অধ্যয়নকে আধুনিক পশ্চিমে প্রাচ্যচর্চা বিকাশের ধারাবিবরণী করে তোলার ইচ্ছা ছিল না বলে আমি ১৮৭০ বা ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিতে প্রাচ্যতত্ত্বের উত্থান, বিকাশ ও এ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ণনা করেছি। যদিও ওখানে মোটামুটি বিচিত্রগামী পণ্ডিত ও সৃষ্টিশীল লেখকেরা আমার আগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হন, তবু কোনো অবস্থাতেই দাবি করা যায় না যে এ ক্ষেত্রটির গঠন, অন্যান্য জ্ঞানক্ষেত্রের সাথে এর সম্পর্ক এবং এর সবচেয়ে প্রভাবশালী কয়েকজন লেখকের কিছু রচনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছাড়া আমি আর কিছু করেছি। আমার প্রধান প্রায়োগিক অনুমান ছিল এবং এখনো আছে যে : সমাজ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অন্যান্য জাগতিক পরিস্থিতি এবং স্কুল, লাইব্রেরি ও সরকার প্রভৃতি ভাবসাদ্যদায়ক প্রভাব জ্ঞানক্ষেত্র, তেমনি সবচেয়ে উৎকেন্দ্রিক লেখকের সৃষ্টির ওপরও নিয়ত চাপ সৃষ্টি করে এবং তার ওপর ক্রিয়াও করে; পণ্ডিতি ও সৃজনশীল

উভয় ধরনের লেখাই কখনো মুক্ত নয়, বরং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কল্পনা, অনুমান ও ইচ্ছার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং সবশেষে, প্রাচ্যতত্ত্বের মতো 'বিজ্ঞান' যেমন উন্নতি সাধন করে বলে আমরা ভাবি বাস্তবে তা অতটা সত্যি নয়। সংক্ষেপে, এখানে আমার গবেষণা প্রাচ্যতত্ত্বকে সুসংগত বিষয়বস্তুতে রূপান্তরকারী সুকৌশলী সংগঠন বর্ণনার চেষ্টা করেছে; এমনকি পশ্চিমে একটি ধারণা, কল্পনা ও চিত্রকল্প হিসেবে প্রাচ্য শব্দটির আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুরণন মেনে নিয়েই।

আমি উপলব্ধি করি এ রকম আন্দাজে বিতর্ক রয়ে গেছে। আমরা অনেকেই সাধারণভাবে চিন্তা করি শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য সামনের দিকে অগ্রসরমাণ; অনুভব করি সময়ের প্রবাহে নতুন তথ্য আহরিত হয়, পদ্ধতিগুলো পরিশোধিত হয়, পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাজের ওপর উন্নয়ন সাধন করে নতুন প্রজন্ম। এ ছাড়া আমরা সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে এমন একটি অতিকথা বিশ্বাস করি যে তীক্ষ্ণধী শিল্পী, প্রকৃত প্রতিভাবান বা একজন শক্তিশালী মেধাবী স্রষ্টা পৃথিবীর নিকট একটি নতুন কীর্তি তুলে ধরার জন্য তার সময় ও অবস্থানের বন্দিত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের বক্তব্যে যে কিছু সত্যতা আছে তা অস্বীকার করা অযৌক্তিক।

এ সত্ত্বেও মহৎ ও খাঁটি মনের সংস্কৃতিতে সৃষ্টির সম্ভাবনা অফুরন্ত নয়, যেমন এও সত্যি যে প্রকৃত মেধাবী স্রষ্টা তার গৃহীত বিষয়টির সঞ্চয় এবং এতে পূর্ববর্তীদের সম্পাদিত কাজকর্মের প্রতি সব সময়ই যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। অগ্রবর্তীদের কাজ, পণ্ডিতি জ্ঞানক্ষেত্রটির প্রাতিষ্ঠানিক জীবন, বিশেষজ্ঞ উদ্যমের যৌথ মনোভাব–এসবে আছে ব্যক্তি পণ্ডিতের সৃষ্টির প্রভাব হ্রাস করার প্রবণতা; আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কথা না হয় বাদই দিলাম। প্রাচ্যতত্ত্বের মতো বিষয়ের রয়েছে যৌথ ও একক কেন্দ্রীয় পরিচিতি; এমন এক পরিচিতি যা প্রথাগত শিক্ষা (ধ্রুপদ, বাইবেল, ভাষাশিক্ষা), জনপ্রতিষ্ঠান (সরকার, বাণিজ্য কোম্পানি, ভৌগোলিক সোসাইটি, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ) এবং শ্রেণিগতভাবে সীমাচিহ্নিত রচনা (ভ্রমণকাহিনি, আবিষ্কারকাহিনি, কল্পকথা, অদ্ভুত ধরনের বর্ণনামূলক রচনা) প্রভৃতির সাথে তার সম্পর্ক বিশেষভাবে শক্তিশালী। প্রাচ্যতত্ত্বের জন্য এর ফলাফল হলো–নির্দিষ্ট ছাঁচের জিনিস, নির্দিষ্ট কয়েক ছাঁচের বক্তব্য, কয়েক ধরনের কাজ প্রাচ্যতাত্ত্বিকের বেলায় যথার্থ মনে হয়। তিনি তার গবেষণা ও রচনা দাঁড় করিয়েছেন এসবের ওপর, পরে এগুলো নতুন লেখক-গবেষকদের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। এদিক দিয়ে প্রাচ্যতত্ত্বকে প্রাচ্যের জন্য উপযোগী বলে মনে হয় এমন কিছু অনুজ্ঞা, পরিপ্রেক্ষিত ও ভাবাদর্শিক পক্ষপাতিত্ব দ্বারা শাসিত রচনা, দৃষ্টি ও অধ্যয়নের একটি রীতি বলে মনে করা যেতে পারে। প্রাচ্য অধীত, গবেষিত, শাসিত ও উচ্চারিত হয়েছে অসংলগ্ন কিছু উপায়ে।

প্রাচ্যতত্ত্বে যে প্রাচ্যের দেখা মেলে তা হলো পশ্চিমা জ্ঞানচর্চা, পশ্চিমা চৈতন্য এবং পরে পশ্চিমা সাম্রাজ্যে প্রাচ্যকে টেনে আনা একরাশ শক্তির দ্বারা শাসিত নির্দিষ্ট

উপস্থাপন-পদ্ধতি। প্রাচ্যতত্ত্বের এ সংজ্ঞা যদি খুব বেশি রাজনৈতিক হয়ে থাকে, তাহলে তা এ জন্য যে আমি মনে করি প্রাচ্যতত্ত্ব নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক শক্তি ও তৎপরতার সৃষ্টি। প্রাচ্যতত্ত্ব ভাষ্য-বিশ্লেষণের একটি মতধারা–ঘটনাক্রমে যার বিষয়বস্তু হলো প্রাচ্য, তার সভ্যতা, জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলসমূহ। এর উদ্দেশ্যমুখী আবিষ্কার হলো মূল রচনাসমূহের সম্পাদক, অনুবাদক, ব্যাকরণ লিখক, অভিধান-রচয়িতা, লুপ্তপ্রায় গীতিকাব্যের পুনর্গঠনকারী, ইতিবাচক প্রামাণ্য জ্ঞানচর্চার সূচনাকারী অসংখ্য নিবেদিত পণ্ডিতের রচনারাজি। সেসব রচনা এখন এবং সর্বদাই এই বাস্তবতার শর্তাধীন যে এগুলোর অন্তঃস্থ সত্য ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য সত্যের মতোই, ভাষাতেই প্রকাশরূপ পেয়েছে। অন্যদিকে, ভাষার সত্য আসলে কী সে বিষয়ে নিটশের বক্তব্য এ রকম :

> রূপক, লক্ষণালংকার ও আরোপণের চলমান বাহিনী–সংক্ষেপে মানবীয় সম্পর্কের যোগফল যা কাব্যিক ও বাগ্মিতায় বৃদ্ধি পেয়েছে, স্থানবদল করেছে ও সুসজ্জিত হয়েছে এবং দীর্ঘ ব্যবহারের পর কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত, নিয়মসিদ্ধ ও বাধ্যতামূলক বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে : সত্য হলো বিভ্রম যার সম্পর্কে কেউ হয়তো ভুলে গেছে যে সত্য আসলে তা-ই।[১]

নিটশের মতামত আমাদের কাছে অত্যন্ত নৈরাজ্যবাদী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা অন্তত এই বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যে পশ্চিমের চৈতন্যে প্রাচ্যতত্ত্ব প্রথমে ছিল একটি শব্দ বা পরিভাষা মাত্র; পরবর্তী সময়ে তা একরাশ অর্থ, সম্পর্ক ও ভাবার্থ গ্রহণ করে এবং এগুলো প্রকৃত প্রাচ্যকে নির্দেশ করে না, বরং ইঙ্গিত করে শব্দটির চারপাশের অধ্যয়নক্ষেত্রটির প্রতি।

অতএব, প্রাচ্যতত্ত্ব পশ্চিমে সর্বদা অস্তিত্ববান কোনো ইতিবাচক মতবাদ নয় কেবল, এটি প্রভাবশালী প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যও (যখন কেউ প্রাচ্যতাত্ত্বিক নামে পরিচিত প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞকে নির্দেশ করেন); তেমনি এটি পর্যটক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকার, সামরিক অভিযান, উপন্যাস ও অজানার পথে অভিযানের বর্ণনামূলক রচনার পাঠক, প্রকৃতির ইতিহাসবিদ ও তীর্থযাত্রী–যাদের নিকট প্রাচ্য বিশেষ একধরনের মানুষ, স্থান ও সভ্যতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধরনের জ্ঞান–তাদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি জ্ঞানক্ষেত্রও। প্রাচ্য প্রসঙ্গে বাগবিধির ব্যবহার প্রচুর। এসব বাগবিধি ইউরোপীয় ডিসকোর্সে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। বাগবিধির তলে তলে আছে প্রাচ্য বিষয়ে মতবাদের একটি স্তর–এই মতবাদ চলতি রীতি হিসেবে বহু ইউরোপীয়র অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট; এসব ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা আবার প্রাচ্যের অনিবার্য কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন: প্রাচ্যজনের চরিত্র, প্রাচ্যের স্বজনপ্রীতি, প্রাচ্যের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতিতে এসে একত্রে মিলেছে। আমি মনে করি সাক্ষ্যপ্রমাণে না গিয়েও বলা যায় উনিশ শতকের যেকোনো ইউরোপীয়র বেলায় প্রাচ্যতত্ত্ব ছিল সেই

সত্যের এক পদ্ধতি, নিটশে যে অর্থে সত্যের উল্লেখ করেন। সুতরাং এ কথা সত্যি যে প্রতিটি ইউরোপীয় প্রাচ্য সম্পর্কে যা বলত তার মধ্যেই প্রকাশ পেত তার বর্ণবাদী, সাম্রাজ্যবাদী এবং সম্পূর্ণ জাত্যভিমানী চৈতন্য।

তা ছাড়া যদি স্মরণ করি যে মানবীয় সমাজ বিশেষত অগ্রসর সংস্কৃতি 'অন্য' (Other)-এর সাথে আদান-প্রদানের জন্য ব্যক্তিকে সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ও জাতিগত অহংকার ছাড়া কদাচিত অন্য কিছু দিতে পেরেছে, তাহলে ওই স্তর থেকে কিছু তাৎক্ষণিক কাঁটা অপসারিত করা যায়। অতএব, পৃথিবীতে এশীয় ও ইউরোপ অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্যের বোধ আরও তীব্র ও দৃঢ় করার জন্য সক্রিয় সাংস্কৃতিক চাপ ও প্রাচ্যতত্ত্ব পরস্পরকে সহায়তা করে। আমার কথা হলো প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যকে ঘিরে পরিকল্পিত মৌলিক রাজনৈতিক মতবাদ, কারণ, পশ্চিম প্রাচ্যের চেয়ে সবল, যা প্রাচ্যের দুর্বলতার সাথে তার পার্থক্যকে এড়িয়ে গেছে। আমি এ বক্তব্য ব্যক্ত করেছি প্রথম পরিচ্ছেদে। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহের প্রায় সবকিছুই অংশত এর সমর্থক ও বলকারক হিসেবে উপস্থাপিত। (পশ্চিমে) প্রাচ্যতত্ত্ব নামের একটি বিষয়ের অস্তিত্ব এবং প্রাচ্যে তার সমান্তরালে কোনো বিষয় না থাকার ঘটনাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক শক্তির ইঙ্গিত।

প্রাচ্যের ওপর রচিত বিপুলসংখ্যক পৃষ্ঠার অস্তিত্ব আছে। ওগুলো অবশ্যই চিহ্নিত করে প্রাচ্যের সাথে মিথস্ক্রিয়ার পরিমাণ ও মাত্রা, যা প্রকৃতপক্ষে ভয়াবহ। পশ্চিমা শক্তির গুরুত্বপূর্ণ সূচক এই যে (আঠারো শতকের শেষ দিকে) পশ্চিমাদের পুবমুখী চলনের সংখ্যাগত অবস্থার সাথে প্রাচ্যজনের পশ্চিমমুখী গমনের তুলনার সুযোগও নেই। প্রাচ্যে পশ্চিমা সেনাবাহিনী, কূটনৈতিক দল, ব্যবসায়ী এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের অবিরাম প্রাচ্যমুখী অভিযানের কথা বাদ দিলেও ১৮০০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ইসলামি প্রাচ্য থেকে ইউরোপগামীর সংখ্যা বিপরীতগামীর তুলনায় অতি নগণ্য।[২] তা ছাড়া প্রাচ্যের লোকেরা পশ্চিমে গেছে শেখার জন্য, অগ্রসর একটি সংস্কৃতির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার জন্য; অন্যদিকে, আমরা দেখেছি প্রাচ্যে পশ্চিমের পর্যটকদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধিকন্তু, মোটামুটি ১৮০০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে নিকটপ্রাচ্য সম্পর্কে প্রায় ষাট হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে; এর সাথে তুলনার জন্য পশ্চিম সম্পর্কে অল্পসংখ্যক গ্রন্থও প্রাচ্যে লেখা হয়নি। একটি সাংস্কৃতিক যন্ত্র হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ব কেবল আগ্রাসন, তৎপরতা, বিচার-বিশ্লেষণ, সত্যের ইচ্ছা আর জ্ঞানমাত্র। প্রাচ্য অস্তিত্ববান পশ্চিমের জন্য; অন্তত অসংখ্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকের সে রকমই ধারণা। তারা যা নিয়ে কাজ করেন তার প্রতি তাদের মনোভাব পিতৃত্বসুলভ, কিংবা অকপটে এমন যেন তারা উঁচু আসন থেকে দয়া করে নিচে নেমে এসেছেন; অবশ্য যদি তারা প্রাচীন নিদর্শনাদির ব্যবসায়ী বা বিশেষজ্ঞ না হন। আর তাহলে প্রাচ্য তাদের জন্য ছিল লাভ; শোক প্রকাশের যোগ্য আধুনিক

প্রাচ্যের জন্য নয়। তা ছাড়া আছে প্রায় অসংখ্য এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠান, প্রাচ্যে যার তুলনাও নেই।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এ রকম ভারসাম্যহীনতা পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক বিন্যাসের কাজ। আট থেকে ষোল শতক পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামরিক বিকাশের স্বর্ণযুগে ইসলাম পুব ও পশ্চিম উভয় ক্ষেত্রেই আধিপত্য করেছে। এরপর ক্ষমতাকেন্দ্র পশ্চিমমুখী হয় এবং এখন বিশ শতকের শেষে তা আবার ফিরে যাচ্ছে বলে মনে হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্বের আলোচনা শতাব্দীর বিশেষ একটি উত্তপ্ত সময়ে এসে থেমে গেছে, যখন প্রাচ্যতত্ত্বের ধীর, বিমূর্ত ও প্রদর্শনমূলক দিকগুলো পুবের উপনিবেশবাদের প্রয়োজনের নতুন এক জাগতিক কর্তব্য গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এই প্রকল্প ক্ষণটিকেই আমি বর্ণনা করতে চাই। এটি আমাদের বিশ শতকে প্রাচ্যতত্ত্বের সংকট এবং পুবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির পুনরুজ্জীবনের পটভূমি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জোগাবে।

বিভিন্ন উপলক্ষে আমি প্রাচ্যসম্পর্কিত শিক্ষা, বাগবিধি, বিশ্বাস ও ভাবাদর্শের ঐক্যবদ্ধ রূপ হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ব এবং বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যান্য চিন্তাধারার সংযোগ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছি। উনিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হলো প্রাচ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণাসমূহ যেমন : ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্বৈরতন্ত্রের প্রবণতা, বিকৃত মানসিকতা, ভুলের অভ্যাসের পশ্চাদপদতা প্রভৃতি পরিশোধিত করে একটি আলাদা প্রশ্নহীন ঐক্যের মধ্যে নিয়ে আসা। এর ফলে কোনো লেখক কর্তৃক প্রাচ্য শব্দটির ব্যবহার পাঠককে এমন দিকনির্দেশনা দেয় যাতে তিনি সহজেই প্রাচ্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট একরাশ তথ্য চিহ্নিত করতে পারেন। এসব তথ্যকে নৈতিক প্রশ্নে নিরপেক্ষ এবং উদ্দেশ্যের বিচারে সঠিক বলে মনে হয়। মনে হয় এটি জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে ঐতিহাসিক কালক্রম বা ভৌগোলিক অবস্থানের সমমর্যাদাবান এবং এ কারণে সবচেয়ে মৌলিকরূপে স্থিত প্রাচ্য বিষয়বস্তুকে কারও নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমেও অস্বীকার করা যায় না, তেমনি কখনো তার সম্পূর্ণ পুনর্মূল্যায়নও সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার বদলে উনিশ শতকের বিভিন্ন পণ্ডিত ও সৃষ্টিশীল লেখকেরা ওই জ্ঞানগুচ্ছকেই আরও স্পষ্ট, অনুপুঙ্খ, অনিবার্য এবং 'পাশ্চাত্য তত্ত্ব' থেকে আরও স্বতন্ত্র করে ফেলেন। এ সত্ত্বেও প্রাচ্যতাত্ত্বিক ধারণাসমূহ সাধারণ দার্শনিক তত্ত্বের সাথে যুক্ত হতে পারে (যেমন মানবজাতির ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে) এবং বিচ্ছুরিত করতে পারে বিশ্ব-প্রকল্প–যে নামে দার্শনিকেরা কখনো কখনো অভিহিত করেন একে। প্রাচ্য অধ্যয়নক্ষেত্রের পেশাজীবী লেখকেরা তাদের ধারণাপুঞ্জ, পণ্ডিতি কাজ, তাদের স্ববিবেচিত সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ, ভাষা ও পরিভাষার সাথে খাপ খাইয়ে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন; ওই পরিভাষাগুচ্ছের সাংস্কৃতিক বৈধতা এসেছিল অন্যান্য বিজ্ঞান ও চিন্তাপদ্ধতি থেকে।

আমি যে পার্থক্য সূচিত করছি সে পার্থক্য একদিকে প্রকৃত অচেতন (এবং অবশ্যই স্পর্শ-অযোগ্য) ইতিবাচকতা, যাকে আমি বলব প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতত্ত্ব এবং প্রাচ্যসমাজ, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন বিবৃত মতামতের সমন্বয়–যাকে বলব প্রকাশ্যে প্রাচ্যতত্ত্ব এ দুইয়ের মধ্যে। প্রাচ্যসম্পর্কিত জ্ঞানে যা কিছু পরিবর্তন এসেছে তার প্রায় সবটাই প্রকাশ্য প্রাচ্যতত্ত্বে। প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতত্ত্বের নামহীন অবস্থা, স্থায়িত্ব ও দীর্ঘজীবিতা কমবেশি স্থির। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষিত লেখকদের মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা বিশেষভাবেই প্রকাশ্য। এ পার্থক্য রূপকল্প ও ব্যক্তিক রীতিস্বাতন্ত্র্যে, মৌল বিষয়ে কদাচিত। তাদের প্রত্যেকেই প্রাচ্যের আলাদা অবস্থান, তার রমণীয় প্রবেশ্যযোগ্যতা, তার কুঁড়ে ধরনের নমনীয়তা অক্ষুণ্ন রেখেছেন; ঠিক এ কারণেই প্রাচ্যসম্পর্কিত সকল লেখক রেনান থেকে মার্ক্স (ভাবাদর্শিক থেকে বলছি) বা খুবই নীতিবাগীশ গবেষক (লেইন ও সেসি) থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী সৃষ্টিশীলেরা (ফ্লবেয়ার ও নেরভাল) প্রাচ্যকে দেখেছেন এমন একটি অঞ্চলরূপে যার প্রয়োজনে পশ্চিমের মনোযোগ, পুনর্গঠন এমনকি পুনর্মুক্তকরণ। প্রাচ্য টিকে থাকে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও বাণিজ্যে ইউরোপীয় অগ্রগতির মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে। অতএব, প্রাচ্যের ওপর ভালো বা খারাপ যা কিছু মূল্যবোধই আরোপ করা হয়ে থাকুক না কেন তা উঁচু মাত্রায় বিশেষায়িত কিছু পশ্চিমা স্বার্থের কাজ। ১৮৭০ সাল থেকে কুড়ি শতকের প্রথমাংশ পর্যন্ত এই ছিল পরিস্থিতি। আমার বক্তব্য পরিষ্কার বোঝানোর জন্য কিছু উদাহরণ তুলে ধরতে চাই।

প্রাচ্যের পশ্চাদপদতা, অধঃপতন ও পশ্চিমের তুলনায় হীনতার তত্ত্ব উনিশ শতকের শুরুতে খুব সহজেই জাতিগত বৈষম্যের জীব-বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসম্পর্কিত ধারণার সাথে মিশে যেতে পারে। এর ফলে কুভিয়ের (Le Regne animal), গোবিনো (Essai Sur I'inegalite des races humaines) ও রবার্ট নক্সের (দ্য ডার্ক রেসেস অব ম্যান) রচনার বর্ণবাদী শ্রেণিবিভাজন ইচ্ছুক সঙ্গী খুঁজে পায় প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতত্ত্বে। এসব ধারণার সাথে যুক্ত হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের ডারইউনিজম, যা মনে হয় জাতিসমূহের অনগ্রসরতা ও পশ্চাদপদতা কিংবা আর্য-ইউরোপীয় ও প্রাচ্য-আফ্রিকান বিভাজনের বৈজ্ঞানিক বৈধতা প্রদানে আগ্রহী। এভাবে সাম্রাজ্যবাদের গোটা ব্যাপারটিই অগ্রসর ও পশ্চাদপদ (বা প্রজা) জাতি, সংস্কৃতি ও সমাজসম্পর্কিত নিজস্ব ধরনের যুগ্ম বৈপরীত্য নিয়ে আসে, যা নিয়ে শেষ উনিশ শতকে বিতর্ক চলেছে সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের মধ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জন ওয়েস্টলেইকের চ্যাপ্টার অন দ্য প্রিন্সিপলস অব ইন্টারন্যাশনাল ল (১৮৯৪) যুক্তি দেখায় পৃথিবীর অসভ্য (অন্যদের প্রাচ্যতাত্ত্বিক অনুমানের মালমসলা বহনকারী পরিভাষা) চিহ্নিত অঞ্চলসমূহ অগ্রসর শক্তিগুলোর দ্বারা সংযুক্ত বা দখল করে নেওয়া উচিত। তেমনি কার্লপিটার, লিওপল্ড ডি সোস্যুর ও চার্লস টেমপলের মতো লেখকদের চিন্তাভাবনাও

শেষ উনিশ শতকীয় প্রাচ্যতত্ত্বের সর্বাধিক প্রচারিত অগ্রসরতা/পশ্চাদপদতার যুগ্ম বৈপরীত্যের ধারণার নিকট ঋণী।[৩]

পশ্চাদপদ, অধঃপতিত, অসভ্য ও গতিহীন আখ্যায়িত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে প্রাচ্যজনদের একই কাঠামোয় বিচার করা হয়; এই বিষয়টি জীব-বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ ও নৈতিক রাজনৈতিক সতর্কবাণী থেকে গঠিত। এভাবে প্রাচ্যতত্ত্ব পশ্চিমা সমাজের বিভিন্ন উপাদানের (অপরাধী, উন্মাদ, নারী, দরিদ্র) সাথে যুক্ত হয়–উভয়েরই একটি সাধারণ পরিচয়ের কারণে যাকে সবচেয়ে ভালোভাবে বর্ণনা করা যায় 'বিলাপযোগ্য বেনামান' বলে।

প্রাচ্যজনদের কদাচিৎ দেখা হয় বা তাদের দিকে কদাচিৎ তাকানো হয়। তাদের দেখা হয় স্বচ্ছ বস্তুস্বরূপ এবং বিশ্লেষণ করা হয় : তাও নাগরিক বা জনগোষ্ঠীরূপে নয়, বরং সমস্যা হিসেবে, যার সমাধান হওয়া দরকার বা যাকে আবদ্ধ করা দরকার বা প্রয়োজনে দখল করে নেওয়া দরকার–যেমন ঔপনিবেশিক শক্তি অকপট লালসার বশে দখল করে নেয় এদের ভূমি। লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার হলো প্রাচ্যজন/প্রাচ্যদেশীয় আখ্যার সাথে এরই মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে ঘোষিত মূল্য নির্ধারকমূলক বিচার-বিশ্লেষণ এবং ক্ষয়িত অটোমান সাম্রাজ্যের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট, একরাশ পরোক্ষ ক্রিয়ার কর্মসূচি। যেহেতু প্রাচ্যজন প্রজার জাতির একজন, তাই তাকে প্রজাই হতে হবে : সহজ হিসাব। এ ধরনের বিচার-বিবেচনা পাওয়া যাবে গুস্তাভ লা ভনের কাজে (দ্র. Les Lois psychologiques de I'evolution des peuples, ১৮৯৪)।

প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতত্ত্বের অন্যবিধ ব্যবহারও আছে। ওই ধারণাগুচ্ছ যদি কাউকে অগ্রসর, সভ্য শক্তি থেকে প্রাচ্যজনকে আলাদা করার অনুমতি দেয় এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও আধুনিক প্রাচ্যের প্রতি প্রাচ্যতাত্ত্বিকের অশ্রদ্ধা–উভয়কে বৈধতা দেওয়ার কাজে 'ধ্রুপদ' প্রাচ্য ব্যবহৃত হয়, তাহলে বলতে হবে সুপ্ত প্রাচ্যতত্ত্বও উদ্ভটভাবে (বিরাগকর নয়) পৃথিবীর পুরুষত্বের ধারণাকে উৎসাহিত করে। রেনানের আলোচনায় আমি পূর্বেই এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। প্রাচ্য পুরুষকে দেখা হয়েছে তার সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্নরূপে আর রেনানের অনুসরণে বহু প্রাচ্যতাত্ত্বিক সে সম্প্রদায়কে বিবেচনা করেছেন ঘৃণা ও ভয় জাতীয় মনোভাব নিয়ে। আবার প্রাচ্যতত্ত্ব নিজেই বিশেষভাবেই পুরুষতান্ত্রিক এলাকা। আধুনিক কালে বহু পেশাজীবী জোটের মতো তা নিজেকে ও তার বিষয়বস্তুকে দেখেছে যৌনঠুলি পরে। এটি বিশেষভাবে পর্যটক ও ঔপন্যাসিকদের লেখায় সত্য, নারী এখানে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কল্পরাজ্যের সৃষ্টি। এরা অসীম ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কমবেশি নির্বোধ, সবচেয়ে বড় কথা এরা ইচ্ছাকু। ফ্লবেয়ারের কুচুক হানেম এ ধরনের ক্যারিকেচারের আদিকল্প; পর্নোগ্রাফিক উপন্যাসে তা সুলভ (যেমন পিয়ের লায়েসের Aphrodite), যেগুলোর মহত্ত্ব প্রাচ্যের নিকট ঋণী। তা ছাড়া প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ওপর ক্রিয়াশীল পৃথিবীর পুরুষত্বের ধারণা অনড়,

জমাটবাঁধা–পরজাগতিকভাবে স্থির হওয়ার ঝোঁক রয়েছে তার। প্রাচ্য ও প্রাচ্যজনের জন্য উন্নয়ন, রূপান্তর ও গভীরতর অর্থে মানবীয় চলাচলের সুযোগ অস্বীকার করা হয়। জানা ও নড়নক্ষম বা বন্ধ্যা বৈশিষ্ট্য হিসেবে সেগুলো চিহ্নিত হয় খারাপ পরজাগতিক অবস্থার সাথে : এ কারণে, প্রাচ্যকে যদি অনুমোদন করা হয়, তখন প্রশংসার জন্য প্রয়োগ করা হয় 'পুবের জ্ঞান' জাতীয় শব্দাবলি।

পরোক্ষ সামাজিক মূল্যায়ন থেকে বিশাল সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে অপরিবর্তনীয় পুরুষতান্ত্রিক প্রাচ্যতত্ত্ব উনিশ শতকের শেষে বিভিন্নরূপ গ্রহণ করে, বিশেষ করে যখন ইসলাম আলোচিত হচ্ছিল। সাধারণ সাংস্কৃতিক ইতিহাসকারদের মধ্যে লিওপল্ড ভন র‍্যাঙ্ক ও জ্যাকব বুরখহার্ডটের মতো শ্রদ্ধেয়রা ইসলামকে এমনভাবে আক্রমণ করেন যেন তারা ঐশ্বরিক বিমূর্ত নিয়ে কাজ করছেন না, বরং ধর্ম-রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছেন, যার সম্পর্কে সাধারণীকরণ সম্ভব ও প্রয়োজনীয় : র‍্যাঙ্ক কথা বলেন জার্মান-রোমানীয় মানুষদের নিকট পরাজিত ইসলাম নিয়ে (দ্র, Weltgeschichte, ১৮৮১-১৮৮৪) এবং এমনভাবে (দ্র. Historische Fragmente, অপ্রকাশিত নোট, ১৮৯৩) যেন ইসলাম দুর্দশাগ্রস্ত, উদ্যম ও তুচ্ছ।[৪]

আরও নৈপুণ্য ও আগ্রহ নিয়ে এ রকম বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন অসওয়াল্ড স্পেঙলার। জাদুকরি ব্যক্তিত্ব বিষয়ে তার কল্পনা পরিসিক্ত করেছে তার বিভিন্ন রচনা (Der untergang des Abendlandes, ১৯১৮-১৯২২) ও এতে সমর্থিত সংস্কৃতির 'অঙ্গসংস্থান'-এর ধারণাকে।

প্রাচ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়া এসব ধারণা যে ব্যাপারটির ওপর নির্ভর করে তা হলো সমকালীন পশ্চিমা সংস্কৃতিতে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় গ্রাহ্য শক্তিরূপ প্রাচ্যের সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিছু প্রত্যক্ষ কারণে প্রাচ্য সর্বদাই ছিল বহিরাগত এবং পশ্চিম কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত দুর্বল সঙ্গীর অবস্থানে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিত সমাজ সমকালীন প্রাচ্যতাত্ত্বিক এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিক আন্দোলন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত থাকায় এগুলো কল্পিত হয়েছে হয় নীরব ছায়ারূপে–প্রাচ্যতাত্ত্বিক যাকে প্রাণ ও বাস্তবতা দেবে–অথবা কল্পিত হয়েছে প্রাচ্যতাত্ত্বিকের মহত্তর বিশ্লেষণাত্মক তৎপরতায় ব্যবহার উপযোগী একরকম সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রলেতারিয়েত রূপে, যা উঁচুমানের বিচারক, জানলেঅলা মানুষ ও শক্তিশালী সাংস্কৃতিক চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ প্রাচ্যতাত্ত্বিকের দায়িত্ব পালনের জন্য দরকারি। আমি বলতে চাচ্ছি প্রাচ্যবিষয়ক আলোচনায় প্রাচ্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত অথচ যে কেউ অনুভব করতে পারে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও তার বক্তব্য উপস্থিত। তবু আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে প্রাচ্যের কার্যকর অনুপস্থিতিই প্রাচ্যতাত্ত্বিকের উপস্থিতি সম্ভব করেছে। বিকল্প ও স্থানবদলের (এ নামেই চিহ্নিত করব আমরা) ব্যাপারটি প্রাচ্যকে প্রাচ্যতাত্ত্বিক কাজে খাটো করার জন্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করে, এমনকি তিনি যদি প্রাচ্যকে বিশদ

ও স্পষ্ট প্রদর্শনের জন্য প্রচুর সময়ও ব্যয় করেন। এ ছাড়া আর কীভাবে জুলিয়াস ওয়েলহসন ও থিওডর নরডিকের রচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিতি কাজের সাথে জড়িত এবং তা মাড়িয়ে দেওয়া ওই সব খোলামেলা, ত্বরিত বিবৃতি-ভাষ্যকে ব্যাখ্যা করব যা তাদের বাছাইকৃত বিষয়বস্তুকে প্রায় সম্পূর্ণ কলঙ্কিত করে? এভাবেই নরডিক ১৮৮৭ সালে ঘোষণা করেন প্রাচ্যতাত্ত্বিক হিসেবে তার সমগ্র কাজ পুবের মানুষ সম্পর্কে তার 'নিচু ধারণা' নিশ্চিত করার জন্যই।[৫] কাল বেকারের মতো নরডিকও ছিলেন গ্রিস প্রেমিক; তিনি গ্রিসের প্রতি ভালোবাসা দেখান প্রাচ্যের প্রতি ইতিবাচক অপছন্দ প্রকাশের মাধ্যমে, যদিও প্রাচ্য তার পণ্ডিতি অধ্যয়নের বিষয়।

প্রাচ্যতত্ত্বের অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন জ্যাক ওয়ার্ডেনবার্গের রচনা। (দ্র. L'Islam dans Le miroir de I'occident) ইসলামের প্রতিরূপ নির্মাণে পাঁচজন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনাকালের প্রাচ্যতত্ত্বের জন্য ওয়ার্ডেনবার্গের যমজ চিত্রকল্প রূপকটি যথাযথ। এসব প্রখ্যাত প্রাচ্যতাত্ত্বিকের প্রত্যেকের রচনাতেই ইসলামের অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এমনকি চারজনের রচনাতেই আক্রমণাত্মক চিত্র পাওয়া যায়। যেন এদের প্রত্যেকেই ইসলামকে দেখছেন তার পছন্দ করা নিজস্ব দুর্বলতার প্রতিফলনস্বরূপ। এদের প্রত্যেকেই ছিলেন বিশেষভাবে পণ্ডিত, তাদের রচনারীতিও স্বাতন্ত্রিকতায় চমৎকার। ওই সময়পর্বে মোটামুটি ১৮৮০ থেকে যুদ্ধ-মধ্যবর্তী বছরগুলো পর্যন্ত সবচেয়ে প্রভাবশালী উৎকৃষ্ট রীতির দৃষ্টান্ত রচনা করেন ওই পাঁচ প্রাচ্যতাত্ত্বিক। তবু ইসলামের যে প্রশংসা করেন ইগনাজ গোলজিহার তার আবার শিকড় কেটে দেন মোহাম্মদের (সা.) ঈশ্বরত্ব এবং ইসলামের অতি বহির্মুখী খোদাতত্ত্ব ও আইন-কানুনের প্রতি অপছন্দ প্রকাশ করে। ডানকান ব্ল্যাক ম্যাকডোনাল্ডের আগ্রহ ইসলামের ভক্তিবাদ ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতায়; কিন্তু তা দূষিত হয় তার ভাষায় 'ইসলামের বিরুদ্ধবাদী–খ্রিষ্টানত্বের' অভিযোগে।

ইসলামি সভ্যতা সম্পর্কে কার্ল ব্রেমারের উপলব্ধি তাকে বাধ্য করে ইসলামকে দুঃখজনকভাবে পশ্চাদপদ বলে বিবেচনা করতে। ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে সি. এক হারগ্রোনির উঁচু মাপের পরিশীলিত গবেষণা তাকে পরিচালিত করে ইসলামের পঙ্গুসদৃশ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কঠোর মন্তব্যে (তিনি মনে করেন তা ইসলামের দরকারি অংশ)। লুইস একাত্ম বোধ করেন অথচ তিনি কৌতূহলোদ্দীপকভাবে ইসলামের প্রতি ক্ষমাহীন: তিনি মনে করেন এর কারণ হলো বিমূর্তের রূপদানের বিরুদ্ধে ইসলামের বিদ্রোহ। এদের পদ্ধতিতে প্রকাশিত বিভিন্নতা এত গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ ইসলাম সম্পর্কে তাদের প্রাচ্যতাত্ত্বিক মতৈক্য–ইসলামের প্রচ্ছন্ন নিকৃষ্টতায়।[৬] ওয়ার্ডেনবার্গের রচনার আরেকটি বাড়তি গুণ রয়েছে। ওখানে দেখানো হয়েছে ওই পাঁচ পণ্ডিত একটি সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও পদ্ধতিগত রীতির অনুসারী, যার

ঐক্য সত্যিকার অর্থেই আন্তর্জাতিক। ১৮৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাচ্যতাত্ত্বিক সম্মেলনের পর থেকেই প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা অন্যদের রচনা সম্পর্কে পরস্পরের উপস্থিতি সরাসরি অনুভব করেন। যে ব্যাপারটির ওপর ওয়ার্ডেনবার্গ জোর দেননি তা হলো ওই পাঁচজন রাজনৈতিক সম্পর্কেও পরস্পর সম্পর্কিত ছিলেন। স্নেক হারগ্রোনি তার ইসলামবিষয়ক গবেষণা থেকে সরাসরি ডাচ সরকারের ইন্দোনেশীয় মুসলিম উপনিবেশ-সংক্রান্ত উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ম্যাকডোনাল্ড ও ম্যাসিগনন ছিলেন পাকিস্তান থেকে উত্তর আফ্রিকার ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের নিকট ইসলামি বিষয়ে অভিজ্ঞ, সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্বদ্বয় এবং এক জায়গায় ওয়ার্ডেনবার্গ খুবই সংক্ষেপে বলেছেন : ওই পাঁচ প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইসলামের একীভূত ছবি তুলে ধরেন, যা পশ্চিমের সরকারগুলোর ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।[৭] আমরা ওয়ার্ডেনবার্গের পর্যবেক্ষণের সাথে আরও কিছু যোগ করতে চাই। তা হলো ষোল-সতেরো শতক থেকে, ম্যাসন ওরসেলের মতানুসারে প্রাচ্যকে কেবল একটি অস্পষ্ট সাহিত্যিক সমস্যা হিসেবে না দেখে, বিস্তৃত বিষয়রূপে দেখার প্রবণতায় বাস্তব পরিশোধন নিয়ে আসেন এ পণ্ডিতেরা।[৮]

পূর্বে প্রাচ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা ও আত্মস্থ করার কথা বলেছি; দান্তে থেকে ডি হারবেল্ট পর্যন্ত বিভিন্ন লেখক এ ধরনের চেষ্টা চালিয়েছেন। ওই সব চেষ্টা এবং উনিশ শতকের শেষ নাগাদ যা সত্যিকার অর্থেই ভয়ংকর ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বস্তুভিত্তিক উদ্যোগে পরিণত হয় তার মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যে 'আফ্রিকা নিয়ে কাড়াকাড়ি' কোনো অর্থেই আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রাচ্যে প্রবেশের ঘটনাও এশিয়া সম্পর্কে বহু বছরের পণ্ডিতি গবেষণার আকস্মিক নাটকীয় অব্যবহিত চিন্তার ফল নয়। এগুলোকে দেখতে হবে দীর্ঘ ও দীর্ঘ এক উপযোগীকরণ প্রক্রিয়ারূপে, যার সাহায্যে ইউরোপ বা ইউরোপের প্রাচ্যবিষয়ক সচেতনতা গ্রন্থ ও ভাবনাকেন্দ্রিক অবস্থা থেকে নিজেই প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে রূপান্তরিত হয়। মৌলিক পরিবর্তনটা ছিল পরিসর বিষয়ে এবং ভৌগোলিক অথবা প্রাচ্য সম্পর্কের পরিসরগত ও ভৌগোলিক সচেতনতার মানে। ইউরোপের পূবমুখী বিস্তৃতির প্রতি শতাব্দীর প্রাচীন আখ্যা 'প্রাচ্যজন' বা 'প্রাচ্যদেশীয়' কথাটি অংশগত রাজনৈতিক, অংশত মতবাদগত এবং অংশত কাল্পনিক।

এটি প্রকৃত প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা এবং প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে অনিবার্য কোনো সম্পর্ক ইঙ্গিত করে না। দান্তে ও ডি হারবেল্টও তাদের প্রাচ্যবিষয়ক ধারণার ব্যাপারে কোনো দাবি তোলেননি–কেবল এটুকু ছাড়া যে এগুলো দীর্ঘকাল ধরে শেখা (কিন্তু অস্তিত্ববাদী নয় এমন) ঐতিহ্য দ্বারা জোর সমর্থিত। কিন্তু যখন লেইন, রেনান, বার্টন ও উনিশ শতকের শত শত ইউরোপীয় পর্যটক ও পণ্ডিত প্রাচ্য নিয়ে আলোচনা

করেন, তখন আমরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রাচ্য ও প্রাচ্যের বিষয়সমূহের প্রতি তাদের আরও ঘনিষ্ঠ, এমনকি মালিকানাসুলভ মনোভঙ্গি লক্ষ করি। প্রাচীনরূপ কিংবা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের পুনর্গঠিত সাময়িকরূপ এবং ঠিক আসল রূপ যার মধ্যে আধুনিক প্রাচ্য টিকে আছে, গবেষায়িত ও কল্পিত হয়েছে–উভয় রূপের ওপরই প্রাচ্যের ভৌগোলিক পরিসরে গড়ানো-পেটানো চলেছে; অনুপ্রবেশ হয়েছে, তা বন্ধ রাখা হয়েছে। পশ্চিমের যথেচ্ছা ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক প্রভাব প্রাচ্যকে বিচ্ছিন্ন থেকে রূপান্তরিত করেছে ঔপনিবেশিক ভূমিতে। উনিশ শতকের শেষাংশে এ বিতর্ক জরুরি হয়ে দেখা দেয়নি যে পশ্চিম প্রাচ্যে প্রবেশ করেছে কি না এবং প্রাচ্যকে দখল করেছে কি না, ব্রিটিশ ও ফরাসিরা কীভাবে তা করেছে বলে মনে করে সে তর্কই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশ লেখক, এমনকি ব্রিটিশ প্রশাসকেরা প্রাচ্যের এলাকাসমূহ নিয়ে এমনভাবে কাজ করেছেন যেন প্রাচ্যে ইংরেজ শক্তির উত্থিত অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ নেই, এমনকি স্থানীয় অধিবাসীরা এ পরিস্থিতিতেও ফরাসি দেশ ও চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও। প্রাচ্যের আসল ভূমির প্রসঙ্গে বলতে হয় ইংল্যান্ড ওখানে ছিল, ফ্রান্স নয়–কেবল গেঁয়ো প্রাচ্যজনের অস্থিরচিত্ত প্রলোভন ছাড়া। স্থানগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এই গুণগত পার্থক্যের সবচেয়ে ভালো ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিষয়টি সম্পর্কে লর্ড ক্রোমারের বক্তব্যে, যা তার বিশেষ প্রিয় বিষয় :

> এশীয় ও লেভান্থবাসীদের মধ্যে ফরাসি সভ্যতা বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করার কারণ খুব সরল। তা এই যে ফরাসি সভ্যতা ইংলিশ ও জার্মান সভ্যতা থেকে বেশি আকর্ষণীয় এবং আরও সহজে অনুকরণযোগ্য। প্রদর্শনবিমুখ, লাজুক ইংরেজদের সামাজিকতা বিমুখ একান্ত স্বভাবের সাথে প্রাণবন্ত, মহানাগরিক ফরাসিদের তুলনা করুন; সে (ফরাসি) জানে না লজ্জা শব্দটির অর্থ কী; সাদামাটা পরিচয়ের সুযোগ পেলে দশ মিনিটেই সে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো সম্পর্ক গড়ে তোলে। অর্ধশিক্ষিত প্রাচ্যজন চিনতে পারে না যে, প্রথমজনের রয়েছে ছলনাহীনতার গুণ, যখন দ্বিতীয়োক্তজন পুরো ব্যাপারটিতেই অভিনয় করেছে মাত্র। সে ইংরেজদের দিকে তাকায় ঠান্ডা চোখে, কিন্তু ফরাসির বাহুডোরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এরপর যৌন কটাক্ষ কমবেশি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফরাসি মানুষ হাসিখুশি, রসিক, দয়াশীল, ফ্যাশনদুরস্ত; ইংরেজ পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, বেকনীয় যথাযথ। ক্রোমারের বক্তব্য অবশ্যই মিসরীয় বাস্তবতায় প্রকৃত অনুপস্থিত ফরাসিদের মোহময়তার বিপরীতে ইংরেজদের দৃঢ়তার ওপর ভিত্তি করে রচিত।

> এটি কি বিস্ময়ের ব্যাপার হতে পারে যে, (ক্রোমার চালিয়ে যান) মিসরীয়রা তাদের লঘু বুদ্ধিমত্তা দিয়ে দেখতে পায় না যে, ফরাসিদের যুক্তি-বিচারের তলে তলে প্রায়ই প্রতারণা গোপন থাকে অথবা সে ইংরেজ বা জার্মানের অধ্যবসায়ী,

> অনাকর্ষক পরিশ্রমের পরিবর্তে–ফরাসিদের ভাসা ভাসা মেধাকে বেশি পছন্দ করে। আবার দেখা যাক ফরাসি প্রশাসনিক ব্যবস্থার তাত্ত্বিক অবস্থা, এর খুঁটিনাটি বিস্তৃতি ও সম্ভাব্য আকস্মিক ঘটনা মোকাবিলার জন্য আপাতভাবে আগাম ব্যবস্থা। এসব বৈশিষ্ট্যের তুলনা করুন ইংরেজদের বাস্তব ব্যবস্থার সাথে, যাতে প্রধান প্রধান ব্যাপার নিয়ে কিছু বিধি রচনা করা হয়েছে, বিপুল খুঁটিনাটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির ওপর। অর্ধশিক্ষিত মিসরীয় স্বাভাবিকভাবেই ফরাসিদের ব্যবস্থাই পছন্দ করবে। কারণ বাইরে থেকে সেটি অনেক নিখুঁত ও সহজে প্রয়োগযোগ্য বলে মনে হয়। সে এও দেখতে পায় না যে, ইংরেজরা এমন একটি ব্যবস্থা উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা করে, যা সেই বাস্তব ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে নেবে, যা নিয়ে তারা কাজ করবে। অথচ মিসরে ফরাসি প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হলো বাস্তব পরিস্থিতি প্রায়ই তৈরি ব্যবস্থার সাথে খাপ খায় না।

যেহেতু মিসরে ব্রিটিশরা প্রকৃতই উপস্থিত এবং যেহেতু সেই উপস্থিতি– ক্রোমারের মতে মিসরীয় মনের প্রশিক্ষণের জন্য ততটা নয়, যতটা 'তার চরিত্র গঠনের' জন্য, অতঃপর তাই বলা হয় ফরাসিদের ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণক্ষমতা সুন্দরী তরুণী পরিচারিকার মতো 'কৃত্রিম মোহ' জাতীয় কিছু, অথচ ব্রিটিশদের (আকর্ষণক্ষমতা) ভদ্র প্রবীণা মাতৃকার–হয়তো উন্নততর নৈতিক চরিত্রের ব্যাপার, তবে বাইরের দিক থেকে কম মনোমুগ্ধকর।[৯] ক্রোমারের রাশভারী ব্রিটিশ খালা আর ফরাসি ছেনাল তরুণীর বৈপরীত্যের তলে তলে আছে প্রাচ্যে ব্রিটিশের অবস্থানগত সুবিধা। 'যেসব বাস্তবতা নিয়ে কাজ করতে হয় তাকে (ইংরেজকে) সেগুলো সামগ্রিকভাবে বেশি জটিল ও আগ্রহব্যঞ্জক, এই গুণে যে, ওগুলো ইংল্যান্ডের আয়ত্তে। তার মডার্ন ইজিপ্ট (১৯০৮) প্রকাশের দুই বছর পর ক্রোমার বিস্তৃত দার্শনিক আলোচনা করেন দি এনশিয়েন্ট অ্যান্ড মডার্ন ইম্পেরিয়ালিজমে। ক্রোমারের মনে হয় খোলাখুলিভাবে গ্রাসপ্রবণ, শোষত ও দমনমূলক রোমান সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অধিকতর গ্রহণযোগ্য, যদিও তা দুর্বল। কিছু কিছু ব্যাপারে ব্রিটিশরা খুব পরিষ্কার; যদিও 'অস্পষ্ট, এলোমেলো' কিন্তু স্বভাবের অ্যাংলো-স্যাক্সন রীতির অনুসরণে তাদের (ব্রিটিশদের) সাম্রাজ্য 'পূর্ণ সামরিক দখল' নাকি জাতীয়তাবাদের (প্রজাদের জাতির জন্য) নীতি গ্রহণ করবে সে প্রশ্নে সিদ্ধান্তহীন বলে মনে হয়। তবে এ সিদ্ধান্তহীনতা শেষ পর্যন্ত কেবল একাডেমিক। কারণ ক্রোমার ও ব্রিটেন নিজে 'জাতীয়তাবাদ নীতির' বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। এরপর আছে লক্ষযোগ্য আরও কিছু ব্যাপার। একটা হলো সাম্রাজ্য ত্যাগ করা হবে কি হবে না। আরেকটি হলো স্থানীয়দের সাথে ইংরেজ নারী-পুরুষের বিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত। আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তৃতীয়টি, তা হলো ক্রোমার কল্পনা করেছিলেন পুবের উপনিবেশগুলোয় ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক উপস্থিতি পুবের মন ও সমাজে একটি

দীর্ঘস্থায়ী, বলা যায় মহাপ্লাবী ছাপ রাখবে। এ প্রভাব প্রকাশে তার ব্যবহৃত রূপকটি প্রায় ঈশ্বরতাত্ত্বিক, প্রাচ্যের বিস্তৃত বুকে পশ্চিমের প্রবিষ্ট হওয়ার ধারণা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ক্রোমারের মনে। দেশটি, তিনি বলেন, 'যার ওপর দিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তার তীব্র উত্তপ্ত পশ্চিমা নিঃশ্বাস একবার বয়ে গেছে এবং যেতে যেতে রেখে গেছে দীর্ঘায়ু ছাপ, আর কখনো আগের মতো হয়ে উঠবে না।'[১০]

যা হোক এ ধরনের ব্যাপারে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা থেকে অনেক দূরে ক্রোমার। তিনি যা বলেন এবং যেভাবে বলেন তা ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবী মহলে তার সহকর্মীদের নিকট প্রচলিত বিষয়। এ সাদৃশ্য সহকর্মী-ভাইসরয় কার্জন, সুইটেনহাম ও লুগার্ডের বেলায় বিশেষভাবে সত্যি। বিশেষ করে লর্ড কার্জন সব সময় একটি ঔপনিবেশিক কথ্যভাষার কথা বলতেন। তিনি ক্রোমারের চেয়েও উচ্চস্বরে ব্রিটিশ ও প্রাচ্যের সম্পর্কের একটি ছক তৈরি করেন, যার ভিত্তি হলো দখলদারি, এক দক্ষ ঔপনিবেশক প্রভুর কর্তৃত্বে বিশাল এক ভৌগোলিক পরিসর। একবার কোনো উপলক্ষে তিনি বলেন, তার কাছে সাম্রাজ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় নয়, বরং প্রথমত ও গুরুত্বপূর্ণভাবে বিরাট এক ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা। ১৯০৯ সালে অক্সফোর্ডে ঔপনিবেশিক প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের তিনি মনে করিয়ে দেন, 'আমরা এখানে প্রশিক্ষণ দিই এবং আপনাদের নিকট প্রেরণ করি আপনাদের গভর্নর, প্রশাসক, বিচারক, আপনাদের শিক্ষক, যাজক ও আইনজীবীদের।' সাম্রাজ্য কর্তৃক লালিত শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ এ দৃষ্টিভঙ্গি, কার্জনের জন্য, এশিয়ায় নির্দিষ্ট বিন্যাসে বিন্যস্ত; এ (ব্যবস্থা) সম্পর্কে একবার তিনি বলেন, তা 'কাউকে থামতে ও চিন্তা করতে' বাধ্য করবে।

> আমি কখনো কখনো বিরাট এই সাম্রাজ্যবাদী বুননকে টেনিসনীয় 'প্যারেস অব আর্ট'-এর মতো বিরাট একটি গঠনরূপে কল্পনা করতে ভালোবাসি। যেখানে ব্রিটিশরা তা প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানে এর ভিত্তি; তাদের দ্বারা এর রক্ষণাবেক্ষণও হবে। কিন্তু পিলার হলো উপনিবেশগুলো, আর সবকিছুর ওপরে ভাসমান এশীয় গম্বুজের বিপুল বিস্তৃতি।[১১]

এমন একটি 'টেনিসনিয়ান প্যালেস অব আর্ট' যাদের মনের মধ্যে সেই কার্জন ও ক্রোমার 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চাপ প্রদানের জন্য গঠিত ডিপার্টমেন্টাল কমিটির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। যদি তিনি দেশি ভাষা জানতেন তাহলে ভারতে দুর্ভিক্ষকালীন সফরে সহায়তা পেতেন–আন্তরিকতার সাথে এ ধরনের মন্তব্য করা ছাড়াও কার্জন প্রাচ্যতত্ত্বকে প্রাচ্যের প্রতি ব্রিটিশের দায়িত্বের অংশ বলে যুক্তি দেখান। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখে হাউস অব লর্ডসের উদ্দেশে তিনি বলেন :

শুধু পুবের মানুষের ভাষার সাথেই নয়, তাদের প্রথা-আচার, তাদের অনুভূতি, তাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস, ধর্মের সাথে আমাদের পরিচয়–যাকে বলা যায় প্রাচ্যের প্রতিভা

তা বোঝার ক্ষমতা হলো একমাত্র ভিত্তি, যার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা বিজিত অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হব এবং সে অবস্থান দৃঢ় করতে সক্ষম এমন কোনো পদক্ষেপ বিবেচনায় আনা উচিত নয়, যা মহামান্যবর সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ বা হাউস অব লর্ডসে বিতর্কিত হওয়ার মতো নয়।

পাঁচ বছর পর বিষয়টির ওপর এক কনফারেন্সে কার্জন তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। প্রাচ্যতত্ত্ব বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা নয়, তা হলো তিনি বলেন :

> বিরাট সাম্রাজ্যিক দায়। আমার মতে, এ রকম একটি স্কুল (অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, পরে যার নাম হয় লন্ডন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ) প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রেরই অংশ। আমরা যারা কোনো না কোনোভাবে প্রাচ্যে বহু বছর কাটিয়েছি এবং ভাবি তা আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখকর অংশ এবং আমরা যারা মনে করি ওখানে আমরা যা করেছি তা ছিল, ছোট-বড় যাই হোক, একজন ইংরেজের কাঁধে অর্পণের মতো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, তারা এও বোধ করে যে, আমাদের জাতীয় হাতিয়ার, কলাকৌশলে কোথাও একটা ফাঁক রয়েছে, যা জোর দিয়ে পূরণ করা দরকার এবং আমরা এও মনে করি যে, লন্ডন শহরে যারা আর্থিক সহযোগিতা বা অন্য কোনো সক্রিয় বা ব্যবহারিক সহযোগিতায় সেই ফাঁক পূরণে অংশগ্রহণ করছেন, তারা আসলে সাম্রাজ্যের জন্য দেশপ্রেমমূলক দায়িত্ব পালন করছেন–তারা যৌক্তিক হেতু ও শুভ আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে দিচ্ছেন মানবজাতির মধ্যে।[১২]

প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে কার্জনের ধারণার অনেকখানিই প্রাচ্যের উপনিবেশগুলো সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রশাসনের উপযোগবাদী দর্শনের একটি চমৎকার শতাব্দী থেকে যৌক্তিকভাবে উদ্ভূত। প্রাচ্যে (বিশেষত ভারতে) ব্রিটিশ শাসনের ওপর বেন্থাম ও মিলের প্রভাব উল্লেখযোগ্য এবং খুব বেশি বিধিবিধান ও উদ্ভাবনা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর ছিল। এর পরিবর্তে এরিক স্টকস যেমন গ্রহণযোগ্যভাবে দেখিয়েছেন পুবে ব্রিটিশ শাসনের পেছনের কার্যকর দর্শনে উপযোগিতাবাদের সাথে উদারতাবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্টদের ভগবতবাক্যতত্ত্বের সমন্বয় ঘটেছে এবং তা জোর দিয়েছে আইন ও শাস্তির বিধিবিধানের অস্ত্রে শক্তিশালী নির্বাহী, সীমানা ও কর বিষয়ে মতবাদগত একটি পদ্ধতি এবং সর্বত্র স্থায়ী আকারের একটি রাজকীয় তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের ওপর।[১৩] সমগ্র পদ্ধতিটির মূল খুঁটি ছিল প্রাচ্য সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশোধিত জ্ঞান, যাতে গতানুগতিক সমাজ সামনে এগোতে শুরু করে বাণিজ্যিক সমাজে পরিণত হওয়ার পরও উত্তরাধিকারসূত্রে চলে আসা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ শিথিল না হয় এবং রাজস্ব আয়ও না কমে। যা হোক, কার্জন যখন অনেকটা অশোভনভাবে প্রাচ্যতত্ত্বকে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র হিসেবে উল্লেখ করেন, তিনি তখন ইংরেজ ও স্থানীয়দের পারস্পরিক ব্যবসা পরিচালনা ও নিজ নিজ অবস্থান ধরে রাখার লেনদেনকে একটি স্থিরচিত্রে রূপান্তরিত করেন। স্যার ইউলিয়াম জোনসের

সময় থেকে প্রাচ্য হলো ব্রিটিশরা যাকে শাসন করে ও ব্রিটিশরা তার সম্পর্কে যা জানে–এর উভয়ের সমন্বয়। ভূগোল, জ্ঞান ও ক্ষমতার কাকতালীয় সমান্তরাল অবস্থান গ্রহণ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে, যখন ব্রিটিশরা সর্বদা প্রভুর আসনে। বলতে গেলে যেমন কার্জন একবার বলেন, 'প্রাচ্য হলো একটি বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিতরা যেখান থেকে কখনো ডিগ্রি নেন না।' এ কথা বলার অর্থ হলো এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলা যে প্রাচ্য তার ওখানে চায় কারও উপস্থিতি কমবেশি চিরদিনের জন্য।[১৪]

কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিও ছিল, যার মধ্যে ফ্রান্স ও রাশিয়া ব্রিটিশ উপস্থিতিকে সব সময় (হয়তো ক্ষীণ) হুমকির মুখে রাখে। কার্জন নিশ্চিত সচেতন ছিলেন যে পৃথিবীর প্রতি সব বৃহৎ পশ্চিমা শক্তির অনুভূতি ব্রিটেনের মতোই। কার্জনের দেওয়া আখ্যা অনুযায়ী 'ঢিলে ও পুঁথিগতবিদ্যা' ধরনের ভূগোল (পরবর্তী সময়ে একাডেমিক চর্চা থেকে এ আখ্যা বাদ দেওয়া হয়) 'সর্বোত্তম কসমোপলিটান বিজ্ঞানে' রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা পৃথিবীর সবদিকে পশ্চিমা বিস্তারের সাফাই গায়। জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি লর্ড কার্জন ১৯১২ সালে সোসাইটির উদ্দেশে শুধু শুধু বলেননি :

> একটি সত্যিকার বিপ্লব ঘটে গেছে, কেবল ভূগোল শিক্ষার রীতি-পদ্ধতিতে নয়, এর প্রতি গণমানসের মনোভাবেও। এখন ভূগোলের জ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজনীয় অংশ বলেই ভাবি আমরা। অন্য কোনোভাবে নয়, কেবল ভূগোলের সাহায্যে আমরা উপলব্ধি করি বৃহৎ প্রাকৃতিক শক্তির কার্যাবলি, জনবিন্যাস, বাণিজ্যবৃদ্ধি, সীমান্তের প্রসারণ, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, বিচিত্রভাবে প্রকাশিত মানবীয় শক্তির সমৃদ্ধ অর্জনসমূহ। আমরা ভূগোলকে ইতিহাসের পরিচালকরূপে চিনতে পারি...। ভূগোল, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিজ্ঞানের সহোদরা এবং আমরা যারা ভূগোল পড়ার চেষ্টা করেছি তাদের জানা যে ভৌগোলিক ক্ষেত্রের কেন্দ্র থেকে যে মুহূর্তে আপনি সরবেন সেই মুহূর্তে বুঝবেন আপনি ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান এবং প্রায় সকল সগোত্রীয় বিজ্ঞানের সীমানা অতিক্রম করলেন। অতএব, আমরা বলতে পারি যে ভূগোল বিজ্ঞানের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সবার পূর্বের যথাযথ নাগরিক ধারণা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল। এটি নাগরিক মানুষ উৎপাদনে একটি অনিবার্য বিষয়।[১৫]

প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞানের একটি অনিবার্য খুঁটি হলো ভূগোল। প্রাচ্যের সব গুপ্ত ও অপরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যসমূহ তার ভূগোলে প্রোথিত ও দাঁড়ানো। এভাবে ভৌগোলিক প্রাচ্য একদিকে তার অধিবাসীদের পুষ্টিবিধান করে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে এবং তাদের বিশেষত্ব বর্ণনা করে: অন্যদিকে তা আকর্ষণ করে পশ্চিমের মনোযোগ, এমনকি সংগঠিত জ্ঞান কর্তৃক প্রায়ই উন্মোচিত দ্বৈততা–'প্রাচ্য প্রাচ্যই এবং পশ্চিম পশ্চিমই' জাতীয় ধারণার মধ্যেও। কার্জনের মনে ভূগোলের নাগরিক স্বভাব আসলে পশ্চিমে এর সর্বজনীন গুরুত্বে, অবশিষ্ট পৃথিবীর সাথে যে পশ্চিমের সম্পর্ক অকপট লোলুপতার। তবু ভূগোলের প্রতি আগ্রহ অনুসন্ধান, বাছাইকরণ ও

উন্মোচনের জন্য জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রাণাবেগের নৈতিক পক্ষপাতিত্ব বজায় রাখার দায়িত্ব নিতে পারে, যেমন হার্ট অব ডার্কনেসে যখন মার্লো মানচিত্রের প্রতি তার প্রচণ্ড আবেগ স্বীকার করেন :

> আমি দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার প্রতি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতাম আর আবিষ্কারের সকল গৌরবের মধ্যে ডুবে যেতাম। ওই সময় পৃথিবীতে অনেক খালি জায়গা ছিল। যখন আমি এমন একটি স্থান দেখলাম মানচিত্রে, যেন টানছে (তার সবগুলো অমনই দেখায়), আমি তার ওপর আমার আঙুল রাখলাম : আমি যখন বড় হব তখন ওখানে যাব।[১৬]

মার্লোর এ বক্তব্যের কমবেশি সত্তর বছর পূর্বে ল্যামারটিনের নিকট এটি কোনো সমস্যাই মনে হয়নি যে ম্যাপে যা খালি জায়গা সেখানে আসলে স্থানীয়রা বাস করে; আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ সুইশ প্রুশীয় মানুষ এমার ডি ভ্যাটেল যখন ১৭৫৮ সালে তুচ্ছ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল দখল করে নিতে আহ্বান জানান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে তখন তার মনেও তাত্ত্বিকভাবে কোনো বাধা ছিল না।[১৭] গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো পরিষ্কার একটি বিজয়কে কোনো ভাবাদর্শের আলোকে গৌরবান্বিত করা আরও ভৌগোলিক স্থান দখলের আগ্রহকে তত্ত্বে রূপান্তরিত করা–যে তত্ত্ব একদিকে ভূগোলের সম্পর্ক, অন্যদিকে সভ্য ও অসভ্য জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কে সম্পর্কিত। এ ধরনের যৌক্তিকতা আরোপে ফরাসিদেরও এক বিশেষ অবদান রয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ ফ্রান্সে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতি এমন সাদৃশ্য লাভ করে যাতে ভূগোল ও ভৌগোলিক অনুমান কল্পনা জাতীয় বিনোদনের বিষয়ে পরিণত হয়। ইউরোপের সাধারণ মতামতের পরিবেশ ছিল প্রসন্ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সফলতা নিজেদের পক্ষে উচ্চস্বরে সাফাই গায়। যাই হোক, ফ্রান্স ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফরাসি চিন্তাবিদদের নিকট সব সময়ই মনে হয়েছে তুলনামূলকভাবে সফল ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বাধা হলো ব্রিটেন। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পূর্বে প্রাচ্যের ব্যাপারে অনেক মঙ্গলজনক চিন্তাভাবনা করা হয় এবং তা কেবল কবি ও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেইন্ট মার্ক গিরাডিন ১৮৬২ সালের মার্চের ১৫ তারিখে একটি প্রবন্ধ লিখে তার প্রমাণ দেন (দ্র. Revue des Deux Mondes)[১৮]

ডিজরাইলি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিশ্চয়ই বলতেন যেমন প্রায়ই তিনি বলেছেন যে সিরিয়ায় ফ্রান্সের কেবল আবেগগত স্বার্থ আছে (সিরিয়াও প্রাচ্য এবং গিরাডিন এ সম্পর্কেই লিখেছেন)। (গিরাডিন কর্তৃক ব্যবহৃত) 'জনসংখ্যার দুর্ভোগ'-এর গালগল্প অবশ্যই নেপোলিয়ন কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিল, যখন তিনি মিসরীয়দের কাছে আবেদন রাখেন ইসলামের পক্ষে তুর্কিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য। ত্রিশ, চল্লিশ,

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রাচ্যে দুর্ভোগে পতিত জনসংখ্যা বলতে ছিল সিরিয়ার সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানরা এবং এমন কোনো প্রমাণ নেই যে কেউ ফ্রান্সের নিকট 'লা' অরিয়ঁ' উদ্ধার করার আবেদন জানিয়েছেন, বরং সত্য হলো ব্রিটেন ফ্রান্সের প্রাচ্যমুখী রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। কারণ ফ্রান্স যদি আন্তরিকভাবেই প্রাচ্যের প্রতি কোনো দায়বোধ করে থাকে (কিছু ফরাসি তাই মনে করত) তাহলে ব্রিটেন ও তার কর্তৃত্বাধীন ভারত থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিপুল প্রাচ্যভূমির মাঝখানে আসার কোনো সুযোগ ছিল না ফ্রান্সের।

ফ্রান্সে ১৮৭০ সালের যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের একটি হলো প্যারিসের জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে চমৎকার ফলোদয় এবং সীমান্ত প্রসারের জন্য প্রভাবশালী নবোদ্ভূত দাবি। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের শেষে সোসাইটি ঘোষণা করে যে সে এখন আর কেবল 'বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজে আবদ্ধ নয়'। নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় তারা যেন না 'ভোলেন যে অতীতে আমাদের প্রভাবশালী অবস্থানের সাথে প্রতিযোগিতা করা হয়েছিল ঠিক যেদিন থেকে আমরা প্রতিযোগিতা বন্ধ করেছি...বর্বরতার ওপর সভ্যতার বিজয় অর্জনের পথে।' যা ভৌগোলিক আন্দোলনরূপে পরিচিতি পায়, তার এক নেতা গুইলম ডেলিঙ ১৮৮১ সালে দাবি করেন যে ১৮৭০ সালের যুদ্ধে 'জয়লাভ করেছে স্কুলমাস্টার', এর অর্থ হলো ফরাসিদের কৌশলগত জলোভাব প্রবণতার ওপর প্রুশিয়ার বৈজ্ঞানিক ভূগোলজ্ঞানের বিজয়। সরকারি জার্নালে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক অভিযানের গুণাগুণ (ও লাভ) বিষয়ে সংখ্যার পর সংখ্যা বের হয়। এমন একটি সংখ্যা মারফত নাগরিকেরা ডি লেসেপসের নিকট থেকে জানতে পারে 'আফ্রিকায় সুযোগ-সুবিধাসমূহ' এবং গার্নিয়ারের নিকট থেকে 'নীল নদে আবিষ্কার অভিযান সম্পর্কে'। বৈজ্ঞানিক ও সভ্যতাসংক্রান্ত অর্জন নিয়ে জাতীয় গৌরব এবং প্রাথমিক মুনাফার মনোভাবের সম্পর্ককে ঔপনিবেশিক বিস্তৃতির সমর্থনে কাজে লাগানোর আহ্বান জানানো হয়, আর 'বৈজ্ঞানিক ভূগোল' বাণিজ্যিক ভূগোলকে পথ ছেড়ে দেয়। কোনো এক আগ্রহীর ভাষায়, 'যে মুগ্ধতা আমাদের আমাদের নিজেদের সমুদ্রতীরে শিকল দিয়ে আটকে রেখেছে জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা ভেঙে দেওয়ার জন্য।' এই মুক্তিচিন্তায় জুল ভার্নকে সংযুক্ত করা হয় যার 'অবিশ্বাস্য সফলতা' বাহ্যত দেখায় এসব বিষয়ে আমাদের বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও যুক্তি সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান নিয়েছে। এমনকি জুল ভার্নের নেতৃত্বে পৃথিবীব্যাপী একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অভিযান পরিচালনার জন্য এবং উত্তর আফ্রিকান তীর থেকে ঠিক দক্ষিণের এক বিশাল নতুন সমুদ্র সৃষ্টি ও আলজেরিয়াকে রেলপথে সেনেগালের সাথে যুক্ত করার প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য পরামর্শও দেওয়া হয়, প্রকল্প স্রষ্টাদের ভাষায় তা হবে স্টিলের একটি ফিতা।

উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য বিস্তারের জোয়ারের পেছনে ছিল ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধে প্রুশিয়ার বিজয়ের ক্ষতিপূরণ ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী অর্জনের সমকক্ষতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয়োক্ত আকাঙ্ক্ষাটি এত শক্তিশালী ছিল যে প্রাচ্যে এত দীর্ঘদিনের ফরাসি-ব্রিটেনের আসর হয়েছিল, প্রাচ্যের যেকোনো ব্যাপারেই ব্রিটেনের সমকক্ষ হওয়া ও তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল ফ্রান্স। ১৮৭০-এর দশকে ইন্দো-চায়না সোসাইটি তার লক্ষ্য পুনর্নির্ধারণের সময় 'ইন্দো-চীনকে প্রাচ্যের আওতায় নিয়ে আসা' জরুরি মনে করে। প্রুশিয়ার যুদ্ধে সামরিক ও বাণিজ্যিক দুর্বলতার জন্য প্রয়োজনীয় ঔপনিবেশিক অবস্থান না থাকাকে দায়ী করেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা; ব্রিটেনের সাথে তুলনায় ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক হীনতার কথা না হয় বাদ থাকল। 'পশ্চিমা জাতিগুলোর সীমানা প্রসারের ক্ষমতা', প্রথম সারির ভূগোলবিদ লা রঁসিয়ের মন্তব্য করেন, এর উৎকৃষ্ট হেতু, এর উপাদানসমূহ, মানবজাতির নিয়তির ওপর এর প্রভাবসমূহ ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদদের জন্য চমৎকার অধ্যয়নের বিষয় হবে। তবে কেবল যদি সাদা জাতিগুলো তাদের অভিযানের অভ্যাস লালন করে এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রমাণস্বরূপ ঔপনিবেশিক বিস্তার ঘটে।[২০]

এ ধরনের তত্ত্ব থেকেই এই সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে যে প্রাচ্য এমন এক ভৌগোলিক পরিসর যার আবাদ হওয়া দরকার, ফসল তোলা ও পাহারা দেওয়া প্রয়োজন। যথারীতি কৃষি বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার ধারণা এবং প্রাচ্যকেন্দ্রিক যৌনচিন্তারও প্রসার হয়। এখানে গাব্রিয়েল চার্মস কর্তৃক ১৮৮০ লেখা এমন গতানুগতিক আবেগ-উৎসারণ উদ্ধৃত করা যায় :

> যখন আমরা আর প্রাচ্যে থাকব না এবং যখন অন্যান্য বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তি ওখানে অবস্থান করবে, পরিসমাপ্তি ঘটবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আমাদের বাণিজ্য, এশিয়ায় আমাদের ভবিষ্যৎ, দক্ষিণের বন্দরগুলোয় পরিবহনেরও, তখন শুকিয়ে যাবে আমাদের জাতীয় সম্পদের সবচেয়ে ফলবান একটি উৎস।

আরেক লেখক লিরয়-ব্যুলিউ দর্শনকে আরও এগিয়ে নেন :

> একটি সমাজ তখনই উপনিবেশ সৃষ্টি করে যখন সে নিজে উঁচুমাত্রায় পূর্ণতা ও সামর্থ্য অর্জন করেছে; তা প্রজনন ঘটায়; রক্ষা করে এবং চমৎকার উন্নয়নের পরিবেশ স্থাপন করে; সে তার পৌরুষত্বের শৌর্য-বীর্য তারই জন্ম দেওয়া একটি নতুন সমাজে দিয়ে যায়। উপনিবেশন সমাজ শারীরবৃত্তের সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে সূক্ষ্ম এক প্রপঞ্চ।

উপনিবেশায়নের সাথে প্রজননের সমতা স্থাপনের বিষয়টি লিরয়কে এই বিদ্বেষপূর্ণ চিন্তায় পরিচালিত করে যে আধুনিক সমাজে যা কিছু প্রাণময় সত্তা তার 'প্রসার হয় এর পরম উৎকর্ষ বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে'। অতএব তিনি বলেন :

উপনিবেশায়ন একটি জাতির প্রসারমুখী শক্তি; তা এর প্রজননক্ষমতা, পরিসরের মধ্য দিয়ে এর প্রসার ও গুণভিত্তিক বৃদ্ধি। এ হলো ওই জনগোষ্ঠীর ভাষা, প্রথা-আচার, কল্পনা-আদর্শ, আইনের নিকট বিশ্ব বা তার এক বিরাট অংশের প্রজা হয়ে ওঠা।[২১]

লক্ষণীয় যে প্রাচ্যের মতো দুর্বল বা অনুন্নত অঞ্চলের পরিসরকে দেখা হচ্ছে এমন কিছু রূপে যা ফ্রান্সের আগ্রহ আকর্ষণ করেছে, ফ্রান্সের প্রবেশ ও তার দ্বারা নিষিক্ত হতে চাইছে–সংক্ষেপে উপনিবেশিত হওয়ার কামনা করছে। ভৌগোলিক ধারণা বর্ণনামূলক ও পরিসংখ্যানগতভাবে কাজ চালিয়ে যায় সীমান্ত ও সীমান্ত চৌকি দিয়ে চিহ্নিত পরস্পর বিযুক্ত সত্তা নিয়ে। ডি লেসেপসের মতো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যমী কল্পদ্রষ্ট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে তাদের ভৌগোলিক সম্বন্ধ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তার চেয়ে কম যান না ফরাসি পণ্ডিতবর্গ, প্রশাসক, ভূগোলবিদ, বাণিজ্যিক প্রতিনিধিগণ, তারা তাদের ক্রিয়াশীলতা ঢেলে দেন চমৎকার নরম ও রমণীয় প্রাচ্যে। আর ছিল জিওগ্রাফিক সোসাইটি যার সদস্যসংখ্যা সারা ইউরোপের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়; দুটো কারণে ওখানে Comite de L Asie ও comite de orient-এর মতো শক্তিশালী সংগঠন ছিল, ছিল পণ্ডিতি সংগঠন যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এশিয়াটিক সোসাইটি; এর সংগঠন ও সদস্য চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ইনস্টিটিউট ও সরকারেও প্রবেশ করে। এগুলোর প্রতিটিই নিজ নিজ উপায়ে প্রাচ্যে ফরাসি স্বার্থকে করে তোলে আরও বাস্তব, আরও মূল্যবান। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক দায়িত্বের মুখোমুখি হলে প্রাচ্য সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় অধ্যয়নের গোটা একটা শতাব্দীর পরিসমাপ্তি টানতে হয়।

প্রাচ্যের একমাত্র যে এলাকায় ব্রিটিশ ও ফরাসি স্বার্থ সত্যিকার অর্থে পরস্পরকে মাড়িয়ে যায়, তা হলো এখন আশাহীন ও রুগ্ণ অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ। ওখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু পায় নিখুঁত ও স্বভাবগত সংগতির সাথে তাদের সংঘাত মানিয়ে চলতে সমর্থ হয়। ব্রিটেন ছিল মিসর ও মেসোপটেমিয়ায় : স্থানীয় (ও ক্ষমতাহীন) গোত্রপ্রধানদের সাথে সম্পাদিত কিছু চুক্তির মাধ্যমে সে লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর ও সুয়েজ খাল এবং ভূমধ্যসাগর ও ভারতের মধ্যবর্তী ভূমির বেশির ভাগটাই নিয়ন্ত্রণ করত।

অন্যদিকে ফ্রান্সের নিয়তি ছিল বুঝি প্রাচ্যের ওপর ভেসে বেড়ানো, কখনো কখনো নিচে এসে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করে ডি লেসেপসের সুয়েজ সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটানো। এসব প্রকল্পের অধিকাংশ ছিল রেলপথ স্থাপন, যেমন সিরিয়া-মেসোপটেমিয়া লাইন ধরে কমবেশি ব্রিটিশ দখলাধীন অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনা। এছাড়া ফ্রান্স নিজেকে মনে করত ম্যারোনাইট, ক্যালডিয়ান, মেস্টর প্রভৃতি সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীগুলোর রক্ষক। তবু যথাসময়ে

ফ্রান্স ও ব্রিটেন তুরস্কের এশীয় অংশের বিভাজনে একমত হতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে নিকটপ্রাচ্যকে প্রথমে প্রভাববলয়ে, পরে দখলকৃত অঞ্চলে ভাগ করার জন্য জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চলে। ফ্রান্সে ভৌগোলিক আন্দোলনের চরম বিকাশকালে উদ্ভূত সাম্রাজ্য বিস্তারের উত্তুঙ্গ আবেগ তুরস্কের এশীয় অংশটির পরিকল্পনায় জোর দেয়। এ আবেগ এত তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে এ ব্যাপারে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ১৯১৪ সালে 'দর্শনীয় প্রচারণা শুরু হয়'।[২২] প্রাচ্যকে সর্বোত্তমভাবে ভাগ করার উপায়ে অনুসন্ধান ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত হয় বহুসংখ্যক কমিটি। এ-জাতীয় কমিশনের মধ্যে বুসেন কমিটি থেকেই যৌথ ব্রিটিশ-ফরাসি টিমগুলো গঠিত হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রখ্যাত হলো মার্ক সাইকস ও জর্জ পিটের নেতৃত্বাধীন কমিটি। প্রাচ্যের ভৌগোলিক পরিসর যথাযথ হারে ভাগ করার নীতি এ কমিটির পরিকল্পনা। এ ছিল অ্যাংলো-ফরাসি শত্রুতা প্রশমিত করার সুচিন্তিত প্রয়াস। সাইকস একটি মেমোরেন্ডামে তা প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> আজ বা কাল আরব আন্দোলন যে দেখা দেবে তা পরিষ্কার; আর সে আন্দোলন যাতে আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ হয়ে দেখা না দেয়; তাই ফরাসি ও আমাদের উচিত ভালো সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান করা।[২৩]

শত্রুতা থেকেই যায়। এর সাথে যুক্ত হয় উইলসনের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনায় সৃষ্ট উত্তেজনা। এ সম্পর্কে সাইকস নিজেও মন্তব্য করেন : এ যেন বিভিন্ন শক্তির যৌথ উদ্যোগে স্থিরীকৃত ঔপনিবেশিক ও বিভাজক পরিকল্পনায় মূল কঙ্কালটিকে মূল্যহীন করে ফেলা। বিশ শতকের শুরুতে যখন প্রাচ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শক্তি, স্থানীয় শাসক বংশ, বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী দল ও আন্দোলন এবং ইহুদিদের মধ্যে, তখনকার ওই গোলকধাঁধা আর প্রাচ্যের বিতর্কিত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে। এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো যে উদ্ভট জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোয় প্রাচ্যকে দেখা হয় এবং যার মধ্য থেকে শক্তিসমূহ সক্রিয় হয়। কারণ মতপার্থক্য সত্ত্বেও ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রাচ্যকে দেখে একটি ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, জনমিতিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সত্তা হিসেবে; যার ওপর তাদের প্রথাগত অধিকার রয়েছে। তাদের কাছে প্রাচ্য কোনো আকস্মিক অধিকার বা ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা নয়। এটি ইউরোপের পুবের একটি অঞ্চল। এর মুখ্য মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ইউরোপীয় শর্তে—আরও পরিষ্কার করে বলা যায় যে এমন শর্তে যা বর্তমান প্রাচ্য সৃষ্টির কৃতিত্ব প্রদান করে ইউরোপের বিজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, উপলব্ধি-ক্ষমতা ও প্রশাসনকে। এই হলো অর্জন, কিন্তু বেখেয়ালি অর্জন নয় বা আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের মূল্য বক্তব্যের বাইরে নয়।

প্রাচ্যতত্ত্ব দুটো প্রধান পদ্ধতিতে প্রাচ্যকে পশ্চিমের নিকট সরবরাহ করে। একটি হলো আধুনিক শিক্ষাপ্রক্রিয়ার চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা—এর পরিব্যাপনকারী

পাণ্ডিত্যপূর্ণ পেশা, বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী সংঘ, অভিযানকারী ও ভৌগোলিক সংগঠন ও প্রকাশনাশিল্পের মাধ্যমে। আমরা যেমন দেখেছি এসবই প্রথম যুগের পণ্ডিত, পর্যটক ও কবিদের সম্মানজনক বিশেষজ্ঞতার ওপর গঠিত। এদের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এক প্রাচ্যের রূপ দেয়; এরূপ প্রাচ্যের মতবাদগত বা ঐশ্বরিক মহিমাগত প্রকাশই হলো প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতত্ত্ব।

কেউ যদি প্রাচ্যসম্পর্কিত কোনো ঘটনাক্রমের ব্যাপারে একটি বিবৃতি দিতে চায় প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতত্ত্ব তাকে নিয়মমাফিক বিবৃতি প্রদানের ক্ষমতা সরবরাহ করবে; তা ব্যবহার করা যাবে, চালানো যাবে এবং হাতের কাছের কোনো বাস্তব উপলক্ষে একেই রূপান্তরিত করা যাবে একটি বিকল্প আলোচনায়।

এভাবে বেলফোর যখন ১৯১০ সালে হাউস অব কমনসে প্রাচ্যজন সম্পর্কে কথা বলেন, তখন তার সময়ে চলিত ও গ্রহণযোগ্য যৌক্তিক ভাষার ওই সব বিবৃতিমূলক ক্ষমতার কথা তার মনে থেকে থাকবে, যার সাহায্যে 'প্রাচ্যদেশীয়' জাতীয় নামকরণ এবং এ নিয়ে কথা বলা সম্ভব হয় এবং একই সাথে খুব অস্পষ্টতার বিপদও থাকে না। তবে ওদের সৃষ্ট সকল বিবৃতিমূলক ক্ষমতা ও ডিসকোর্সের মতোই প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতত্ত্ব যথেষ্ট রক্ষণশীল, নিবেদিত এর আত্মসংরক্ষণের প্রতি। প্রাচ্যতত্ত্ব তার অস্তিত্বকে বাজি ধরেছে—এর উন্মুক্ত অবস্থা বা প্রাচ্যকে অবধারণের ক্ষমতার ওপর নয় বরং এর প্রকাশ্য ইচ্ছা-ক্ষমতার পুনরাবৃত্তিমূলক আন্তসংগতির ওপর। এ উপায়ে প্রাচ্যতত্ত্ব বিপ্লব, বিশ্বযুদ্ধসমূহ এবং সাম্রাজ্যের আক্ষরিক ভাঙনের মুখেও বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় যে পদ্ধতিতে প্রাচ্যতত্ত্ব পশ্চিমের নিকট প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করে তা এক গুরুত্বপূর্ণ সমকেন্দ্রিকতার ফল। প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা বহু যুগ ধরে প্রাচ্য নিয়ে কথা বলেছে, প্রাচ্যের বয়ন ভাষান্তরিত করেছে; প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়বস্তু হিসেবে এগুলোর অনুকরণীয় ভিনদেশি বৈশিষ্ট্যের বদৌলতে ইউরোপের দৃষ্টির সামনে ব্যাখ্যা করেছে প্রাচ্যের সভ্যতা, ধর্ম, শাসকগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, মানসিকতা। প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা হলো বিশেষজ্ঞ, রেনান ও লেইনের মতো। সমাজে তাদের দায়িত্ব স্বদেশবাসীর নিকট প্রাচ্যকে ব্যাখ্যা করা। দুর্বোধ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা দুর্গম বস্তুটিকে অনূদিত করে, সহানুভূতির সাথে চিত্রায়িত ও অন্তর্গতভাবে গ্রাস করে কমিয়ে নিয়েছে এর অস্পষ্টতা। তবু প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রাচ্যের বাইরেই থাকেন। প্রাচ্য যতই বোধগম্য হোক না কেন তা টিকে আছে পাশ্চাত্যের বাইরে। এই সাংস্কৃতিক, সময়গত ও ভৌগোলিক দূরত্ব প্রকাশ পেয়েছে গভীরতা, গোপনীয়তা ও যৌনানুরাগের রূপকের মধ্য দিয়ে : 'প্রাচ্য রমণীর নেকাব' বা 'প্রাচ্য দুর্জ্ঞেয়' জাতীয় উক্তি এখন ভাষায় প্রচলিত।

তবু উনিশ শতকে প্রায় স্ববিরোধীভাবে হ্রাস পেতে শুরু করে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের দূরত্ব। দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বস্তুর যোগাযোগ বৃদ্ধি

পায় (এমনভাবে যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি)। এর ফলে প্রাচীন ধ্রুপদ প্রাচ্যসম্পর্কিত গবেষণার সমর্থনপুষ্ট প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতত্ত্বের অন্ধ মতবাদ এবং পর্যটক, তীর্থযাত্রী, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি পশ্চিমা মানুষের প্রদত্ত আধুনিক, প্রকাশ্য, বর্তমান প্রাচ্যের বর্ণনার মধ্যে টানাপোড়েন বাড়ে। পূর্বোক্ত টানাপোড়েনের প্রভাবে কোনো এক সময় দুই প্রাচ্যতত্ত্ব একীভূত হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ঠিক কখন তা বলা মুশকিল। প্রাচ্য আসলে কী, এ বিষয়ে যখন প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা সর্বপ্রথম সরকারকে পরামর্শ দিতে শুরু করেন সে সময়ই একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সূচিত হয়ে থাকবে; এটা অবশ্য আমার আন্দাজ। এখানে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রস্তুত বিশেষজ্ঞ তার কর্মক্ষেত্রে আরেকটি মাত্রা সংযোজন করেন–পশ্চিমা শক্তি কর্তৃক প্রাচ্যসম্পর্কিত নীতি-নির্ধারণের প্রয়াসে (পরামর্শদাতা) প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের গণ্য করা যায় পশ্চিমা শক্তির বিশেষ প্রতিনিধিরূপে। প্রতিটি শিক্ষিত (এবং তত শিক্ষিত নয় এমন) ইউরোপীয় পর্যটকই প্রাচ্যে নিজেকে ভাবে পশ্চিমের প্রতিনিধি, বিশেষত যারা 'দুর্জেতার' অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। আমরা সব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করেছি। যেমন: বার্টন, ডাফটি, লেইন, ফ্লবেয়ার প্রমুখের বেলায় তা অবশ্যই সত্যি।

প্রাচ্যে পশ্চিমের দখলকৃত অঞ্চল আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিম কর্তৃক আধুনিক ও প্রকাশ্য প্রাচ্যের আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এভাবে পণ্ডিত প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা যাকে 'অনিবার্য' প্রাচ্য বলেন তা কখনো ওই প্রাচ্যের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে বরং নিশ্চিত করে, বিশেষত যখন প্রাচ্য প্রকৃত প্রশাসনিক দায় হিসেবে দেখা দেয়। প্রাচ্যজন সম্পর্কে প্রথাগত প্রাচ্যতাত্ত্বিক আর্কাইভ থেকে ধার করা ক্রোমারের তত্ত্ব প্রতিহিংসায় দূষিত; কারণ তিনি বাস্তবে শাসন করেছেন কোটি কোটি প্রাচ্যজনকে। সিরিয়া, আফ্রিকা ও অন্যত্র ফরাসি উপনিবেশে ফরাসি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও এ কথা সমান সত্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণামে যখন তুরস্কের এশীয় অংশ বিভাজনের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স-ব্রিটেন যৌথ উদ্যোগে জরিপ চালায়, তখনই প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতাত্ত্বিক মতবাদ এবং প্রকাশিত প্রাচ্যতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা সমরূপী ও একমুখী হয়ে ওঠে সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে। তখন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্থান বিবরণ আর সকল দুর্বলতা উন্মোচিত করে দিয়ে অপারেশন টেবিলে শায়িত সিক ম্যান অব ইউরোপ, শল্য চিকিৎসার অপেক্ষায়।

প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞান নিয়ে অপরিমেয় গুরুত্বসহ ভূমিকা পালন করেন এ অপারেশনে। মিসরে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব যাচাই এবং আরবির বিদ্রোহের সাথে তার সংযোগ পরিমাপের জন্য ১৮৮২ সালে সিনাইয়ে পাঠানো হয় পণ্ডিত এডওয়ার্ড হেনরি পালমারকে। গুপ্তচর হিসেবে তার ভূমিকা সম্পর্কে তখনই কিছু সংবাদ প্রকাশ পেয়ে যায়। যথাসময়ে খুন হন পালমার। সাম্রাজ্যের পক্ষে এ ধরনের দায়িত্ব পালনে

পালমার সর্বাধিক ব্যর্থ একজন। তখন এই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি ভিত্তিতে সমাপ্য কাজটির আংশিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয় 'অঞ্চল বিশেষজ্ঞদের ওপর'। আরব অঞ্চলের উন্মোচন সম্পর্কে বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি পেনিট্রেশন অব অ্যারাবিয়া' (১৯০৪)[২৪]-এর লেখক প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডি ডি হোগার্থকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শুধু শুধু 'আরব ব্যুরো অব কায়রো'র প্রধান নিয়োগ করা হয়নি।

তেমনি গার্ট্রুড বেল, টি ই লরেন্স, সেন্ট জন ফিলবির মতো প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ নারী-পুরুষকে যে ব্রিটিশের এজেন্ট হিসেবে প্রাচ্যের বন্ধুরূপে এবং প্রাচ্য ও প্রাচ্যজন সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সূত্রে নীতিনির্ধারক হিসেবে প্রাচ্যে নিয়োগ দেওয়া, তাও দুর্ঘটনা নয়। এরা সবাই মিলে একটি বন্ধনীর মতো; এদের বন্ধনের ভিত্তি বিরোধাত্মক ধারণা ও ব্যক্তিগত সাদৃশ্য : তীক্ষ্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রাচ্যের সাথে সহানুভূতি ও স্বজ্ঞামূলক সম্পর্ক, ঈর্ষান্বিতভাবে বুকে পুষে রাখা এই বোধ যে এটি প্রাচ্যে তাদের ব্যক্তিগত মিশনও। এদের সবার কাছে প্রাচ্য হলো ওদের প্রত্যক্ষ করা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হওয়া এবং তার দায়িত্ব আধিপত্যবাদী অন্য শক্তির হাতে তুলে দেওয়ার আগেই ওদের মাধ্যমে প্রাচ্যতত্ত্ব এবং প্রাচ্যকে পরিচালনার রীতিনীতি ধারণ করে পুরোপুরি ইউরোপীয় রূপ।

এদের মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ছিলেন অপ্রাতিষ্ঠানিক লোক। অচিরেই আমরা দেখব প্রাচ্যতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যের পেশাগত ও অফিশিয়াল সাহচর্য ছাড়াই এরা প্রাচ্যসম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চার সুফল ভোগ করেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যতত্ত্বকে ছড়িয়ে দেওয়া বা উল্টোমুখী করা নয়, এদের দায়িত্ব ছিল তাকে কার্যকর করার। এদের বুদ্ধিবৃত্তিক বংশলতিকায় ওপরে রয়েছেন লেইন ও বার্টনের মতো মানুষ। প্রাচ্যের সাথে আচরণে বা প্রাচ্যসম্পর্কিত লেখায় অনিবার্যভাবে প্রায়-পণ্ডিতি জ্ঞান এরা কাজে লাগান প্রাচ্যজনের সাথে লেনদেনে বা তাদের সম্পর্কে লেখার সময়। প্রাচ্যের পাঠ্যসূচিতে ওরা প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যতত্ত্বকে একটু বিশদভাবে নিয়েছিলেন, ওদের যুগের সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিতে তা ছিল সুলভ। এদের পণ্ডিতি নির্দেশের তালিকা তৈরি হয়েছে এদের নিয়ে, যেমন: উইলিয়াম মুইর, এন্থনি বিভান, ডিএস মারগোলিওথ, চার্লস লাইয়াল, ইজি ব্রাউন, আর এ নিকলসন, গাই লা স্ট্রেঞ্জ, ইডি রস এবং থমাস আর্নল্ড–যিনি নিচের দিকে লেইনের পরপরই জায়গা নেন। আর তাদের কল্পনার পটভূমি সরবরাহ করেছেন সমকালীন বিশদ চিত্রকরসদৃশ রুডইয়ার্ড কিপলিং; যিনি 'তাল ও আঙুরের (বাগানের) ওপর আধিপত্য' ধরে রাখার অবিস্মরণীয় গান গেয়ে গেছেন।

এসব বিষয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পার্থক্য প্রাচ্যে তাদের ইতিহাসের সাথে নিখুঁততম সংগতিপূর্ণ : ব্রিটিশরা ওখানে পৌঁছে যায়, ভারত ও মধ্যবর্তী ভূমি হারানোর জন্য ফরাসিরা বিলাপ করে। শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সের প্রধান লক্ষ্য হয় সিরিয়া। কিন্তু সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা ওখানেও ফরাসিরা লোকবল বা রাজনৈতিক প্রভাবের দিক

থেকে ব্রিটিশের সমকক্ষ নয়। অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পদের ওপর ফরাসি-ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা টের পাওয়া যায় হেজাজ, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধেও। কিন্তু এডমন্ড ব্রেমন্ডের মতো বিচক্ষণ মানুষের পর্যবেক্ষণ হলো, ওসব এলাকায় মেধা ও কৌশলগত পদক্ষেপে ব্রিটিশ প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি ফরাসি প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা।[২৫] লুইস ম্যাসিগননের মতো ব্যতিক্রম ছাড়া, একজন ফ্রেঞ্চ লরেন্স বা সাইকস বা বেল ছিল না। তবে এটিন ফ্ল্যান্ডিন বা ফ্রাঙ্কলিন বুইলনের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাম্রাজ্যবাদীরা ছিল। ১৯১৩ সালে প্যারিসে অলিয়াঁস ফ্রঁসেজে বক্তৃতা করতে গিয়ে কোঁতে ডি ক্রেসেতি ঘোষণা করেন সিরিয়া ফ্রান্সের বাণিজ্যিক, নৈতিক ও আর্থ স্বার্থের জায়গা। যে স্বার্থ, ক্রেসেতি যোগ করেন, 'সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের যুগে' রক্ষা করতেই হবে। এ সত্ত্বেও ক্রেসেতি লক্ষ্য করেন যে প্রাচ্যে ফরাসি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানার অবস্থান এবং ফরাসি স্কুলসমূহে প্রাচ্যের বহু ছেলেমেয়ে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্সকে অবিচ্ছিন্নভাবে কোণঠাসা করা হচ্ছে; ফ্রান্স কেবল ব্রিটেন নয়–অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও রাশিয়ারও হুমকির মুখে। ফ্রান্স যদি 'ইসলামের প্রত্যাবর্তন' ঠেকানো অব্যাহত রাখতে চায় তাহলে প্রাচ্যে দৃঢ় হয়ে বসাই সর্বোত্তম। ক্রেসেতি এ যুক্তি দেন এবং তার সমর্থন করেন সিনেটর পল ডুমার। বহু উপলক্ষে এ যুক্তি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর আফ্রিকা ও সিরিয়ায় ফ্রান্স তা প্রয়োগও করেছে। তবে প্রাচ্যের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং কাগজপত্রে স্বাধীন অঞ্চলগুলোয় ব্রিটিশ প্রভাব–এই দুই জিনিস তার চোখ এড়িয়ে গেছে বলে মনে করে ফ্রান্স। যথারীতি আধুনিক ব্রিটিশ ও আধুনিক ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্বের পার্থক্য রীতিগত বলেই মনে করা হয়–প্রাচ্য ও প্রাচ্যজনের সাধারণীকরণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্যের বোধ, প্রাচ্যের ওপর আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই একরূপ। যাকে সচরাচর বলা হয় বিশেষজ্ঞতা, রীতি; তা হলো ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান, ইচ্ছা ও বুদ্ধির দ্বারা নির্দিষ্ট জাগতিক পরিস্থিতিকে ভেঙেচুরে পরিষ্কার রূপ দেওয়ার ফল। ওই বিশেষজ্ঞতাই সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত থাকে। আমাদের এখন দৃষ্টি ফেলতে হবে ওই কটি নিয়ামকের ওপর, বিশ শতকের শুরুতে ফ্রান্স ও ব্রিটেনে প্রাচ্যতত্ত্বের ওই বোধগম্য, আধুনিকায়িত পরিশোধনের ওপর।

• খ •

রীতি, বিশেষজ্ঞতা, দৃষ্টি
প্রাচ্যতত্ত্বের জাগতিকতা

একটি কল্পনা, একটি চরিত্র–সত্তার একটি রূপ হিসেবে কিপলিঙের সাদা মানুষ বহু কবিতা, কিমের মতো উপন্যাস এবং শ্লেষাত্মক কল্পনাসুলভ উক্তিতে যেভাবে ঘুরে-ফিরে এসেছে, তাতে মনে হয় এ চরিত্র বিশেষ প্রভাবিত করেছিল প্রবাসী ব্রিটিশদের। প্রকৃত গাত্রবর্ণ স্থানীয় জনসমুদ্র থেকে নাটকীয়ভাবে এবং নিশ্চিতভাবে আলাদা করে রাখে তাদের। তবে ভারতীয়, আফ্রিকান ও আরবদের মাঝে ছড়িয়ে থাকা ব্রিটিশদের মনে কিছু নির্দিষ্ট জ্ঞান কাজ করেছে : তা এই যে, তারা গাঢ় বর্ণের জাতিগুলোর ওপর নির্বাহী দায়িত্ব পালনের দীর্ঘ ঐতিহ্যের সাম্রাজ্যবাদী ও আধ্যাত্মিক সঞ্চয়ের অন্তর্গত এবং প্রয়োজনে তা থেকে গ্রহণও করতে পারে। এই ঐতিহ্য, গৌরব ও সমস্যার কথাই লিখেন কিপলিং, যখন তিনি সাদা মানুষ কর্তৃক উপনিবেশমুখী পথযাত্রার ঘটনাকে অভিনন্দিত করেন :

> এই সেই পথ, যে পথে হেঁটে যায় সাদা মানুষেরা,

যখন কোনো ভূমি সাফ করতে যায়–

> পদতলে লৌহপাত, উপরে আঙুরলতা;
> দুর্বোধ্য গহন দুহাতে।
> আমরা মাড়িয়েছি এই পথ–ভেজা ও ঝড়ো পথ,
> আমাদের বেছে নেওয়া ধ্রুবতারা।
> আহা! পৃথিবীর জন্য শুভ যখন রাজপথ মাড়িয়ে যায়
> পাশাপাশি সাদা মানুষেরা।[২৭]

পরস্পর সূক্ষ্ম ঐকতানের মধ্য দিয়ে ভূমি সাফ করার কাজটি সাদা মানুষেরা ভালোভাবেই করেছে; এটি উপনিবেশে ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বিতারও ইঙ্গিত দেয়। নীতিমালা সমন্বয়ের প্রয়াস ব্যর্থ হলে কিপলিংয়ের সাদা মানুষেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত : 'আমাদের জন্য স্বাধীনতা, আমাদের সন্তানদের জন্য এবং স্বাধীনতা ব্যর্থ হলে যুদ্ধ'। সাদা মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ নেতৃত্বের মুখোশের নিচে রয়েছে জোর প্রয়োগের

ইচ্ছা–খুন করার এবং খুন হওয়ার। তার লক্ষ্যকে মহিমান্বিত করে এ রকম বুদ্ধিবৃত্তিকে নিষ্ঠার বোধঃ সে সাদা মানুষ, কিন্তু কেবল স্বার্থান্ধ নয়, কারণ তার বেছে নেওয়া নক্ষত্রের অবস্থান বৈষয়িক লাভ-ক্ষতি থেকে অনেক উর্ধ্বে। বহু সাদা মানুষ হয়তো অবাক হয়েছে আর ভেবেছে : কিসের জন্য তারা এই ভেজা ও ঝোড়ো পথে যুদ্ধ করছে এবং নিশ্চয়ই আরও বিপুল সংখ্যক অবাক হয়েছে যে কী করে তাদের গায়ের রং পৃথিবীর বেশির ভাগের ওপর বিরাট ক্ষমতা ও উঁচু তাত্ত্বিক মর্যাদা এনে দিয়েছে। এ সত্ত্বেও, কিপলিঙের নিজের জন্য এবং তিনি যাদের বোধ ও ভাষা প্রভাবিত করেছেন তাদের জন্য সাদা মানুষ হওয়ার বিষয়টি স্ব-নিশ্চিতকরণের ব্যাপার। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো 'ওই কাপের পানীয় পান করা এবং সাদাদের যুগে' অপরিবর্তনীয় নিয়তিকে যাপন করা। উৎস, কারণ ও ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা সম্পর্কে অলস আন্দাজ করার সময় নেই এখন।

অতএব, সাদা মানুষ হওয়ার ব্যাপারটি একটি ধারণা ও বাস্তবতা। এর সাথে জড়িয়ে আছে সাদা ও অ-সাদা এই উভয় পৃথিবীর প্রতি যৌক্তিক অবস্থান গ্রহণের প্রশ্ন। এক অর্থে এর অর্থ হলো উপনিবেশে কিছু বিধি-বিধানের সংকেত অনুযায়ী আচরণ করা, এমনকি কিছু ব্যাপার অনুভব করা ও অন্যগুলো না করা। এটি নির্দেশ করে বিশেষ কিছু বিচার-বিবেচনা, মূল্যায়ন. দৃষ্টি; এ হলো এক রকম কর্তব্য যার সামনে অবনত হবে অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষ এমনকি শ্বেতাঙ্গরাও। তা যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করে (ঔপনিবেশিক সরকার, কূটনৈতিক দল, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।) সেখানে তা সেই প্রতিষ্ঠান ও সারা পৃথিবীর প্রতি গৃহীত নীতি অভিব্যক্তকরণ, বিস্তারণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিনিধি। যদিও নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির স্বাধীনতা অনুমোদন করা হয়, তবু সাদা মানুষের ব্যক্তিনিরপেক্ষ সাম্প্রদায়িক ধারণাই এখানে নিয়ন্ত্রক। সংক্ষেপে সাদা মানুষ হওয়ার অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু রীতিনীতি মেনে পৃথিবীতে অস্তিত্ব যাপন এবং বাস্তবতা, ভাষা ও চিন্তাকে অবধারণের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। এটি সম্ভাবিত করে বিশেষ এক রীতিকে।

কিপলিং নিজে তুচ্ছ সাদামাটা কোনো আবির্ভাব নন, তেমনি তার সাদা মানুষও না। এ রকম কল্পনা ও তার স্রষ্টা জটিল ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত; এদের আবির্ভাবের পটভূমি এবং উনিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্বের পটভূমির অন্তত দুটো বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান।[২১] এর একটি হলো সাংস্কৃতিকভাবে অনুমোদিত বিস্তৃত পরিসরের সাধারণীকরণ ব্যবহার করে বাস্তবতাকে বিভিন্ন যূথে ভাগ করার অভ্যাস, যেমনঃ বর্ণ, ভাষা, জাতি, ধরন, মানসিকতা; মূল্য নির্ধারক ভাষ্য হিসেবে এর কোনোটিই কিন্তু নিরপেক্ষ আখ্যা নয়। এসব বর্গের তলে আছে 'আমাদের' ও 'ওদের' ভিত্তিক কঠোর যুগ্ম বৈপরীত্য, যেখানে প্রথমোক্তরা (আমরা) বরাবরই দ্বিতীয়োক্তদের ওপর চড়াও হচ্ছে (এমনকি 'ওরা' নির্দেশের কাজটিও একচ্ছত্রভাবে

'আমাদের' এখতিয়ারে), কেবল নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ও ইতিহাসই ওই বৈপরীত্যকে জোরদার করেনি, প্রাকৃতিক বাছাইকরণের ডারউইনীয় তত্ত্ব এবং মার্গীয় সংস্কৃতির মানবতাবাদের বাখোয়াজিও একে বলশালী করেছে। রেনান ও আর্নল্ডের মতো লেখকদের জাতি বিষয়ে সাধারণীকরণের অধিকার দিয়েছে তাদের সংঘটিত সাংস্কৃতিক শিক্ষা। 'আমাদের' মূল্যবোধগুলো হলো উদারনৈতিক, মানবিক, সঠিক–এদের সমর্থনে আছে রসসাহিত্য, পাণ্ডিত্য, যৌক্তিক অনুসন্ধিৎসার ঐতিহ্য। যখনই এগুলোর গুণাবলি বিশেষ উৎকর্ষতা অর্জন করেছে, তখনই আমরা ইউরোপীয় (ও সাদা মানুষ) সেই সব গুণ গ্রহণ করেছি।

তবে যাই ঘটুক, পুনঃচর্চিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে গঠিত মানবীয় অংশীদারি যতটা গ্রহণ করে তেমন বর্জনও করে। কারণ যখন আর্নল্ড, রাসকিন, মিল, নিউম্যান, কার্লাইল, রেনান, গোবিনো বা কোঁতে 'আমাদের' শিল্পকলার কোনো আদর্শের পক্ষে বলেছেন তখন এ বিষয়ক প্রতিটি ধারণা আমাদের একেকটি নতুন বন্ধনে যুক্ত করছে, তখনই লুপ্ত হচ্ছে বাইরের কোনো আরেকটি সংযোগ ও ধারণা। এমনকি এটি যদি বাগাড়ম্বরের ফলও হয়ে থাকে তবু মনে রাখতে হবে যে উনিশ শতকের ইউরোপে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরাট সৌধ নির্মিত হয়েছে প্রকৃত বহিরাগতদের মুখের ওপর (উপনিবেশ, দরিদ্র ও অপরাধী), সংস্কৃতিতে যাদের ভূমিকা ছিল সাংবিধানিকভাবে তারা কোন জিনিসটির সাথে খাপ খায় না তা বর্ণনা করা।[২৮]

সাদা মানুষ ও প্রাচ্যতত্ত্ব সৃষ্টির আরেকটি সাদৃশ্যজনক পরিস্থিতি হলো প্রত্যেকের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি 'ক্ষেত্র' এবং সেই সাথে এই বোধ যে এ ধরনের ক্ষেত্র সঙ্গে নিয়ে আসে উদ্ভট মেজাজ, এমনকি আচরণ, শিক্ষা, দখল ও অর্জনের প্রথাচার। যেমন কেবল একজন পশ্চিমাই প্রাচ্যজন সম্পর্কে বলতে পারবে, যেমন একজন সাদা মানুষ গাঢ়বর্ণ বা অ-সাদা মানুষকে আখ্যায়িত করতে পারে ও নাম প্রদান করতে পারে। প্রাচ্যতাত্ত্বিক বা সাদা মানুষের (অবস্থান দুটো পরিবর্তনযোগ্য) প্রতিটি ভাষ্য সাদা ও অ-সাদা মানুষ এবং পাশ্চাত্যজন ও প্রাচ্যজনের মধ্যে পার্থক্যসূচক একটি অমোচনীয় দূরত্বের বোধ সঞ্চারিত করে। তা ছাড়া প্রতিটি বক্তব্যের পেছনে প্রতিধ্বনি তোলে অভিজ্ঞতা, জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার ঐতিহ্য, যা অশ্বেতাঙ্গ প্রাচ্যজনকে পাশ্চাত্যজনের পরীক্ষণের বিষয়বস্তুর অবস্থানে ধরে রাখে; কিন্তু কখনো তার উল্টোটা ঘটে না। এখানে একজন আছে ক্ষমতার অবস্থানে, যেমন ছিলেন ক্রোমার; প্রাচ্যজন শাসনপদ্ধতির আওতাভুক্ত, যে পদ্ধতির কাজ হলো এমন পরিস্থিতি নিশ্চিত করা যাতে কোনো প্রাচ্যদেশীয় কখনো স্বাধীন হতে না পারে বা নিজেকে নিজে শাসন করতে না পারে। ওখানে কার্যকর সূত্রটি এই যে যেহেতু প্রাচ্যদেশীয়রা স্বশাসন সম্পর্কে অজ্ঞ তাই ওদের ভালোর জন্যই ওদেরকে সে পথ থেকে দূরে রাখতে হবে।

অ-সাদাদের দূরে সরিয়ে রাখার রেখাটির খুব নিকটেই অবস্থান করেন প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও সাদা মানুষ। তাই তিনি মনে করেন তার দায় হলো তার পর্যবেক্ষিত স্বাধীন

উপনিবেশটিকে প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে সংজ্ঞায়িত ও পুনঃসংজ্ঞায়িত করা। ওখানে আখ্যানমূলক বর্ণনার অনুচ্ছেদসমূহ নিয়মিতভাবে সংজ্ঞায়ন ও বিচার-বিবেচনার দু-একটি অনুচ্ছেদের সাথে স্থান বদলে নেয়। এর ফলে আখ্যান হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খল। এটি সেসব প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখকের লেখার বৈশিষ্ট্য যারা সাদা মানুষের মুখোশ পরে লিখেন। এখানে টি ই লরেন্স ভি ডব্লিউ রিচার্ডসের নিকট লিখছেন ১৯১৮ সালে :

> আরবরা আমার কল্পনা আলোড়িত করেছে। এটি প্রাচীন–খুবই প্রাচীন সভ্যতা, যা গার্হস্থ্য ঈশ্বরদের সরিয়ে পরিশোধন সমাপ্ত করেছে এবং ফাঁদের অর্ধেকও সরিয়ে ফেলেছে, যা করতে আমাদের সভ্যতা দ্বিধান্বিত। বস্তু বিষয়ে উন্মুক্তভাবে নীতি ভালো, তবে তা মনে হয় নৈতিক উন্মুক্ততার সাথেও জড়িত। ওরা মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে এবং কোনো কোণ-বাঁক না ঘুরেই জীবনের ভেতর দিয়ে পেছনে চলে যেতে চায়। তা অংশ মানসিক ও নৈতিক অবসাদের ফল, প্রশিক্ষিত একটি জাতির; ডুবন্ত জাহাজ বাঁচানোর জন্য যেমন সমানে মালামাল ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি নানা জটিলতা এড়ানোর জন্য এদের এত বেশি ত্যাগ করতে হয়, যা আমার কাছে মনে হয় গুরুতর এবং সম্মান প্রদর্শনের যোগ্য। ওদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গী না হয়েও, আমি বুঝতে পারি যে ওরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিদেশি এই আমাকে ও অন্যদের কোন দৃষ্টিতে দেখে। আমি জানি ওদের নিকট আমি অচেনা এবং সর্বদা অচেনাই থেকে যাব। তবে আমি ওদের আরও খারাপ বলে বিশ্বাস করতে পারি না, আমি যতটা ওদের মতো হতে পারি তার চেয়ে বেশি নয়।[২৯]

একই রকম পরিপ্রেক্ষিত গার্ট্রুড বেলের মন্তব্যে, যদিও আলোচনার বিষয় ভিন্ন :

> কত হাজার বছর ধরে এই অবস্থাটি টিকে আছে। [অর্থাৎ আরবরা যে যুদ্ধাবস্থায় জীবন যাপন করে] যারা মরুভূমির ভেতরের এলাকার নথিপত্রগুলো পড়বেন তারা বলবেন আমাদের। কারণ, এদের সূচনা থেকেই এই অবস্থার সৃষ্টি। কিন্তু ওই সব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরবরা কোনো জ্ঞান বহন করে আনেনি। সে কখনো নিরাপদ নয় অথচ এমনভাবে করে যেন নিরাপত্তা তার ডাল-ভাত।[৩০]

এর সাথে টীকা হিসেবে যোগ করা দরকার তার আরেকটি পর্যবেক্ষণ, এবার দামেস্কের জীবন সম্পর্কে :

> আমি হতাশভাবে দেখতে লাগলাম পুবের বিরাট একটা শহরের সভ্যতা বলতে কী বোঝায়; ওরা কীভাবে জীবন যাপন করে, কী চিন্তা করত, আমি ওদের সাথে সম্পর্কের সূত্রটি ধরতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস, ইংরেজ পরিচয় এ ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।...আমরা ও জগৎটিতে প্রবেশ করেছি পাঁচ বছর আগে। পার্থক্য খুবই পরিষ্কার। আমার ধারণা, মিসরে আমাদের সাফল্য এর বড় কারণ...রাশিয়ার পরাজয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং আমার মনে হয় পারস্য উপসাগর ও ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চলে লর্ড কার্জনের তেজোদীপ্ত নীতিও

আরেক কারণ। যে কখনো প্রাচ্য দেখেনি সে বুঝতে পারবে না ওরা কীভাবে পরস্পর লগ্ন হয়ে থাকে। যদি ইংরেজদের অভিযান কাবুলের গেট থেকে ফিরে যেত তাহলে দামেস্কের রাস্তায় কঠোর ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি হজম করে চলতে হতো ইংরেজ পর্যটকদের।[৩১]

এ রকম বক্তব্যে প্রথমেই আমরা যা লক্ষ করি তা হলো 'আরবদের' রয়েছে বিচ্ছিন্নতা, নির্দিষ্টতা ও পরস্পর যূথবদ্ধতার একরকম দেহ-জ্যোতি, যা বর্ণনাযোগ্য ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস বিশিষ্ট আরবের অস্তিত্ব মুছে ফেলে। কল্পমূর্তি এবং জীবনদর্শন (বা দৃষ্টিভঙ্গি) রূপে আরবের স্বচ্ছতা লরেন্সকে নাড়া দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই লরেন্স একজন অ-আরবের পরিশোধক-প্রেক্ষিত থেকে দেখা আরব ধারণাটি ভালোভাবে জড়িয়ে নেন। তিনি এখানে পরিষ্কারভাবেই এমন কেউ যার উপলব্ধির প্রয়োজনেই আরবদের আদিম সরলতা বর্ণিত হচ্ছে কোনো পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে, যিনি অবশ্যই সাদা মানুষ। তবু আরবদের পরিশোধন ইয়েটসের বাইজেনটাইন-সম্পর্কিত এ কল্পদৃশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ :

আগুন! জ্বালানি কাঠ যাকে খাদ্য জোগায়নি,
পাথর টুকরো বা লোহাও ওঠেনি জ্বলে,
বিরক্ত করে না ঝড়ও। আগুনের শিখা থেকে জন্ম নেওয়া অগ্নিশিখা
যেখানে রক্ত থেকে উত্থিত প্রাণশক্তি;
আর ছেড়ে যায় প্রচণ্ড রোষের জটিলতা![৩২]

এখানে অনিবার্যভাবে আরবদের অপরিবর্তনীয়তার প্রসঙ্গ জড়িয়ে যায়। যেন আরবরা ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু লরেন্সের নিকট স্ববিরোধীভাবে মনে হয়েছে আরবরা সময়ের সাথে অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তাদের শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছে। এভাবে বিরাট আরব সভ্যতা কাজ করেছে আরবদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য গঠনে। কিন্তু অন্যদিকে এ প্রক্রিয়ায় নৈতিকভাবে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে ওরা। এরপর আমাদের সামনে অবশিষ্ট থাকে গার্ট্রুড বেলের আরব অর্থাৎ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোনো জ্ঞান বহন করে আনেনি যে আরবেরা। অতএব, যৌথ সত্তারূপী আরবেরা অস্তিত্বগত এমনকি শব্দার্থগত ঘনত্বও অর্জন করতে পারেনি। ওরা মরুভূমির ভেতরের অংশের নথিপত্রের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একই রকম হয়ে গেছে, শুধু লরেন্সের উল্লিখিত ক্লান্তিকর পরিশোধনের ব্যাপারটি ছাড়া। অতএব, আরবেরা যদি আনন্দ অনুভব করে, সন্তান বা মা-বাবার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতায় যদি অন্যায়ের ধারণা জন্মে তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে এগুলো 'আরব' হওয়ার মতোই নিরলংকার, খাঁটি ও দুষ্পরিবর্তনীয় ঘটনার প্রভাবাধীন।

এ-জাতীয় পরিস্থিতির আদিমতা বিরাজ করে অন্তত দুটো স্তরে : এক সংজ্ঞায়, যা সংকোচক, দুই (লরেন্স ও বেলের মতে) বাস্তবতায়। এই পূর্ণ সাদৃশ্য কোনো

সাদামাটা ব্যাপার নয়। কারণ, প্রথমত বিষয়ের ঠিক কেন্দ্রে পৌছার জন্য এবং দুর্ঘটনা, পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতাজনিত বিচ্যুতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে সজ্জিত জ্ঞানতাত্ত্বিক কৌশল ও শব্দসম্ভারের সাহায্যে কেবল বাইরে থেকেই তা করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সাদৃশ্য হলো একটি ঘটনা, যা পদ্ধতি, ঐতিহ্য ও রাজনীতির ঐক্যবদ্ধ তৎপরতার ফল। প্রত্যেকটিই এক অর্থে বিভিন্ন ছাঁচ যেমন : প্রাচ্যজন ও সেমেটিক, আরব ও প্রাচ্য ইত্যাদির পার্থক্য এবং নিত্য বাস্তবতার বিলোপ ঘটায়, যা ইয়েটসের ভাষায় 'পাশব মেঝেয় নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য রহস্য, মানুষের বাস এর মধ্যেই। অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত যখন কোনো প্রাচ্যজনের মুখোমুখি হবেন তখন তিনি এই প্রাচ্যজনের ক্ষেত্রে তার জ্ঞানজগতের প্রাচ্যজন ছাঁচের জন্য নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলোই গ্রহণ করবেন। বহু বছরের ঐতিহ্য প্রাচ্যজন বা সেমেটিক জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক আবেগের ডিসকোর্সের ওপর লেপে দিয়েছে বৈধতার প্রলেপ এবং রাজনৈতিক বোধ শিখিয়েছে–বেলের চমৎকার কথায়–প্রাচ্যে সব পরস্পর লগ্ন হয়ে থাকে। প্রাচ্য হলো প্রাচ্য–একটি ধারণা; প্রাচ্য সম্পর্কে যেই লিখুক বা ভাবুক তাকে ফিরে যেতে হবে ওই ধারণায়। এ 'ধারণা' যেন সময় ও অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে টিকে থাকা কষ্টিপাথর।

একে বোঝার ভালো উপায় প্রাচ্য প্রসঙ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা কর্তৃক এর ব্যবহার পর্যবেক্ষণ। লরেন্স ও বেলের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো আরব ও প্রাচ্যজন সম্পর্কে তাদের মন্তব্য একটি স্পষ্ট ও কর্তৃত্বপরায়ণ প্রথার অন্তর্গত যে প্রথা আবার এ সম্পর্কিত অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এসব 'আরব, সেমেটিক, প্রাচ্যজন/প্রাচ্যদেশীয়' ধারণাগুলো এসেছে কোত্থেকে?

আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি প্রাচ্যের সবকিছু সম্পর্কে পূর্ব-অনুমিত প্রতিনিধিত্বের ধারণা থেকে উনিশ শতকে কীভাবে রেনান, লেইন, ফ্লবেয়ার, কজিন ডি পার্সিভাল, মার্ক্স ও ল্যামারটিনের লেখায় প্রাচ্যবিষয়ক সাধারণীকরণের প্রক্রিয়া শক্তি গ্রহণ করে; প্রাচ্যের প্রতিটি কণা তার প্রাচ্যত্ব ঘোষণা করে–এত প্রবলভাবে যে প্রাচ্যদেশীয় হওয়ার বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো ক্ষতিপূরণমূলক দৃষ্টান্তকেও গ্রাহ্য করে না। প্রাচ্যের একজন মানুষ প্রথমে প্রাচ্যজন, তারপর মানুষ। এ ধরনের ছাঁচ নির্মাণ স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞান (আমি বলব ডিসকোর্স) দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে, যা অতীত ও অধোমুখী পথ গ্রহণ করেছিল প্রজাতি বর্গীকরণের দিকে। প্রজাতির বর্গ প্রজাতির প্রতিটি সদস্যের বংশগতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও প্রদান করে। এভাবে 'প্রাচ্য' জাতীয় বিস্তৃত, জনপ্রিয় আখ্যার পেছনে বৈজ্ঞানিকভাবে বৈধ কিছু বৈশিষ্ট্যেও সৃষ্টি করা হয়; এগুলো প্রধানত ভাষার ধরন– সেমেটিক, দ্রাবিড়, হেমেটিক। কিন্তু এগুলো তাদের সমর্থনে অতিদ্রুত অর্জন করে নেয় নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, জীববিদ্যাগত ও সাংস্কৃতিক সাক্ষ্য। যেমন রেনানে ব্যবহৃত 'সেমেটিক' পরিভাষাটি ছিল ভাষাতাত্ত্বিক সাধারণীকরণের ব্যাপার। রেনানের মাধ্যমেই এটি শারীরতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস

এমনকি ভূবিজ্ঞানেও অর্জন করে নেয় সমান্তরাল ধারণা। অতঃপর সেমেটিক কেবল বর্ণনা বা আখ্যা হিসেবে নয়, যেকোনো ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা কেটেছেঁটে তার পূর্বগামী ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কেন্দ্রের মধ্যে স্থাপন করার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই সেমেটিক হলো কোনো 'সেমেটিক' সত্তার ভিত্তিতে প্রতিটি স্বতন্ত্র সেমেটিক আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য এবং কিছু সাধারণ 'সেমেটিক' উপাদানের আলোকে মানব জীবনের সব দিক ও তৎপরতা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কালোত্তীর্ণ ও ব্যক্তি-অতিরেক একটি বর্গ।

উনিশ শতকের উদারতাবাদী সংস্কৃতিতে এ ধরনের শাস্তিমূলক মতাদর্শ আঁকড়ে থাকার বিষয়টি রহস্যময় মনে হবে যদি না আমরা স্মরণ করি যে উনিশ শতকে ভাষাবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের যে আবেদন সৃষ্টি হয় তার বক্তব্য ছিল যে এগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান– কোনোভাবেই ভবিষ্যদ্বাণীপ্রবণ বা ভাবাদর্শিক জ্ঞানচর্চা নয়। বপ-এর 'ইন্দো-ইউরোপীয়'-এর মতোই রেনানের 'সেমেটিক' গঠিত জিনিস। বৈজ্ঞানিকভাবে বোধগম্য এবং বাস্তবে বিশ্লেষণযোগ্য নির্দিষ্ট সেমেটিক ভাষার উপাত্তের বদৌলতে 'সেমেটিক' যৌক্তিক ও অনিবার্য বলে বিবেচিত হয়। এভাবে প্রত্নবর্গীয় ও আদিম ভাষিক (সাথে সাথে সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক) বর্গ সৃষ্টির উদ্যোগের মধ্য দিয়ে 'প্রাথমিক মানবীয় সম্ভাবনা' সংজ্ঞায়নের চেষ্টা চলে।[৩৩] এ চেষ্টা থেকে উদ্ভূত হয়েছে আচরণের নির্দিষ্ট কিছু ধরন। তা সম্ভব হতো না যদি না ধ্রুপদ অভিজ্ঞতাবাদ অনুযায়ী বিশ্বাস করা হতো যে দেহ ও মন পরস্পর নির্ভরশীল বাস্তব এবং উভয়ই মূলে প্রদত্ত একগুচ্ছ ভৌগোলিক, জীববৈজ্ঞানিক ও আধা-ঐতিহাসিক অবস্থার বিন্যাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৩৪] স্থানীয় বাসিন্দারা এ বিন্যাসটি আবিষ্কার করতে পারে না বা অন্তর্দৃষ্টিতে ধরতে পারে না। এ বিন্যাস এড়িয়ে যাওয়া বা তা থেকে মুক্তি অর্জন দুরূহ। প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রাচীনতাধর্মী পক্ষপাতিত্ব ওই সব অভিজ্ঞতাবাদী ধারণার দ্বারা সমর্থিত। প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম বা জুরস্ত্রিয়ান অধ্যয়নে–জর্জ এলিয়টের ক্যাসোভনের স্বীকারোক্তির মতো–নিজেরাই অনুভব করেন 'যেন পৃথিবীতে এলোমেলো ছুটে বেড়ানো প্রাচীনকালের কোনো ভূত, ধ্বংস ও গোলমেলে পরিবর্তন সত্ত্বেও একে আবার তার অভ্যাসের পৃথিবীরূপে গড়ে নিতে চাচ্ছে।'[৩৫]

ভাষা, সভ্যতা ও পরিশেষে জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এসব অভিসন্দর্ভ যদি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতদের প্রাতিষ্ঠানিক বিতর্কের একটি ক্ষুদ্র অংশ হতো তাহলে আমরা তাকে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন নাটকের প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ বলে বাতিল করে দিতে পারতাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বিতর্ক এবং বিতর্কের পরিস্থিতিগুলোর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া; যেমন মন্তব্য করেছেন লিওনিল ট্রিলিং : 'উনিশ শতকের শেষ দিকের সংস্কৃতিতে' ক্রমশ সঞ্চারিত জাতীয়তাবাদ ও

উপনিবেশবাদের অনুপ্রেরণায় এবং বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণ ও গোলমেলে সমন্বয়ের সমর্থনে এসব জাতিবিষয়ক তত্ত্ব বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে যেতে সমর্থ হয়।[৩৬]

জাতিবিষয়ক তত্ত্ব, আদিম উৎপত্তি ও আদি শ্রেণিবিভাজন, আধুনিককালের পতন, সভ্যতার অগ্রগতি, সাদাদের (আর্যদের) নিয়তি, উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা–এই সবকিছুই বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও রাজনীতির অদ্ভুত সমন্বয়, যার স্রোত প্রায় ব্যতিক্রম ছাড়াই ইউরোপ বা ইউরোপের কোনো কোনো জাতিকে মানবজাতির অ-ইউরোপীয় অংশের ওপর আধিপত্যশীল অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে। সচরাচর মনে করা হয় ডারউইনের নিজের অনুমোদন সাপেক্ষে ডারউইনবাদের এক অদ্ভুত রূপান্তরিত মতবাদ অনুযায়ী এমন সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে যে, 'প্রাচ্যজন' আসলে প্রাচীন এক মহৎ জাতির অবশেষ; প্রাচ্যের বর্তমান অবক্ষয় থেকে ওখানকার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। কিন্তু তা সম্ভব হয় কেবল দুটো কারণে : ক. শ্বেতাঙ্গ বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পুনর্গঠন-প্রক্রিয়া চালানো এবং খ. দ্রুত ছড়িয়ে পড়া সাধারণীকৃত একগুচ্ছ পরিভাষা (সেমেটিক-আর্য, প্রাচ্যজন/প্রাচ্যদেশীয়) কল্পনানির্ভর কিছু কাহিনিকে নির্দেশ না করে বরং নির্দেশ করে একরাশ সুবিন্যস্ত বৈশিষ্ট্যকে, যেগুলো উদ্দেশ্যমুখী ও ঐকমত্যভিত্তিক বলে মনে হয়।

প্রাচ্যজনেরা কী করতে পারে এবং কী না পারে এমন মন্তব্যের পেছনে সমর্থন জোগায় জীববিজ্ঞানের সত্য : যেমন পি. চার্লস মিশেলের এ বায়োলজিক্যাল ভিউ অব আওয়ার ফরেইন পলিসি (১৮৯৪), থমাস হেনরি হাক্সলির স্ট্রাগল ফর এক্সিসটেন্স ইন হিউম্যান সোসাইটি (১৮৮৮), বেনজামিন কিডের সোশ্যাল ইভল্যুশন (১৮৯৪), জন বি ক্রোজিয়ারের হিস্টরি অব ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অন দ্য লাইনস অব মডার্ন ইভল্যুশন (১৮৯৭-১৯০১) এবং চার্লস হারভির দ্য বায়োলজি অব ব্রিটিশ পলিটিকস (১৯০৪)[৩৭] প্রভৃতি গ্রন্থের বক্তব্য। এ সময় ধরে নেওয়া হয় যে ভাষাবিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুযায়ী যদি ভাষাসমূহ পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে থাকে তাহলে ভাষা ব্যবহারকারীরা–তাদের মন, সংস্কৃতি, সম্ভাবনা এমনকি দেহেও পরস্পর থেকে একইভাবে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের পেছনে আছে তত্ত্ববিদ্যাগত ও অভিজ্ঞতাবাদী সত্যের জোর এবং তার সাথে উৎপত্তি, বিকাশ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ক্রমপরিণতি-বিষয়ক অধ্যয়নে ওই সত্যের বিশ্বাসযোগ্য প্রদর্শন।

এখানে লক্ষ্যযোগ্য বক্তব্য এই যে জাতি, সভ্যতা ও ভাষার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতার সত্য মৌলিক এবং অমোচনীয় (অথবা তেমন বলে ভান করা হয়)। তা বস্তুর নির্যাস পর্যন্ত পৌঁছে যায়; এমন দাবিও করা হয় যে উৎস এবং উৎসের দ্বারা নির্ধারিত ছাঁচ থেকে মুক্তি অসম্ভব; এটি মানবীয় সত্তাসমূহের মধ্যে নির্মাণ করে

আসল সীমানাপ্রাচীর, যার ভিত্তিতে গঠিত হয় নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, জাতি ও সভ্যতা; এটি আনন্দ-বেদনা, রাজনৈতিক সংগঠন ইত্যাদি সাধারণ যৌথ মানবিক বাস্তবতা থেকে দৃষ্টিকে সরে যেতে বাধ্য করে, যা টেনে নিয়ে যায় অতীত ও অধোমুখী পরিবর্তনীয় উদ্ভবের দিকে। একজন বিজ্ঞানী তার গবেষণায় কখনো উৎপত্তির প্রসঙ্গটি এড়াতে পারেন না। তেমনি কোনো প্রাচ্যজন 'সেমেটিক' বা 'আরব' বা 'ইন্ডিয়ান' থেকে মুক্তি পান না। এ থেকে তার বিনষ্টকৃত, উপনিবেশিত ও পশ্চাদপদ বর্তমানকে সরিয়ে রাখা হয়; তা কেবল শ্বেতাঙ্গ গবেষকদের শিক্ষণীয় উপস্থাপনের কাজে লাগে।

বিশেষায়িত গবেষণা পেশা হিসেবে অতুলনীয় সুযোগ এনে দেয়। আমরা স্মরণ করতে পারি লেইন প্রাচ্যদেশীয় রূপ ধারণ করতে পারতেন, আবার নিজের পণ্ডিতি বিচ্ছিন্নতাও বজায় রাখতে পারতেন। তার অধীত প্রাচ্যজন পরিণত হয় তার প্রাচ্যজনে। কারণ, তিনি তাদের কেবল বাস্তব মানুষ হিসেবে দেখেননি, তার বর্ণনায় (প্রাচ্যজনের) স্মারক স্তম্ভ হিসেবেও দেখেছেন। এই দ্বৈত পরিপ্রেক্ষিত এক রকম কাঠামোবদ্ধ শ্লেষ উৎসাহিত করে। একদিকে একদল মানুষ বর্তমান জীবনযাপন করে; অন্যদিকে, গবেষণার বিষয় হিসেবে এরাই পরিণত হয় 'মিসরীয়' বা 'মুসলমান' বা 'প্রাচ্যজন'-এ। দুই স্তরের মধ্যবর্তী ত্রুটি শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেবল পণ্ডিতদের। প্রথমোক্তটির ঝোঁক বৃহত্তর বৈচিত্র্যের দিকে, তবু সেই বৈচিত্র্যকে সর্বদাই পেছনে অধোমুখে টেনে রাখা হয় ও সংকুচিত করা হয় সর্বজনীনভাবে মৌল ভিত্তির ওপর। প্রতিটি স্থানিক, আধুনিক আচরণ এক একটি নির্গমন পরিণত হয়, যা প্রেরিত হয় মূল টার্মিনালে; ওখানে তা আরও জোরালো হয়। এই ধরনের প্রেরণাই হলো প্রাচ্যতত্ত্বের বিষয়।

মিসরীয়দের বর্তমান সত্তারূপে, আবার একটি বর্গীয় লেবেলের বৈধতারূপে বিচারের ক্ষেত্রে লেইনের সক্ষমতা তৈরি হয় প্রাচ্যবাদী জ্ঞানক্ষেত্র এবং সেমেটীয় বা নিকটপ্রাচ্যের মুসলমান সম্পর্কে সর্বজনীন মতামত–উভয়ের মিলিত ক্রিয়ায়। প্রাচ্যদেশীয় সেমেটিকদের যেভাবে যুগপৎ বর্তমান ও উৎপত্তিরূপে দেখা সম্ভব হয় আর কোনো জাতিতে তা সম্ভব নয়।

প্রাচ্যবিষয়ক অধ্যয়নের বিষয়রূপে ইহুদি ও মুসলমান তাদের আদি উৎপত্তির আলোকে সহজেই বোধগম্য। এ সিদ্ধান্ত ছিল (কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো) আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের মূল স্তম্ভ। রেনান সেমেটিকদের বৃত্তাবদ্ধ বিকাশের দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করেছেন। কার্যক্ষেত্রে প্রাচ্যতাত্ত্বিকের নিকট রেনানের মন্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় যে, কোনো আধুনিক সেমেটিক মানুষ নিজেকে যতই আধুনিক মনে করুক, সে কখনো তার উৎপত্তির ঘনিষ্ঠ সাংগঠনিক দাবি অস্বীকার করতে পারে না। কার্যকর নীতি স্থান ও কাল পরিসরে একত্রে সক্রিয় থাকে। কোনো সেমেটিক প্রাচীন যুগের উন্নয়ন থেকে আর অগ্রসর হতে পারেনি। কোনো সেমেটিক তার তাঁবু ও উপজাতীয়

পরিচয়ের যাযাবর, মরু পরিবেশ ত্যাগ করতে পারে না। সেমেটিক জীবনের যেকোনো প্রকাশকেই আদিম ব্যাখ্যামূলক বর্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে নির্দেশ করা যেতে পারে এবং তাই করা উচিত।

নির্দেশনার এমন কার্যকর ক্ষমতা প্রবল হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে, যার সাহায্যে প্রকৃত আচরণের প্রতিটি স্বতন্ত্র উদাহরণকেই অল্পসংখ্যক ব্যাখ্যামূলক 'প্রকৃত' বর্গে সংকুচিত ও প্রত্যাবর্তিত করা যায়। প্রাচ্যতত্ত্বের এ বিষয়টি জনপ্রশাসনে আমলাতন্ত্রের মতো। ফাইলের চেয়ে অধিদপ্তর বড় এবং ব্যক্তি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে কেবল ফাইলের উপলক্ষে। আমরা প্রাচ্যতাত্ত্বিককে একজন কেরানিরূপে কল্পনা করতে পারি, যার কাজ 'সেমেটিক' লিখিত বিরাট এক আলমারিতে বহু ধরনের বিপুলসংখ্যক ফাইল একত্রে সাজিয়ে রাখা।

উইলিয়াম রবার্টসন স্মিথের মতো পণ্ডিত মানুষ তুলনামূলক ও আদিম নৃতত্ত্বের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের সহায়তায় নিকটপ্রাচ্যের অধিবাসীদের এক দলভুক্ত করেন এবং তাদের গোত্রবদ্ধতা ও বিয়ের প্রথাচারকে ধর্মচর্চারূপে বিবেচনা করে গ্রন্থ রচনা করেন। স্মিথের রচনার ক্ষমতা নিহিত সেমেটিকদের পুরাণ থেকে মুক্ত করার মধ্যে। ইসলাম ও ইহুদিবাদ কর্তৃক পৃথিবীর সামনে স্থাপিত বাধা দূরে ছুড়ে ফেলা হয়; সব আরব বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সমাজপদ্ধতি বিকাশের প্রকল্পিত চিত্র গঠনের জন্য স্মিথ ব্যবহার করেন সেমেটিক ভাষাতত্ত্ব, পুরাণ ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্য। যদি এই চিত্রে টোটেমবাদ বা প্রাণীপূজায় একেশ্বরবাদের পূর্ববর্তী অথচ প্রভাবশালী শেকড় আবিষ্কার করা যায় তাহলেই পণ্ডিতেরা সফল এবং স্মিথ যোগ করেন, আমাদের মোহামেডান উৎসসমূহ প্রাচীন বর্বরতার অনুপুঙ্খের ওপর যতটা সম্ভব ঘোমটা টেনে দেওয়া সত্ত্বেও।[৩৮]

সেমেটিকদের ওপর স্মিথের কাজ ঈশ্বরতত্ত্ব, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করে এবং তা করা হয় পূর্ববর্তী প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের রচনাসমূহকে বিবেচনায় রেখেই। (রেনানের ইস্তওয়র দ্য পিপল দ্য ইসরাইল-এর ওপর ১৮৮৭ সালে রচিত স্মিথের তীব্র আক্রমণ দেখুন) এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এ কাজটির উদ্দেশ্য আধুনিক সেমেটিকদের বুঝতে সহায়তা করা। আমি মনে করি শ্বেতাঙ্গ বিশেষজ্ঞদের প্রাচ্যের সাথে যুক্ত করেছে যে বুদ্ধিবৃত্তিক পরম্পরা, স্মিথ তার গুরুত্বপূর্ণ সংযোজক। স্মিথ তার গ্রন্থাদি না লিখলে লরেন্স, হোগার্থ, বেল ও অন্যদের পক্ষে প্রাচ্য সম্পর্কে কোষাগারে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান বিতরণ সম্ভব হতো না। এমনকি আরবের ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ ও অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রাচীন নিদর্শনাদির বিশেষজ্ঞ স্মিথও তার পণ্ডিতি কর্তৃত্বের অর্ধেকই অর্জন করতে পারতেন না। আদি নমুনাসমূহ উপলব্ধি এবং সমকালীন প্রাচ্যদেশীয় আচরণ নিয়ে অভিজ্ঞতাবাদীদের খেলার পেছনের সাধারণ সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা–এ দুই জিনিসের সমন্বয় স্মিথের রচনাকে ওজনদার করেছে।

এই বিশেষ সমন্বয়ই বিশেষজ্ঞতার সেই রীতি আভাসিত করে, যার ওপর ভিত্তি করে খ্যাতি অর্জন করেন লরেন্স, বেল ও ফিলবি।

পূর্বসূরি বার্টন ও চার্লস ডাফটির মতো স্মিথও ১৮৮০-১৮৮১ সালের মধ্যে হেজাজে গমন করেন। প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের জন্য আরব ছিল সুবিধাজনক দেশ। মুসলমানরা ইসলামকে প্রতিভার আসল ক্ষেত্র মনে করত বলে নয় কেবল, এ জন্যও যে হেজাজ ভৌগোলিকভাবে যেমন তেমনি ঐতিহাসিকভাবেও বন্ধ্যা ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এসব কারণে আরব হয়ে ওঠে এমন এক মরু এলাকা যার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে মানুষ একই রীতিতে (ও একই বিষয়ে) মন্তব্য করতে পারত। হেজাজে যে কেউ মুসলিম, আধুনিক ইসলাম ও প্রাচীন ইসলামের মধ্যে পার্থক্য না করেই কথা বলতে পারত। সেমেটিক অধ্যয়নের সূত্রে ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন ওই শব্দ ভান্ডারে বাড়তি পাণ্ডিত্যের ছাপ রাখতে সমর্থ হন স্মিথ। তার মন্তব্যে আমরা উপলব্ধি করি ইসলাম, আরববাসী ও আরবদের বিষয়ে পূর্ববর্তী সব পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত এক পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গি :

> মোহামেডানিজমের প্রকৃতি হলো সব জাতীয় উপলব্ধিতে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ–এত প্রবলভাবে যে মুসলিম দেশসমূহের শাসনব্যবস্থা ও সমাজ যেন পুরোপুরি ধর্মীয় পোশাকে সজ্জিত। তবে যা কিছু ধর্মীয় রূপ গ্রহণ করে বৈধতা অর্জন করেছে তার সবকিছুর পেছনেই যে খাঁটি ধর্মীয় আবেগ আছে এমন ধরে নেওয়া ভুল হবে। আরবদের সংস্কারের শেকড় তাদের রক্ষণশীলতায়; রক্ষণশীলতা তাদের ইসলামি বিশ্বাসের চেয়েও গভীরভাবে প্রোথিত। নবী তার ধর্ম প্রথম প্রচার করেন যে জাতির মধ্যে তাদের সংস্কারের নিকট এ ধর্ম সহজেই বাধা পড়ে। তা এ ধর্মের বড় দুর্বলতা। এ ধর্ম তো সব বর্বর ও সেকেলে ধারণাকে স্থান দিয়েছে; মোহাম্মদ (সা.) নিজেও দেখেছেন যে ধর্ম হিসেবে ওগুলো একেবারেই অযোগ্য। তবু সংস্কারকৃত মতবাদ প্রচারের জন্য ওগুলোকেই তার নীতিমালায় নিয়ে এসেছেন। এ সত্ত্বেও আমাদের নিকট খাঁটি মোহামেডান বলে মনে হয় এমন অনেক সংস্কারের কোনো ভিত্তি কোরআনে নেই।[৩৯]

এই বিস্ময়কর যুক্তিবিন্যাসের শেষ বাক্যে 'আমাদের' শব্দটি শ্বেতাঙ্গ মানুষের সুবিধাজনক দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট করে তোলে। এ যুক্তিই আমাদের প্রথম বাক্যে বলার অনুমোদন দেয় যে আরবের সব রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন ধর্মীয় পোশাক-আবৃত (অতএব, ইসলামকে নিয়ন্ত্রণবাদী ধর্মরূপে চিত্রিত করা যায়)।

দ্বিতীয় বাক্য বলে যে ইসলাম মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি ছদ্মবেশ মাত্র (অন্য কথায় মুসলমানরা অনিবার্যভাবে ভণ্ড)। তৃতীয় বাক্যে দাবি করা হয় আরব বিশ্বাসে জায়গা করে নেওয়া সত্ত্বেও এ ধর্ম প্রাক-ইসলামি আরব রক্ষণশীলতা দূর করতে পারেনি। আর ইসলাম যদি ধর্ম হিসেবে সফল হয়ে থাকে তবে সে অসহায়ভাবে

আরব সংস্কারসমূহকে জায়গা করে দেওয়ার কারণে। এ ধরনের কৌশলের জন্য (এখন দেখা যাবে এ কৌশল ইসলামের পক্ষে প্রযুক্ত হয়) দায়ী করা উচিত নির্দয় ভণ্ড মোহাম্মদকে (সা.)। তবে এসব কিছুই কমবেশি ধুয়েমুছে যায়, যখন স্মিথ আমাদের আশ্বস্ত করেন যে তিনি এতক্ষণ যা বলেছেন তা বাতিল, কারণ ইসলামের অত্যন্ত অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো আদৌ মোহাম্মদীয় নয়।

খানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে আত্মপরিচয় ঘোষণা ও সংঘাত এড়ানোর নীতিতে প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা আবদ্ধ থাকেননি। কেবল প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞতাই তাদের মাড়িয়ে যেতে পারে, যার ভিত্তি হলো প্রাচ্যতাত্ত্বিকের দার্শনিক ও ভাষিক উপলব্ধির সম্পূর্ণ আওতাধীন অকাট্য ও তথাকথিত সত্য ধারণসমূহ। 'ফাঁকা, বাস্তব এবং...আরব মনের প্রকাশ্য অধার্মিক অভ্যাস' সংগঠিত ভণ্ডতারূপে ইসলাম, আচারসর্বস্বতা ও ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিকে পদ্ধতিতে পরিণত করা মুসলিম নিবেদনের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরও অসম্ভাব্যতা ইত্যাদি নিয়ে স্মিথ কথা বলতে পারেন সামান্যতম ইতস্ততা ছাড়াই। ইসলামের ওপর তার আক্রমণ আপেক্ষিকতার সাথে সম্পর্কিত নয়। কারণ, তার কাছে ইউরোপীয় ও খ্রিষ্টীয় শ্রেষ্ঠত্ব কল্পিত নয়, বাস্তব। আসলে জগৎ সম্পর্কে স্মিথের দৃষ্টি তলে তলে যুগ্মতায় ভরপুর, যার প্রমাণ মেলে এ রকম উদ্ধৃতিতে :

> আরব পর্যটকেরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের পরিভ্রমণ তার নিকট বিরক্তি মাত্র; এতে তার কোনো আনন্দ হয় না (যদিও আমাদের হয়), ক্ষুধা বা ক্লান্তিতে ওরা সর্বশক্তি দিয়ে ঘ্যান ঘ্যান শুরু করে (যদিও আমরা করি না)। আপনি কখনো কোনো প্রাচ্যদেশীয়কে বোঝাতে পারবেন না যে উটের পিঠ থেকে নেমেই একটা কার্পেট বিছিয়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে ধূমপান ও পান করতে করতে বিশ্রাম নেওয়ার পূর্বে আপনার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। তা ছাড়া আরবেরা সুন্দর দৃশ্যাবলি দেখে কদাচিৎ মুগ্ধ হয়, (যদিও আমরা হই)।[৪০]

'আমরা এই রকম, ওরা ওই রকম, কোনটি আরব কোনটি মুসলিম কখন, কীভাবে, কী দিয়ে যাচাইকৃত'–এসব প্রশ্ন হেজাজে স্মিথের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সেমেটিক ও প্রাচ্যদেশীয় সম্পর্কে যে যাই জানতে বা শিখতে পারে তাই সাথে সাথে সত্যের মর্যাদা লাভ করে কেবল আর্কাইভেই নয়, সরাসরি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রেও।

এমন দমনমূলক কাঠামোর দ্বারা গাঢ় গাত্রবর্ণের আধুনিক মানুষেরা চিরতরে শিকলে বাঁধা পড়ে আছে–তাদের ভাষিক, নৃতাত্ত্বিক ও মতবাদকেন্দ্রিক প্রত্নপুরুষ সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতের রচিত সর্বজনীন সত্যের সাথে। এ কাঠামো থেকেই উদ্ভব হয়েছে বিশ শতকের ইংল্যান্ড ও ইউরোপের প্রতিভাবান প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের রচনারাজি। এসব প্রাচ্যতাত্ত্বিক আবার ওই কাঠামোতে যুক্ত করেন ব্যক্তিগত পুরাণ ও অবদমন। ডাফটি

ও লরেন্সের মতো লেখকের মধ্যে তা উল্লেখযোগ্য শ্রমসাপেক্ষে পরীক্ষিত হয়েছে। উইলফ্রেল ব্লান্ট, ডাফটি, লরেন্স, বেল, হোগার্থ, ফিলবি, সাইকস, স্টরস–প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন প্রাচ্যদেশীয় বিষয়াদির ব্যাপারে তার দৃষ্টি প্রাচ্য, ইসলাম বা আরবের সাথে বিশেষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্রে প্রাপ্ত–তার নিজের সৃষ্টি। প্রাচ্য সম্পর্কে গৃহীত অফিশিয়াল জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন এদের প্রত্যেকে। 'সূর্য আমাকে আরব বানিয়েছে', অ্যারাবিয়া ডেজার্টায় লিখেন ডাফটি, 'কিন্তু কখনো প্রাচ্যতত্ত্বে নিমজ্জিত করেনি'। এ সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে (ব্লান্ট ব্যতীত) এদের সবাই পশ্চিমা ঐতিহ্যে প্রচলিত প্রাচ্য-বিরোধিতা ও প্রাচ্য-ভীতির অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। প্রাচ্যের সাধারণীকরণের বিরাট ভান্ডার, বিজ্ঞানমনস্কতা তাদের মতামতে দিয়েছে সূক্ষ্মতা ও আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক রীতির ব্যক্তিক স্পর্শ। এটি হ্রাস করার সূত্র নেই, পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই। (ডাফটি যে পৃষ্ঠায় প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতি ঘৃণা দেখিয়েছেন, ঠিক সে পৃষ্ঠাতেই তিনি আবার লিখেছেন :

> সেমেটিকদের চোখ পর্যন্ত আলখাল্লাওয়ালা মানুষের মতো, যার ভ্রূ স্পর্শ করে আছে বেহেশত।[৪১]) এ রকম সাধারণীকরণের ভিত্তিতে ওরা কাজ করে, জননীতি বিষয়ে পরামর্শ দেয়, প্রতিজ্ঞা করে এবং উল্লেখযোগ্য এক শ্লেষের মধ্য দিয়ে ওরা তাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে শ্বেতাঙ্গ প্রাচ্যতাত্ত্বিকের পরিচয় লাভ করে। এমনকি ডাফটি, লরেন্স, হোগার্থ ও বেলের মতো পেশাগতভাবে প্রাচ্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও (যেমন স্মিথ) আগাগোড়া প্রাচ্যকে অবজ্ঞা করতে তাদের সমস্যা হয় না। কারণ প্রাচ্য ও ইসলামকে সাদা মানুষের নিয়ন্ত্রণে রাখাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

এ প্রকল্প থেকে নতুন যুক্তিতর্কের উদ্ভব হয়। এখন প্রাচ্যতাত্ত্বিককে কেবল 'উপলব্ধি' করতে পারলেই চলবে না : প্রাচ্যকে ভূমিকা পালনে বাধ্য করতে হবে, প্রাচ্যের শক্তিকে দেখাতে হবে 'আমাদের' মূল্যবোধ, সভ্যতা, স্বার্থ লক্ষ্যের অনুকূলে। প্রাচ্যকে তাই সরাসরি কর্মে রূপান্তরিত করা হয়। এর ফলে নতুন চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি হয় খোদ প্রাচ্যে। কিন্তু পরিবর্তে এর জন্য প্রয়োজন হয় শ্বেতাঙ্গ মানুষের নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা এবং এখন শুধু প্রাচ্য বিষয়ে পণ্ডিতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্বেতাঙ্গ মানুষ নয়, জরুরি বাস্তবতারূপে সমকালীন ইতিহাসের নির্মাতা (যেহেতু বিশেষজ্ঞ এ বাস্তবতার সূচনা করেছেন, তাই বিশেষজ্ঞের পক্ষেই এ বাস্তবতাকে যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব)। প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা এখন পরিণত হন প্রাচ্যের ইতিহাসের ব্যক্তিত্বে, এর থেকে আলাদাভাবে শনাক্ত করারও অযোগ্য; তিনি হয়ে ওঠেন এই ইতিহাসের রূপদানকারী, পশ্চিমের কাছে এর স্বভাবগত চিহ্ন। এই নতুন দর্শনের সারাৎসার পাওয়া যাবে এখানে :

> কিছুসংখ্যক ইংরেজ–যার প্রধান কির্চনার, বিশ্বাস করতেন তুর্কিদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ ইংল্যান্ডের জন্য জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে জার্মানির মিত্র তুরস্ককে পরাজিত করতে সহায়ক হবে। আরবিভাষী জনগোষ্ঠীর

> প্রকৃতি, ক্ষমতা ও ওদের দেশ সম্পর্কে জ্ঞান তাদের এ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে যে এ-জাতীয় বিদ্রোহের পরিণাম সুখকর হবে। বিদ্রোহের চরিত্র ও পদ্ধতি নির্দেশ করেন তারা। অতএব, প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা লাভ করায় ওই ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিদ্রোহ ঘটতে হয়। এ সত্ত্বেও মক্কার শেরিফের বিদ্রোহ অনেকের নিকট ছিল বিস্ময়কর এবং মিত্রদের জন্য অপ্রস্তুতকর। এ বিদ্রোহ মিশ্র অনুভূতি এবং বন্ধু ও শত্রুর জন্ম দেয়, যাদের ঈর্ষাজাত দ্বন্দ্বের কারণে তার ফলাফল উল্টে যেতে শুরু করে।[৪২]

উদ্ধৃতিটি সেভেন পিলারস অব উইসডমের প্রথম পরিচ্ছেদে লরেন্সের নিজের বিশ্লেষণ। কিছু সংখ্যক 'ইংরেজ ভদ্রলোকের' জ্ঞান প্রাচ্যে একটি আন্দোলনের অনুমোদন দেয়, যার ফল হয় মিশ্র ধরনের। এই নতুন, পুনর্জাগ্রত প্রাচ্যের গূঢ়, আধা কাল্পনিক, ব্যঙ্গাত্মক-বিয়োগাত্মক পরিণতিই হয়ে ওঠে একধরনের বিশেষজ্ঞ রচনার বিষয়–নতুন রীতির প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্স। এ ডিসকোর্স উপস্থাপন করে এমন এক প্রাচ্যের ছবি, যা কোনো আখ্যান নয়, গুরুতর জটিলতা সংকট, আহত প্রত্যাশার সমাহার; এর ভবিষ্যদ্বাণী-সুলভ, স্পষ্ট বিবরণ হলেন শ্বেতাঙ্গ প্রাচ্যতাত্ত্বিক গ্রন্থকারেরা।

আমরা লেইনের মডার্ন ইজিপশিয়ানেই দৃষ্টির নিকট বয়নের পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছি। এমনকি সেভেন পিলারসের ন্যায় কাহিনিসদৃশ রচনার ক্ষেত্রেও এ পরাজয় সত্য। প্রাচ্যসম্পর্কিত দৃষ্টি (বর্ণনা, চিত্রাত্মক রেকর্ড) ও প্রাচ্যের ঘটনাবলির বয়নের এ দ্বন্দ্ব আসলে অনেকগুলো বিষয়কে কেন্দ্র করে বহুস্তরে বিস্তৃত এক সংঘাত। এ সংঘাত সময় সময় প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্সে নতুনভাবে জেগে উঠেছে বলে এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থিত করা যেতে পারে। প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রাচ্যকে দেখেন ওপর থেকে–তার সামনে সংস্কৃতি, ধর্ম, মন, ইতিহাস ও সমাজ নিয়ে ফুটে ওঠা পূর্ণ দৃশ্যটি আয়ত্তে পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এ জন্য তাকে একগুচ্ছ রূপান্তর-হ্রাসকরণমুখী বর্গ বা ধরনের (যেমন: সেমেটিক, মুসলিম মন, প্রাচ্য এবং এসব) মধ্য দিয়ে প্রতিটি অনুপুঙ্খ দেখতে হয়। যেহেতু এসব ধরন প্রাথমিকভাবে ছকভুক্ত ও কার্যকর এবং যেহেতু মোটামুটি এখন ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রাচ্যদেশীয় কোনো ব্যক্তিই নিজেকে তেমন করে চিনতে পারে না যেভাবে প্রাচ্যতাত্ত্বিক তাকে জানতে পারে। তাই প্রাচ্যকে দেখার যেকোনো দৃষ্টিই শেষ পর্যন্ত আসঞ্জন-ক্ষমতা ও শক্তির জন্য নির্ভর করে সেই ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ডিসকোর্সের ওপর, প্রাচ্য যার সম্পদ। যেকোনো সর্বাত্মক দৃষ্টি মৌলিকভাবে রক্ষণশীল; আমরা দেখেছি পশ্চিমে নিকটপ্রাচ্যসম্পর্কিত ধারণা ও ভাবাদর্শের ইতিহাসে কীভাবে তাদের বিরুদ্ধবাদী সমালোচনার প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েও প্রচলিত (প্রকৃতপক্ষে, আমরা বলতে পারি যে, এসব ধারণা তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য নিজেরাই সাক্ষ্য সৃষ্টি করে)।

প্রাচ্যতাত্ত্বিক মূলত এ সর্বাত্মক দৃষ্টির প্রতিনিধি। একজন ব্যক্তি কীভাবে নিজের ধারণাকে তার অধীনস্থ মনে করে কিংবা নিজের দেখাকে প্রাচ্য বা প্রাচ্য জাতি নামে যৌথভাবে পরিচিত প্রপঞ্চ সম্পর্কে 'বৈজ্ঞানিক' মতামতের জরুরি অংশবিশেষ বলে ধরে নেয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন লেইন। অতএব, দৃষ্টি স্থির ব্যাপার, ঠিক যেমন উনিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্বে তথ্য জোগানদার বৈজ্ঞানিক শ্রেণিসমূহ স্থির : 'সেমীয়' বা 'প্রাচ্যদেশীয়' মনের বাইরে আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই; এগুলো প্রাচ্যসম্পর্কিত সামগ্রিক মতামতের মধ্যে প্রাচ্যদেশীয় আচরণের প্রতিটি শ্রেণি বা বৈচিত্র্য ধারণ করার চূড়ান্ত পরিসর। অধ্যয়নের বিষয় বা পেশা কিংবা বিশেষায়িত ভাষা বা ডিসকোর্স হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ব পুরো প্রাচ্যের স্থায়িত্বের ওপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। কারণ প্রাচ্য ছাড়া 'প্রাচ্যতত্ত্ব' নামের সংগতিপূর্ণ, বোধগম্য ও স্পষ্ট জ্ঞানও থাকবে না। এভাবে প্রাচ্য হলো প্রাচ্যতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার, যেমন ধরে নেওয়া হয় প্রাচ্যসম্পর্কিত তথ্য রয়েছে প্রাচ্যতত্ত্বে।

এই 'যুগপৎ অনিবার্যতা'[৪৩]–যাকে বলেছি 'দৃষ্টি' যেহেতু তা আগাম কল্পনা করে নেয় যে প্রাচ্যকে পূর্ণ দৃশ্যরূপে দেখা সম্ভব–তার বিপরীতে নিয়ত চাপ থাকে। আখ্যান এ চাপের উৎস, এ অর্থে যে, যদি প্রাচ্যের কোনো বস্তু বা বিষয় বিকশিত বা স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে দেখানো সম্ভব হয় তাহলে প্রক্রিয়াটিতে সময়োত্তীর্ণতা যুক্ত হয়ে যায়। যা ছিল স্থিতিশীল–স্থিতিশীলতা ও অপরিবর্তনীয় চিরন্তনতারই নামান্তর প্রাচ্য–তা হয়ে ওঠে অস্থিতিশীল। এই অস্থিতিশীলতা নির্দেশ করে তার বিপর্যয়কর অনুপুঙ্খ, পরিবর্তনের প্রবাহ, বিস্তার, ক্ষয় বা নাটকীয় আন্দোলনমুখী প্রবণতা নিয়ে প্রাচ্যে ও প্রাচ্য সম্পর্কে ইতিহাস সম্ভব। ইতিহাস এবং ইতিহাসের প্রতিনিধি বয়ান যুক্তি দেখায় যে কেবল দৃষ্টিই (বা কল্পিত চিত্রাত্মক বর্ণনাই) যথেষ্ট নয় এবং নিঃশর্ত তাত্ত্বিক বর্গরূপে 'প্রাচ্য' বাস্তবতা পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রতি অবিচার করেছে।

তা ছাড়া দৃষ্টির স্থায়িত্বের বিরুদ্ধে লিখিত-ইতিহাসের গৃহীত কৌশল হলো বয়ান। লেইন যখন তার ও তার তথ্য বিষয়ে রৈখিক অবস্থান গ্রহণ না করে তথ্যকোষ বা আভিধানিক রীতিতে দেখার প্রক্রিয়ার ভিন্ন প্রতিমূর্তি নির্মাণ করার মতো রীতি গ্রহণ করেন তখনই হয়তো তিনি বয়নের বিপজ্জনক দিকটি অনুভব করেছিলেন। বয়নের নিশ্চিত ঘোষণা করে মানুষের জন্মগ্রহণ বিকাশ ও মৃত্যুর ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠান ও বাস্তবের পরিবর্তিত হওয়ার ঝোঁক, আধুনিকতা ও সমকালীনতা কর্তৃক 'ধ্রুপদ' সভ্যতা পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা; সবচেয়ে বড় কথা তা ঘোষণা করে যে বাস্তবতার ওপর দৃষ্টির আধিপত্য আসলে ক্ষমতার ইচ্ছা, সত্যের ইচ্ছা ও তার ভাষা ছাড়া কিছু নয় এবং কোনোভাবে ইতিহাসের উদ্দেশ্যমুখী শর্ত নয়। এক কথায় দৃষ্টির একক তরঙ্গমালার মধ্যে বয়ন প্রস্তাব করে একটি বিরোধাত্মক মনোভঙ্গি, পরিপ্রেক্ষিত ও চেতনা; তা দৃষ্টির দাবিকৃত অ্যাপোলীয় কল্পকাহিনির শান্তি বিঘ্নিত করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণামে যখন প্রাচ্য প্রবেশ করে ইতিহাসে তখন তা ঘটায় প্রতিনিধিরূপী প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরাই। হান্নাহ আরেন্দত চমৎকারভাবে লক্ষ্য করেছেন যে আমলাতন্ত্রের বিরোধী অংশটি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি।[৪৪] এর অর্থ হলো এ কথা বলা যে প্রাচ্যতত্ত্ব নামে যৌথ প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা যদি প্রাচ্যের নির্দিষ্ট কিছু রক্ষণশীল দৃষ্টির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে ওই সব দৃষ্টি অনুগত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি, যেমন টি ই লরেন্স। তার রচনায় আখ্যান ও দর্শনের সংঘাত সবচেয়ে পরিষ্কাররূপে দেখতে পাই আমরা; তার ভাষায়, 'নব সাম্রাজ্যবাদ (প্রাচ্যের) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর কিছু দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার' সক্রিয় চেষ্টা চালায়।[৪৫] ইউরোপীয় শক্তির সংঘাত তাদের বাধ্য করে প্রাচ্যকে সক্রিয় প্রাণময়তার দিকে ঠেলে দিতে, প্রাচ্যকে তাদের কাজে লাগাতে, প্রাচ্যকে অপরিবর্তনীয় 'নিষ্ক্রিয়তা' থেকে লড়াকু আধুনিক জীবনের দিকে পরিবর্তিত করতে। তবে যা-ই ঘটুক, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল প্রাচ্যকে তার নিজের মতো চলতে না দেওয়া বা হাতছাড়া না করা। কারণ প্রথাগত ধারণা ছিল যে প্রাচ্যের স্বাধীনতার ঐতিহ্য নেই।

লরেন্সের রচনার বড় নাটকীয়তা হলো কিছু সংগ্রামী প্রয়াসের প্রতীকায়ন। প্রথমত, (প্রাণহীন, সময়বিহীন, চলৎশক্তিহীন) প্রাচ্যকে চলতে উদ্বুদ্ধ করার সংগ্রাম, দ্বিতীয়ত সেই চলনের ওপর অনিবার্যভাবে পশ্চিমা রীতি আরোপণ; তৃতীয়ত নতুন ও উত্থিত প্রাচ্যকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে ধারণ করার চেষ্টা, যার অতীতমুখী প্রবণতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যর্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রবল বোধ।

> আমি একটি নতুন জাতি সৃষ্টির কথা বলেছি, হারানো প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং বিশ মিলিয়ন সেমেটিক মানুষকে এমন এক ভিত্তি প্রদান করার, যার ওপর তারা নির্মাণ করবে তাদের জাতীয় চিন্তার প্রাণিত স্বপ্নপুরী।...সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সব প্রদেশ মিলে আমার কাছে একটি মৃত ইংলিশ বালকের সমানও নয়। আমি যদি প্রাচ্যে কিছু আত্মশ্রদ্ধাবোধ, একটি লক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে থাকি : লাল গাত্রবর্ণের মানুষের ওপর অনিবার্য করে থাকি সাদাদের শাসন, সে ক্ষেত্রে আমি ওই সব মানুষের নতুন কমনওয়েলথে এমন অবস্থানে স্থাপিতও করেছি যাতে আধিপত্যকারী জাতিগুলো তাদের রূঢ় অর্জনের কথা ভুলে যাবে এবং সাদা ও লাল ও হলুদ ও বাদামি ও কালো পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে পৃথিবীর সেবায় এক কাতারে দাঁড়াবে।[৪৬]

এগুলো ইচ্ছা, প্রকৃত কর্মভার কিংবা ব্যর্থ প্রকল্প যাই হোক না কেন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শুরুর পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া খুঁটিনাটি স্তরে এসব সম্ভব হতো না :

> মেট্রোপল ব্রাইটনে বসবাসরত কৃপণ, এডোনিসের পূজক, দামেস্কের গর্ভবাসী ওই সব বিশ্বাসঘাতক ইহুদি সেমেটিকদের ভোগ ক্ষমতার সাদৃশ্যময় প্রতীক এবং

> সেই স্নায়বিক অনুভূতির যা অন্য মেরুতে আমাদের দেয় আত্ম-অস্বীকৃতিবোধ বা প্রথম যুগের খ্রিষ্টানদের মতে, কিংবা দরিদ্রদের জন্য সর্বোত্তম বেহেশতের পথ করে নেওয়া প্রথম খলিফাদের মতো। সেমেটিক মানুষেরা কামনা ও আত্ম-অস্বীকৃতির মাঝখানে ঝুলে থাকে।

গোটা উনিশ শতক থেকে বিচ্ছুরিত বাতিঘরের আলোর রশ্মির মতো মান্য এক ঐতিহ্য লরেন্সের ওই জাতীয় মন্তব্যকে সমর্থন করেছে; অবশ্যই তার আলোক-উৎসারণ কেন্দ্রে রয়েছে 'প্রাচ্য' এবং তা তার আওতাভুক্ত সামগ্রিক ও সূক্ষ্ম ভূভাগ আলোকিত করার জন্য যথেষ্ট। এডোনিসের পূজক ও দামেস্কের বিশ্বাসঘাতক ইহুদিরা মানবতার প্রতীক নয়–বলা যায় বরং ভাষাতত্ত্বের এক শাখা সেমেটিকের প্রতীক, যা প্রাচ্যতত্ত্বের সেমেটিক শাখা কর্তৃক একীভূতরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রটির অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপার সম্ভব :

> আরবরা একটি আদর্শে রশির মতো করে ঝুলতে পারে। মনের প্রতিজ্ঞাহীন বশ্যতা ওদের অনুগত চাকরে পরিণত করেছে। দায়দায়িত্ব ও জড়িত থাকার শর্তসমেত যতক্ষণ সাফল্য দেখা না দেয় ততক্ষণ ওরা সে বন্ধন ছিন্ন করে না। তখন আদর্শ উধাও, কাজ শেষ হয় ধ্বংসস্তূপে। ধর্মবিশ্বাস ছাড়া এদের জগতের সম্পাদরাজি ও আনন্দ আয়োজন দেখিয়ে পৃথিবীর চার কোনায় নিয়ে যাওয়া যাবে (তবে বেহেশতে নয়); কিন্তু যদি রাস্তায় নামে...তাহলে দেখা পেয়ে যায় কোনো ভাবাদর্শবাহী নবীর, যার মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে নির্ভর করে দান-খয়রাত বা পাখির দয়ার ওপর। অতঃপর তারা সেই নবীর প্রেরণার জন্য তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে।...এরা পানির মতো অস্থিতিশীল, হয়তো চূড়ান্ত পর্যায়ে পানির মতোই থেকে যায়। প্রাণের সূচনা থেকেই এরা বিভিন্ন ক্রমাগত তরঙ্গপ্রবাহে মাংসের তীরভূমির বিপরীতে ঠেলাঠেলি করেছে। প্রতিটি তরঙ্গ ভেঙেছে... এমন একটি তরঙ্গ আমি উত্থিত করেছি এবং একটি ভাবাদর্শের দম নেওয়ার পূর্বে গড়িয়ে দিয়েছি তা তার সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছে এবং ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়ে গেছে দামেস্কের ওপর। সেই তরঙ্গের অবশেষ যা পেছনে ছিটকে এসেছে সংশ্লিষ্ট বস্তু বিষয়াদির প্রতিরোধের মুখে তা-ই পরবর্তী তরঙ্গের উপাদান জোগাবে যখন সময়ের পূর্ণতায় আরেকবার ফুলে উঠবে সমুদ্র।

'পারে, হয় ও যদি' হলো এই ক্ষেত্রতে নিজেকে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য লরেন্সের কৌশল। এভাবে শেষের বাক্যটির সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং সে বাক্যে আরবদের প্রভাবক হিসেবে তাদের মাথায় চড়ে বসেন লরেন্স। কনরাডের কুৎজের মতো লরেন্স পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন চলমান নতুন বাস্তবতায় নিজেকে জড়ানোর জন্য; পরবর্তীকালে তিনি বলেন যে তাকে যে জন্য দায়ী করা যায় তা হলো 'নতুন এশিয়াকে ঠেলেঠুলে আকার দেওয়া...যাকে কাল জোরপূর্বক আমাদের ওপর ন্যস্ত করেছে।'[৪৭]

আরব বিদ্রোহ সেই অর্থই পেয়েছে তার জন্য যে অর্থ সাজিয়েছেন লরেন্স। তার অর্থ এশিয়ার নিকট ব্যক্ত হয়েছে বিজয়রূপে। বিস্তৃতির একটি ধনরূপে, যার মধ্যে আমরা অনুভব করি যে আমরা অনুমান করে নিচ্ছি অন্য কারও ব্যথা বা অভিজ্ঞতা তার ব্যক্তিত্ব।

প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা এখন হয়ে উঠেছেন প্রাচ্যের প্রতিনিধি। আগের যুগের অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক লেইনের মতো নয়, যার জন্য প্রাচ্য ছিল সতর্কতার সাথে দূরে সরিয়ে রাখা কিছু। কিন্তু লরেন্সে সাদা ও প্রাচ্যজনের মধ্যে একটি সমাধান অযোগ্য সংঘাত ছিল। যদিও তিনি স্পষ্ট করে বলেননি এই দ্বন্দ্ব তার মনে অনিবার্যভাবে জাগিয়ে দিয়েছে পুব ও পশ্চিমের ঐতিহাসিক সংঘাতের প্রসঙ্গ। প্রাচ্যের ওপর তার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা, তার দ্বৈততা সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রাচ্যের অন্য কিছু সম্পর্কে তার অসচেতনাবোধ থেকে তিনি বুঝতে পারেন ইতিহাস ইতিহাসই এবং এমনকি তাকে ছাড়াও আরবরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। এই উপলব্ধি থেকেই লরেন্স বিদ্রোহের (তার ক্ষণস্থায়ী সাফল্য ও তিক্ত ব্যর্থতার) গোটা বয়ানকে অনিঃশেষ গৃহযুদ্ধরূপে দেখার জন্য নিজেকে নিজস্ব দৃষ্টিতে সংকুচিত করেন :

> এ সত্ত্বেও বাস্তবে আমাদের নিজেদের দোহাই দিয়ে অথবা অন্তত আমাদের স্বার্থের অনুকূল বলে কথিত হওয়ায় আমরা সেই বদল বহন করেছি : এই জ্ঞান থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়বোধ ও উদ্দেশ্যে নতুন বিশ্বাসের ভান। এই আচরণের পেঁচানো গলি-রাস্তা, পূর্ববর্তী ঘটনাকে বাতিল করে বা দ্বিগুণ করে এমন অজানা, লজ্জিত উদ্দেশ্যের বৃত্তের ভেতর বৃত্তে আমরা যারা নেতা, তাদের সোজা হাঁটার উপায় নেই মনে হয়।[৬৮]

পরাজয়ের এই তীক্ষ্ণ বোধের মধ্যে লরেন্স পরে এক 'বুড়ো মানুষের' গল্প যোগ করেন, যে তার বিজয় চুরি করে নিয়ে গেছে। যেকোনো উপলক্ষেই লরেন্সের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এই যে একজন শ্বেতাঙ্গ বিশেষজ্ঞ এবং বহু বছর ধরে প্রাচ্যসম্পর্কিত জনপ্রিয় ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের সুফল ভোক্তা হিসেবে তিনি নিজে ওদের একজন হয়ে ওঠার কায়দা আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন অর্থাৎ 'নতুন এশিয়ার' একটি আন্দোলনকে রূপদানকারী প্রাচ্যদেশীয় নবীর ভূমিকা গ্রহণ করার কায়দা এবং যে কারণেই হোক, যখন আন্দোলন ব্যর্থ হয় (অন্যরা তা দখল করে, তার উদ্দেশ্য বানচাল হয় এবং এর স্বাধীনতার স্বপ্ন মূল্যহীন হয়ে যায়) তখন লরেন্সের হতাশা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। সন্দেহজনক ঘটনাপ্রবাহের বেগবান স্রোতে একজন মানুষমাত্র রূপে হারিয়ে যাওয়ার বদলে লরেন্স নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তুলনা করেন এশিয়ার আগত নতুন সংগ্রামের সাথে। এস্কিলাস যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত, শোকরত এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং নেরভাল হতাশা ব্যক্ত করেছেন, কারণ তিনি যেমন আশা করেছিলেন প্রাচ্য তেমন জাঁকজমকপূর্ণ নয়,

তখন লরেন্স একই সাথে শোকের মহাদেশ ও মহাজাগতিক মোহমুক্তির আত্মমুখী সচেতনতায় পরিণত হন। পরিশেষে লরেন্সের দৃষ্টি রূপান্তরিত হয় প্রাচ্যের সংকটের প্রতীকে : সংক্ষেপে, লরেন্স প্রাচ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন পাঠক ও ইতিহাসের মাঝখানে তার জানা অভিজ্ঞতারাজি ছড়িয়ে দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে লরেন্স পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন অনালোচিত বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা। স্বল্পকালের জন্য নিজেই প্রাচ্য হয়ে ওঠার ক্ষমতা। আরব বিদ্রোহ সম্পর্কে সাধারণ্যে গৃহীত ঘটনাবলি শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যের পক্ষে লরেন্সের অভিজ্ঞতারূপেই সংকুচিত হয়ে থাকে।

অতএব এ রকম ক্ষেত্রে রীতি কেবল এশিয়া, প্রাচ্য বা আরব জাতীয় সাধারণ বর্গ প্রতীকায়নের ক্ষমতাই নয়; স্থানচ্যুতকরণ ও অধিগ্রহণের একটি ধরনও, যার মধ্য দিয়ে একটিমাত্র ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সমগ্র ইতিহাসরূপে দেখা দেয় এবং লেখক-পাঠক নির্বিশেষে সব পশ্চিমা মানুষের জন্য প্রাচ্যের এমন একমাত্র রূপে পরিণত হয়, যার সম্পর্কে জানা সম্ভব। রেনান যেমন সেমেটিকদের সামনে উন্মুক্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেছিলেন, লরেন্স তেমনি তালিকাভুক্ত (ও পুনর্বণ্টন) করেন আধুনিক এশিয়ার সময় ও পরিসরকে।

এ রীতির প্রভাব এই যে এটি এশিয়াকে পশ্চিমের লোভনীয় রকম নৈকট্যকে নিয়ে আসে, কিন্তু কেবল সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। শেষে আমরা আবার পতিত হই এমন এক করুণ দূরত্বে, যা এখনো 'আমাদের' প্রাচ্য থেকে আলাদা করে রাখে; পশ্চিমের প্রতি স্থায়ী অদ্ভুতত্বের চিহ্ন হিসেবে ভিনদেশি ছাপ বহনই সে প্রাচ্যের নিয়তি। ই এম ফরস্টারের উপন্যাস এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার শেষ অংশ এই হতাশাব্যঞ্জক পরিসমাপ্তিই (সমকালীন পটভূমিতে) তীব্র, যেখানে আজিজ ও ফিল্ডিং চেষ্টা করে পুনরায় মিলিত হতে ব্যর্থ হয় :

> 'আমরা এখন বন্ধু হতে পারি না কেন?' তাকে আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরে বলে অন্যজন। 'আমি তা-ই চাই। তুমিও তা-ই চাও।' কিন্তু ঘোড়াগুলো তা চায় না–ওরা পিছলে আলাদা হয়ে যায়; মাটি তা চায় না বলে পাথরের চাঁই পাঠিয়ে দিয়ে রাস্তায় একজনের পেছনে আরেকজনকে চলতে বাধ্য করে; মন্দির, পুকুর, কারাগার, প্রাসাদ, পাখি, কাক, মেহমানখানা, নিচে মাও–যা তাদের নজরে আসে : এরা সবাই তা চায় না, ওরা তাদের শত কণ্ঠস্বরে বলে, 'না! এখনো নয়!' এবং আকাশ বলে, 'না! এখানে নয়!'[৪৮]

প্রাচ্য সব সময় এ রীতি, এই নিবিড় বর্ণনার মুখোমুখি হব।

নেতিবাচক দিক সত্ত্বেও এর পেছনে একটি রাজনৈতিক বক্তব্য আছে। পশ্চিম ও পূর্বের পার্থক্যের উপসাগর দূর করা সম্ভব পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও ক্ষমতার দ্বারা, ক্রোমার ও বেলফোর তা ভালো করেই জানতেন। লরেন্সের দৃষ্টির প্রশংসা করা হয়েছে ফ্রান্সে মরিস ব্যারেসের ১৯১৪ সালে নিকটপ্রাচ্যভ্রমণের বিবরণে (পৃষ্ঠা-২৪৪,

প্যারা ৩)। আরও বহু রচনার মতো এনকুয়েতও সারসংক্ষেপকরণ জাতীয় রচনা: গ্রন্থকার পুবে পশ্চিমা সংস্কৃতির উৎস ও উৎপত্তিই অনুসন্ধান করেননি কেবল–প্রাচ্যে নেরভাল, ফ্লবেয়ার ও ল্যামারটিনের পুনরাবৃত্তিও করেছেন।

তার ভ্রমণের একটি অতিরিক্ত রাজনৈতিক মাত্রা ছিল ব্যারেসের কাছে : তিনি প্রাচ্য ফরাসি শাসনের গঠনমূলক ভূমিকার প্রমাণ ও সিদ্ধান্তধর্মী সাক্ষ্য খোঁজেন। তবু ব্রিটিশ ও ফরাসি বিশেষজ্ঞতার পার্থক্য থেকেই যায়। প্রথমোক্ত বিশেষজ্ঞ জ্ঞান জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলের প্রকৃত সংযোগ ব্যবস্থাপনার কাজ করে, দ্বিতীয়োক্তটি আত্মিক সম্ভাবনার জগৎ নিয়ে ব্যাপৃত। মরিসের মতে, ফরাসি স্কুলগুলোতেই ফ্রান্সের উপস্থিতি সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে চোখে পড়ে। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার এক ফরাসি স্কুলের প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রাচ্যদেশীয় ছোট ছোট বালিকারা স্বাগত জানাচ্ছে এবং (তাদের কথ্য ফরাসিতে) চমৎকারভাবে কথাকাহিনি ও সংগীত পুনরাবৃত্ত করছে–এ দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর।' যদি প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যে কোনো ফরাসি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত নাও হয়ে থাকে, তবু সে সম্পূর্ণ দখলহীন নয় :

> ওখানে প্রাচ্যে, ফ্রান্সের প্রতি ধর্মীয় বোধসুলভ এমন এক প্রবল অনুভূতি আছে, যা আমাদের সবচেয়ে বিপরীতধর্মী আকাঙ্ক্ষালোকেও অবধারণ ও সমন্বিত করতে সক্ষম। প্রাচ্যে আমরা আত্মিক শক্তির বোধ, ন্যায়বিচার ও আদর্শের নমুনার প্রতিনিধিত্ব করি। ইংল্যান্ড ওখানে শক্তিশালী, জার্মানি কেবলই ক্ষমতা; কিন্তু আমরা দখল করেছি প্রাচ্যের আত্মাকে।

জোরেসের সাথে বিতর্কে এশিয়াকে তার নিজের অসুস্থতার বিপরীতে রোগ প্রতিরোধক প্রদান, প্রাচ্যদেশীয়দের পাশ্চাত্যজনের অনুরূপ করা এবং ফ্রান্সের স্বাস্থ্যকর ঘনিষ্ঠতা আনার প্রস্তাব করেন এই প্রখ্যাত ইউরোপীয় ডক্টর। তবু এ প্রকল্পেও ব্যারেসের দৃষ্টি পুব ও পশ্চিমের পার্থক্য ধরেই রাখে, যা দূর করার পক্ষপাতী বলে দাবি করেন তিনি :

> আমরা কীভাবে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক এলিট সৃষ্টি করতে পারব, যাদের সাথে কাজ করা যাবে, প্রাচ্যজনদের থেকে উদ্ভূত হয়েও যারা জাতিবিচ্ছিন্ন হবে না, যারা তাদের নিজেদের আচার-প্রথানুযায়ীই বিকশিত হবে, তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যে প্রভাবিত হবে এবং এভাবে আমাদের বিপুলসংখ্যক স্থানীয়দের মধ্যবর্তী সংযোগে পরিণত হবে? (প্রাচ্যে) আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য সন্তোষজনক হবে এমন মতৈক্য ও চুক্তিতে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কীভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলব? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সাথে সম্পর্ক রাখার সঠিক রুচি অর্জনের জন্য শেষ পর্যন্ত এগুলোই প্রয়োজন।[৫০]

শেষ বাক্যে প্রদত্ত জোর ব্যারেসের নিজের। লরেন্স ও হোগার্থের মতো না করে (হোগার্থের গ্রন্থ দ্য ওয়ান্ডারিং স্কলার ১৮৯৬ ও ১৯১০[৫১] সালে লেভান্তে দুটো ভ্রমণের

কেবল তথ্যজ্ঞাপক, কাঠখাট্টো নথি)। তিনি দূরবর্তী সম্ভাবনার এক জগৎ সম্পর্কে লিখেন। প্রাচ্য যে নিজের পথে চলতে শুরু করবে সে পরিস্থিতির জন্য তিনি মানসিকভাবে অনেক বেশি প্রস্তুত। তবু তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে রকম বন্ধন পরিকল্পনা করেন তাতে সব সময় পশ্চিম থেকে পুবগামী বিচিত্র বুদ্ধিবৃত্তিক চাপ প্রেরণের অনুমোদনও থাকে। ব্যারেস বিষয়টিকে যেমন সূক্ষ্ম তেমন দুর্মর বুদ্ধিবৃত্তিক সাম্রাজ্যবাদের চর্চা বিবেচনা করেন, আন্দোলনের তরঙ্গ, যুদ্ধ বা আত্মিক শক্তির অভিযান হিসেবে দেখেন না। লরেন্সের ব্রিটিশ-সম্পর্কিত দৃষ্টি প্রাচ্যের মূল স্রোত শ্বেতাঙ্গ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত জনগোষ্ঠী, রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের প্রবাহকে ধারণ করে; প্রাচ্য 'আমাদের' প্রাচ্য, 'আমাদের' লোক, 'আমাদের' উপনিবেশ। এলিট ও সাধারণের মধ্যে ব্রিটিশরা তেমন পার্থক্য করার পক্ষপাতী নয়, যতটা চায় ফরাসিরা। সংখ্যালঘু এবং ফ্রান্স ও তার ঔপনিবেশিক সন্তানদের সমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের দুষ্ট চাপের ওপর পরিকল্পিত ফরাসিদের উপলব্ধি ও নীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে লরেন্স, বেল, ফিলবি, স্টরস হোগার্থ প্রমুখ ব্রিটিশ প্রতিনিধি-প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ অভিযানকারী বিকেন্দ্রিক (উনিশ শতকে লেইন, বার্টন ও হেস্টার স্ট্যানহোপ কর্তৃক সৃষ্ট) এবং উপনিবেশক শাসক–এই উভয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, যার স্থান হলো কেন্দ্রে স্থানীয় শাসকের ঠিক পরেই : হাশেমীয় গোত্রের সাথে লরেন্স, সউদ পরিবারের সাথে ফিলবি দুটো সেরা দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ব্রিটিশ প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞতা নিজেকে পুষ্ট করে মত সমন্বয়, রক্ষণশীলতা এবং সার্বভৌম কর্তৃত্বের ধারণায়; দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ফরাসি বিশেষজ্ঞতা বহুমত, আত্মিক সম্পর্ক ও বহির্মুখী প্রবণতার সাথে জড়িত। তাই এটি কোনো দুর্ঘটনা নয় যে সে যুগের দুই প্রধান পণ্ডিত–একজন ব্রিটিশ, একজন ফরাসি–ছিলেন এইচ আর গিব ও লুইস ম্যাসিগনন; একজন আগ্রহী ইসলামের সুন্নাহ (বা রক্ষণশীলতায়), অন্যজন প্রায় যিশুখ্রিষ্টের মতো, ঈশ্বরতাত্ত্বিক সুফি ব্যক্তিত্ব মনসুর হাল্লাজ। আমি খানিক পর এই দুই গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্যতাত্ত্বিকের প্রসঙ্গে ফিরে আসব।

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের ওপর যদি আমি অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করে থাকি তবে তা প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞানের সাথে মিথস্ক্রিয়া, প্রাচ্যতত্ত্বে প্রাতিষ্ঠানিক থেকে প্রায়োগিক মনোভঙ্গির দিকে পালাবদল ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়ার জন্যই। এই পালাবদলের সাথে পরিবর্তন আসে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ব্যক্তিক মনোভাবেও; এখন ওরা নিজেদের লেইন, সেসি, রেনান, কজিন, মুলার ও অন্যদের মতো নিজস্ব আচার-ঐতিহ্যবিশিষ্ট কোনো সংঘ জাতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বশীল মানুষ, যিনি তার রচনায় নিবিড়ভাবে বুনে দেন গুরুত্বপূর্ণ একধরনের দ্বৈততা; তার রচনা সেই দ্বৈততার প্রতীকী অভিব্যক্তি :

পাশ্চাত্য সচেতনতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান দখল করে প্রাচ্যের দূরবর্তী প্রান্ত, তেমনি প্রাচ্যের সবচেয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ও। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাচ্যতাত্ত্বিক নিজেকে বিবেচনা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সংগঠকরূপে, তবে অবশ্যই পাশ্চাত্যের প্রকৌশলগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি পুনরায় ঘোষণা করেই। এ ধরনের মিলনে ইতিহাস নির্বাসিত না হলেও দুর্বল হয়ে পড়ে। উন্নয়নের প্রবাহ ও বয়নের চড়া হিসেবে কিংবা সময় ও পরিসরে ধীরে ধীরে উন্মোচিত গতিশীল এক শক্তি হিসেবে বিবেচিত প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের মানবীয় ইতিহাস প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভাজনের ভাবাদর্শিক ও অনিবার্য ধারণার বশীভূত হয়। যেহেতু প্রাচ্যতাত্ত্বিক নিজেকে পুব-পশ্চিম বিভাজকরেখার একেবারে মেরুদণ্ডে দণ্ডায়মান বলে মনে করেন, তিনি তাই ব্যাপক সাধারণ বর্গ সম্পর্কেই কথা বলেন না শুধু, তিনি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের জীবনের প্রতিটি দিককে এক বা অন্য ভৌগোলিক অঞ্চলের অনালোচিত চিহ্নে রূপান্তরের চেষ্টাও চালান।

প্রাচ্যতাত্ত্বিকের রচনায় তার বিশেষজ্ঞ সত্তা এবং পশ্চিমের সাময়িক প্রতিনিধিস্বরূপ প্রত্যক্ষণকারী সত্তার এই আদান-প্রদান আসন্ন হিসেবে চিত্রাত্মক পরিভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে (গিব কর্তৃক উদ্ধৃত) ডানকান ম্যাকডোনাল্ডের ধ্রুপদ রচনা দ্য রিলিজিয়াস অ্যাটিচুড অ্যান্ড লাইফ ইন ইসলাম গ্রন্থের একটি নমুনাধর্মী অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়া হলো :

> আরবরা নিজেদের এমনভাবে প্রদর্শন করে যে ওরা বিশ্বাসের ব্যাপারে খুব সহজ নয়, বরং নিজেদের কুসংস্কার ও ব্যবহার সম্পর্কে জটিল বুদ্ধিসম্পন্ন বস্তুবাদী; এ বিষয়ে তারা অবিরল প্রশ্ন করে, সন্দেহ করে ব্যঙ্গ করে; ওদের খুব প্রিয় ব্যাপার আদিদৈবিক বিষয়গুলো পরীক্ষা করে দেখা—কিন্তু সবই খেয়ালি মনে প্রায় ছেলেমি কায়দায়।[৫২]

এখানে পরিচালক ক্রিয়া হলো প্রদর্শন, এখানে তা আমাদের বুঝতে দেয় যে আরবরা বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণের প্রতি এবং তার জন্য নিজেদের (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) প্রদর্শন করে। ওদের ওপর আরোপিত গুণ—বৈশিষ্ট্যসমূহের ও এর বহুবিধ প্রয়োগের কারণে, আরবরা অস্তিত্বের দিক থেকে একরকম ওজনহীনতা লাভ করে; এভাবে 'আরবরা' সৃষ্টি হয় নৃতত্ত্বে বহুল প্রচলিত ব্যাপক সাধারণ আখ্যা 'ছেলেটির আদিমতা' ইত্যাদি প্রত্যাখ্যানের জন্য। ম্যাকডোনাল্ড এই ইঙ্গিতও করেন যে এ ধরনের বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাজনক অদ্ভুত অবস্থানটি দখল করে রেখেছে পশ্চিমা প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা, যাদের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ হলো তা-ই দেখানো যা দেখা দরকার। এভাবে সব নির্দিষ্ট ইতিহাস প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একত্র সর্বোচ্চ চূড়া বা সংবেদনশীল সীমান্তে প্রদর্শিত হতে পারে। মানব জীবনের জটিল গতিবিদ্যা, যাকে আমি বলছি বয়ানরূপী ইতিহাস—বৃত্তীয় কল্পদৃষ্টির তুলনায় অপ্রাসঙ্গিক কিংবা তুচ্ছ মনে হয়; এ দৃষ্টি

প্রাচ্যদেশীয় জীবনের খুঁটিনাটি বড়জোর পর্যবেক্ষিতদের প্রাচ্যদেশীয় পরিচয় এবং পর্যবেক্ষকের পাশ্চাত্য পরিচয় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে লাগতে পারে।

যদি এ ধরনের চিত্র কোনোভাবে স্মৃতিতে দান্তের প্রসঙ্গ নিয়ে আসে তাহলে আমরা দেখব দান্তের প্রাচ্য আর এই প্রাচ্যের মধ্যে কী বিশাল পার্থক্য! এখানে সাক্ষ্য বলতে বোঝায় (এবং হয়তো বিবেচিত হয়) বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য : এর উর্ধ্বতন বংশসূত্র। তা ছাড়া প্রাচ্য কোনো সহজ মার্বেল বা শত্রু বা অদ্ভুত বিষয়বস্তু-সম্পর্কিত শাখা নয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ এক মুহূর্তের রাজনৈতিক বাস্তবতা। লরেন্সের মতো ম্যাকডোনাল্ডও তার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র থেকে নিজেকে পণ্ডিতরূপে ঠিক আলাদা করতে পারেননি। অতএব, তার দেখা ইসলামের চিত্র, লরেন্সের দৃষ্টিতে আরবদের চিত্রের মতো, বর্ণনাকারীর পরিচয়সহ বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমা পণ্ডিতদের গড়ে তোলা প্রাচ্যদেশীয় আদর্শ কল্পচিত্রের মধ্যে জায়গা করে নিতে হবে সব আরব প্রাচ্যজনকে। তেমনি প্রাচ্যদেশীয় সব আরবকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটি নির্দিষ্ট সংস্পর্শের মধ্যে স্থান করে নিতে হবে। শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিত প্রাচ্যের সাথে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার ঘটনাক্রম হিসেবে প্রাচ্যের সারসত্তা উপলব্ধি করতে পারে। ফরস্টারের মতো লরেন্সের ক্ষেত্রেও এই দ্বিতীয়োক্ত সংবেদনশীলতা হতাশা ও ব্যক্তিগত ব্যর্থতা সৃষ্টি করে; কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের মতো পণ্ডিতের জন্য এটি জোরদার করে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্সকেই।

এবং এটি সেই ডিসকোর্সকে বিদেশ সংস্কৃতি, রাজনীতি ও বাস্তবতার জগতে জায়গা করে দেয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে পুব-পশ্চিমের সম্পর্ক এমন এক রূপলাভ করে, যা একই সাথে সর্বব্যাপী আবার উদ্বেগপূর্ণও; উদাহরণস্বরূপ আমরা মারলক্সের উপন্যাস থেকে তা সহজেই বিচার করে দেখতে পারি। সর্বত্র প্রাচ্যের স্বাধীনতার দাবির ইঙ্গিত; অবশ্যই ভেঙে যাওয়া অটোমান সাম্রাজ্যে তা মিত্রদের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছে; সমগ্র আরব বিদ্রোহ ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়; এলাকাটি সহসাই সমস্যাসংকুল হয়ে ওঠে। প্রাচ্যকে তখন মনে হয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার পথে : সামগ্রিকভাবে পশ্চিমের বিরুদ্ধে নয় শুধু পশ্চিমের প্রাণাবেগ, জ্ঞান ও ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধেও। প্রাচ্যে অবিরাম হস্তক্ষেপ (ও অধ্যয়নের) চমৎকার একটি শতাব্দী পার হওয়ার পর পুবে ঔপনিবেশিক শাসন নিজেই আধুনিকতার সংকটে যে প্রতিক্রিয়া করে তা উল্লেখযোগ্য রকম জটিল বলে মনে হয়। জবরদখলের ইস্যুটিও সরাসরি আলোচনায় আসে; এ ছাড়া ছিল ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত অঞ্চলের কথা, প্রাচ্য ইউরোপীয় শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্থানীয় এলিটদের সাথে সম্পর্ক, স্থানীয় গণ-আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য স্থানীয়দের দাবির প্রসঙ্গ; পুব ও পশ্চিমের সভ্যতাকেন্দ্রিক যোগাযোগের ব্যাপারটিও উঠে আসে। এসব প্রসঙ্গ জোরপূর্বক অনিবার্য করে তোলে প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের জ্ঞানের পুনর্বিবেচনা। ১৯২৮ থেকে

১৯৩৫ সাল পর্যন্ত প্যারিসের এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, কলেজ ডি ফ্রান্সের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক সিলভিয়ান লেভির মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব পুব-পশ্চিম সমস্যার ওপর লিখেন :

আমাদের দায়িত্ব প্রাচ্য সভ্যতাকে উপলব্ধি করা। বিদেশি সভ্যতাকে তার অতীত ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রূপসহ জানার জন্য সহানুভূতিশীল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রচেষ্টা চালানোর কাজটি বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের বিধায় তার সাথে যুক্ত মানবীয় সংকটও ওই স্তরেই বিদ্যমান, যা আমাদের ফরাসিদের বাস্তব সমস্যা হয়ে উঠেছে। [যদিও কোনো ইংরেজও একই রকম ভাবাবেগ পোষণ করতে পারেন: সমস্যাটি মূলত ইউরোপের] এশিয়ায় আমাদের বিশাল উপনিবেশগুলোর ব্যাপার।

ওই মানুষগুলো বহন করে এনেছে এক দীর্ঘ ইতিহাস, শিল্পকলা ও ধর্মের উত্তরাধিকার; ওদের মধ্য থেকে সেই বোধ এখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি এবং তা তারা দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখতেও আগ্রহী। আমরা কখনো তাদের সাথে আলোচনা ছাড়াই, কখনো বা তাদের অনুরোধে হস্তক্ষেপ করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছি।...ভুল বা সঠিকভাবে হোক আমরা উন্নততর সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করছি বলে দাবি করেছি এবং এই শ্রেষ্ঠত্বের গুণে পাওয়া অধিকারে–যে অধিকার আমরা আবার স্থানীয়দের সাথে তুলনা করে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি পুনঃ পুনঃ নিশ্চিত করে নিই–আমরা তাদের সকল স্থানীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছি।...

তাহলে সাধারণভাবে যখনই কোনো ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ করেছে তখনই স্থানীয় মানুষেরা সামগ্রিক হতাশায় নীত হয়েছে, যা আসলেই ছিল হতাশাব্যঞ্জক, যেহেতু তারা অনুভব করেছে বস্তুগত পরিমাপের তুলনায় নয়, নৈতিকভাবেই–ভালো-মন্দের হিসেবে প্রবৃদ্ধির বদলে তারা পিছিয়ে গেছে; তার সামাজিক জীবনের ভিত্তি গঠনকারী সব উপাদান এখন মনে হয় ভঙ্গুর এবং তার নিচে দুমড়েমুচড়ে পড়ে আছে। যে সোনার খুঁটির ওপর ভিত্তি করে সে তার জীবনকে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিল তা এখন মনে হয় রাঙ দিয়ে মোড়ানো কার্ডবোর্ডের জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়।

এই হতাশা রূপান্তরিত হয়েছে প্রাচ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তব্যাপী তিক্ততায়, এখন এ তিক্ততা ঘৃণায় পরিণত হওয়ার পথে এবং ঘৃণা কর্মে প্রকাশিত হওয়ার জন্য কেবল একটি সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে। আলস্য বা অনুধাবনের অভাব যে কারণেই হোক ইউরোপ যদি কেবল তার স্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমও না দেয়, তাহলে এশীয় নাটক তার সংকট-বিন্দুর দিকে অগ্রসর হবে।

এখানে জীবনের একটি ধরন ও নীতির হাতিয়াররূপী বিজ্ঞান–যেখানেই আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে সেখানেই–নিজ উদ্যোগে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে তাদের সভ্যতা ও জীবনে প্রবেশ করবে তাদের সমাজের মৌলিক মূল্যবোধ ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্যসমূহ আবিষ্কার করার জন্য, ইউরোপীয় সভ্যতাকেন্দ্রিক

> বিদেশি কিছু আমদানির হুমকি দিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন আরও মসৃণ করার চেষ্টা করবে। এ সভ্যতার সামনে আমাদের তুলে ধরতে হবে যেমন আমাদের বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্য বিকোনোর জন্য তুলে ধরি স্থানীয় বিনিময় বাজারে।[৫৩]

প্রাচ্যতত্ত্বকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করতে লেভির কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ প্রাচ্যে পশ্চিমের দীর্ঘকালীন হস্তক্ষেপ এবং জ্ঞানচর্চায় স্থানীয় দরিদ্র মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি অস্বীকার করা যাবে না। এ দুইকে যোগ করা যায় উদ্বিগ্ন ভবিষ্যতে। তার প্রকাশিত সব মানবিক বোধ, সহযাত্রী প্রাণীর জন্য তার সহানুভূতি সত্ত্বেও, লেভি বর্তমান চৌরাস্তার মোড়টিকে উপলব্ধি করেন অস্বস্তিকর বদ্ধ পরিভাষায়। তিনি কল্পনা করেন প্রাচ্যদেশীয়রা পৃথিবীর কোনো উন্নততর সভ্যতার হুমকির মুখে পড়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে। তবু তারা উদ্দেশ্যে ধাবমান–মুক্তির ইতিবাচক আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ওদের ভাষায় অর্জিত সাংস্কৃতিক সঞ্চয় এসব কোনো কিছুর দ্বারা নয়, বরং তিক্ততা বা ঈর্ষান্বিত ঘৃণার তাড়নায়। বিষয়গুলো এমন খারাপ দিকে মোড় নেওয়ার কারণ প্রদত্ত চিকিৎসা হলো এই যে, প্রাচ্যকে পশ্চিমের ভোক্তার জন্য বাজারজাত করতে হবে; তার সামনে রাখা হবে প্রাচ্যকে, তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে এমন আরও অসংখ্য জিনিসের একটি হিসেবে। একটি মাত্র স্ট্রোকে আপনি প্রাচ্যকে ছড়িয়ে দেবেন (একে নিজের সম্পর্কে এমন ভাবতে দিয়ে যে পশ্চিমের ভাবাদর্শের বাজারে প্রাচ্যও একটি 'সমপরিমাণ' আদর্শিক ধারণা মাত্র) এবং এভাবে আপনি শান্ত করে ফেলবেন প্রাচ্যদেশীয় জোয়ারের তরঙ্গের পশ্চিমা ভীতি। তার নিচে আছে অবশ্যই লেভি কর্তৃক স্পষ্ট স্বীকৃত মূল বক্তব্য : প্রাচ্যের ব্যাপারে কিছু একটা না করলে–'এশীয় নাটক তার সংকট-বিন্দুর দিকে অগ্রসর হবে।'

এশিয়া দুঃখ ভোগ করছে এবং এই দুঃখভোগের মধ্য দিয়েও হুমকি দিচ্ছে ইউরোপকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে টানা শত্রুভাবাপন্ন সীমানা, প্রায় প্রাচীনকাল থেকেই যা অপরিবর্তিত। প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে সবচেয়ে মহৎ লেভি যা বলেন তা স্বল্প-পরিশোধিত সাংস্কৃতিক মানবতাবাদী বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। ১৯২৫ সালে ফরাসি সাময়িকী লা কাইয়ে দ্য মা'আ গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালায়; লেখকদের মধ্যে প্রাচ্যতাত্ত্বিক (লেভি, এমিল সেনার্ট) ও আন্দ্রে জিঁদ, পল ভালেরি ও এডমন্ড জালোক্সের মতো সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক বিষয়ে সময়োপযোগী–যদি নাও বলি যে নির্লজ্জভাবে উসকানিমূলক–প্রশ্ন করা হয় এবং তা ওই সময়ের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেয়। আমরা দ্রুতই উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে প্রাচ্যতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যে সৃষ্ট এক জাতীয় ধারণাগুচ্ছ কীভাবে এরই মধ্যে গৃহীত সত্যে উন্নীত হয়। একটি

প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পর প্রবেশযোগ্য কি না (ধারণাটি ম্যাটারলিংকের): অন্য একটি প্রশ্ন ছিল প্রাচ্যের প্রভাব ফরাসি চিন্তার ক্ষেত্রে–আঁরি মাসির ভাষায়–কোনো ভয়ংকর বিপদ কি না; তৃতীয় প্রশ্নে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সেই সব মূল্যবোধ চিহ্নিত করতে বলা হয় যেগুলোকে প্রাচ্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ভালেরির বক্তব্য আমার কাছে মনে হয় উদ্ধৃতির যোগ্য, এত ঋজু ও সময়োপযোগী তার যুক্তিবিন্যাস, অন্তত বিশ শতকের শুরুর সময়টিতে :

> সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি না এখন আমাদের আর প্রাচ্যের প্রভাবকে খুব একটা ভয় পাওয়ার কারণ আছে। তা আমাদের কাছে অচেনা নয়। আমাদের শিল্পকলা ও জ্ঞানের এক বিরাট অংশ সূচনাপর্বের জন্য প্রাচ্যের নিকট ঋণী। প্রাচ্য থেকে এখন যা আসবে আমরা তাকে স্বাগত জানাতে পারি, যদি নতুন কিছু উদ্ভূত হয়–যদিও সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ সন্দেহ আমাদের নিশ্চয়তা এবং ইউরোপের হাতিয়ারও।
>
> অন্যদিকে এ ধরনের ব্যাপারে প্রকৃত প্রশ্নটি আসে আত্মীকরণ প্রসঙ্গে। কিন্তু এটিও যথার্থ অর্থে বহু যুগ ধরে ইউরোপীয় মননের বিশেষ ক্ষমতা। অতএব আমাদের কাজ হলো বৈশ্বিক উপলব্ধি ও সকল কিছু আমাদের উপাদানে রূপান্তরিত করে নেওয়ার ক্ষমতা বজায় রাখা–সেই ক্ষমতা যা আমাদের তাই বানিয়েছে আমরা এখন যা আছি। গ্রিক ও রোমানরা আমাদের দেখিয়েছে কীভাবে এশিয়ার দৈত্য-দানবের মোকাবিলা করতে হয়, কীভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের সাথে আচরণ করতে হয়, কীভাবে তাদের অপরিহার্য উপাদানগুলো শুষে নিয়ে আসতে হয়।...ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে আমার নিকট একটি বদ্ধ পাত্রের মতো মনে হয়, যেখানে বিশাল প্রাচ্যের সারবত্তা বিন্যস্ত হয়ে ঘনীভূত আকার ধারণ করেছে।[৫৪]

যদি ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রাচ্যকে আত্মীকৃত করে থাকে, তাহলে ভালেরি নিশ্চিত সচেতন ছিলেন যে, যে নির্দিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান এ দায়িত্ব পালন করেছে তা হলো প্রাচ্যতত্ত্ব। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে উইলসনিয়ান নীতির জগতে ভালেরি প্রাচ্যের হুমকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। 'পছন্দ করার ক্ষমতা' মূলত ইউরোপের জন্য, প্রথমত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রাচ্যকে মেনে নেওয়া, অতঃপর তাকে পেছনে ফেলে আসা উৎসরূপে বিবেচনা করা। একইভাবে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে বেলফোর ফিলিস্তিনের ভূমির ওপর স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার মেনে নিতে পারেন, কিন্তু সে ভূমি ধরে রাখার জন্য তাদের কর্তৃত্ব মানতে পারেন না। তিনি বলেন সাত লাখ আরবের তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষার সাথে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক আন্দোলনের গন্তব্য তুলনার যোগ্য নয়।[৫৫]

অতএব এশিয়া হঠাৎ উপস্থাপন করছে এক ধ্বংসের সম্ভাবনা, যা 'আমাদের' জগৎ ধ্বংস করে দিতে পারে যেমন, জন বুকান ১৯২২ সালে লিখেন :

পৃথিবী বিভিন্নমুখী শক্তি ও অসংগঠিত বুদ্ধিতে ফুটছে। আপনি কখনো চীনের ব্যাপারটি ভেবে দেখেছেন? ওখানে লাখ লাখ ত্বরিত মস্তিষ্ক লোক দেখানো মূল্যহীন কাজে হাঁসফাঁস করছে। তাদের কাছে নির্দেশনা, কোনো চালিকাশক্তি নেই, তাই তাদের প্রচেষ্টার ফলাফলও ব্যর্থতামাত্র এবং পৃথিবী চীনের দিকে তাকিয়ে হাসে।[৫৬]

কিন্তু চীন নিজেকে গুছিয়ে আনতে পারে (যা সে করবে): তা হলে তা আর হাসির ব্যাপার থাকবে না। তাই ইউরোপের চেষ্টা হয় ভালেরির ভাষায় 'ক্ষমতার মেশিনটি'[৫৭] চালু রাখা, ইউরোপের বাইরে থেকে তা যা টেনে আনতে পারে সেটুকু শোষণ করে নেওয়া, সবকিছুকে বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তার ব্যবহারে লাগানো, প্রাচ্যকে বাছাইকৃতভাবে সংগঠিত (বা অসংগঠিত) অবস্থায় রাখা। কেবল দৃষ্টি ও বিশ্লেষণের স্বচ্ছতার দ্বারা তা সম্ভব। প্রাচ্য যা তা যদি পরিষ্কার দেখা না যায় তাহলে আজ বা কাল এর সামরিক, বস্তুগত ও আত্মিক শক্তি ইউরোপকে আবৃত করে ফেলবে। তাই সম্ভাবনার ভীতি ঠেকাতে বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, সুশৃঙ্খলভাবে দমনের বিশাল প্রক্রিয়া, টিকে থাকে। ঔপনিবেশিক প্রজাদের ইউরোপ থেকে প্রবাহিত উৎপাদন–অর্থাৎ আফ্রিকি, এশীয়, প্রাচ্যদেশীয় ছাড়া আর কিছু বিবেচনা করা উচিত নয়, ১৯৩৯ সালে মারাকাসে ওদের যেরূপে দেখেন জর্জ অরওয়েল :

> আপনি যখন দুই লাখ অধিবাসীর এ রকম শহরের ভেতর দিয়ে হাঁটবেন যাদের মধ্যে অন্তত ২০ হাজার লোকের দাঁড়ানোর জন্য এক টুকরা তেনা ছাড়া আর কিছুই নেই, যখন আপনি দেখবেন মানুষেরা কীভাবে বেঁচে থাকে এবং তার চেয়ে বেশি করে, কত সহজে তারা মারা যায় তখন বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে আপনি সত্যি সত্যিই মানুষের মাঝখান দিয়ে হাঁটছেন। প্রকৃতপক্ষে সব ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এই বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। লোকগুলোর মুখ বাদামি–অন্যদিকে ওরা সংখ্যায় অনেক! ওরা কি আপনার মতোই রক্ত-মাংসের অধিকারী? ওদের এমনকি কোনো নাম আছে? অথবা ওরা কি মৌমাছি বা কোরাল পতঙ্গের মতো স্বতন্ত্র, অবিভাজিত বাদামি বস্তু? এরা মাটি থেকে জন্ম নেয়, কয়েক বছর ঘাম ঝরায় ও উপোস থাকে, অতঃপর আবার নামহীন পাহাড়ের কবরখানায় ডুবে যায়। কেউ লক্ষ করেও না যে ওরা চলে গেছে। এমনকি কবরটিও অচিরেই মিশে যায় মাটিতেই।[৫৮]

পিয়েরে লটি, মারমাদুক পিকথেল প্রমুখ স্বল্পখ্যাত লেখকদের উপন্যাসের চিত্রধর্মী বর্ণনায় অঙ্কিত চরিত্রগুলোর কথা বাদ দিলে ইউরোপীয়দের জানা অ-ইউরোপীয় মানুষ তা-ই যা অরওয়েল বলেছেন। হয় সে হাস্যকর চরিত্র অথবা সাধারণ কিংবা পরিকল্পিত ডিসকোর্সে বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে প্রাচ্যদেশীয়, আফ্রিকি, বাদামি বা মুসলিম নামে চিহ্নিত ও অপৃথককৃত বর্গের একটি অণুমাত্র। এ রকম বিমূর্তায়নে প্রাচ্যতত্ত্ব অবদান রেখেছে তার সাধারণীকরণের ক্ষমতা এবং কোনো সভ্যতার উপাদানসমূহকে সেই সভ্যতার মূল্যবোধ, ধারণা ও অবস্থানের আদর্শ বাহকে

রূপান্তরিত করার ক্ষমতার মাধ্যমে: প্রাচ্যতাত্ত্বিক আবার এসব মূল্যবোধবাহী উপাদান 'প্রাচ্য'ই ফিরে পায় এবং সাধারণ সাংস্কৃতিক ধারণায় রূপান্তরিত করে।

যদি এখানে উল্লেখ করা হয় যে রেমন্ড স্কোয়াব অ্যাঁকুইতিল দুপেরনের মেধাদীপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশ করেন ১৯৩৪ সালে এবং সেই অধ্যয়ন শুরু করেন, যা প্রাচ্যতত্ত্বকে যথাযথ সাংস্কৃতিক পটভূমিতে স্থাপিত করে, তাহলে এ মন্তব্যও করতে হয় যে তার কৃত কাজ তার সহকর্মী শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের কাজের তুলনায় প্রবল বৈপরীত্যময়; ওই সব শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর কারণেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এখনো দ্বিতীয় সংস্করণের বিমূর্ত বিষয়, পল ভালেরির নিকট তা যেমন ছিল। কয়েক প্রজন্ম পূর্বে ম্যাক্স মুলার যাকে বলেছিলেন 'প্রাচ্যের জ্ঞান' তা যে এলিয়ট, পাউন্ড, ইয়েটস, আর্থুর ওয়েইলি, ফেনোলজা, পল ক্লদেল (তার প্রাচ্যের সাথে পরিচয় গ্রন্থে) ও অন্যদের কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে এমন নয়, বরং সংস্কৃতি প্রাচ্য, বিশেষত ইসলামকে দেখেছে অবিশ্বাসের চোখে। প্রাচ্যের প্রতি তাদের বিজ্ঞ মনোভাব ক্রিয়া করেছে এই অবিশ্বাসের মাধ্যমেই। এই সমকালীন মনোভঙ্গির সবচেয়ে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হলো ১৯২৪ সালে ইউরোপের অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও প্রাচ্য বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতার অধিকারী ভ্যালেন্টাইন শিরল কর্তৃক শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য' বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালা। তার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত আমেরিকানদের নিকট পরিষ্কার করা যে প্রাচ্যকে যতটা দূর ভাবা হয় তা আসলে অতটা দূর নয়। তার বক্তব্য এমন সরল যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পর অমোচনীয় বৈপরীত্যে অবস্থান করছে এবং প্রাচ্য, বিশেষ করে মোহামেডানিজম, হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে গভীরতর বিভাজনের জন্য দায়ী বিশাল শক্তি।[৫৯] শিরলের ত্বরিত সাধারণীকরণের আভাস পাওয়া যায় তার ছয়টি বক্তৃতার শিরোনামেও : 'ওদের প্রাচীন রণক্ষেত্র', 'অটোমান সাম্রাজ্যের বিদায়', 'মিসরের অদ্ভুত ব্যাপার', 'মিসরে মহান ব্রিটিশ পরীক্ষণ', 'প্রটেক্টরেইট ও ম্যান্ডেট', 'বলশেভিজমের নতুন সংকট এবং কিছু সাধারণ সমাপনী ভাষ্য'।

প্রাচ্য বিষয়ে শিরলের কাজের মতো এমন জনপ্রিয় বর্ণনার উদাহরণ দেওয়া যায় এলি ফরে থেকেও। এ ভদ্রলোকও তার দিবাস্বপ্নে শিরলের মতো ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান এবং সাদা-পাশ্চাত্যবাদ ও বর্ণ প্রাচ্যতত্ত্ব থেকে অনেক ধার করেন। তিনি বৈপরীত্য প্রকাশের পাশাপাশি দেখান যে প্রাচ্যদেশীয়দের দেহ অলস, ইতিহাস বা জাতি কিংবা দেশ সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণা নেই, প্রাচ্য অনিবার্যভাবেই রহস্যপ্রবণ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে মন্তব্য করেন যদি প্রাচ্যদেশীয়রা যুক্তিবাদী না হয় এবং জ্ঞান ও ইতিবাচকতার কৌশল রপ্ত না করে তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোনো লেনদেন সম্ভব হবে না।[৬০] প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমস্যার ওপর আরও সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায় ফার্নান্দ বাল্ডেনস্পার্গারের প্রবন্ধে। তবে তিনিও ভাবাদর্শ, মানসিক শৃঙ্খলা ও যৌক্তিক ভাষ্যের প্রতি প্রাচ্যদেশীয়দের জন্মগত অবজ্ঞার কথাই বলেন।[৬১]

ওরা যেভাবেই ইউরোপীয় সংস্কৃতির গভীরতর বোধের মধ্যে থেকে বলেছেন এবং বলেছেন সেই সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে, তাতে এমন সাদৃশ্যকে (এগুলো পূর্ণ আইডি সিরিজ) কেবল উগ্র স্বাদেশিকতা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সাদৃশ্য তা নয়। যারা ফরে ও বান্ডেনস্পার্গারের অন্য রচনার সাথে পরিচিত তারা প্রমাণ পাবেন সেসব রচনা ওই ধারণার সাথে সংঘাতপূর্ণ। তাদের পটভূমিতে আছে যথার্থকৃত, পেশাগত প্রাচ্যতত্ত্বের রূপান্তর-প্রক্রিয়া; উনিশ শতকের সংস্কৃতিতে যার কাজ ছিল মানবতার একটি হারানো অংশকে ইউরোপের নিকট পুনঃস্থাপন। কিন্তু বিশ শতকে এসে তা হয়ে ওঠে নীতিনির্ধারণের উপাদান এবং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, একটি সংকেতলিপি যার সাহায্যে ইউরোপ নিজেকে এবং নিজের নিকটপ্রাচ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এ গ্রন্থের প্রথম দিকে বর্ণিত কয়েকটি কারণে আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব এরই মধ্যে ইউরোপে ব্যাপক ইসলামভীতির ছাপ বহন করছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধের পরিণামস্বরূপ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা একে আরও নাজুক করে তুলেছে। আমার বক্তব্য এই যে তুলনামূলকভাবে নিরীহ ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ জ্ঞানকে রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ, উপনিবেশসমূহ শাসন, সাদা মানুষের জটিল সভ্যকরণ মিশন সম্পর্কে প্রায় রহস্যা-উদ্ঘাটক ধরনের বিবৃতি ভাষ্য সৃষ্টির ক্ষমতায় রূপান্তরিত করা–এসবই তথাকথিত উদারতাবাদী একটি সংস্কৃতিতে একত্রে ক্রিয়াশীল এমন কিছু যা তার রক্ষণশীলতা, বহুত্ববাদিতা ও মুক্ত মানসিকতা নীতির গর্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে তা 'উদার'-এর ঠিক বিপরীত : নীতি ও অর্থ-এর কঠোরতা 'বিজ্ঞান' কর্তৃক 'সত্য'-এ রূপান্তর। যদি এ সত্য প্রাচ্যকে নির্বাক রেখে বিচার করার অধিকার রাখে, যা আমি আগে উল্লেখ করেছি, তাহলে উদারতা আসলে মানসিকতাজাত সংস্কার ও দমনের একটি ধরন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ রকম উদারতাকে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির ভেতর থেকে চিহ্নিত করা হয়নি এবং এখনো করা হয় না। এ গ্রন্থে তার কারণগুলোই আমি বের করার চেষ্টা করছি। এটি দুঃখজনক যে এ রকম অনুদারতাকে কখনো প্রশ্ন করা হয়নি। এখানে আই এ রিচার্ডসের 'মেনকিয়াস অন দ্য মাইন্ড' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে প্রদত্ত উদ্ধৃতি দৃষ্টান্ত আছে; আমরা এখানে সহজেই 'চীনা' শব্দটিকে 'প্রাচ্যদেশীয়' দিয়ে বদলে নিতে পারি :

> পশ্চিমের ওপর চীনা জ্ঞানের দিন দিন বেড়ে ওঠা প্রভাব প্রসঙ্গে বলছি, মূর্খ বা অসতর্ক বলা যাবে না এমন লেখক এম এটেইন গিলসন তার দ্য ফিলসফি অব সেন্ট থমাস একুইনাসের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় থমাসের দর্শন সম্পর্কে লিখছেন যে তা 'সকল মানবীয় ঐতিহ্য জড়ো করেছে এবং গ্রহণ করেছে'। তিনি যে এমন মন্তব্য করতে পারেন তা আমার কাছে আগ্রহের ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। আমরা সবাই এ রকমই ভাবি; আমাদের নিকট পশ্চিমই হলো পৃথিবী

> [বা পৃথিবীর একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অংশ]। কিন্তু একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হয়তো বলবেন এ রকম উগ্র স্বাদেশিকতা বিপজ্জনক এবং আমরা পশ্চিম ততটা সুখী নই যে নিশ্চিত বলতে পারি এ মনোভাবের প্রভাবে আমরা দুর্ভোগের শিকার হইনি।[৬২]

আমরা যাকে যৌগিক সংজ্ঞায়ন বলি, রিচার্ডের যুক্তি তা প্রয়োগের দাবিকে এগিয়ে দেয়। এ হলো প্রকৃত বহুত্ববাদ এবং সেই সাথে সংজ্ঞায়নের প্রচলিত পদ্ধতি অবলুপ্তির সুবিধাজনক অবস্থা। আমরা গিলসনের উগ্র স্বাদেশিকতার ব্যাপারে রিচার্ডের প্রতিবাদ মানি বা নাই মানি, তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি যে উদার মানবতাবাদ–ঐতিহাসিকভাবে যার একটি শাখা প্রাচ্যতত্ত্ব–প্রকৃত উপলব্ধির উপায়স্বরূপ বিস্তৃত ও বিস্তৃতিশীল অর্থের প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে ফেলেছে। বিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্বে–অর্থাৎ টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে যা–বিস্তৃত অর্থবোধের স্থান দখল করেছে তা হলো বিষয়–হাতের সবচেয়ে নিকটস্থ বিষয়।

• গ •

পূর্ণ বিকশিত অ্যাংলো-ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্ব

আমরা আজকাল প্রাচ্যতত্ত্বের কোনো শাখা বা এর সমগ্র বিকাশে বৃত্তান্তের কোনো একটি দিকের ওপর 'অঞ্চলবিদ্যা' বিশেষজ্ঞরূপে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এ কারণে সেই উজ্জ্বল স্মৃতি ভুলেই বসেছি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মনে করা হতো প্রাচ্যতাত্ত্বিক হলেন সাধারণ জ্ঞানে পারঙ্গম (অবশ্যই নির্দিষ্ট কোনো বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী), যিনি সারাংশমূলক ভাষ্য প্রদানে উঁচুমানের দক্ষতা অর্জন করেছেন। সারাংশমূলক ভাষ্য বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে, তুলনামূলকভাবে সরল দৃষ্টান্তস্বরূপ আরবি ব্যাকরণ বা ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে একটি ধারণা বিন্যস্ত করার মধ্য দিয়ে প্রাচ্যতাত্ত্বিক সামগ্রিকভাবে প্রাচ্য সম্পর্কেও একটি ভাষ্য প্রদান করছেন। অতএব, তাতে যোগ করছেন বলেই মনে করা হতো (এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও তা-ই মনে করতেন)। প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাচ্যদেশীয় বস্তু-বিষয়াদির ওপর বিচ্ছিন্ন অধ্যয়ন সারাংশের আকারে বিষয় বা বস্তুটির খাঁটি প্রাচ্যতত্ত্বও নিশ্চিত করে এবং যেহেতু সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, গোটা প্রাচ্য কোনো উপাদানগত সংসক্তির বলে নিবিড় জড়াজড়ি করে আছে, তাই এটি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের জন্য চমৎকার একটি বোধ সরবরাহ করে। এর ফলে তিনি এমন করতে পারেন যে, যে বস্তুনির্ভর প্রমাণ নিয়ে তিনি কাজ করছেন তা তাকে যথারীতি প্রাচ্যদেশীয় চরিত্র, মন, বা বিশ্বাত্মা সম্পর্কে অধিকতর ভালো উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাবে।

এ গ্রন্থের প্রথম দুটো অধ্যায়ে প্রাচ্যতাত্ত্বিক চিন্তার ইতিহাসের প্রথম পর্বগুলো সম্পর্কে এ রকম যুক্তি দেয়া হয়েছে। এখানে আলোচ্য প্রাচ্যতত্ত্বের পরবর্তী ইতিহাসে পৃথক্‌করণের বিষয়টি মোটামুটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে এবং পরের দুই সময়পর্বের অন্তর্গত। উভয় ক্ষেত্রে এবং পূর্ববর্তী যুগগুলোতেও প্রাচ্য মূলত প্রাচ্যদেশীয়; নির্দিষ্ট ব্যতিক্রমের উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও এবং তা বর্ণনার যে রীতি বা কৌশলই ব্যবহৃত হয়ে থাকুক না কেন। দুই যুগের মধ্যে পার্থক্য নিহিত আছে প্রাচ্যের অনিবার্য প্রাচ্যত্বকে দেখার পক্ষে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রদত্ত যুক্তিতে। যুদ্ধ-

পূর্বকালে প্রদর্শিত যুক্তির ভালো একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ১৮৯৯ সালে এডওয়ার্ড সাচোর প্রবন্ধের (Muhammedanisches Recht) স্নাউক হারগ্রোনেই কৃত সমালোচনার উদ্ধৃত অংশে :

> যে আইন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর চর্চা ও প্রথা এবং তাদের শাসকের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে অকল্পনীয় ছাড় দিত, সে আইনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়ে গেছে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে। দাই এটি আমাদের জন্য এখনো গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নের বিষয় হিসেবেই আছে। কেবল ইতিহাস, সভ্যতা ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত বিমূর্ত কারণেই নয়, কিছু বাস্তব কারণেও। ইসলামি প্রাচ্য ইউরোপের সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছে, তত বেশি মুসলিম দেশ ইউরোপের প্রভাবাধীন হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন, ধর্মীয় আইন ও ধারণামূলক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে জানা আমাদের ইউরোপীয়দের জন্য ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।[৬৩]

হারগ্রোনেই যদিও মেনে নিয়েছেন যে 'ইসলামি আইন' -এর মতো বিমূর্ত বিষয় মাঝেমধ্যে ইতিহাস ও সমাজের চাপের মুখে নত হয়েছে, তবু তিনি এ বিমূর্ততা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজনে ধরে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। কারণ এর 'ইসলামিক আইন' শিরোনামটির বিস্তৃত বহিঃকাঠামো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্য নিশ্চিত করে। হারগ্রোনেইর কাছে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের পার্থক্য প্রাতিষ্ঠানিক বা জনপ্রিয় বুলি নয়; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু। তার কাছে এটি দুই অঞ্চলের ক্ষমতাকেন্দ্রিক সম্পর্ক নির্দেশক। প্রাচ্যসম্পর্কিত জ্ঞান এ পার্থক্যকে হয় প্রমাণ করেছে কিংবা দ্রুত করেছে বা গভীরতর করেছে, যার সাহায্যে এশিয়ার ওপর আরও কার্যকরভাবে বিস্তৃত হয়েছে ইউরোপীয় আধিপত্য। তাই সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যকে জানার অর্থ হলো একে এই কারণে জানা যে, প্রাচ্যকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার কাউকে দেয়া হয়েছে, যখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি পশ্চিমের কোনো মানুষ।

হারগ্রোনেইর বক্তব্যের সঙ্গে এক শ ভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ একটি অনুচ্ছেদের দেখা মেলে গিবের ১৯৩১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ দি লিগ্যাসি অব ইসলাম-এর 'লিটারেচার' প্রবন্ধটিতে। আঠারো শতক পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তিনবারের সংযোগ বর্ণনা করার পর গিব উনিশ শতকের দিকে অগ্রসর হন :

> সাদামাটা যোগাযোগের এ তিনটি সময়পর্ব অনুসরণ করে জার্মান রোমান্টিকরা আবার প্রাচ্যের দিকে ফেরেন এবং প্রাচ্যের কাব্যসাহিত্যের প্রকৃত ঐতিহ্যকে ইউরোপীয় কাব্যকলায় প্রবেশের সুযোগ করে দেয়ার সচেতন চেষ্টা চালান। ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বোধসমৃদ্ধ উনিশ শতক যেন বেপরোয়াভাবে ঘটাং করে দরজা লাগিয়ে দেয় তাদের পরিকল্পনার মুখের ওপর। অন্যদিকে আজকাল আবার প্রাচ্য সাহিত্য তার নিজের বদৌলতেই অধীত হচ্ছে, প্রাচ্য সম্পর্কে অর্জিত হচ্ছে নতুন উপলব্ধি। যেহেতু, এ জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রাচ্য মানবজীবনে

> সঠিক অবস্থান ফিরে পাচ্ছে, তাই প্রাচ্য সাহিত্য আবার তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে, আমাদের সংকীর্ণ ও দমনমুখী ধারণাগুচ্ছের বৃত্ত থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করতে পারে, যে ধারণারাশি শিল্প-সাহিত্য, চিন্তা ও ইতিহাসের সব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে পৃথিবীর আমাদের অংশে সীমাবদ্ধ করে রাখছে।[৬৪]

গিবের 'তার নিজের বদৌলতে' বাক্যাংশটি প্রাচ্যের ওপর ইউরোপীয় আধিপত্য সম্পর্কে হারগ্রোনেইর ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত যুক্তিগুলোর ঠিক বিপরীত। বাকি থাকে সামগ্রিক পরিচয় হিসেবে 'প্রাচ্য' নামের কিছু একটি এবং 'পাশ্চাত্য' নামের অন্য কিছু একটি; এ পরিচয় মুছে ফেলা যাবে বলে মনে হয় না। এ ধরনের সত্তা পরস্পরের কাজে আসতে পারে। এ বিষয়ে গিবের প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য হলো, এ জিনিসটা বোঝানো যে, পশ্চিমা সাহিত্যের ওপর প্রাচ্য সাহিত্যের প্রভাব (তার ফলাফল) ব্রুনটিয়েরের ভাষায় 'জাতীয় মর্যাদাহানিকর' হওয়ার কারণ নেই বরং পশ্চিমের আত্মকেন্দ্রিকতার স্থানিক বন্দিত্বের বিপরীতে মানবিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রাচ্যকে মোকাবিলা করা যায়।

গ্যোয়েটের ওয়েল্টলিটারেচারের ধারণার পক্ষে তার পূর্বের ওকালতি তেমন টেকসই ছিল না। এখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মানবিক উজ্জীবনের জন্য গিবের আহ্বান যুদ্ধোত্তরকালে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রতিফলন। প্রাচ্যের ওপর ইউরোপীয় আধিপত্য লুপ্ত হয়নি, পরিবর্তিত হয়েছে–ব্রিটিশ মিসরে স্থানীয়দের সুবোধ স্বীকৃতি থেকে সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থানীয়দের স্বাধীনতার প্রবল দাবি। এ কটি বছর জগলুল, ওফাদ পার্টি এসবের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজের অবিরাম সমস্যার কাল।[৬৫] এ ছাড়া ১৯২৫ সালে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাও টানাপোড়েন বাড়িয়ে দেয় যার প্রতিফলন রয়েছে গিবের রচনায়। তিনি মনে হয় তার পাঠকদের বলতে চেয়েছিলেন প্রাচ্যের কথায় দান দাও, সংকীর্ণতা, দমনমুখী বিশেষজ্ঞতা ও সীমিত পরিপ্রেক্ষিত থেকে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে পশ্চিমের সংগ্রামে প্রাচ্যকে ব্যবহার করার জন্য।

ভিত্তি পরিবর্তিত হয়ে হারগ্রোনেই থেকে গিবের দিকে চলে যায়, যেমন বদলায় অগ্রাধিকারও। প্রাচ্যের ওপর ইউরোপের আধিপত্য একটি প্রাকৃতিক ঘটনা এমন বক্তব্য এখন আর বিতর্কমুক্ত নয়। তেমনি এখন আর এমন বলা হয় না যে, পশ্চিমের আলোকবিকিরণ প্রাচ্যের দরকার। যুদ্ধমধ্যবর্তীকালে যা গুরুত্ববহ তাহলো উগ্র স্বাদেশিকতা ও পক্ষপাতিত্ব ছাড়িয়ে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নির্ধারণের গুরুত্ব উপলব্ধি। গিবের মতে, প্রাচ্যকে পশ্চিমের প্রয়োজন একে অধ্যয়নের জন্য। কারণ, তা নির্বীজ বিশেষজ্ঞতা থেকে প্রাণশক্তিকে মুক্ত করে বাইরে নিয়ে আসে। এটি অতিরিক্ত জাতীয়তাবাদী আত্মকেন্দ্রিকতা ও উগ্র স্বাদেশিকতা হ্রাস করে, সংস্কৃতির অধ্যয়নে এটি প্রকৃতই কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকৃতই ধারালো করে।

প্রাচ্য যদি এই সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতার যুক্তিবাদের যুগে অংশীদাররূপে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে তা প্রথমত এ কারণে যে প্রাচ্য আগে যেমন ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে, যার আংশিক কারণ হলো অবশিষ্ট পৃথিবীর ওপর পশ্চিমের আধিপত্যের অবসান।

অতএব ম্যাসিগনন ও গিবের পেশাগত অবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রতীকায়িত, যুদ্ধমধ্যবর্তীকালে লিখিত সর্বোত্তম প্রাচ্যতাত্ত্বিক রচনাগুলোয় আমরা এ পর্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল মানবতাবাদী পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অনেক উপাদানই পাই। তাই আমি আগে যে সারাংশপ্রবণ মনোভঙ্গির কথা বলেছি তাকে মনে করা যেতে পারে পশ্চিমের মানববিদ্যায় সহানুভূতিশীল, সংজ্ঞানির্ভর, ইতিবাচকতাবিরোধী প্রক্রিয়ায় সমগ্ররূপে সংস্কৃতিকে জানার প্রচেষ্টার সঙ্গে তুল্য প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে। প্রাচ্যতাত্ত্বিক এবং অপ্রাচ্যতাত্ত্বিক সবই এমন একবোধ নিয়ে শুরু করেন যেন পশ্চিমা সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব অতিক্রম করছে। যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর ওপর বর্বরতা, সংকীর্ণ টেকনিক্যাল ধারণা, নৈতিক শূন্যতা, উচ্চৈঃস্বরের জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি হুমকি কর্তৃক আরোপিত সংকট। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নির্দিষ্ট কোনো রচনা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট থেকে সাধারণে উপনীত হওয়ার (একটি যুগের পুরো সময়ে ও একটি সংস্কৃতিতে উপলব্ধির জন্য) ধারণা পশ্চিমের ওই সব মানবতাবাদীদের রচনায় সুলভ যারা উইলহলেম ডিলথি এবং ম্যাসিগনন ও গিবের মতো লেখকদের অত্যুজ্জ্বল প্রাচ্যতাত্ত্বিক রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। পুনরুজ্জীবিত ভাষাতত্ত্বের প্রকল্প কার্টিয়াস, ভোসলার, অরবাখ, স্পিৎজার, গান্ডফ, হোমম্যানস্থালের[৬৬] রচনায় যেমন পাওয়া যায়, তার বিপরীত পক্ষে দেখা দেয় ম্যাসিগননের রহস্যময় শব্দকোষ, ইসলামি ইবাদতের শব্দাবলি ইত্যাদি অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে কঠোরভাবে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্বে সরবরাহকৃত অনুত্তেজনা।

তবে এ কালপর্বের প্রাচ্যতত্ত্ব এবং ইউরোপীয় মানববিদ্যার মধ্যে আরেকটি আকর্ষণীয় সংযোগ সাধিত হয়। প্রথমে অবশ্যই লক্ষণীয় যে, ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থানের মধ্য দিয়ে অনিবার্যভাবে অভিব্যক্ত হয় আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিকারক, নীতি-বিচ্ছিন্ন টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞতার মানবতাবাদী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির প্রতি যেকোনো হুমকিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া করে অ-প্রাচ্যতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন। এই প্রতিক্রিয়া দুই যুদ্ধমধ্যবর্তীকালের উদ্বেগকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালেও বিস্তৃত করে। এর চমৎকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ, ব্যক্তিগত প্রমাণ পাওয়া যায় এরিখ অরবাখের ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল মাইমেসিস-এ এবং ভাষাতাত্ত্বিক[৬৭] হিসেবে তার সর্বশেষ আলোচনায়। তিনি লিখেছেন মাইমেসিস তুরস্কে তার নির্বাসনকালে লেখা। মুখ্য উদ্দেশ্য প্রায় শেষ মুহূর্তে পশ্চিমা সংস্কৃতির উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ; তখনো সে সংস্কৃতিতে সততা ও

সভ্যতাকেন্দ্রিক সংসক্তি বজায় আছে। সুতরাং তিনি কিছুসংখ্যক নির্দিষ্ট রচনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানের ওপর একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন–বৈচিত্র্য, সমৃদ্ধি ও উর্বরতাসমেত পশ্চিমা সাহিত্যচর্চার মূলনীতিগুলো অঙ্কন করার ধরনে। এর লক্ষ্য হলো পশ্চিমা সংস্কৃতির সংশ্লেষণ, যাতে খোদ সংশ্লেষের কাজটি এবং তা করার ভঙ্গি সমান গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে; তা সম্ভব হয় অরবাখের ভাষায় 'বিলম্বিত বুর্জোয়া মানবতাবাদ[৬৮]-এর দ্বারা। এভাবে বিচ্ছিন্ন নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে বিশ্ব ইতিহাস প্রক্রিয়ার অত্যন্ত পরিকল্পিত প্রতীকে।

অন্য জনগোষ্ঠীর জাতীয় সংস্কৃতিতে জড়িত হওয়ার ঘটনা অরবাখের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; এটিও প্রাচ্যতত্ত্বের বেলায় প্রাসঙ্গিক। অরবাখ কার্টিয়াসের উদাহরণ টানেন। কার্টিয়াস যে জার্মান হয়েও নিজেকে পেশাগতভাবে রোমান্টিক সাহিত্যের জন্য নিবেদন করেন তার প্রমাণ তার বিশাল কাজে। তাই অরবাখ শুধু শুধু সেইন্ট ভিক্টরের ডিডাস্কেলিকন-এর হুগো থেকে এই উদ্ধৃত দিয়ে তার আলোচনা শেষ করেননি : 'যিনি তার নিজের ঘরকে সুন্দর মনে করেন তিনি কচি যাত্রা-সূচনাকারী; যেকোনো মাটিই যার নিজের বাড়ি তিনি এরই মধ্যে যথেষ্ট শক্ত হয়ে উঠেছেন : তবে তিনিই নিখুঁত যার কাছে গোটা বিশ্বই বিদেশ'।[৬৯] কেউ তার সাংস্কৃতিক বাড়িটিকে যত বেশি ছেড়ে যেতে পারবে, সে নিখুঁত দৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় আত্মিক বিচ্ছিন্নতা ও উদারতার সঙ্গে তত ভালোভাবে সেই সংস্কৃতিকে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা পৃথিবীকে বিচার করতে পারবে। ঘনিষ্ঠতা ও বিচ্ছিন্নতার একরকম সমন্বয়ের সাহায্যেই কেউ কেউ আরও বেশি সহজে নিজেকে ও অচেনা সংস্কৃতিকে বিচার করতে পারে।

সামাজিক বিজ্ঞানে বিশ্লেষণাত্মক কৌশল ও পরিচিত জিনিস নতুনভাবে দেখার উপায়রূপে 'ছাঁচ' ব্যবহার কম গুরুত্বপূর্ণ ও পদ্ধতিগতভাবে কম রূপদায়ক সাংস্কৃতিক শক্তি নয়। ছাঁচ-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায় বিশ শতকের চিন্তাবিদ ওয়েবার, ডুর্কহেইম, লুকাস, ম্যানহেইম ও অন্যান্য পণ্ডিত সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায়; এর ইতিহাস বহুবার পর্যালোচিত হয়েছে।[৭০] আমার ধারণা ওখানে বলা হয়নি যে ওয়েববারের প্রোটেস্ট্যান্টবাদ, ইহুদিবাদ, বুদ্ধধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে এমন এলাকায় যা আসলে প্রাচ্যতাত্ত্বিক দ্বারা চিহ্নিত ও দাবিকৃত। ওখানে তিনি উনিশ শতকের ওই সব লেখকদের থেকে উৎসাহ পান, যারা মনে করতেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক (তেমনি ধর্মীয়) 'মানসিকতার' মধ্যে তত্ত্ববিদ্যাগত পার্থক্য রয়েছে।

ওয়েবার যদিও ভালোভাবে ইসলাম অধ্যয়ন করেননি, তবু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছেন। তার প্রধান কারণ ছাঁচ সম্পর্কে ওয়েবারের বক্তব্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অনেক মতবাদগত অভিসন্দর্ভের পক্ষে বাইরের সমর্থন হিসেবে

কাজ করে; যদিও ওই সব অভিসন্দর্ভের একমাত্র কথা হলো প্রাচ্যদেশীয় মৌলিকভাবে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক যুক্তিবোধ মেনে কাজ করতে অক্ষম। ইসলাম অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এসব সস্তা বক্তব্য শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়েছে ১৯৬৬ সালে ম্যাক্সিম রডিনসনের গুরুত্বপূর্ণ রচনা ইসলাম অ্যান্ড দি ক্যাপিটালিজম বের হওয়ার আগ পর্যন্ত। তবু ছাঁচ প্রাচ্যদেশীয়, ইসলামি বা আরব বা যাই হোক না কেন টিকে যায় এবং আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ থেকে উদ্ধৃত এ-জাতীয় বিমূর্ততা বা আদিকল্প বা ছাঁচ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়।

এ গ্রন্থে আমি প্রায়শই প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের একরকম বিচ্ছিন্নতাবোধের অভিজ্ঞতার কথা বলেছি, যেহেতু তারা তাদের নিজেদের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন কোনো সংস্কৃতিতে বাস করতেন বা তা নিয়ে কাজ করতেন। এখন ইসলামি প্রাচ্যতত্ত্ব থেকে অন্য সব জ্ঞানক্ষেত্রের চোখে পড়ার মতো পার্থক্য হলো ইসলামি প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইসলাম থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতাকে কখনো ভালো অথবা তাদের নিজের সংস্কৃতিকে ভালোভাবে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে গৃহীত মনোভাবরূপে দেখেননি। বরং ইসলাম থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা তাদের মনে ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের বোধই তীব্রতর করে; তাদের বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পুবের ওপর, যার সবচেয়ে পতিত (স্বাভাবিকভাবেই মারাত্মক বিপজ্জনক) প্রতিনিধি হলো ইসলাম। উনিশ শতকজুড়ে প্রাচ্যতত্ত্ব অধ্যয়নের ঐতিহ্যে এ প্রবণতা গড়ে ওঠে; এবং সময়ে তা অধিকাংশ প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের আদর্শ অঙ্গে পরিণত হয়–হস্তান্তরিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। আমার ধারণা উনিশ শতকেও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ খুব সম্ভবত বাইবেলীয় পটভূমির পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করে নিকট-প্রাচ্যকে স্থায়ীভাবে প্রভাবশালী ধর্মীয় প্রাধান্যবিশিষ্ট একটি এলাকা বলে মনে করেন। খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের কারণে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ধারণায় ইসলাম চিরতরে প্রকৃত সাংস্কৃতিক ঔদ্ধত্য হিসেবেই থেকে যায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় এই ভীতি যে, ইসলামি সভ্যতা মৌলিক (ও সমকালীন) দিক থেকেও দাঁড়িয়ে আছে খ্রিষ্টান ধর্মের বিপরীতে।

এসব কারণে এই যুদ্ধমধ্যবর্তী ইসলামি প্রাচ্যতত্ত্ব অরবাখ ও অন্যান্যদের আগাম-কথিত সাংস্কৃতিক সংকটের বোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। কিন্তু অন্যান্য মানব বিজ্ঞানে এ রকম প্রভাব পড়েনি। ইসলামি প্রাচ্যতত্ত্ব যেহেতু শুরু থেকে জড়িয়ে থাকা অদ্ভুত বিতর্কিত ধর্মীয় মনোভাব লালন করে, তাই তা নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতিগত রাস্তায় অনড় থেকে যায়। আধুনিক ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক পরিপার্শ্ব এবং নতুন তথ্য কর্তৃক অনিবার্য করে তোলা তাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক ছাঁচ থেকে ইসলামের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার প্রয়োজন। অন্যভাবে ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক প্রদত্ত বিমূর্ততা (কিংবা বিমূর্ততা সৃষ্টির সুযোগ) নতুন বৈধতা অর্জন করে বলে ধরে নেয়া হয়; কারণ ধরে নেয়া হয়

যে, ইসলাম সেভাবেই বিকশিত হয়েছে প্রাচ্যতাত্ত্বিক যেমন ব্যাখ্যা করেছেন (বাস্তব থেকে উল্লেখ করে নয়, কেবল একরাশ 'ধ্রুপদ' নীতি সাক্ষ্য মেনে)। এমন ধরে নেয়া হয় যে, আধুনিক ইসলাম আসলে নতুন বলে দাবিকৃত পুরোনোর একটি সংস্করণ ছাড়া কিছুই নয়, বিশেষত যেহেতু এও ধরে নেয়া হয় যে, ইসলামের জন্য আধুনিকতা যতটা না চ্যালেঞ্জ, তার চেয়ে বেশি অপমান। (এই বর্ণনার অধিকাংশ অনুমানও ধরে নেয়া, ঘটনাক্রমে, মানবীয় বাস্তবতাকে দেখার নিজস্ব পন্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রাচ্যতত্ত্বের অনিবার্য উৎকেন্দ্রিক পাক ও মোড় ফেরার প্রবণতা স্পষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত)। সবশেষে যদি (অরবাখ ও কার্টিয়াসের কল্পিত) ভাষাতত্ত্বের সংশ্লেষী উচ্চাকাঙ্ক্ষা পণ্ডিতের সচেতনতা, তার মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ, কিছু মানবীয় আচরণের সর্বজনীনতা বিস্তৃত করার দিকে নিয়ে যায়, তাহলে ইসলামি প্রাচ্যতত্ত্বে সংশ্লেষ টেনে আনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্যের তীব্রতরবোধ যার প্রতিফলন দেখি ইসলামে।

অতএব, আমি এমন কিছু বর্ণনা করছি যা নির্দেশ করে বর্তমান পর্যন্ত ব্যাপ্ত ইসলামি প্রাচ্যতত্ত্বের প্রকৃতি, অন্যান্য মানব বিজ্ঞানের (এমনকি প্রাচ্যতত্ত্বের অন্যান্য শাখার) তুলনায় এর রক্ষণশীল অবস্থান, এর সামগ্রিক পদ্ধতিগত ও ভাবাদর্শিক পশ্চাৎপদতা মানববিদ্যার অন্যান্য শাখা এবং ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব পৃথিবীতে উন্নয়নের ধারা থেকে এর বিচ্ছিন্নতা।[৭১]

উনিশ শতকের শেষে ইসলামি (বা সেমেটিক) প্রাচ্যতত্ত্বে এসব দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দেয়, সম্ভবত এ কারণে যে কোনো কোনো পর্যবেক্ষক পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন, ধর্মীয় পটভূমিতে ইসলাম সেমেটিক প্রাচ্যতত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছিল উভয়ই এখনো কেমন অনড় ওখানেই রয়ে গেছে। প্রথম প্রাচ্যতাত্ত্বিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৩ সালে, প্যারিসে, শুরু থেকেই অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছে মনে হয় বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পিছিয়ে আছেন সেমেটিক ও ইসলামবিষয়ক পণ্ডিতরা। ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সব কটি সম্মেলন জরিপ করতে গিয়ে ইংরেজ পণ্ডিত আর এন কাস্ট সেমেটিক ইসলামি উপশাখাটি সম্পর্কে এ মন্তব্য করেন :

> [প্রাচীন সেমেটিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলন প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে আধুনিক সেমেটিক সম্পর্কে একই কথা বলা যাবে না। লোকসমাগম হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু আলোচিত বিষয়বস্তুর সাহিত্যিক আকর্ষণ একেবারে সামান্য; এগুলো পুরোনো চিন্তাধারার পণ্ডিতদের মনে সাড়া জাগাবে, উনিশ শতকের 'নির্দেশক' মহান শ্রেণিটির মধ্যে নয়: জুতসই একটা শব্দের সন্ধানে আমি প্লিনি পর্যন্ত যেতে বাধ্য হয়েছি। এ বিভাগে আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মনন অনুপস্থিত। রিপোর্ট পড়ে মনে হয় বুঝি গ্রিক নাটকের একটি অনুচ্ছেদ পাঠ নিয়ে আলোচনার জন্য গত শতকের বিশ্ববিদ্যালয় টিউটরদের

> সম্মেলন কিংবা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনাপর্বে স্কুলকেন্দ্রিকদের মাকড়সা জাল ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার আগে একটি ভাওয়েল-এর উচ্চারণ সঠিক করার সম্মেলন।[৭২]

প্রাচীন-নির্দেশনাদির প্রতি বিতর্কিত বাতিকের বর্ণনা দেন কাস্ট তা এক অর্থে, ইউরোপের সেমেটিক বিরোধিতা পণ্ডিতি বিবরণ। এমনকি মুসলিম ও ইহুদি নির্দেশক 'আধুনিক সেমেটিক' আখ্যাটি (যার উৎপত্তি রেনান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সেমেটিক অধ্যয়নক্ষেত্র) বহন করছে সংযত বর্ণবাদী অহংকারের ব্যানার। রিপোর্টে একটু এগিয়েই কাস্ট মন্তব্য করেন যে, 'আর্যরা' সভায় সমালোচনার জন্য অনেক বেশি বিষয়বস্তু সরবরাহ করেছে। পরিষ্কারভাবে 'আর্য' কথাটি 'সেমেটিক'-এর বিপরীত জবাব। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত কিছু কারণে এ রকম পুরোনো ক্রেতার সেমেটিকদের ক্ষেত্রেই সঠিক বলে মনে হয়; সমগ্র মানবসমাজের কোনো মানবিক ও নৈতিক পরিণামের ব্যয়ে এমন হলো তা বিশ শতকের ইতিহাসই ভালো করে দেখায়। তবু আধুনিক সেমেটিক-বিরোধিতার ইতিহাসের যে বিষয়টির ওপর জোর দেয়া হয়নি, তা হলো প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক ওই রকম পুরোনো ধারার আখ্যা দেয়ার প্রবণতাকে বৈধতা দেয়া এবং যেভাবে এই বৈধকরণের প্রবণতা আধুনিককালে ভেসে এসে ইসলাম, আরব বা নিকট-প্রাচ্যের আলোচনায় এখনো টিকে আছে তা আমার বর্তমান অধ্যয়নের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, 'নিগ্রো মন' বা 'ইহুদি চরিত্র' জাতীয় মর্যাদাহানিকর আখ্যা নিয়ে কিছু লেখা এখন যেমন অসম্ভব, ততটাই সম্ভব 'ইসলামি মন' বা 'আরব চরিত্র' নিয়ে গবেষণা; এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব আরও পরে।

যুদ্ধমধ্যবর্তী ইসলামি প্রাচ্যতত্ত্বের কুলজি সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও সন্তোষজনকভাবে প্রকাশ পেয়েছে (শ্লেষ নিয়ে বলছি না) ম্যাসিগনন ও গিবের মধ্যে। এই কুলজি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিজের বিষয়ের প্রতি প্রাচ্যতাত্ত্বিকের সারাংশমূলক মনোভাব এবং তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যপূর্ণ মনোভাবের পার্থক্য বুঝতে হবে যার প্রকাশ দেখি অরবাখ ও কার্টিয়াসের মতো ভাষাতাত্ত্বিকদের লেখায়। 'বিলম্বিত বুর্জোয়া মানবতাবাদের' একটি দিক হলো ইসলামি প্রাচ্যতত্ত্বে বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট। ইসলামি প্রাচ্যতত্ত্ব নিজস্বরূপ ও রীতিতে 'প্রাচ্যদেশীয়' ও 'পাশ্চাত্য' শিরোনামে দুটো শ্রেণিতে ভাগ করে দেখে মানবজাতির সমস্যাকে। এমন বিশ্বাস করা হতো যে, পশ্চিমের জন্য প্রযোজ্য উদারতা, আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিস্তৃতি প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয়দের ব্যাপার নয়। ইসলামি প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইসলাম সম্পর্কে এমনভাবে তার মতামত প্রকাশ করেন যাতে কয়েকটি বিষয়ে জোর দেয়া হয় : যেমন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে, পুব ও পশ্চিমের পারস্পরিক উপলব্ধির বিরুদ্ধে, সেকেলে, আদিম ধ্রুপদ প্রতিষ্ঠান থেকে নারী-পুরুষের উন্নয়ন ও আধুনিকতায় প্রবেশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের (আনুমানিক) প্রতিরোধ। পরিবর্তন প্রতিরোধের বোধ এত প্রবল এবং এ ধারণায় আরোপিত

ক্ষমতা এত বেশি সর্বজনীন ছিল যে, প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের লেখা পড়ে যে কেউ বুঝতে পারে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীতে কথিত ভয় আসলে পশ্চিমা সভ্যতা ধ্বংসের ভয় নয়, বরং পুব ও পশ্চিমকে আলাদা করে রাখা বিভাজকগুলো ভেঙে যাওয়ার ভয়। গিব যে আধুনিক ইসলামি দেশগুলোর জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেন তার কারণ তিনি অনুভব করেন যে, জাতীয়তাবাদ ইসলামকে প্রাচ্য বানিয়ে রাখার অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে ক্ষয় করে ফেলবে; কারণ অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের অর্থ হলো পুবকে ঠিক পশ্চিমের মতো করা। এখানে ভিন্ন একটি জাতির সঙ্গে গিবের অসাধারণ সহানুভূতিশীল আত্মলেপন প্রশংসার যোগ্য। কারণ, তিনি এমনভাবে তার অমত প্রকাশ করেন যে, মনে হতে পারে তিনি হয়তো ইসলামের 'রক্ষণশীল' সমাজের পক্ষ থেকে কথা বলছেন। এ রকম আবেদন কতটা আদি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মতো স্থানীয়দের জন্য কথা বলা, আর কতটাই বা ইসলামের স্বার্থে কথা বলার আন্তরিক প্রচেষ্টা তার উত্তর নির্ভর করে এই দুই বিকল্পের মাঝখানে।

কোনো চিন্তাবিদই কোনো ভাবাদর্শ বা মতধারার নিখুঁত প্রতিনিধি নন, যদিও তিনি তার জাতীয় উৎসের গুণে বা ইতিহাসের দুর্ঘটনায় তাতে অংশগ্রহণ করেন। আমি মনে করি, প্রাচ্যতত্ত্বের মতো তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিশেষায়িত ঐতিহ্যের প্রত্যেক পণ্ডিতের মধ্যেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছুটা সচেতনতা কাজ করে–জাতীয় ভাবাদর্শের ব্যাপারে যদি নাও হয়। প্রাচ্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে এ কথা সত্যি; এর আবার একটা বাড়তি কারণ হলো প্রাচ্যের কোনো না-কোনো দেশে ইউরোপীয় জাতিগুলোর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ভূমিকা। ব্রিটিশ বা ফরাসি নয় এমন উদাহরণ দেয়ার জন্য ডাউক হারগ্রোনেইর নাম উল্লেখ করা যায়; তার জাতীয় আত্মপরিচয়ের বোধ সরল ও পরিষ্কার, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে।[৭৩] তবু ব্যক্তি ও আদর্শ ছাঁচ-এর (বা ব্যক্তি ও ঐতিহ্যের) মধ্যে পার্থক্যের সব বৈশিষ্ট্য ঠিকঠাক করার পর, ম্যাসিগনন বা গিব যে কতদূর আদর্শ প্রতিনিধি তা ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। সম্ভবত এভাবে বলা ভালো যে, ম্যাসিগনন ও গিব তাদের জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয় রাজনীতি তাদের নিজ নিজ জাতীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিক মতধারার আকাঙ্ক্ষা এক শ ভাগ পূরণ করেছেন। সিলভিয়ান লেভি স্বাতন্ত্র্যিক দুই চিন্তাধারার পার্থক্য প্রকাশ করেছেন যথেষ্ট জোরালভাবে :

> ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সম্পর্কের রাজনৈতিক আগ্রহ ব্রিটিশদের নিরেট বাস্তবের সঙ্গে স্থানীয় সংযোগ স্থাপনের কাজে নিয়োজিত রাখে, এবং বজায় রাখে অতীতের প্রতিনিধিত্ব দৃশ্যাবলির পারস্পরিক সংসক্তি।
>
> ধ্রুপদ ঐতিহ্যে পুষ্ট ফ্রান্স খুঁজে বেড়ায় মানুষের আত্মা-ভারতে তার কর্মকাণ্ডে যেমন দেখা যায়, একইভাবে সে আগ্রহী চীনের ব্যাপারে।[৭৪]

এখানে সহজেই বলা যায় যে, এ মেরুকরণের ফলাফল হলো একদিকে দক্ষ, সূক্ষ্ম, নিরেট কাজ–অন্যদিকে বিশ্বজনীন, ভবিষ্যৎ ভাষ্যমূলক, মেধাদৃপ্ত কাজ। তবু

মেরুপ্রবণতা দীর্ঘজীবী ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুই পেশাকে আরও উজ্জ্বল করে দেখায়, যাদের মাঝখানে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আধিপত্য করেছে ফরাসি ও অ্যাংলো-আমেরিকান ইসলামি প্রাচ্যতত্ত্ব। আধিপত্যের যদি কোনো অর্থ হয়ে থাকে তাহলে তা এই যে, প্রত্যেক পণ্ডিতই আত্মসচেতনতার ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত হয়ে তার মধ্যে থেকেই কাজ করেছেন। এই আত্মসচেতনতার সীমাবদ্ধতাগুলো (রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বলছি) ওপরে প্রদত্ত লেভির বর্ণনার মতো বর্ণনা করা যায়।

গিব-এর জন্ম মিসরে, ম্যাসিগননের ফ্রান্সে। দুজনই পরে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ হন; দুজনই সমাজ থেকে না শিখে শিখেছেন সমাজের ধর্মীয় জীবন থেকে। এরা স্বার্থের দিক থেকেও সচেতন ছিলেন : এদের প্রচেষ্টাতেই প্রথাগত পাণ্ডিত্যকে আধুনিক রাজনীতির জগতে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। তবু তাদের কাজের পরিধি ও বুনন পরস্পর থেকে মেরুদূর; বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও ধর্মীয় অধ্যয়নের পার্থক্য তাতে ছাপ ফেলেছে। ১৯৬২ সালে ম্যাসিগননের মৃত্যুতে প্রদত্ত বক্তব্যে গিব লিখেন যে তিনি আল-হাল্লাজ বিষয়ে জীবনব্যাপী সাধনায় 'পরবর্তীকালের ইসলামি সাহিত্য ও ভক্তির মধ্যে তার প্রভাব খুঁজে বের করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন'। ম্যাসিগননের গবেষণার অ-সীমিত বিশাল ব্যাপ্তি তাকে সর্বত্র নিয়ে যায়, খুঁজে বের করে 'সময় ও পরিসরের ভেতর মানবীয় আত্মার' সাক্ষ্য। 'সমকালীন মুসলিম জীবন ও চিন্তার প্রতিটি কোন-বাঁক' উন্মোচক কাজের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যতত্ত্বে ম্যাসিগননের উপস্থিতি তার সহকর্মীদের জন্য নিয়ত চ্যালেঞ্জের মতো। আমরা একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে, গিব একবার ম্যাসিগননের আরাধ্য পথ ভালোবেসেও শেষে ফিরে আসেন :

> সে ভাব যা কোনোভাবে মুসলিম ও ক্যাথলিকদের আধ্যাত্মিক জীবনের সংযোগ সাধন করে, ফাতিমার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির ইতিবাচক সর্বজন মান্য উপাদান খুঁজে বের করায় তাকে (ক্যাথলিককে) সক্ষম করে এবং এরই পরিণতিতে উপনীত বিশেষ আকর্ষণীয় অধ্যয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিয়া চিন্তাধারার প্রকাশিত রূপ, কিংবা সেই অব্রাহামের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্প্রদায়ে এবং সাত নিদ্রিত তরুণ-জাতীয় বিষয়ে। এসবের ওপর তার রচনা এমন উৎকর্ষে সমৃদ্ধ যে, তার ইসলাম অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়বস্তুগুলোর স্থায়ী গুরুত্ব এনে দিয়েছে। কিন্তু কেবল এই গুণের কারণে এগুলো দুটো ভাগে রচিত। একটি হলো পাণ্ডিত্যের সাধারণ স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকৌশলের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান প্রপঞ্চসমূহ উন্মোচনের চেষ্টা। অন্যটি হলো, লক্ষ্যমুখী তথ্যরাশি ও উপলব্ধি আত্তীকৃত করে ব্যক্তিগত সংজ্ঞার আধ্যাত্মিক পরিসরে তার রূপান্তরের প্রয়াস। প্রথমোক্ত কাজ এবং ব্যক্তিগত আত্মিক সমৃদ্ধির অভিব্যক্তিস্বরূপ রূপান্তরের মধ্যে পরিষ্কার ভাগ করে দেখানো সব সময় সহজ নয়।

এখানে এমন ইঙ্গিত রয়ে যাচ্ছে যে, প্রটেস্ট্যান্টদের তুলনায় ক্যাথলিকরা 'ফাতিমার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির' ব্যাপারে একটু বেশি ঝুঁকে আছে। তবে বিষয়মুখী পাণ্ডিত্য ও (বিশদভাবে নির্দেশিত) 'ব্যক্তিগত সংজ্ঞার আধ্যাত্মিক পরিসর' ভিত্তিক পাণ্ডিত্যের

পার্থক্য যিনি মুছে ফেরেন তার সম্পর্কে গিব যে সন্দেহপ্রবণ তা বুঝতে আমাদের ভুল হওয়ার কথা নয়। যাহোক, দ্বিতীয় প্যারায় গিব 'মুসলিম শিল্পকলার প্রতীকীরূপ, মুসলিম যুক্তিবোধের কাঠামো ও মধ্যযুগীয় অর্থনীতির জটিলতা, শিল্পীদের প্রতিষ্ঠানের সংগঠন' প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে ম্যাসিগননের মনের 'উর্বরতা' স্বীকার করে ঠিক কাজটিই করেন এবং একটু পরই তিনি সেমেটিক ভাষাসমূহে ম্যাসিগননের প্রথমদিকে উৎসাহ সম্পর্কে বলেন যে, তা 'অসূচিত বিষয়সমূহে এমন বৃত্তীয় অধ্যয়নের প্রবণতা সৃষ্টি করে যা প্রাচীন বায়ুনিরোধী কৌশলের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী। এ সত্ত্বেও গিব তার আলোচনা শেষ করেন এই উদার বক্তব্যে :

> তিনি তার দৃষ্টান্তে তার প্রজন্মের প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রভাবিত করার মধ্যে দিয়ে আমাদের জন্য শিক্ষা রেখে যান। তা এই যে পুবের সংস্কৃতির বিচিত্র চেহারার অর্থ ও মূল্যপ্রদায়ক প্রাণদায়ী শক্তির প্রতি কিছুটা প্রতিশ্রুতি না দিলে এমনকি ধ্রুপদ প্রাচ্যতত্ত্বও এখন আর যথেষ্ট নয়।[৭৫]

তা অবশ্যই ম্যাসিগননের সবচেয়ে বড় অবদান এবং এও সত্যি যে, 'পুবের সংস্কৃতি' তে অর্থ সঞ্চার করে যে 'প্রাণদায়ী শক্তি' তার সঙ্গে একাত্মবোধের একটি ঐতিহ্য বিকশিত হয় সমকালীন ফরাসি ইসলামতত্ত্বে (মাঝে মাঝে এ ডানে ডাকা হয় বিষয়টিকে)। এ প্রসঙ্গে জ্যাক বার্ক, ম্যাক্সিম রডিনসন, ইয়েভস লাকোস্ত, রজার আর্নালদাজের মতো পণ্ডিতদের অসাধারণ অর্জন উল্লেখ করলেই যে কেউ ম্যাসিগননের মৌলিক কাজে বিস্মিত হবেন। উদ্দেশ্য ও উপায়ে এরা একজন আরেকজন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হওয়া সত্ত্বেও সবার ওপর ম্যাসিগননের প্রভাব স্পষ্ট।

তবু ম্যাসিগননের বিভিন্ন শক্তি ও দুর্বলতার ওপর আখ্যানের ভঙ্গিতে মন্তব্য করতে গিয়ে গিব তার আসল ব্যাপারগুলো চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা ম্যাসিগননকে গিব ও অন্যদের থেকে আলাদা করেছে, এমনকি সামগ্রিকভাবে দেখলে তাকে পরিণত করেছে ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতীকে। একটি হলো ম্যাসিগননের ব্যক্তিক পটভূমি; ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে লেভির বর্ণনার সারসত্য তা চমৎকারভাবে বিচিত্র করে। গিব ও আরও অনেক ব্রিটিশ পণ্ডিতের উদ্ভব যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় পরিবেশে তাতে 'মানবীয় আত্মা'র ধারণাটিই কম-বেশি অচেনা।

সৌন্দর্যতাত্ত্বিক ধর্মীয়, নৈতিক, ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসেবে 'আত্মা'র ধারণা ছেলেবেলা থেকেই লালন করে থাকবেন ম্যাসিগনন। তার পরিবার হায়াসমানের মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনি যা লিখেছেন তার প্রায় সবকিছুতেই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে তার প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব এবং প্রতীকবাদের শেষদিকের ধারণাসমূহ উপস্থিত; এমনকি একধরনের ক্যাথলিজমের (এবং সুফিবাদের) প্রভাবও

স্পষ্ট। ম্যাসিগনন লিখেছেন শতাব্দীর অন্যতম সেরা ফরাসি রীতিতে, যাতে উগ্রতা বা রুক্ষতা নেই। মানবীয় অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনায় তিনি সমকালীন শিল্পী-চিন্তাবিদদের কাছ থেকে অকপটে গ্রহণ করেছেন। তাকে গিব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করেছে তার চিন্তার ধরনের বিরাট সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি। তার জীবনের প্রথম পর্বের ধারণাগুলো দানা বাঁধে তথাকথিত সৌন্দর্যতাত্ত্বিক ক্ষয়ের যুগে। তবে এ ক্ষেত্রে বার্গসঁ, ডুর্কহেইম, মসের মতো ব্যক্তিত্বের কাছেও তিনি ঋণী। তরুণ বয়সে তিনি রেনানের বক্তৃতা শুনতেন। ওখান থেকেই প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতি তার আগ্রহের সূচনা। তিনি সিলভিয়ান লেভিরও ছাত্র; পল ক্লাদেল, গাবরিয়েল বাওনর, জ্যাক মারিতেইন ও রাইসা মারিতেইন, চার্লস ডি ফুকো প্রমুখ ছিলেন তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। পরবর্তী সময়ে রেনান শহুরে সমাজবিজ্ঞান, কাঠামোবাদী ভাষাবিজ্ঞান, মনোবিশ্লেষণ, সমকালীন নৃ-বিজ্ঞান ও নব-ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনার সূত্রে এসব সাম্প্রতিক জ্ঞান-শাখার নতুন ধ্যান-ধারণা আত্মস্থ করেন। আল-হাল্লাজ বিষয়ে বিশাল ও শ্রেষ্ঠতর রচনার কথা আলাদা রেখেই বলা যায় তার কাজ সমগ্র ইসলামি সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছে অনায়াসে। তার রহস্যময় পাণ্ডিত্য ও প্রায় পরিচিত ব্যক্তিত্বের জন্য মাঝেমধ্যে তাকে হর্হে লুই বোর্হেস কর্তৃক সৃষ্ট কোনো পণ্ডিত বলে মনে হয়।

ম্যাসিগনন ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রাচ্যদেশীয় বিষয়বস্তুর ব্যাপারে খুব সংবেদনশীল ছিলেন; এটি গিবেরও আগ্রহের বিষয়। তবে গিবের মতো তিনি ওই সব লেখকদের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না, যারা প্রাচ্যকে 'বুঝে ফেলেছে'। আবার পরবর্তীকালের প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রাচ্য সম্পর্কে যা 'আবিষ্কার' করে তা আবিষ্কারের পূর্বেই সেই সময়ে কিছু কিছু ইউরোপীয় লেখক তাদের লেখায় এগুলো তুলে ধরেছেন। ম্যাসিগনন এসব রচনায় আগ্রহ দেখাননি; যদিও গিব এগুলোর প্রতি আগ্রহী ছিলেন (যেমন সালাদিন সম্পর্কিত গবেষণায় গিব স্কটকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করেন)। সাত নিদ্রিত তরুণ-এর জগৎ বা আব্রাহামের প্রার্থনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ ম্যাসিগননের 'প্রাচ্য' (অথচ এ দুটো বিষয়কেই গিব ইসলামের প্রতি ম্যাসিগননের রক্ষণশীল মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ আলাদা করে উল্লেখ করেন) উৎকেন্দ্রিক, কিছুটা অসাধারণ–ম্যাসিগননের বিশ্লেষণধর্মী বিস্ময়কর বর্ণনার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মানানসই (এ বর্ণনাই একে বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে)। গিব যদি স্কটের সালাদিনকে পছন্দ করে থাকেন, তাহলে ম্যাসিগননের সুষম পক্ষপাতী নেরভালের জন্য, আত্মহত্যার মতো–মনস্তাত্ত্বিক অস্বাভাবিকতা। এর অর্থ এই নয় যে, ম্যাসিগনন অতীতের ছাত্র বরং তিনি ফরাসি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থিত রাজনীতি ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন ম্যাসিগনন। তিনি মনে করতেন প্রাচ্যে প্রবেশ করা সম্ভব; কিন্তু কেবল পাণ্ডিত্য দিয়ে নয়, এর সব কর্মকাণ্ডের প্রতি ভক্তি-

নিবেদনের মধ্য দিয়ে। তবে সেই কর্মকাণ্ড বলতে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া পুবের খ্রিষ্টীয় জগৎ বোঝায় না, যার অন্যতম শাখা বাদালিয়া ভ্রাতৃত্বকে উৎসাহিত করেছেন ম্যাসিগনন।

ম্যাসিগননের অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা তার পণ্ডিতি কাজকে কখনো কখনো অস্থির, অতিরিক্ত নাগরিক এবং প্রায়ই ব্যক্তিগত আন্দাজে পরিসিক্ত করে তুলেছে বলে মনে হয়। এই 'মনে হওয়া' ভুল-বোঝাবুঝির জন্ম দেয় এবং তা কোনোক্রমেই তার কাজের যথাযথ বিবরণ হতে পারে না। তিনি বিশেষভাবেই যা এড়াতে চেয়েছেন তা তার নিজের ভাষায় 'প্রাচ্যতত্ত্বের বিশ্লেষণাত্মক ও স্থির উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ'[৭৬]–ইসলামি রচনা বা সমস্যা বলে ধরে নেয়া কোনো কিছুর ওপর উৎস, উৎপত্তি, প্রমাণ, প্রদর্শন ইত্যাদির একরকম নিষ্ক্রিয় স্তূপ তৈরি বরং সর্বত্র তিনি চেষ্টা করেছেন রচনা বা সমস্যায় তার পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, যাতে একে প্রাণবন্ত করা সম্ভব হয়, যাতে রচনায় জড়িয়ে থাকা মানব-হৃদয়ের প্রবেশের জন্য নীতি ও প্রথার সীমানা মাড়িয়ে যেতে ইচ্ছুক ম্যাসিগননের মতো ব্যক্তিত্বের সহজাত ক্ষণিক অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা পাঠকদের বিস্মিত করা সম্ভব হয়। কোনো আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিক এবং অবশ্যই অর্জন ও প্রভাবের দিক থেকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দিবও, এত সহজে (ও যথাযথভাবে) একত্রে ইসলামি মরমিবাদের সাধক এবং ইয়ুথ, হেইসেনবার্গম মালার্মে, কিয়ের্কেগার্ডের উল্লেখ করতে পারেননি। এর সঙ্গে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার যে অসাধারণ সংশ্লেষণ দেখি আমরা তার ১৯৫২ সালের প্রবন্ধ 'প্রাচ্যের পূর্বের পাশ্চাত্য'[৭৭]-এ, তা খুব কম প্রাচ্যতাত্ত্বিকই অর্জন করতে পেরেছেন। তবু তার বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎ স্পষ্ট বর্ণনাযোগ্য। তার পেশাগত জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর রয়েছে নির্দিষ্ট একটি কাঠামো; এর পরিধি ও উল্লেখের অনুপম সমৃদ্ধি সত্ত্বেও তা কিছু অপরিবর্তিত ধারণায় অলংকৃত। সংক্ষেপে সেই কাঠামোর বর্ণনা এবং ধারণাগুচ্ছের তালিকা দেয়া যাক।

আব্রাহামের বংশধরদের মধ্যে টিকে থাকা প্রচলিত তিনটি ধর্ম দিয়ে শুরু করেন ম্যাসিগনন। তিন ধর্মের মধ্যে ঈসাহর কাছে প্রতিশ্রুত বেহেশতের প্রতিশ্রুতির বাইরের জনগোষ্ঠীর একেশ্বরবাদী ধর্ম হলো ইসলাম। অতএব, ইসলাম (পিতারূপী ঈশ্বর ও মূর্তরূপ ঈসাহকে) প্রতিরোধের ধর্ম। তবু এ ধর্ম হাজেরার চোখের পানিতে সূচিত দুঃখবোধ অক্ষুণ্ণ রাখে। ফলত আরবি অশ্রুর ভাষা, ঠিক যেমন ইসলামে জেহাদ সম্পর্কিত পুরো ধারণাটির (যাকে ম্যাসিগনন বলেছেন মহাকাব্যিক রূপ, যা রেনানের চোখ এড়িয়ে গেছে) গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক মাত্রা রয়েছে। এর লক্ষ্য হলো বাইরের শত্রু খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং অভ্যন্তরীণ শত্রু অর্থাৎ বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের মোকাবিলা করা। তবু ম্যাসিগননের বিশ্বাস ছিল তিনি একরকম বিরোধাত্মক প্রবাহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, যা মরমিবাদে মূর্ত ঐশ্বরিক

দয়ার দিকে নিবেদিত; এর অধ্যয়ন তার বুদ্ধিবৃত্তিক লক্ষ্যে পরিণত হয়। মরমিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর আত্মগত প্রকৃতি। এর যুক্তি-বিরহিত এমনকি ব্যাখ্যার অযোগ্য প্রবণতা মূলত ঐশ্বরিকতায় একক, ব্যক্তিগত ক্ষণস্থায়ী অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা। মরমিবাদ সম্পর্কিত ম্যাসিগননের সব রচনাই এভাবে রক্ষণশীল ইসলামি সমাজ কর্তৃক আরোপিত রীতি-নীতি বা সুন্নাহর সীমাবদ্ধতায় বন্দী আত্মার পরিচয় প্রদানের প্রয়াস। একজন আরব মরমি সাধকের চেয়ে একজন ইরানি মরমি অনেক বেশি সাহসী। এর আংশিক কারণ তিনি 'আর্য' (পুরোনো, উনিশ শতকীয় 'আর্য ও সেমেটিক' লেবেল ম্যাসিগননের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো, তেমনি ওই দুই ভাষা-পরিবারের যুগ্ম- বৈপরীত্য সম্পর্কে শ্লেগেলের অভিমতের বৈধতাও[৭৮]); অন্য কারণ তিনি এমন এক মানুষ যিনি ক্রটিহীনতা খুঁজে বেড়ান। ম্যাসিগননের মতে আরব মরমিবাদ হলো ওয়ার্ডেনবার্গ যাকে বলেছেন প্রামাণ্য অদ্বৈতবাদ। ম্যাসিগননের উদাহরণ হলেন আল-হাল্লাজ। আল-হাল্লাজ রক্ষণশীল সমাজ থেকে নিজের মুক্তি চেয়েছেন; এবং পরিশেষে ইসলামে নিষিদ্ধ ক্রশ-বিদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। ম্যাসিগননের অভিমত মোহাম্মদ (সা.) ও খোদার মধ্যকার পার্থক্য মোচনের সুযোগ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন মোহাম্মদ নিজেই। অতএব, আল-হাল্লাজের অর্জন হলো ইসলামের খুঁটিনাটি রীতি-নীতির বিরুদ্ধে আল্লাহর সঙ্গে মরমি মিলন।

রক্ষণশীল সমাজের বাকি অংশ বাস করে তত্ত্ববিদ্যাগত তাড়নার মধ্যে। আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেন একরকম 'অনুপস্থিত'-এ উপস্থিত থাকতে অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। তবু আল্লাহর ইচ্ছায় (ইসলাম) নিবেদিত মুসলমানের চৈতন্য সৃষ্টি করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এবং মূর্তিপূজার প্রতি সহনশীলতার নিতান্ত অভাব। 'খতনা করা হৃদয়' এসব ধারণাগুচ্ছের আবাসস্থল। কঠোর নীতিমান মুসলমানের মধ্যে যেমন আল হাল্লাজে-চিরতরে বন্দী এ আত্মা অ-পার্থিব আবেগ বা আল্লাহর প্রেমে জ্বলে ওঠে। উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের একাবস্থায় (তাওহিদ) প্রতিজ্ঞাপূর্বক সমর্পণ অথবা আল্লাহর প্রেমের মধ্যে দিয়ে তাওহিদকে বারবার উপলব্ধি করতে হয়। ম্যাসিগনন এক জটিলতর নিবন্ধে লিখেছেন তাওহিদ উপলব্ধির ব্যাপারটিই ইসলামের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বর্ণনা করে।[৭৯]

স্পষ্টত ইসলামের মরমি দিকটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ম্যাসিগননের সহানুভূতি। এর কারণ তার ক্যাথলিক মননের সঙ্গে ইসলামি মরমিবাদের নৈকট্য এবং রক্ষণশীল গোষ্ঠীতে এর বিপর্যয়কর প্রভাব। ম্যাসিগননের ইসলামের চিত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এর অবিরাম প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে (অন্যান্য আব্রাহামীয় ধর্মের তুলনায়) এর বিলম্বিত আবির্ভাব, পার্থিব বাস্তবতা সম্পর্কে এর তুলনামূলক অর্থহীনতাবোধ, আল্লা-হাল্লাজ ও অন্যান্য সুফিসাধক আত্মার যে ধরনের আলোড়ন-বিলোড়নের চর্চা

করেছেন তার বিরুদ্ধে এর আত্মরক্ষামূলক বিশাল কাঠামো, তিনটি বিরাট একেশ্বরবাদী ধর্মের মধ্যে টিকে থাকা সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে এর আলাদা অবস্থান ইত্যাদির সঙ্গে।[৮০]

ইসলাম সম্পর্কে এমন 'সুষম, স্পষ্ট'[৮১] (বিশেষ করে ম্যাসিগননের এমন সমৃদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্রে) অনিবার্য কঠোর মতো কিন্তু ইসলামের প্রতি কোনো গভীর শত্রুতা দেখায় না। ম্যাসিগননের পড়তে গেলে পাঠকই অবাকই হবেন যে, লেখক বারবার জটিল পাঠ-এর ওপর জোর দিচ্ছেন, সরলতর পাঠের ওপর আরোপ করছেন নিষেধাজ্ঞা, যার আন্তরিকতা বিষয়ে সন্দেহ পোষণ অসম্ভব। ১৯৫১ সালে তিনি লিখেন যে, তার বর্ণিত প্রাচ্যতত্ত্ব আবেগের চর্চা নয়, বা ইউরোপ কর্তৃক (প্রাচ্যকে) দোষারোপও নয় বরং প্রাচীন সভ্যতার প্রকৃত ঐতিহ্য ও আমাদের গবেষণাপদ্ধতির মধ্যে আদর্শ সমন্বয়।[৮২] আরবি বা ইসলামি রচনাপাঠে এই প্রাচ্যতত্ত্ব প্রয়োগ করলে দেখা যাবে তা এক মোহময় বুদ্ধিবৃত্তির ভাষ্য সরবরাহ করে। ম্যাসিগননের মহত্ত্ব ও নিখাদ প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা না দেখানো বোকামি হবে। তবু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তার দেয়া প্রাচ্যতত্ত্বের সংজ্ঞার এ দুটো বাক্যাংশ : (প্রাচ্যতত্ত্ব হলো) 'আমাদের গবেষণাপদ্ধতি' এবং 'প্রাচীন সভ্যতার প্রকৃত ঐতিহ্য'। ম্যাসিগনন দেখেন এ দুইয়ের সংশ্লেষ হিসেবে তিনি যা করেন তা পরিমাণগত দিক থেকে পরস্পর বিরোধিতা করে; এদের বৈপরীত্যই মূল সমস্যা, ইউরোপ ও প্রাচ্যের বৈপরীত্যের বাস্তবতা নয়। তিনি মনে করেন, প্রাচ্য ও ইউরোপের পার্থক্যের সারসত্তা হলো প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ও সাম্প্রতিক বিষয়সমূহের ওপর তার লেখায় পুব-পশ্চিম পার্থক্য সবচেয়ে অদ্ভুত রূপ গ্রহণ করে এবং এখানেই তাৎক্ষণিকভাবে ম্যাসিগননের চিন্তার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারবেন পাঠক।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্ককে যে দৃষ্টিতে দেখেন ম্যাসিগনন তাতে প্রাচ্যে পশ্চিমের দখলাভিযান, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, ইসলামের ওপর অবিরাম আক্রমণ প্রভৃতির জন্য পশ্চিমকে কঠোরভাবে দায়ী করেন তিনি। মুসলিম সভ্যতার পক্ষে তিনি বিরামহীন যোদ্ধা। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালের পর থেকে তার লেখা বহু গ্রন্থ নিবন্ধ ও চিঠিপত্রে ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে আরব মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের অধিকারের পক্ষ সমর্থনে–আব্বা এবেনের বরাত দিয়ে তিনি কঠোর ভাষায় যাকে অভিহিত করেছেন ইসরাইলের 'বুর্জোয়া উপনিবেশবাদ'[৮৩] বলে। এ সত্ত্বেও যে চিন্তাকাঠামোয় ম্যাসিগননের দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত তা ইসলামি প্রাচ্যকে অনিবার্যভাবে প্রাচীন এককালের সঙ্গে যুক্ত করে, আর পশ্চিমকে আধুনিকতায়। বরার্টসন স্মিথের মতো ম্যাসিগননও মনে করেন প্রাচ্যজন আধুনিক মানুষ নন, সেমেটিক মানুষ। এই সংকোচক বর্গীয় গেরো আঁটো হয়ে বসে ম্যাসিগননের চিন্তায়।

১৯৬০ সালে ম্যাসিগনন এবং কলেজ ডি ফ্রান্সে তার সহকর্মী জ্যাক বারাক 'আরব' সম্পর্কে তাদের কথোপকথন প্রকাশ করেন ইস্পিরিট পত্রিকায়। আলোচনায় দীর্ঘ সময় দেখা হয় একটি প্রশ্ন মীমাংসার পেছনে। তা হলো, সমকালীন আরব সমস্যাসমূহ দেখার সবচেয়ে ভালো উপায় কি এ রকম বলা যে, এগুলো সেমেটিক সমস্যা। যেমন : আরব-ইসরাইলি সংঘাত। বারাক বিনয়ের সঙ্গে বারবার আপত্তি তোলার চেষ্টা করেন এবং ম্যাসিগননকে একটা সম্ভাবনা দেখাতে চান যে হয়তো পৃথিবীর অন্য অনেক অঞ্চলের মতো আরবও বারাকের ভাষায় 'নৃ-তাত্ত্বিক ভিন্নতা'র মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ম্যাসিগনন তা বাতিল করে দেন।[৮৪] ফিলিস্তিনি সংঘাত বোঝার ও তার ওপর রিপোর্ট করার জন্য ম্যাসিগননের বারংবার প্রয়াস কখনো ইসহাক ও ইসমাঈলের সংঘাতের আবহ থেকে বেরোতে পারেনি; কিংবা ইসরাইলের সঙ্গে তার সংঘাতের পটভূমিতে, ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টান ধর্মের পারস্পরিক উত্তেজনার বৃত্ত পার হয়ে আসতে পারেনি; যদিও এ সংঘাতে সব মানবিক দিক উপস্থিত রয়েছে। ইহুদিবাদীরা যখন আরব শহর ও গ্রামগুলো দখল করে নেয়, তখন আঘাত লাগে ম্যাসিগননের ধর্মীয় সংবেদনশীলতায়।

ইউরোপ, বিশেষ করে ফ্রান্সকে দেখা হয় সমকালীন বাস্তবরূপে। এর আংশিক কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের সঙ্গে তার প্রাথমিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ ব্রিটেনের নীতি বিষয়ে তার প্রকাশ্য বিরোধিতা। লরেন্স ও এ শ্রেণির অন্যদের গৃহীত নীতি খুবই জটিল; ফয়সালের সঙ্গে আলোচনায় ম্যাসিগনন তার বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশরা প্রাচ্যে 'সম্প্রসারণ, অনৈতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সেকেলে দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করছে বলে মনে হয়।[৮৫] ফরাসিরা আরও আধুনিক মানুষ। তারা আধ্যাত্মিক, ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যা হারিয়েছে, প্রাচ্যে তা ফিরে পেতে চায়। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে ম্যাসিগননের বিনিয়োগের পেছনে আছে গোটা উনিশ শতক ধরে চলে আসা এ ধারণা যে, পশ্চিম প্রাচ্যকে তার নিজের মনোচিকিৎসাগত প্রয়োজনে একরকম থেরাপি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এর আধ্যাত্মধর্মী অনুপ্রেরণার আদি-উৎস কুইনেট। ম্যাসিগননে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খ্রিষ্টীয় করুণার বোধ :

> প্রাচ্যদেশীয়দের প্রশ্নে, আমাদের উচিত করুণার বিজ্ঞান অবলম্বন করা, এমনকি তাদের ভাষা ও মানসিক কাঠামো পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই 'অংশগ্রহণে, যে কাজে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে আমাদের। কারণ, এ বিজ্ঞান এমন সত্যের সাক্ষী যা আমাদেরও সত্য না হলে এমন সত্যের যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি এবং এখন যাকে ফিরে পেতেই হবে। সবশেষে, কারণ গভীরতর অর্থে যা অস্তিত্বশীল তা কোনো-না কোনোভাবে ভালো; এবং উপনিবেশের ওই বেচারারা কেবল আমাদের জন্য নয়, ওদের নিজেদের মধ্যে নিজেদের জন্যও জীবন ধারণ করছে।[৮৬]

যা হোক, প্রাচ্যজন, নিজে নিজেকে বুঝতে অথবা গ্রহণ করতে অক্ষম। এর একটি কারণ ইউরোপ তাদের যা করেছে : তারা তাদের ধর্ম ও দর্শন হারিয়েছে; মুসলমানের

মধ্যে আছে 'বিরাট এক শূন্যতা' ওরা নৈরাজ্য ও আত্মহত্যার খুব নিকটস্থ; তাই ফ্রান্সের দায়িত্ব হলো মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সংস্কৃতি, সামাজিক জীবনের রীতিনীতি ও বিশ্বাসীদের উত্তরাধিকার রক্ষা করা।[৮৭]

কোনো পণ্ডিত, এমনকি কোনো ম্যাসিগননও, তার জাতির চাপ এবং তিনি যে পণ্ডিতি ঐতিহ্যে কাজ করেন তার চাপ প্রতিরোধ করতে পারেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্পর্ক বিষয়ে তিনি যা বলেন তা যেন অন্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের বক্তব্যের পরিশোধিত ও পুনরাবৃত্ত রূপ। আমরা এমন সম্ভাবনা মেনে নিতে পারি যে, এই পরিশোধন, ব্যক্তিরীতি, ব্যক্তিগত প্রতিভা শেষ পর্যন্ত প্রথা ও জাতীয় আবহে সক্রিয় রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিতে পারে। এমন সম্ভব হলেও, ম্যাসিগননের বেলায় আমরা দেখব প্রাচ্যবিষয়ক ধারণার অন্তত একটি জায়গায় তিনি সম্পূর্ণ প্রথানুগ ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক, তাদের ব্যক্তিত্ব ও উল্লেখযোগ্য উৎকেন্দ্রিকতা যাই থাকুক। তার মতে, ইসলামি প্রাচ্য আধ্যাত্মিক, সেমেটিক, উপজাতীয়, পরম একেশ্বরবাদী, অনার্য; বিশেষণগুলো শেষ উনিশ শতকের নৃ-তাত্ত্বিক বিবরণের অনুরূপ। যুদ্ধ, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আর্থ-দমন, প্রেম, মৃত্যু, সাংস্কৃতিক দেয়া-নেয়া প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপারগুলোকে মনে হয় ম্যাসিগননের চোখে পড়েছে অধিবিদ্যাগত জিনিস হিসেবে, ফলত অ-মানবীকৃত লেন্সের মধ্য দিয়ে; এগুলো সেমেটিক, ইউরোপীয়, প্রাচ্যদেশীয়, পশ্চিমা, আর্য ইত্যাদি। এসব বর্গ কাঠামোবদ্ধ করেছে তার জগৎকে এবং তার নিজের ভাষায়–তার মধ্যে সঞ্চার করেছে গভীরতরবোধ। ম্যাসিগনন নিজেকে এক বিশেষ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। ইসলামকে তিনি একদিকে ইউরোপ থেকে, অন্যদিকে ইসলামেরই রক্ষণশীলতা থেকে রক্ষা করেন। প্রাণসঞ্চারক ও মহত্তর এই হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে প্রাচ্যের ভিন্নতা) প্রাচ্যকে তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তনের জন্য তার প্রয়াস। উভয় ক্ষেত্রে, ম্যাসিগননে জ্ঞানের ইচ্ছা প্রবল। তার আল-হাল্লাজ সেই ইচ্ছার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব। আল-হাল্লাজে আরোপিত অসম হারের গুরুত্ব দুটো জিনিস চিহ্নিত করে : এক. একটি চরিত্রকে তার প্রচলিত সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে তুলে আনার লক্ষ্যে লেখকের সিদ্ধান্ত; দুই. আল-হাল্লাজ সেই খ্রিষ্টীয় সমাজের প্রতি অবিরাম চ্যালেঞ্জের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যারা মনে করে বিশ্বাস অর্থ এই নয় যে, এর জন্য আত্ম-উৎসর্গ করা যাবে, অথচ যা সুফিদের জন্য প্রযোজ্য। উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামের আল-হাল্লাজ একটি সাহিত্যিক পরিকল্পনা, একটি পদ্ধতি যা ম্যাসিগনন নিজে বর্ণনা করেছেন একে আল-হাল্লাজ দিয়ে আবৃত করে চালিয়ে দেয়ার জন্য।

যাই ঘটে থাকুক, এখনই বলার প্রয়োজন নেই যে, ম্যাসিগননের কাজ বিকৃত মানসিকতার বাহক, কিংবা 'সাধারণ' মুসলমান আকৃষ্ট হবে এমনভাবে ইসলামকে বিকৃত করেছেন তিনি। একজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম পণ্ডিত শেষোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে

তর্ক তুলেছেন; তিনি অবশ্য ম্যাসিগননের নাম করেননি।[৮৮] পাশ্চাত্যে যে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, তা দেখানোই যেহেতু এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাই অনেকেই একমত হবেন যে, তর্কের মূল বিষয় হলো কোনো কিছুর সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব আদৌ সম্ভব কি না, কিংবা প্রতিনিধিত্ব যেহেতু প্রতিনিধিত্ব তাই কোনো একটি বা সব প্রতিনিধিত্ব প্রথমে প্রতিনিধিত্বকারীর ভাষায়, অতঃপর সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক আবহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় কি না। যদি শেষেরটি সঠিক হয় (যা আমি মনে করি) তাহলে আমাদের এই সত্য স্বীকার করে নিতে হবে যে, প্রতিনিধিত্ব 'সত্য' ছাড়াও অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে বিজড়িত, প্যাঁচ-খাওয়া, প্রবিষ্ট ও আন্তর্বুননে যুক্ত; আবার এখানে 'সত্য' নিজেও প্রতিনিধিত্ব মাত্র। অতএব আমরা পদ্ধতিগতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, প্রতিনিধিত্ব (বা ভুল-প্রতিনিধিত্ব—পার্থক্য কেবল মাত্রায়) খেলার একটি সর্বজনীন ক্ষেত্রে বিরাজ করা যে ক্ষেত্রটি সংজ্ঞায়িত হয়েছে প্রতিনিধিত্ব বা ভুল প্রতিনিধিত্ব-এর জন্যই। এ সংজ্ঞায়ন সম্পন্ন হয় কিছু সর্বজনীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, ডিসকোর্সের জগৎ দ্বারা। এ বিষয়টি কোনো একজন পণ্ডিতের সৃষ্টি নয়, তবে যে কোনো পণ্ডিত এ ক্ষেত্রটিকে ব্যবহার করতে পারেন এবং তিনি এখানে এসে নিজের জায়গায়ও খুঁজে পেয়ে যান; অতঃপর তিনি জ্ঞান ক্ষেত্রটিতে নিজের অবদান রাখেন। অবদান হলো, ব্যতিক্রমী প্রতিভার বেলায়ও, জ্ঞান ক্ষেত্রে বিরাজমান বিষয়গুলো পুনরায় বিন্যস্ত করে প্রদর্শন; এমনকি যেসব পণ্ডিত কোনো হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন তিনিও 'খুঁজে-পাওয়া' রচনাকে দেখান আগে থেকে এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত কোনো পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ, সেটিই হলো কোনো পাণ্ডুলিপি 'উদ্ধার'-এর প্রকৃত অর্থ। এভাবে এ জ্ঞানক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি অংশগ্রহণকারী প্রথমে পরিবর্তন নিয়ে আসেন, পরে প্রতিষ্ঠিত করেন একরকম স্থিতিশীলতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিধির জায়গায় বিশটি এমন ধরনের কম্পাস রয়েছে যে তাতে একুশতম কম্পাসটি স্থাপন করলেই তাদের কাঁটার কম্পন শুরু হয়ে যাবে; তবে শেষে স্থির হবে কোনো এক জায়গায় এসে।

ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতিনিধিত্বকে বলা যায় অপ্রাসঙ্গিক সংগতির মতো; যার নিজস্ব ইতিহাস আছে এবং প্রদর্শনের মতো বস্তুগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি আছে। রেনান প্রসঙ্গে আমি বলেছি এ ধরনের সংগতি আসলে সাংস্কৃতিক চর্চাধারা ও প্রাচ্য সম্পর্কে ভাষ্য-বিবৃতি প্রদানের সুযোগ নিয়ে সক্রিয় একটি পদ্ধতি। আমার বক্তব্যের সামগ্রিক অর্থ এই নয় যে, এ পদ্ধতিটি কেবল প্রাচ্যের সত্তার ভুল প্রতিনিধিত্ব বরং আমি তা একমুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করি না। আমি বলতে চাই এটি প্রতিনিধিত্বের মতো কাজ করে, কোনো একটি উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোনো ঐতিহাসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এমনকি অর্থনৈতিক বিন্যাসে একটি বিশেষ প্রবণতা নিয়ে।

অন্য কথায়, প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে আছে এগুলো অধিকাংশ সময় সক্রিয় থাকে এবং এক বা একাধিক লক্ষ্য পূরণ করে। প্রতিনিধিত্ব হলো গঠন বা রোঁলা বার্থ যেমন বলেছেন, সব ভাষার ক্রিয়াশীলতাই বি-গঠন। প্রতিনিধিত্ব হিসেবে প্রাচ্য হলো ইউরোপে ভৌগোলিক এলাকা 'পুব'-এর প্রতি ক্রমেই সুনির্দিষ্ট সংবেদনশীলতা থেকে গঠন বা বি-গঠন। বিশেষজ্ঞরা এর ওপর কাজ করেছেন। কারণ, সময়ে তাদের প্রাচ্যতাত্ত্বিক পেশার জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যেন তারা বলতে পারেন তারা তাদের সমাজকে প্রাচ্যের রূপ, জ্ঞান ও এ সম্পর্কিত অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করেছেন। প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রাচ্যকে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সমাজকে যা প্রদান করেন (ক) তা তার স্বাতন্ত্রিক চিহ্ন বহন করে (খ) তা দেখায় তার মতে প্রাচ্য কি বা কি হওয়া উচিত (গ) তা সচেতনভাবে প্রাচ্য সম্পর্কে অন্য কারও মতামতের বিরোধিতা করে (ঘ) তা প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্সের জন্য ওই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত রসদ জোগায় (ঙ) তা সংশ্লিষ্ট যুগের সাংস্কৃতিক, পেশাগত, জাতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাও সাড়া দেয়। দেখা যায় ইতিবাচক জ্ঞানের ভূমিকা পরম রূপ থেকে অনেক দূরে, যদিও তা কখনো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে না। 'জ্ঞান' কখসো কাঁচামাল, অপরিশোধিত কিংবা কেবল উদ্দেশ্যমূলক নয়। ওপরে বর্ণিত প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রতিনিধিত্বের পাঁচটি আরোপিত গুণ বা ধর্মসঞ্চার ও পুনঃসঞ্চার করে তা-ই জ্ঞান।

এভাবে দেখা যেতে পারে যে, ম্যাসিগনন যতটা না পুরাণায়িত 'প্রতিভা' তার চেয়ে বেশি নির্দিষ্ট ধরনের ভাষা-বিবৃতি উৎপাদনের পদ্ধতি; এসব ভাষ্য-বিবৃতি আবার পরস্পর ভিন্নতাযুক্ত গঠনের বিপুল স্তূপে মিশে যায়, যা সৃষ্টি করে তার যুগের আর্কাইভ বা সাংস্কৃতিক বস্তু-বিষয়াদি। আমি মনে করি, না তা মেনে নিলে ম্যাসিগননকে অমানবিক করা হয় বা তাকে জীর্ণ নিয়তিবাদের শিকারে সংকুচিত করা হয় বরং এক অর্থে এই উপায়েই আমরা দেখতে পারি একজন মানুষ কীভাবে এমন সাংস্কৃতিক ও উৎপাদনমুখী মেধা অর্জন করতে সক্ষম হন, যার রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বা অতি-মানবিক মাত্রা। এমনই হওয়া উচিত সেই সীমাবদ্ধ মানুষের আকাঙ্ক্ষা, যিনি সময় ও পরিসরে তার সীমাবদ্ধ উপস্থিতিতে সন্তুষ্ট নন। ম্যাসিগনন যখন বলেন, 'আমরা প্রত্যেকেই সেমিটিকদের সমান' তখন তিনি নির্দেশ করেন তার সমাজের ওপর তার ধারণার বিস্তার; ইঙ্গিত করেন তার প্রাচ্যবিষয়ক ধারণা ব্যক্তি ফরাসি বা ফরাসি সমাজের স্থানীয় গালগল্পের পরিস্থিতি ছাড়িয়ে কতটা উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে। 'সেমেটিক' বর্গ ধারণাটি ম্যাসিগননের প্রাচ্যতত্ত্ব থেকে পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু তার শক্তির উৎস হলো সংশ্লিষ্ট জ্ঞানক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার বাইরে বিস্তৃতির প্রবণতা—একটি বৃহৎ ইতিহাস ও নৃ-তত্ত্বে ছড়িয়ে পড়ার ঝোঁক, যেখানে তার রয়েছে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বৈধতা ও ক্ষমতা।[৮৯]

ম্যাসিগননের প্রাচ্যবিষয়ক নির্মাণ ও প্রতিনিধিত্বের বৈধতা প্রশ্নহীন না হলেও অন্তত একটি ক্ষেত্রে তার সরাসরি প্রভাব স্বীকার্য : পেশাজীবী সংঘের অভ্যন্তরে গিব কর্তৃক ম্যাসিগননের কৃতিত্ব স্বীকার করার ঘটনা ইঙ্গিত করে তারা মনে করেন গিবের নিজের কাজের বিকল্পরূপে ম্যাসিগননের বক্তব্যও অবলম্বন করা যায়। আমি কেবল ম্যাসিগননের প্রতি গিবের শ্রদ্ধাঞ্জলির ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। তবে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে যদি আমরা গিবের কাজের দিকে নজর দিই।

আলবার্ট হুরানি কর্তৃক গিবের ওপর লেখা স্মৃতিচারণামূলক অসাধারণ নিবন্ধ গিবের পেশাগত জীবন, তার প্রধান প্রধান ধারণাসমূহের সারোৎসার ও তার কাজের গুরুত্ব চমৎকারভাবে বর্ণনা করে–হুরানির বিশ্লেষণের মূল বিন্যাসের সঙ্গে আমি একমত। তবু কিছু জিনিস তার নজর এড়িয়ে গেছে, যার ক্ষতিপূরণ আছে উইলিয়াম পক-এর 'প্রাচ্যতত্ত্ব ও ইতিহাসের মধ্যে স্যার হ্যামিল্টন গিব'[৯০] শিরোনামের রচনায়। হুরানি মনে করেন গিব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রভাব ইত্যাদির উৎপাদন। গিব বোঝার কাজে হুরানির তুলনায় বেশ অ-সূক্ষ্ম ও অপরিশোধিত। পক গিবকে দেখেন প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত প্রতিভারূপে; বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণামূলক মত সম্মিলন হিসেবে।

থমাস কুন থেকে নেয়া এ ধারণাটি এক অর্থে গিবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। হুরানি আমাদের মনে করিয়ে দেন গিব ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব। প্রথম জীবনে লণ্ডনে বা মধ্যজীবনে অক্সফোর্ডে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে, কিংবা শেষদিকে হার্ভার্ডে মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন কেন্দ্রের পরিচালকের প্রভাবশালী পদে থাকাকালে সারা জীবন ধরে গিব বলেছেন, তার মধ্যে আছে প্রতিষ্ঠিত একাডেমির অভ্যন্তরীণ আবহে স্থির ও সহজ মনের স্পষ্ট ছাপ। ম্যাসিগনন নিঃসন্দেহে আগন্তুক, গিব স্থানীয়। উভয়েই যথাক্রমে ফরাসি ও অ্যাংলো-আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্বে বিপুল খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী। গিবের প্রাচ্য সরাসরি অভিজ্ঞতাজাত নয়–গঠিত, জেনে নেয়া, অধীত–জ্ঞানী সম্প্রদায়, বিশ্ববিদ্যালয় আর পণ্ডিতি সম্মিলনের সীমাবদ্ধতায় লিখিত। ম্যাসিগননের ন্যায় গিবও মুসলমানদের বন্ধুত্ব পেয়েছেন, কিন্তু কার্যোপলক্ষে বন্ধুত্ব, আন্তরিক কিছু নয়। অতএব, গিব হলেন ব্রিটিশ ও পরে মার্কিন প্রাচ্যতত্ত্বের কাঠামোয় এক সাম্রাজ্যিক ব্যক্তিত্ব, যার কাজ বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যে খুবই সচেতনভাবে জাতীয় প্রবণতা প্রদর্শন করে।

একটি উদাহরণ দেয়া যায়। পূর্ণ বয়সে গিব প্রায়ই নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করতেন, এ বিষয়ে লিখতেন। ১৯৫১ সালে দি নিয়ার ইস্ট অ্যান্ড দি গ্রেট পাওয়ার শিরোনামের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে তিনি অ্যাংলো-আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্ব অধ্যয়ন বিস্তৃত করার যুক্তিতে লিখেন যে :

> ...আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমের সব দেশের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা এখন আর যুদ্ধ-পূর্বকালীন মর্যাদার উপাদানে নির্ভর করতে পারি না, তেমনি আশা করতে পারি না, যে আমরা বসে থাকব, আর আমাদের কাছে জ্ঞান নিতে আসবে আফ্রিকা বা এশিয়া বা পূর্ব-ইউরোপের মানুষরা। আমাদের ওদের সম্পর্কে জানতে হবে, যাতে ওদের সঙ্গে এমন সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ করার কায়দা বুঝতে পারি: যা হবে পারস্পরিক-এর নিকটবর্তী কিছু।[৯১]

এই নতুন সম্পর্কের শর্ত পরিষ্কার উচ্চারণ করা হয় 'এরিয়া স্টাডিজ রিকনসিডার্ড'-এ। এরিয়া স্টাডিজ বা অঞ্চলবিদ্যা এখন আর অতটা পণ্ডিতি চিন্তাভাবনা হয়ে ওঠার প্রয়োজন নেই বরং একে হতে হবে সদ্য-স্বাধীন, সম্ভবত একগুঁয়ে প্রাক্তন উপনিবেশিত জাতিসমূহের ব্যাপারে জাতীয় নীতির অবলম্বনরূপে। আটলান্টিক অঞ্চলের কমনওয়েলথভুক্ত জাতিসমূহের ওপর তার পুনর্যোজিত সচেতনতার অস্ত্রে শক্তিশালী প্রাচ্যতাত্ত্বিক হবেন নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী ও নতুন প্রজন্মের তরতাজা একদল পণ্ডিতের পথ নির্দেশক।

গিবের পরবর্তী সময়ের রচনায় প্রাচ্যতাত্ত্বিকের কাজের ইতিবাচক পাণ্ডিত্য অতটা গুরুত্ব পায় না (তরুণ বয়সে মধ্য এশিয়ায় মুসলিম অভিযান নিয়ে গবেষণা করার সময় যে রকম পণ্ডিত ছিলেন গিব), বরং জনসমাজে সে কাজের প্রায়োগিক অভিযোজন ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হুরানি লিখেছেন :

> তার (গিবের) পরিষ্কার উপলব্ধি হয় যে, আধুনিক সরকার ও এলিট তাদের নিজেদের সামাজিক জীবন ও নৈতিক প্রথা ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেই কাজ করছে; এটিই তাদের ব্যর্থতার কারণ। তখন থেকে তার লক্ষ্য হয় অতীতের সতর্ক অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজের নির্দিষ্ট প্রকৃতি, এর সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের জগৎকে আলোকিত করা, যা এর অন্তস্তলজুড়ে অবস্থান করে। এমনকি এ সমস্যাকেও তিনি প্রথমে দেখেন কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে।[৯২]

তবু প্রথম জীবনের রচনায় ব্যাপক প্রস্তুতি ছাড়া পরবর্তীকালে গিবের এ রকম দৃষ্টি পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমরা তাকে বোঝার জন্য সে ব্যাপারটিই খুঁজে দেখব। গিবের ওপর প্রভাবসঞ্চারি ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম চিহ্নিত করা যায় ডানকান ম্যাকডোনাল্ডকে। তার কাছ থেকেই গিব এ ধারণা লাভ করেন যে ইসলাম জীবন-যাপনের একটি সমন্বিত পদ্ধতি। তবে সে সমন্বয়ের জন্য জীবন-যাপনকারী কোনো জনগোষ্ঠীর তেমন কৃতিত্ব নেই; মতবাদগত কিছু নীতিমালা, ধর্মচর্চার পদ্ধতি, শৃঙ্খলার ধারণা সমন্বয়ের কাজটি সম্পন্ন করেছে, তাতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মুসলমান। আমজনতা ও ইসলামের মধ্যে একধরনের বহুমাত্রিক দেয়া-নেয়া আছে; কিন্তু পশ্চিমের শিক্ষার্থীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ইসলামের হস্তক্ষেপের

ক্ষমতা যার সাহায্যে তা ইসলামি জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে বোধগম্য রূপ দেয়।

ম্যাকডোনাল্ডের মতে অতঃপর গিবের মতানুযায়ী অধ্যয়নের বিষয়রূপী ইসলামের (যে সম্পর্কে বিশাল সাধারণ বিবৃতি প্রদান সম্ভব)। জ্ঞানতাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত জটিলতাকে কখনো বশে আনা সম্ভব হয়নি। ম্যাকডোনাল্ডের ধারণা ইসলাম অধ্যয়নে প্রাচ্যদেশীয় মনের অনেক বিমূর্ত ধারণা উপলব্ধি করা সম্ভব। তার সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রন্থ (গিবের কাছে যার গুরুত্ব কোনোভাবেই খাটো নয়) দি রিলিজিয়াস অ্যাটিচুড অ্যান্ড লাইফ ইন ইসলাম-এর গোটা একটি অধ্যায়জুড়ে আছে পুবের বা প্রাচ্যের মন সম্পর্কে বিতর্ক অযোগ্য, ঘোষণাধর্মী মন্তব্যের সংকলন। তিনি শুরু করেছেন এই দিয়ে যে, 'আমি মনে করি এটি পরিষ্কার ও স্বীকৃত যে, পশ্চিমাদের তুলনায় প্রাচ্যদেশীয়দের কাছে অ- দেখা কোনো কিছু অনেক বেশি বাস্তব ও নিকটবর্তী।' 'বিশাল সংস্কারক উপাদানরাশি যেগুলোকে মনে হয় সময় সময় সাধারণ নিয়মসমূহকে এলোমেলো করে দিয়েছে প্রায়, সেগুলো আসলে তা করে না; এমনকি প্রাচ্যদেশীয় মনের পরিচালক অন্যান্য সাধারণ ও তীব্র নীতি-নীতিগুলোকেও বিশৃঙ্খল করে না। 'অ-দেখা জিনিসে বিশ্বাস স্থাপন প্রাচ্যদেশীয় মনের অনিবার্য পার্থক্য নয়, বরং দেখা জিনিসে একটি পদ্ধতি আরোপের অক্ষমতাই মূল সমস্যা।' আরেকটি দিক হলো 'প্রাচ্যদেশীয়দের পার্থক্য ধর্মীয় নয় বরং আইনিবোধের অভাব। প্রকৃতির কোনো স্থির বিন্যাস তার অসম্ভব মনে হয়।' পরবর্তীকালে গিব এ সমস্যাকে আরবি সাহিত্যে রূপ-সংগঠনের অভাব এবং বাস্তবতা সম্পর্কে মুসলমানদের অনুপুঙ্খে আগ্রহের জন্য দায়ী করেন। এ-জাতীয় 'সত্য' বিজ্ঞানে ইসলামের অভাবনীয় অর্জনে কেন নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি– যে অর্জনের ওপর পশ্চিমের বিজ্ঞান অনেকখানি নির্ভরশীল–সে প্রশ্নে ম্যাকডোনাল্ড নীরব। তিনি তার তালিকা বর্ণনা অব্যাহত রাখেন : 'প্রাচ্যদেশীয়দের কাছে যে কোনোকিছুই সম্ভব, অতিপ্রাকৃত তার এত নিকটবর্তী যে তা যেকোনো সময় তাকে ছুঁয়ে দিতে পারে।' একটি উপলক্ষ অর্থাৎ প্রাচ্যে একেশ্বরবাদের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জন্ম ম্যাকডোনাল্ডের কাছে পুব-পশ্চিমের পার্থক্য বিষয়ে বিরাট এক তত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়; এতে বোঝা যায় প্রাচ্যতত্ত্ব ম্যাকডোনাল্ডকে কতটা নিবেদিত করে তুলেছিল। এখানে তার সারাংশ উদ্ধৃত করা হলো :

> জীবনকে ধীরস্থিরভাবে, সামগ্রিকভাবে উপলব্ধির অক্ষমতা: জীবন সম্পর্কিত যেকোনো তত্ত্বকে যে জীবনের সবদিক, ঘটনা ও দায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা বোঝার অক্ষমতা, একটি মাত্র অন্ধ ধারণার সাহায্যে সবকিছু মাড়িয়ে যাওয়ার দায়; আমি মনে করি, এটিই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পার্থক্য।[৯৩]

এর কিছুই নতুন নয়। শ্লেগেল থেকে রেনান, রবার্টসন স্মিথ থেকে টি ই লরেন্স পর্যন্ত অনেকের মধ্যে এসব ধারণা ঘুরেফিরে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এগুলো প্রকৃতির

কোনো সত্য নয় বরং প্রকাশ করে প্রাচ্য সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্তকে। ম্যাকডোনাল্ড বা গিবের মতো যেই প্রাচ্যতত্ত্ব নামে একটি পেশায় প্রবেশ করেন তিনিই এসব করেন একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী–তা হলো প্রাচ্য হচ্ছে প্রাচ্য, প্রাচ্য হচ্ছে অন্য রকম ইত্যাদি। অতএব, প্রাচ্যকে সীমাবদ্ধ রাখার নিমিত্তে জ্ঞান- ক্ষেত্রটির বিশদায়ন, পরিশোধন, ঘটনাক্রমিক উচ্চারণ ওই সিদ্ধান্তকে দীর্ঘজীবী করে। প্রাচ্যের দায়সমূহকে একটি মাত্র ধারণার দ্বারা মাড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ম্যাকডোনাল্ড বা গিবের মতামতে বোধগম্য কোনো শ্লেষ ধরা পড়ে না; তেমনি প্রাচ্যতত্ত্বের দায়-দায়িত্বসমূহকে একটি মাত্র প্রাচ্যদেশীয় পার্থক্যের দ্বারা মাড়িয়ে যাওয়ার (যা করেছেন ম্যাকডোনাল্ড) ব্যাপারটিও মানুষের বোধগম্য বলে মনে হয় না। আবার 'ইসলাম' বা 'প্রাচ্য'-এর মতো পাইকারি আখ্যাগুলোকে এমনভাবে নাম-বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করে তার সঙ্গে বিশ্লেষণ ও ক্রিয়াজুড়ে দেয়া হয়, যাতে মনে হয় এগুলো যেন কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে, মানসিক ধারণামাত্রকে নয়। এ ধরনের কাজও কোনো মানুষের জানা ব্যাপার বলে বোধ হয় না।

তাই, এটি কোনো দুর্ঘটনা নয় যে, গিব ইসলাম ও আরবদের সম্পর্কে যা লিখেছেন তার নিয়ামক বিষয়বস্তু হলো মহান 'ইসলাম' ও আধিপত্যশীল প্রাচ্যদেশীয় ঘটনা এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাস্তবতা–এ দুইয়ের টানাপোড়েন। পণ্ডিত ও নিবেদিত খ্রিষ্টান হিসেবে তার আগ্রহ 'ইসলাম'–ইসলামে সূচিত জাতীয়তাবাদ, শ্রেণিসংগ্রামের মতো তুচ্ছ বিষয় নয় কিংবা প্রেম, ক্রোধ, বা মানবীয় কাজের অভিজ্ঞতাসমূহকে ব্যক্তিক মাত্রা প্রদান নয়। এর সবচেয়ে অপুষ্ট, দরিদ্র চেহারা প্রকাশ পেয়েছে গিবের সম্পাদনায় ১৯৩২ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন উইদারিং ইসলাম?-এ। এতে উত্তর আফ্রিকার ইসলামের ওপর ম্যাসিগননের লিখিত একটি চমৎকার প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়; নাম প্রবন্ধটির লেখক গিব নিজে। এতে দেখা যায় গিবের কাজ হলো ইসলামকে বিশ্লেষণ করা, এর বর্তমানকে জানা এবং ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি আন্দাজ করা। গিব নিজে ইসলামের একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন; অতঃপর শেষ প্রবন্ধে এর যথার্থ ও প্রকৃত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন। ম্যাকডোনাল্ডের মতো গিবও আদিম প্রাচ্যের ধারণায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, যে প্রাচ্যের অস্তিত্বগত পরিস্থিতি জাতি বা জাতিগত তত্ত্বে সংকুচিত করা যায় না। সাধারণীকরণকে বাতিল করে দিয়ে গিব এমন একটি বিষয়কে তুলে আনেন যা আগের প্রজন্মের প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের কাছে সবচেয়ে দোষনীয় বলে মনে হতো। ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-গোত্রের মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুকূল সহিষ্ণুতার প্রতি গিব উদার ও সহানুভূতিশীল। তিনি ইহুদি ও ম্যারোনাইট খ্রিষ্টানদের আলাদা করে দেখান যে, কেবল এরাই এই অঞ্চলে সহাবস্থানে অক্ষম; এই বক্তব্যের মধ্যে ছিল এক নির্দয় ভবিষ্যদ্বাণী।[১৪]

তবে গিবের যুক্তিতর্কের সার বক্তব্য হলো– যেহেতু তা প্রকৃতির বদলে অ দেখা জিনিসকে প্রাচ্যদেশীয়দের মূল ব্যাপার বলে দেখায়, হয়তো সে কারণে–ইসলামি প্রাচ্যের সব জীবনের ওপর ইসলামের আধিপত্য ও অগ্রাধিকার রয়েছে। গিবের কাছে ইসলাম হলো ইসলামি রক্ষণশীলতা, বিশ্বাসী সম্প্রদায়, জীবন, একতাবদ্ধতা, বোধগম্যতা, মূল্যবোধ; তা আইনশৃঙ্খলাগত পরিস্থিতিও, অবশ্য জিহাদিদের বিপর্যয়কর তৎপরতা ও কমিউনিস্টদের আন্দোলন প্রসঙ্গে নয়। উইদারিং ইসলাম-এ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে আমরা জানতে পারি যে মিসর ও সিরিয়ায় নতুন বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলাম বা ইসলামি উদ্যোগের ফসল। স্কুল ও ক্রমশ বর্ধিত সাক্ষরতাজ্ঞান ইসলামি ঘটনা, তেমনি সাংবাদিকতা পাশ্চাত্যকরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায়ও। যখন তিনি জাতীয়তাবাদের উত্থান ও তার 'বিষফল' নিয়ে কথা বলেন তখনো তিনি একবারও ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ সম্পর্কে একটি কথাও লিখেন না। উপনিবেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক প্রতিরোধের কারণে আধুনিক ইসলাম যে অনেক বোধগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে তা মনে হয়নি গিবের, যেমন মুসলিম দেশগুলো গণতান্ত্রিক নাকি স্বৈরতান্ত্রিক সে তথ্যেও তার কাছে গৌণ বোধ হয়।

গিবের কাছে 'ইসলাম' একরকম বহিঃকাঠামো। রাজনীতি (জাতীয়তাবাদ, কমিউনিজম ও পাশ্চাত্যকরণ) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সার্বভৌমত্বের দ্বারা একে সংস্কার করার জন্য মুসলমানদের নিজেদের বিপজ্জনক প্রচেষ্টার কারণে আজ তা হুমকির সম্মুখীন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে লক্ষণীয় যে, কীভাবে ধর্ম ও এ-জাতীয় শব্দগুলোয় রং লাগিয়ে দেয়া হয়েছে গিবের সুরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার জন্য এবং এত স্পষ্ট ও এত প্রবলভাবে তা করা হয়েছে যে 'ইসলাম'-এর ওপর এই স্বার্থমুখী চাপ আরোপণের ব্যাপারে আমরা যথার্থই বিরক্তবোধ করি :

> ধর্ম হিসেবে ইসলাম তার শক্তির সামান্যই হারিয়েছে, কিন্তু সামাজিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইসলামের আসন। নতুন শক্তিসমূহ এমন কর্তৃত্ব চর্চা করতে চাইছে যা কখনো কখনো ইসলামের ঐতিহ্য ও সামাজিক পরামর্শমালার সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু ক্রমশ জোরপূর্বক তার জায়গা করে নেয়। যা ঘটছে তা সহজভাবে বললে এই বোঝায়। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত, সাধারণ মুসলমান ও চাষিদের কোনো রাজনৈতিক আগ্রহ বা তৎপরতা নেই, ধর্মীয় সাহিত্য ব্যতীত সহজে উপভোগ্য কোনো সাহিত্যও নেই, ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়া কোনো উৎসবাদী বা সাম্প্রদায়িক জীবন নেই, ধর্মীয় দৃষ্টির সহায়তা ছাড়া বাইরের পৃথিবীর খুব সামান্যই ওরা দেখেছে। এরই পরিণতিতে, ধর্ম তার কাছে সবকিছু। এখন তার আগ্রহ বিস্তৃত এবং তৎপরতা আর ধর্মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। তার মধ্যে অনেক রাজনৈতিক প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয় এমন বিভিন্ন বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ সে পড়েছে বা তাকে পড়ে শোনানো হয়েছে, যেগুলো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে আলোচিত হয়নি। তা ছাড়া এগুলোর

> ভিত্তিতে বিচারপূর্বক গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৯৫]

চিত্রটিতে বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই; যেহেতু অন্য সব ধর্মের মতো নয়, তাই ইসলাম হলো সবকিছু। একটি মানবীয় প্রপঞ্চের বর্ণনায় প্রদত্ত রূপকটি প্রাচ্যতত্ত্বে দৃষ্টান্তবিহীন বলে মনে করি আমি। জীবন নিজে অর্থাৎ রাজনীতি, সাহিত্য, শক্তি, কর্মকাণ্ড, প্রবৃদ্ধি (একজন পশ্চিমার কাছে) এই অকল্পনীয় প্রাচ্যদেশীয় সমগ্রতার ওপর প্রবল আরোপণ। এ সত্ত্বেও 'ইউরোপীয় সভ্যতার সম্পূরক ও বিপরীত-ভারসাম্যরূপে' আধুনিক ইসলাম কার্যোপযোগী। আধুনিক ইসলাম সম্পর্কে এই হলো গিবের উপলব্ধির সারকথা। কারণ, ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরে এখন যা ঘটছে ইউরোপ ও ইসলামের মধ্যে তা হলো 'রেনেসাঁসে কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত পাশ্চাত্য সভ্যতার পুনরেকত্রীকরণ, বিপুল শক্তিতে তার ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।'[৯৬]

ম্যাসিগনন তার ভবিষ্যদ্বাণীর অধিবিদ্যাগত চরিত্র লুকানোর চেষ্টা করেননি। কিন্তু গিব তার অধিবিদ্যাগত বক্তব্য এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যেন তা কোনো বস্তুনির্ভর জ্ঞান। এ সত্ত্বেও যেকোনো মানদণ্ডে ইসলাম সম্পর্কে গিবের সব সাধারণ রচনা অধিবিদ্যাগত। তার কারণ কেবল এই নয় যে, তিনি এমনভাবে 'ইসলাম' নামের বিমূর্ত ধারণাটি ব্যবহার করেছেন যে, মনে হয় এর কোনো পরিষ্কার ও স্বাতন্ত্র্যিক অর্থ আছে; আরও কারণ হলো তিনি কখনো পরিষ্কার করে দেখাননি তার 'ইসলাম' কোথায়, কখন সংঘটিত হচ্ছে। ম্যাকডোনাল্ডের প্রভাবে একদিকে তিনি ইসলামকে পশ্চিমের বাইরে ঠেলে দিয়েছেন, আবার অন্যদিকে তার সঙ্গে পশ্চিমের সভ্যতার একত্রীকরণের কথা বলছেন। ১৯৫৫ সালে তিনি এই ভেতর-বাইর প্রশ্নটিকে আরেকটু পরিষ্কার করেন–অবৈজ্ঞানিক উপাদানের ক্ষেত্রে পশ্চিম প্রাচ্য থেকে কেবল সেসব জিনিস গ্রহণ করেছেন, যা একদা প্রাচ্য পশ্চিম থেকে ঋণ করেছিল; অন্যদিকে ইসলামের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গ্রহণের ক্ষেত্রে পশ্চিম কেবল এই নীতি মেনে চলেছে যে, 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশল...অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থানান্তরযোগ্য।[৯৭] সারকথা হলো, 'শিল্প-সাহিত্য, সৌন্দর্যতত্ত্ব, দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তাভাবনায় ইসলাম দ্বিতীয় সারির উৎস (যেহেতু ইসলামের ধারণাগুলো পশ্চিম থেকে নেয়া); বিজ্ঞান ও প্রকৌশল প্রসঙ্গে বলা যায় ওগুলো আদৌ ইসলামি জিনিসই নয়।

ইসলাম সম্পর্কে গিবের মতামত বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যাবে এই অধিবিদ্যাগত চাপের মধ্যে। চল্লিশের দশকে লেখা তার দুটো গ্রন্থ মডার্ন ট্রেন্ডস ইন ইসলাম ও মোহামেডানিজম : এন হিস্টরিক্যাল সার্ভে এ ব্যাপারে সবচেয়ে পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে। উভয় গ্রন্থেই গিব ইসলামের বর্তমান সংকটের আলোচনায় গভীর ব্যথিত, কারণ ঐতিহ্যসূত্রে চলে আসা এর অনিবার্য রূপের আধুনিক সংস্কারের ঘোর বিরোধী তিনি। আমি আগে তা অবহিত করেছি। এখন বলা দরকার যে, গিব

ইসলামের ওপর মোহামেডানিজমের ধারণাকে গুরুত্ব দেন (কারণ তার অনুমান ইসলাম সাহিত্য প্রজন্মক্রমিক প্রচারকের উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, মোহাম্মদ (সা.) এসে তা সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌছিয়েছেন) এবং মনে করেন যে, ইসলামের নিয়ামক বিজ্ঞান হলো আইন যা আদিতে ধর্মতত্ত্বকে সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে। এ বক্তব্যের কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো এর দাবি ইসলামের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে গৃহীত হয়নি বরং এর ভিত্তি ইসলামের বাইরের যৌক্তিক শৃঙ্খলা। কোনো মুসলমান নিজেকে মোহামেডান বলে পরিচয় দেয় না, আইন ঈশ্বরতত্ত্বের ওপর গুরুত্বও দেয় না। গিব পণ্ডিত হিসেবে নিজেকে স্থাপন করেন তার নিজের উপলব্ধ একটি পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির মধ্যে : আলোচ্য ক্ষেত্রে 'ইসলামের পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতিতে যেখানে আনুষ্ঠানিক বহির্মুখী প্রক্রিয়া ও অন্তর্গত বাস্তবতার মধ্য নির্দিষ্ট একধরনের অপ্রকাশিত স্থানচ্যুতির ব্যাপার রয়েছে।[৯৮]

তাই প্রাচ্যতাত্ত্বিকের কাজ হলো এই স্থানচ্যুতির কথা বলা এবং ইসলাম সম্পর্কে সত্য উচ্চারণ করা; সংজ্ঞা অনুযায়ী সে সত্য হলো যেহেতু ইসলামের উপলব্ধির ক্ষমতাতেই দ্বন্দ্ব, তাই নিজেকে প্রকাশও করতে পারে না। গিব ইসলাম সম্পর্কে তার সংজ্ঞা-অনুসারী সাধারণ বক্তব্যে বলেছেন যে, সংস্কৃতি ও ধর্ম কিছু উপলব্ধিতে অক্ষম : প্রাচ্যদেশীয় দর্শন কখনো গ্রিক দর্শনের ন্যায় বিচারের ধারণাকে গ্রহণ করেনি। অধিকাংশ পশ্চিমা সমাজের বিপরীতে ইসলাম দার্শনিক চিন্তার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্থিতিশীল সমাজ-সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছে। ইসলামের মূল দুর্বলতা হলো উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ইসলামের বিচ্ছিন্নতা।[৯৯] গিব জানতেন ইসলাম শেষ পর্যন্ত গণ-বিচ্ছিন্ন থাকেনি। তাই অবশ্যই বাইরের দিক থেকে ইসলাম ও বাকি পৃথিবীর সম্পর্কে বহু স্থানচ্যুতি, সংযোগ-বিচ্ছিন্নতা থেকে গেছে। তিনি বলতে চান ইসলাম রোমান্টিক পশ্চিমা ভাবাদর্শের দ্বৈত সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে চলে আসা ধ্রুপদ ধর্ম। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় ইসলামে দেখা দিয়েছে একদল আধুনিক ভাবুক ব্যক্তিত্ব, যাদের চিন্তা সব সময় আধুনিক পৃথিবীর অনুপযোগী, হতাশ ধারণার জন্ম দিয়েছে : যেমন জাতীয়তাবাদ, মাহদিবাদ, খিলাফত ইত্যাদি। তাহলে প্রশ্ন আসে চূড়ান্তভাবে ইসলাম আসলে কী? যেহেতু তা তার অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি কাটিয়ে উঠতে পারে না, আবার বাইরের পারিপার্শ্বিকও সন্তোষজনকভাবে মোকাবিলা করতে পারে না? এর উত্তর খুঁজে নেয়া যায় মডার্ন ট্রেন্ডস-এর নিম্নোক্ত কেন্দ্রীয় অনুচ্ছেদ থেকে :

> ইসলাম শত-সহস্র-নিযুত হৃদয়ে আলোড়ন জাগানো একটি জীবন্ত, গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম, যা সহৎ সংযুত ও ভালোভাবে বাঁচার জন্য কিছু আদর্শ তাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। ইসলাম নয়, পাথরের মতো অপরিবর্তনীয় লাভ করেছে এর প্রাচীন রক্ষণশীল কাঠামো, এর পদ্ধতিভিত্তিক ধর্মজ্ঞান, এর সামাজিক দুঃখবোধ।

> এখানেই স্থানচ্যুতির বিষয়টি জড়িত, এখানেই আছে এর সবচেয়ে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান অনুসারীদের অসন্তোষের কারণ এবং ভবিষ্যৎ বিপদের বিষয়টিও এখানে অত্যন্ত পরিষ্কার। কোনো ধর্ম শেষ পর্যন্ত ভাঙন রোধ করতে পারে না, যদি অনুসারীদের ইচ্ছার ওপর এর দাবি এবং বুদ্ধির ওপর এর আবেদনে বিশাল ব্যবধান অব্যাহত থাকে। মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত এখনো আধুনিকতাবাদীদের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষে নয়; কিন্তু আধুনিকতার বিস্তৃতি একটি সতর্ক সংকেত, যে সংস্কার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।
>
> ইসলামি নীতিগুলোর এমন পাথরের মতো অপরিবর্তনশীলতার উৎপত্তির খোঁজে আমরা সে প্রশ্নটিও ভেবে দেখতে পারি, যা আধুনিকতাবাদীরা উত্থাপন করেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত জবাব পায়নি; তা হলো এমন কোনো উপায় কি আছে যাতে ইসলামের মৌলনীতিসমূহকে এমনভাবে পুনরায় সূত্রবদ্ধ করা যায় যেন এর মূল উপাদানগুলো প্রভাবিত না হয়।[১০০]

অনুচ্ছেদের শেষের অংশটি যথেষ্ট পরিচিত–যেহেতু প্রাচ্য নিজেকে পুনর্গঠিত ও পুনঃসৃজনে অক্ষম, তাই প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা সে দায়িত্ব পালন করুক। তাই অংশত প্রাচ্যে মান্য, অধীত, প্রচারিত ইসলামের আগে আছে গিবের ইসলাম। তবু এই ইসলাম প্রাচ্যতাত্ত্বিক কল্পনামাত্র নয়; এটি এমন এক ইসলামের ভিত্তিতে উদগত যে ইসলাম–তা সত্যি সত্যি টিকে থাকতে পারে না বিধায়–গোটা একটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন রাখে।

ইসলাম যে কমবেশি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের নির্দেশিত ভবিষ্যৎরূপে টিকে থাকতে পারে, তার কারণ প্রাচ্যে ইসলাম তার উলেমাদের ভাষার দ্বারা দখলকৃত এবং কলঙ্কিত, যাদের দাবি অনুসারীদের মনের ওপর। এদের আবেদনে যতক্ষণ তা নীরব থাকবে, ততক্ষণ ইসলাম নিরাপদ। যে মুহূর্তে সংস্কারবাদী উলেমারা ইসলামকে আধুনিকতায় প্রবেশ উপযোগী করার জন্য সংস্কার শুরু করবে সেই মুহূর্ত থেকে সমস্যার শুরু। সে সমস্যা হলো স্থানচ্যুতি।

গিবের লেখায় স্থানচ্যুতি ইসলামের আন্দাজকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু। আমি মনে করি তা নির্দেশ করে সেই সুযোগ-সেই ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইসলাম সম্পর্কে লিখতে, ওকালতি করতে ও সংস্কার করতে পারে। এটি তার গৃহীত বিষয়ে প্রবেশের জন্য জ্ঞানতাত্ত্বিক সংযোগ-পথ, এবং একটি পর্যবেক্ষণ-প্ল্যাটফর্ম যাতে অবস্থান করে তিনি তার সব গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকাকালে ইসলামকে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন। গিব তা-ই বলেন যা ইসলাম বলতে পারে না কিংবা এর উলেমারা বলে না। একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে গিবের লেখা ইসলামে তার ধর্মীয় অস্তিত্বের আগের কোনো একসময়ের একরাশ সমন্বিত বিশ্বাসরূপে

প্রদর্শন করে। কারণ, মুসলমানদের বিশ্বাস পার্থিব তর্ক-বিতর্ক, চর্চা ও যুক্তি বিন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠার আগে তাদের কাছে ইসলামের আবেদন গিবের লেখায় ধরা পড়ে।

গিবের রচনার স্ববিরোধিতা এই যে, তা ইসলামের উলেমা অনুসারীদের বক্তব্যে প্রকাশিত ইসলামকে গ্রহণ করে না, আবার এর অনুসারীরা বলার সুযোগ পেলে যা বলত বলে মনে হয়, তার সঙ্গেও একমত নয়। এখানেই তার রচনাকে অধিবিদ্যাগত মনোভাবের দ্বারা নির্বাক করা হয়েছে, যে মনোভাব তার সব রচনা এমনকি আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাসকেও পরিচালিত করেছে। প্রাচ্য ও ইসলাম বাস্তবেরও অধিক, প্রপঞ্চগত এমন একরূপ অর্জন করেছে, যা কেবল পশ্চিমারাই বুঝতে সক্ষম। ইসলাম ও প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের অনুমানের শুরু থেকেই একটি জিনিস স্থির হয়ে যায় : তা হলো প্রাচ্য নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। অধিবিদ্যায় এবং কেবল অধিবিদ্যাগতভাবেই সত্তা ও সম্ভাবনাকে এক করে ফেলা যায়। কেবল অধিবিদ্যাগত মনোভাব নিয়েই গিবের 'দি স্ট্রাকচার অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম' বা 'এন ইন্টারপ্রিটেশন অব ইসলামি হিস্ট্রি' জাতীয় প্রখ্যাত প্রবন্ধ রচনা সম্ভব। লক্ষণীয় যে, এর আগে গিব কর্তৃক ম্যাসিগননের সমালোচনায় আত্মগত ও বিষয়মুখী জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করলেও এখানে তা কোনো সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় না।[১০১] 'ইসলাম' সম্পর্কে রচিত মন্তব্যগুলোয় যে আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি রয়েছে, তা সত্যিকার অর্থেই রূপান্তরযোগ্য এবং এ কারণে 'ইসলাম' ও গিবের বর্ণনায় থেকে যায় এক প্রশান্ত অপ্রাসঙ্গিক মসৃণতা যার সাধারণ উপাদান হলো ইংরেজ পণ্ডিতের লিখিত, সুশৃঙ্খল পৃষ্ঠাসমূহ।

পরিকল্পিত আদর্শ হিসেবে মুদ্রিত পৃষ্ঠার আবির্ভাবের ওপর আমি বেশ গুরুত্ব দিই। ডি হারবেল্ট, রেনান, লেইন ও সেসি প্রসঙ্গেও আমি তা উল্লেখ করেছি। এই পৃষ্ঠাসমূহে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস আছে, যার মধ্যে দিয়ে পাঠক কেবল প্রাচ্যকেই অনুভব করে না, সেই সঙ্গে ভাষ্যকর, প্রদর্শক, ব্যক্তিত্ব, আলোচক, প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞরূপী প্রাচ্যতাত্ত্বিককেও উপলব্ধি করে। গিব ও ম্যাসিগনন অবিস্মরণীয় উপায়ে ওই সব পৃষ্ঠাসমূহ উৎপাদন করেছেন। যেগুলো পশ্চিমে প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখালেখির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে; সে ইতিহাস বিচিত্র বর্গীয় ও স্থানিক রীতিতে লিখিত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অভিন্নরীতির ঐক্যে সমন্বিত। প্রাচ্যদেশীয় নমুনা, প্রাচ্যদেশীয় অভিধানবিদ্যা বিভাগ, প্রাচ্যদেশীয় সিরিজ—এসব কিছুই গিব ও ম্যাসিগননের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের সরলরৈখিক গদ্যে, প্রবন্ধে, সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে, পণ্ডিতি গ্রন্থে অধীনস্থ বিষয় হয়ে উঠেছে। ওদের সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে ষাটের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত—রূপান্তর লাভ করে প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখালেখির তিনটি ধরন : বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে (এনসাইক্লোপিডিয়া

অব ইসলাম, ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম), চাকরির নিম্নস্তরে (ভাষায় প্রাথমিক নির্দেশনা যা লোকদের সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি বা ইতিহাস অধ্যয়নে প্রস্তুত করবে, কূটনীতিতে নয়), ও সংবেদনশীল উন্মোচনের জগতে (জ্ঞানচর্চার বদলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বা সরকারের সঙ্গে আরও দায়িত্ব পালনের জন্য; লরেন্স সবচেয়ে উপযোগী উদাহরণ)। প্রশান্ত, খেয়ালি কিন্তু যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক গদ্যের শিল্পী গিব এবং ম্যাসিগনন এমন শিল্পী-ব্যক্তিত্বের জ্বলন্ত মশাল নিয়ে আবির্ভূত হন যাদের কাছে কোনো উল্লেখই অতিরঞ্জন নয়, যেহেতু তা উৎকেন্দ্রিক বিশ্লেষণমুখী প্রতিভায় পরিচালিত : এ দুজন ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বের অনিবার্য সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের পরে নতুন বাস্তবতা–নতুন বিশেষায়িত রীতি হিসেবে দেখা দেয় সামগ্রিক অর্থে অ্যাংলো-মার্কিন, সংকীর্ণ অর্থে মার্কিন সমাজবিজ্ঞান। এখানে পুরোনো প্রাচ্যতত্ত্ব ভেঙে বহু অংশে বিভক্ত; এ সত্ত্বেও এখনো অন্ধ প্রাচ্যতাত্ত্বিক মতবাদের প্রয়োজনে কাজে লাগে তার প্রতিটি বিচ্ছিন্ন অংশও।

• ঘ •

সর্বশেষ পর্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশেষ করে প্রতিটি আরব ইসরাইল যুদ্ধের পর আরব মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে জনপ্রিয় মার্কিন সংস্কৃতিতে; এমনকি প্রতিষ্ঠান ও নীতি-নির্ধারকদেরবলয় ও ব্যবসার জগতে আরবদের প্রতি খুবই মনোযোগ দেয়া হয়। এটি আন্তর্জাতিক ক্ষমতাবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতীক। ফ্রান্স ও ব্রিটেন এখন আর বিশ্বরাজনীতির মঞ্চের কেন্দ্রে নেই। তাদের স্থানচ্যুত করেছে মার্কিন সাম্রাজ্য। স্বার্থের এক বিরাট নেটওয়ার্ক এখন সব প্রাক্তন উপনিবেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, ঠিক যেমন আগের সব ভাষাতাত্ত্বিক বিষয় এবং প্রাচ্যতত্ত্বের মতো ইউরোপভিত্তিক জ্ঞান-শাখাকে বিভাজিত (আবার যুক্ত) করছে প্রাতিষ্ঠানিক উপ-বিশেষজ্ঞতা। অঞ্চল-বিশেষজ্ঞ আজকাল যে নামে ডাকা হয় প্রাচ্যতাত্ত্বিককে দাবি করছেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের; তা আবার সরকার ও ব্যবসা ক্ষেত্রে কাজে লাগছে। আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের কালানুগ বিবরণে সঞ্চিত যেমন জুলস মোহলের উনিশ শতকীয় লগবুকে লিপিবদ্ধ আধা বস্তুবাদী জ্ঞানের অবসান হয়েছে, জন্ম নিয়েছে নতুন রীতি। মিশ্র প্রজাতির প্রতিনিধিত্বের বিচিত্র রীতি এখন সংস্কৃতিতে উত্তপ্ত করে রাখে। জাপান, ইন্দোচীন, চীন, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান–এগুলোর প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নির্দিষ্ট কিছু কারণে সর্বত্র আলোচনার সূচনা করেছে ওরা। ইসলাম ও আরবের নিজস্ব প্রতিনিধিত্বও আছে। খণ্ডিত, কিন্তু ভাবাদর্শিকভাবে ও যথেষ্ট ক্ষমতাসমেত পরস্পর আসঞ্চিত অবস্থায় একগুঁয়েভাবে সংগঠিত ওই ব্যাপারগুলো এখানে আলোচনা করব আমরা। এগুলো কদাচিৎ আলোচিত হয়; আমেরিকায় এর মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে প্রথাগত ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ব।

জনপ্রিয় কল্পমূর্তি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব : আজকাল কোনোরূপ আরবদের প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া হলো। লক্ষ করুন রূপান্তর ও সংকোচনের সঙ্গে 'আরব' আখ্যাটি কেমন খাপ-খাইয়ে যায়; সহজ একটা প্রবণতা–যার মধ্যে জোর করে ঠেসে দেয়া হচ্ছে তাকে (অর্থাৎ যাকে 'আরব'

বলে নির্দেশ করা হচ্ছে)। ১৯৬৭ সালের জুনের যুদ্ধের পূর্বে প্রিন্সটনের দশম পুনর্মিলনীতে আরব সাজার পরিকল্পনা করা হয় : পোশাক হলো আলখাল্লা, মস্তকাবরণ ও স্যান্ডেল। কিন্তু যুদ্ধের ঠিক পর পর যেহেতু দেখা যায় আরবের ছদ্মবেশ বিব্রতকর, পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের মোটিফে পরিবর্তন আনা হয়। ঠিক হয় ক্লাসের ছাত্ররা মাথার ওপর হাত তুলে মৌন মিছিল করব, যা হবে আরবদের পরাজয়ের প্রতীক–উটের পিঠের সওয়ার থেকে ক্যারিকেচার এবং তা থেকে অযোগ্যতা ও সহজ পরাজয়ের প্রতীকায়ন; আরবদের কেবল এটুকু সুযোগই দেয়া হয়।

আরব কল্পমূর্তি আরও হুমকিদায়করূপে সর্বত্র দেখা দেয় ১৯৭৩ সালের যুদ্ধের পর। গ্যাসোলিন পাম্পের পেছনে দাঁড়ানো আরব শেখের কার্টুন সে সময়ের একটি জনপ্রিয় প্রবণতা। এসব আরবেরা পরিষ্কার 'সেমেটিক' ওদের খাড়া বাঁকানো নাক, মুখের ওপর এসে উঁকি দেয়া শয়তানি গোঁফ নিশ্চিত মনে করিয়ে দেয় (প্রধানত অ-সেমেটিক জনগোষ্ঠীর কথা) যে, সেমেটিকরা আমাদের সব সমস্যার মূল। যে গণ–ঘৃণাবোধ ছিল সেমেটিক ইহুদিদের প্রতি তার অভিমুখ খুবই চমৎকারভাবে সেমেটিক আরবদের দিকে সরিয়ে দেয়া হয়; কারণ উভয়েই সেমেটিক ফিগার।

কাজেই যদিও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো পরিসর আরবদের দেয়া হয়, তার অবস্থান হয় মূলত নেতিবাচক মূল্যবোধক। তাকে দেখা হয় ইসরাইল বা পশ্চিমের অস্তিত্বে বিপর্যয়-সৃজক উপাদানস্বরূপ বা ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির পথে ধ্বংসযোগ্য বাধার মতো। এদের যদি কোনো ইতিহাস থেকেও থাকে তবে সে ইতিহাস হলো প্রথমে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, পরে ইহুদি ধারা কর্তৃক আরবদের দেয়া (অথবা আরবদের কাছে থেকে কেড়ে নেয়া, পার্থক্য সামান্যই) ইতিহাসের অংশ মাত্র। ল্যামারটিন ও প্রথম যুগের ইহুদিবাদীরা ফিলিস্তিনকে দেখেছেন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষমাণ শূন্য মরুভূমিরূপে : এর অধিবাসীরা তো যাযাবর! এই ভূমির ওপর তাদের কোনো দাবি নেই, অতএব, কোনো সাংস্কৃতিক বা জাতীয় বাস্তবতাও নেই! এভাবে আরব হয়ে ওঠে ছায়ামাত্র। যেহেতু আরব ও ইহুদি উভয়ই প্রাচ্য সেমেটিক। তাই এই ছায়ার মধ্যে বসিয়ে দেয়া যেতে পারে প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের ঐতিহ্যিক অবিশ্বাস। যেহেতু নাজি-পূর্ব ইউরোপে ইহুদি ছিল বিনষ্টের প্রতীক। এখন (বার্টন, লেইন, রেনান প্রমুখ আদি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সহায়তায়) ইহুদিদের চিত্রিত করা হয় 'নায়করূপে, আর আরবরা তাদের ছায়ামাত্র–ধীরগতির, রহস্যময়, ভয়ানক। পশ্চিমের সৃষ্ট অতীত ছাড়া আর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আরবরা। নির্দিষ্ট এক নিয়তির সঙ্গে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দেয়া হয়। তারা কেবল একরাশ পূর্বনির্ধারিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সংকুচিত হয়ে যায়। এর জন্য ইসরাইল মাঝেমধ্যে বারবারা টুচমানের ঈশ্বরতাত্ত্বিক ভাষায় 'ইসরাইলের ভয়ংকর দ্রুততর তরবারির' সাহায্যে তাকে যথাযোগ্য শাস্তি দেয়।

ইহুদি-বিরোধিতা ছাড়া, আরবরা তেল রপ্তানিকারকও। এটিও তার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য। কারণ, ১৯৭৩-৭৪ সালে সব আরব তেল রপ্তানিকারক বয়কটে অংশগ্রহণ করে (যদিও এতে লাভবান হয় পশ্চিমের কয়েকটি তেল কোম্পানি এবং কিছু আরব এলিটই)। তবে সত্য যে, তেলের এমন বিশাল সঞ্চয়ের মালিকানা লাভের উপযুক্ত নৈতিক যোগ্যতা নেই ওদের। অতএব, প্রায়শই এমন প্রশ্ন উচ্চারিত হয় যে, কেন আরবদের মতো মানুষ উন্নত (স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, নীতিবোধসমৃদ্ধ) বিশ্বকে হুমকির মুখে রাখবে? এ থেকে এমন পরামর্শও উত্থাপিত হয় যে, আরব তেলক্ষেত্রগুলো মার্কিন মেরিন সেনাদের দিয়ে দখল করিয়ে নেয়া উচিত।

সিনেমা, টেলিভিশনে দেখা যায় আরব প্রতিমূর্তি হয় লম্পট, নয়তো রক্তপিপাসু। তাকে দেখানো হয় অতি-কামুক, দুশ্চরিত্র, চতুর, ষড়যন্ত্রে কেমন দক্ষ ও উদার; কিন্তু অনিবার্যভাবে মর্ষকামী, বিশ্বাসঘাতক, নিচু, দাস, ব্যবসায়ী, উটের চালক, মানিচেঞ্জার, রঙিলা, চরিত্রহীন–এগুলো সিনেমার প্রথাগত আরব চরিত্র। (চোর, ডাকাত, স্থানীয় বিদ্রোহীদের) আরব নেতাদের প্রায়ই দেখা যায় আটককৃত পশ্চিমা নায়ক ও তার সাদা চুলের নায়িকার প্রতি হুমকি দিচ্ছে (উভয়কেই উলঙ্গ করা হয়েছে) : 'আমার লোকেরা তোমাদের খুন করবে, তবে তার আগে ওরা একটু মজা লুটবে।' সংবাদে, সংবাদচিত্রে সর্বত্র আরবরা দলবদ্ধভাবে প্রদর্শিত, কোনো ব্যক্তিক চরিত্র বা ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ নেই। বেশির ভাগ চিত্রই তুলে ধরে দলগত রোষ, দুর্দশা বা অসহিষ্ণু দৃষ্টি। এসব ছবির পেছনে আছে জিহাদ-এর হুমকি। এসবের পরিণতি হলো সাধারণ পশ্চিমাদের মনে এই ভীতি যে, মুসলমান (বা আরবরা) দখল করে নেবে গোটা পৃথিবী।

ইসলামের ওপর নিয়মিত প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থাদিতেও মধ্যযুগের ও রেনেসাঁর ইসলামবিরোধী মনোভাবে কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। অবশ্য এও সত্য যে, এমন আর কোনো ধর্ম নেই যার সম্পর্কে চ্যালেঞ্জে পড়ার ঝুঁকি ছাড়া আয়েশে লেখা যেতে পারে। ১৯৭৫ সালে কলাম্বিয়ার আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কলেজের আরবি কোর্স গাইডে লেখা হয় যে এ ভাষার প্রতিটি শব্দই সন্ত্রাসের সঙ্গে কোনো না-কোনোভাবে যুক্ত এবং ভাষাটিতে প্রতিফলিত আরব মন অপরিবর্তনীয়ভাবে বাকসর্বস্ব। হারপার ম্যাগাজিনে এমিট টাইরিলের একটি প্রকাশিত নিবন্ধে আরও ভয়ংকর বর্ণবাদী মনোভাব নিয়ে মন্তব্য করা হয় যে, আরবরা মৌলিকভাবে খুনি, এদের জিন প্রজন্মক্রমে বহন করে আনে সন্ত্রাস ও প্রতারণা।[১০২]

আরবস ইন আমেরিকান টেক্সট বুকস শিরোনামের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য-বিভ্রান্তি বা একটি জাতি-ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে নির্মম প্রতিনিধিত্ব। একটি গ্রন্থে প্রশ্ন করা হয়েছে 'কোন জিনিসটি আরবদের ঐক্যবদ্ধ রাখে' নির্দ্বিধায় দেয়া উত্তর হলো ইহুদি ও ইসরাইলি জাতির প্রতি ঘৃণা ও আগ্রাসনই

তাদের ঐক্যবদ্ধতার সর্বশেষ সূত্র। আরেকটি গ্রন্থে লেখা হয়েছে, মুসলমানদের ধর্ম, যাকে বলা হয় ইসলাম, সূচিত হয় সাত শতকে মোহাম্মদ (সা.) নামে আরবের এক সম্পদশালী ব্যবসায়ীর মাধ্যমে। তিনি নিজেকে নবী ঘোষণা করেন, কিছু সমর্থকও পেয়ে যান। তাদের তিনি বলেন তাদের নির্বাচিত করা হয়েছে পৃথিবী শাসন করার জন্য। এরপর আসে আরেকটু টুকরা জ্ঞান : মোহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর কিছুকাল পরই তার দেয়া শিক্ষা একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়, যার নাম হয় কোরআন। এটি ইসলামের পবিত্র গ্রন্থে পরিণত হয়।[১০৩]

প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তে নিকট-প্রাচ্য অধ্যয়নে নিয়োজিত পণ্ডিতরা এসব ভ্রান্ত তথ্যকে সংশোধন করেননি বরং সমর্থন করেছেন (উল্লেখ্য যে, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরব পোশাক পরিধানের যে ঘটনার দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি তা এমন এক বিশ্ববিদ্যালয় যা ১৯৭২ সালে দেশে প্রথমবারের মতো নিকট-প্রাচ্যবিষয়ক অধ্যয়নের জন্য একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে)। প্রিন্সটন সমাজবিজ্ঞান ও নিকট-প্রাচ্য বিষয়ের অধ্যাপক মোরো বার্গারের ১৯৬৭ সালের রিপোর্ট উদাহরণ হিসেবে নেয়া যায়; তখন তিনি মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন সংঘের (MESA) সভাপতি। এটি পণ্ডিতদের সংঘ, প্রাথমিকভাবে ইসলামের উত্থানের কারণে, দ্বিতীয়ত, সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত।[১০৪] তিনি তার অভিসন্দর্ভের নাম দেন মিডল ইস্টার্ন অ্যান্ড নর্থ আফ্রিকান স্টাডিজ : ডেভেলপমেন্টস অ্যান্ড নিডস। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত দিক–ন্যাশনাল ডিফেন্স এডুকেশন প্যাক্ট ১৯৫৮ ইত্যাদি বিচার করে বার্গার উপসংহার টানেন এভাবে :

> আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা বিরাট সাংস্কৃতিক অর্জনের অঞ্চল নয়, ভবিষ্যতে তেমন সম্ভাবনাও নেই। আধুনিক সংস্কৃতির প্রসঙ্গে বলা যায়, অঞ্চল সম্পর্কিত অধ্যয়ন নিজে কোনোরূপ লাভজনক হতে পারবে না।
>
> ...আমাদের অঞ্চলটি কোনো বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির আবাস নয়, ভবিষ্যতে তেমন হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও নেই...মধ্যপ্রাচ্য (উত্তর আফ্রিকা ততটা নয়) যুক্তরাষ্ট্রের অব্যবহিত রাজনৈতিক গুরুত্বের দিকে সরে যাচ্ছে (এমনকি শিরোনামে বা বিরক্তির মূল্যবোধেও) আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যের তুলনায়।
>
> ফলত সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য সামান্য মাত্রায় পণ্ডিতি আগ্রহের যোগ্য। তা এ ইঙ্গিত করে না যে এর ওপর অধ্যয়নের বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্য কমে গেছে, বা তা পণ্ডিতি কাজকে প্রভাবিত করবে না। যে সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত, তা হলো এ পরিস্থিতি আসলে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে ক্ষেত্রটির ওপর–এর বিকাশের ক্ষমতায়, যারা অধ্যয়ন করবে ও শিক্ষা দেবে তাদের সংখ্যার ওপরও।[১০৫]

এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসন্দেহে শোক করার মতো। পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার কারণ হলো বার্গার তার অধ্যয়নের জন্য সরকারি নিয়োগ পেয়েছিলেন। কারণ, তিনি এই অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। মধ্যপ্রাচ্য যে বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র হয়ে উঠছে তা বুঝতে বার্গারের ব্যর্থতা উদ্ভূত হয়েছে প্রথম এবং শেষ প্যারা থেকে, যার পরম্পরা হলো প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস। মধ্যপ্রাচ্য যে বিরাট সাংস্কৃতিক অর্জনের জায়গা নয় এবং শক্তিহীন–বার্গারের এমন ধারণার উৎস যথাক্রমে প্রাচ্যতত্ত্বের মতাদর্শিক ঘোষণা যে সেমেটিকদের কোনো সমৃদ্ধ সংস্কৃতি থাকতে পারে না এবং রেনানের এই বক্তব্য যে, সেমেটিক জগৎ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খুব বেশি হতদরিদ্র। বার্গারের এ বিচার-বিশ্লেষণ সময়োচিত; চোখের সামনের বাস্তবতা সম্পর্কেও তিনি যেন অন্ধ। কারণ, তিনি পঞ্চাশ বছর আগে লিখছেন না, এমন এক সময় এ মন্তব্য লিখছেন যখন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রয়োজনীয় তেলের ১০ শতাংশ আমদানি করছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে, এলাকাটিতে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগও তখন প্রচুর। আসলে এর মধ্য দিয়ে বার্গার নিশ্চিত করেন তার প্রাচ্যতাত্ত্বিক অবস্থান অর্থাৎ তিনি বলতে চান এই অঞ্চলকে বুঝতে হলে তার ভাষ্য ও আলোচনা প্রয়োজন। অংশত এ কারণে যে ওখানে সামান্য যা কিছু আছে তা কিছুটা অদ্ভুত; আরেকটি কারণ হলো কেবল প্রাচ্যতাত্ত্বিকই প্রাচ্যকে বিশ্লেষণ করতে পারে, প্রাচ্য আত্ম-বিশ্লেষণে অক্ষম।

সমাজবিজ্ঞানী বার্গার ধ্রুপদ প্রাচ্যতাত্ত্বিক না হয়েও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাচ্যতত্ত্বের ধারণাগুচ্ছ থেকে ঋণ গ্রহণ এড়াতে পারেনি। এর কারণ হলো তার অধ্যয়নের জন্য গৃহীত বিষয়বস্তুর প্রতি ঘৃণা, যা তার কাছে সেগুলোর মর্যাদা খাটো করে ফেলে। এর প্রভাবে বার্গার এতটাই অন্ধ হয়ে পড়েন যে, তিনি নিজেকে একবারও প্রশ্ন করেননি মধ্যপ্রাচ্য যদি 'বিরাট সাংস্কৃতিক অর্জনের অঞ্চল নয়' তবে তিনি কেন পরামর্শ দিচ্ছেন যেন কেউ ঠিক তার নিজের মতোই ওই অঞ্চলের সংস্কৃতি অধ্যয়নে আত্মোৎসর্গ করে। যেমন ডাক্তারদের তুলনা পণ্ডিতেরা তাদের পছন্দের ও আগ্রহের বিষয় সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন। কেবল একরকম সাংস্কৃতিক দায়বোধ থেকেই একজন পণ্ডিত সে বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন, যা তার কাছে সঠিক মনে হয় না। প্রাচ্যতত্ত্ব এমন এক দায়বোধই জন্ম দিয়েছে। কারণ, প্রজন্মক্রমে সংস্কৃতি প্রাচ্যতাত্ত্বিককে তিনদিক আটকে ঠেলে দিয়েছে; ওখানে পেশাগত কাজে প্রাচ্যতাত্ত্বিক মোকাবিলা করেন 'পূর্ব'কে অসভ্যতা, উৎকেন্দ্রিকতা, অনাচারকে এবং পশ্চিমের পক্ষ থেকে একে সর্বদা দূরে সরিয়ে রাখেন।

আমি বার্গারের প্রসঙ্গ এনেছি প্রাতিষ্ঠানিক মনোভাবের দৃষ্টান্ত দেখানোর জন্য কীভাবে কোনো জ্ঞানসমৃদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে প্রচলিত ক্যারিকেচারকেও সমর্থন করতে পারে তা প্রদর্শনের জন্য। তবু বার্গার প্রাচ্যতত্ত্বের সমকালীন পরিবর্তনমুখী

স্রোতের পক্ষে : মূলত ভাষাতাত্ত্বিক বিষয় থেকে সামাজিক বিজ্ঞানে রূপান্তরেরও সমর্থক। প্রাচ্যতাত্ত্বিক এখন প্রথমেই প্রাচ্য ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করবেন না বরং তিনি প্রশিক্ষিত সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে শুরু করবেন। এই পরিবর্তনের অবদান আমেরিকা, মোটামুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পরিত্যক্ত জায়গায় আমেরিকা নিজেকে অধিষ্ঠিত দেখার পর সূচিত। এর পূর্বে প্রাচ্য বিষয়ে আমেরিকার অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত। সংস্কৃতির বিভাজক মেলভিল এ সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন, সন্দেহবাদী মার্ক টোয়েন প্রাচ্য ভ্রমণ করে এর সম্পর্কে লিখেছেন : ইন্ডিয়ান চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের ভাবনা-চিন্তার কিছুটা সাযুজ্য দেখেছেন মার্কিন শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা। গুটিকয় ধর্মতাত্ত্বিক ও প্রাচীন বাইবেল বিষয়ের কিছু ছাত্র অধ্যয়ন করেছেন প্রাচ্যের কয়েকটি প্রাচীন ভাষা সম্পর্কে। এ ছাড়া বর্বর-ডাকাতদের সঙ্গে কয়েকবারের সামরিক ও কূটনৈতিক সংযোগ এবং দূরপ্রাচ্যে বিশ্রী নৌ-সেনা অভিযান ও ধর্মপ্রচারকদের সংসর্গের কথা উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্বের গভীরতর ঐতিহ্য নেই আমেরিকার। এর ফলে ইউরোপে যেমন প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞান ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে সূচিত হয়ে বিভিন্ন সময় পরিশোধন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, আমেরিকায় সে জ্ঞানকে এসব স্তর অতিক্রম করতে হয়নি। তেমনি ওখানে কাল্পনিক বিনিয়োগও হয়নি। তার কারণ সম্ভবত বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে আমেরিকানদের ধারণা ছিল পশ্চিমমুখী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরপর মধ্যপ্রাচ্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী গুরুত্ব লাভ করে। তবে ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বে শত শত বছর ধরে মূল উপাদান হিসেবে বহমান ক্যাথলিক ধর্মীয় আবেগের ঐতিহ্য নেই আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্বে। এবার আমেরিকান সামাজবিজ্ঞানীরা মঞ্চে প্রবেশ করেন। তারা এমন সব সূক্ষ্ম পরিবর্তন নিয়ে আসেন, যা কোনোক্রমে শনাক্তযোগ্য। যাই হোক নতুন প্রাচ্যতত্ত্ব মদত দেয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে এবং তা লালনও করে। নতুন আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্বের একটি লক্ষ্যযোগ্য দিক হলো তা সাহিত্যকে পুরোপুরি এগিয়ে যায়; নিকট-প্রাচ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞকে লেখা শত শত পৃষ্ঠা পড়লেও সাহিত্যের একটি উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। ঘটনাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এর মোট সামগ্রিক প্রভাব হলো ওই অঞ্চল ও তার জনগোষ্ঠীকে মূক করে 'মনোভাব, প্রবণতা, পরিসংখ্যান ইত্যাদিতে সংকুচিত রাখা—এককথায় বি-মানবীকৃত অবস্থায় সীমাবদ্ধ রাখা। কারণ, আরব কবি ও ঔপন্যাসিক তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেখেন যা বিপর্যস্ত করে দিতে পারে প্রাচ্যকে প্রতিনিধিত্ব করার বিভিন্ন মাধ্যম, বিভিন্ন নমুনা (কল্পমূর্তি, জীর্ণ নীতিকথা, বিমূর্ত ধারণা ইত্যাদি)। সাহিত্যিক রচনা সরাসরি জীবন্ত বাস্তবতার কথা বলে। আরব, ফরাসি বা ইংলিশ পরিচয়ে নয়, এর শক্তি নিহিত শব্দের ক্ষমতা ও গুরুত্বের ওপর। তাই তা প্রাচ্যতত্ত্বের হাত থেকে মূর্তিগুলো বের করে আনবে, ফলে হাত ফসকে

পড়ে যাবে প্রাচ্যতাত্ত্বিকের সৃষ্ট ওই সব পঙ্গু সন্তানেরা অর্থাৎ প্রাচ্যে চালিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত ধারণা-কল্পনা।

আমেরিকায় নিকট-প্রাচ্যবিষয়ক অধ্যয়নে সাহিত্যের অনুপস্থিতি প্রাচ্যতত্ত্বের নতুন উদাসীনতার উদাহরণ। ওখানে নিকট-প্রাচ্যবিশেষজ্ঞরা এমন কিছুই করছেন না যা গিব ও ম্যাসিগননে পরিসমাপ্ত প্রথাগত প্রাচ্যতত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উৎপত্তিগত দিক থেকে বলা যায় আধুনিক মার্কিন প্রাচ্যতত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে যুদ্ধ-পূর্ব ও পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত আর্মির ভাষাশিক্ষা স্কুলে, যুদ্ধোত্তর অ-পাশ্চাত্য পৃথিবীতে সরকার ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থচিন্তায়, স্নায়ুযুদ্ধ এবং প্রাচ্যদেশীয়দের প্রতি মিশনারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা মনে করে ওরা এখন সংস্কার ও শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত। কিছু অনিবার্য প্রাথমিক কারণে প্রাচ্যের দুর্বোধ্য ভাষার অ-ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন কার্যকরবোধ হয়। তবে যেসব 'বিশেষজ্ঞ' কে অর্থহীনভাবে অস্পষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম বলে মনে হয় তাদের কর্তৃত্বের সনদপত্র প্রদানের জন্যও ওই অধ্যয়ন প্রয়োজনীয়।

সামাজিক বিজ্ঞানে বস্তুর বিন্যাস, ভাষা ইত্যাদি উচ্চতর মূল লক্ষ্যে পৌঁছার অবলম্বন মাত্র–তবে সাহিত্যিকরচনা পাঠের জন্য নয়। যেমন–মধ্যপ্রাচ্যের দিকে নজর রাখা ও গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত আধা সরকারি সংঘ মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউট তার রিপোর্ট অন কারেন্ট রিসার্চ উপস্থাপন করে। মজার ব্যাপার হলো এতে 'প্রেজেন্ট স্টেট অব অ্যারাবিক স্টাডিজ ইন আমেরিকা' শিরোনামের লেখাটি লিখেন হিব্রুর এক অধ্যাপক। ভূমিকায় ঘোষণা করা হয়, বিদেশি ভাষা এখন আর কেবল মানববিদ্যার পণ্ডিতদের এখতিয়ার নয়; এটি প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও অন্য অনেক বিশেষজ্ঞের কাজের হাতিয়ার। সমগ্র রিপোর্টটি আরব অঞ্চলের তেল কোম্পানির নির্বাহী, প্রকৌশলী ও সামরিক ব্যক্তিদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তবে এর স্যার কথা আছে এ তিনটি বাক্য : 'রুশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরবিতে অনর্গল কথা বলতে সক্ষম জনবল প্রস্তুত করছে। মানুষের নিজের ভাষায় তাদের মনে আবেদন রাখার গুরুত্ব তারা অনুভব করতে পেরেছে। বিদেশি ভাষা কর্মসূচি উন্নয়নে আমেরিকার আর কালক্ষেপণ করা উচিত হবে না।'[১০৬]

এভাবে প্রাচ্যদেশীয় ভাষা হলো এবং অতীতেও ছিল নীতিবিষয়ক জিনিস বা প্রচারণার হাতিয়ার। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচ্যদেশীয় ভাষার অধ্যয়ন হ্যারল্ড লাসওয়েলের প্রচারণাবিষয়ক এই তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, মানুষ কীভাবে তা জরুরি নয়–মানুষকে কী ভাবতে বাধ্য করা হয় তা-ই জরুরি।

> প্রচারণার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও গণতন্ত্রের প্রতি উদাসীনতার সমন্বয়। বিস্তৃত কর্মতৎপরতায় গণমানুষের অভিমত এবং মানবীয় পছন্দের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

> উদ্ভূত।...আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর মতো আধুনিক প্রচারক মানুষের নিজের আগ্রহ বিচারের অক্ষমতাকে চিহ্নিত করতে পারেন, মানুষ নিশ্চিত কারণ ছাড়াই এক বিকল্প থেকে অন্য বিকল্পে ঘোরাফেরা করে অথবা কোণে বহু পুরোনো শ্যাওলা ধরা পাথর টুকরোয় লেপটে থাকে। স্বভাবে ও মূল্যবোধে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন ধরে রাখার সম্ভাবনার অঙ্ক কষা সাধারণভাবে মানুষের পছন্দের অগ্রাধিকার হিসাব করার চেয়ে অনেক বড় কিছু। এর অর্থ মানুষ যেসব টিস্যুতে গঠিত সেগুলো সব পর্যবেক্ষণ করা এবং দেখা এদের কোনটিতে বিবেচনাহীন পছন্দের ব্যাপারটি রয়েছে; অতঃপর সমাধানের জন্য একটি কর্মসূচি স্থির করা যা আসলে...ওই সব খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারে শ্রদ্ধাবোধ রেখেই বলা যায় প্রচারকের কাজ হলো এমন লক্ষ্যের প্রতীক উদ্ভাবন করা যা একই সঙ্গে গ্রহণ ও অভিযোজনে সহায়তা করবে। সেই প্রতীককে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন আদায় করতে হবে।...প্রচারক মেনে নেন যে, গোটা পৃথিবীটাই কারণযুক্ত, কিন্তু কেবল তার অংশ বিশেষ সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব।...[১০৭]

অতএব, অর্জিত বৈদেশিক ভাষাসংশ্লিষ্ট জনগণের ওপর আঘাতের একটি অংশ। এ ধরনের কর্মসূচির থাকে একটি উদারতার মুখোশ এবং সচরাচর তার দায়িত্ব পড়ে পণ্ডিত, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও কৌতূহলী মানুষের ওপর। এতে উৎসাহিত পরিকল্পনাটি এ রকম যে আরব বা মুসলমানদের সম্পর্কে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমরা তো ভিন্ন একটি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে পারছি। এ ক্ষেত্রে ওদের নিজেদের কথা নিজেরাই বলুক, নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করুক (অবশ্য এর তলে তলে আছে লুই নেপোলিয়নের জন্য বলা মার্কসের এ বক্তব্য : ওরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না; অবশ্যই ওদের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে)। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এবং এক বিশেষ উপায়ে। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর আরব ইসরাইল যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলোয় দি নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন ইসরাইল ও আরবদের পক্ষ থেকে দুটো নিবন্ধ প্রকাশ করে। ইসরাইলের পক্ষের নিবন্ধটি লিখেন জনৈক ইসরাইলি আইনজীবী। আরবদের পক্ষের প্রবন্ধটি লিখেন এমন এক আমেরিকান যিনি আরব অঞ্চলে রাষ্ট্রদূত ছিলেন, প্রাচ্য সম্পর্কে যার কোনো প্রশিক্ষণ বা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা নেই। আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি যে, আরব ও ইহুদি উভয়ই সেমেটিক এবং উভয়ের পক্ষেই জোরপূর্বক প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে। প্রাউস্ট-এ যেখানে একটি অভিজাত সেলুনে কোনো এক ইহুদি প্রবেশ করে সে দৃশ্যের বর্ণনা থেকে এই অনুচ্ছেদটি এ প্রসঙ্গে তুলে দেয়া যেতে পারে :

> রোমানীয়, তুর্কি ও মিসরীয়রা ইহুদিদের ঘৃণা করতে পারে। কিন্তু কোনো ফরাসি বৈঠকখানায় এসব লোকদের মধ্যে পার্থক্য পার্থক্য ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না এবং এক ইসরাইলি এমনভাবে প্রবেশ করে যেন সে মরুভূমির বুক থেকে উঠে এসেছে, তার শরীর হায়েনার ভঙ্গিতে অগ্রসরমাণ, তার গলা সামনের দিকে

> বাড়ানো–'সালাম'-এর মধ্য দিয়ে সে গর্বের সঙ্গে নিজেকে বিস্তৃত করে দিচ্ছে : তা একধরনের প্রাচ্যদেশীয় রুচির সম্পূর্ণ তৃপ্তি সাধন করে।[১০৮]

সাংস্কৃতিক সম্পর্কের নীতি : বিশ শতকের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সাম্রাজ্য হয়ে ওঠেনি তা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, উনিশ শতকজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রাচ্যের ব্যাপারে এমনভাবে সজাগ ছিল যা তার উত্তরকালীন সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ১৮০১ ও ১৮১৫ সালে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা বাদ দিলে বিবেচনায় আনা যায় ১৮৪২ সালে আমেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৩ সালে এর বাৎসরিক সভায় সভাপতি জন পিকারিং পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, আমেরিকা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অনুকরণে প্রাচ্যবিষয়ক অধ্যয়নের প্রস্তাব করছে। পিকারিং-এর বক্তব্য ছিল প্রাচ্যতত্ত্ব কেবল সোজাসাপ্টা পণ্ডিতি ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক বিষয়ও। নিম্নোক্ত সার বক্তব্যে বোঝা যায় প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনায় সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই :

> ১৮৪৩ সালের বাৎসরিক সভায় সভাপতি পিকারিং প্রস্তাবিত বিষয়টির চমৎকার নকশা তুলে ধরেন। সময়ের অনুকূল পরিবেশ, সর্বত্র বিরাজমান শান্তি, প্রাচ্যদেশসমূহে প্রবেশের মুক্ত অধিকার এবং যোগাযোগের উত্তম সুযোগ ইত্যাদি অনুকূল পরিবেশে নতুন ক্ষেত্রটি আবাদের প্রস্তাব করা হয়। লুই ফিলিপ ও মেটারনিকের সময় পৃথিবী ছিল শান্তসুবোধ। নানকিং চুক্তি চীনা বন্দরগুলো উন্মুক্ত করে দেয়। সমুদ্রগামী জাহাজে যুক্ত হয় স্ক্রুপ্রপেলার। মোর্স তার টেলিগ্রাফ যোগাযোগ সম্পন্ন করেছেন এবং এরই মধ্যে প্রস্তাব করেছেন একটি ট্রান্স আটলান্টিক তার বসানোর জন্য। সোসাইটির উদ্দেশ্য হলো এশীয়, আফ্রিকি ও পলিনেশীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়ন এবং যা কিছু প্রাচ্যদেশীয় তার সবকিছু সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া, যাতে দেশে প্রাচ্যতত্ত্ব অধ্যয়নের ব্যাপারে উৎসাহ দেখা দেয়; এ ছাড়া বিভিন্ন প্রস্তক, অনুবাদ ও পত্রযোগাযোগ প্রকাশ করা, একটি লাইব্রেরি স্থাপন করাও সোসাইটির লক্ষ্য। বেশির ভাগ কাজই হয় এশীয় বিষয়ে এবং সংস্কৃত ও সেমেটিক ভাষায়।[১০৯]

মেটারনিক, লুই-ফিলিপ, নানকিং চুক্তি, স্ক্রু-প্রপেলার সবই প্রাচ্যে ইউরোপ-আমেরিকার অবাধ প্রবেশের প্রস্তুতির নির্দেশক। এ প্রস্তুতি কখনো থামেনি। এমনকি প্রাচ্যে উনিশ ও বিশ শতকে কিংবদন্তিতুল্য মার্কিন ধর্মপ্রচারকরাও এমন ভূমিকা গ্রহণ করেন, যা তাদের ঈশ্বরের জন্য ততটা নয়, যতটা তাদের নিজেদের সংস্কৃতির জন্য ও উদ্দেশ্যের দিকে।[১১০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিবাদে এবং ফিলিস্তিনে উপনিবেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে টেনে আনার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বেলফোর ঘোষণার আগে ও পরে (নভেম্বর ১৯১৭) ব্রিটিশ আলোচনা থেকে আন্দাজ করা যায় যুক্তরাষ্ট্র কতটা গুরুত্বের সঙ্গে এ ঘোষণা গ্রহণ করে।[১১১] এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ দ্রুত

বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ও তার পরবর্তী সময়ে। যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত হয় কায়রো, তেহরান, উত্তর আফ্রিকা। এই অবস্থায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক মধ্যপ্রাচ্যের তেল, কৌশলগত অবস্থান ও জনসম্পদ শোষণের দৃষ্টান্তের উদ্বুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত হয় তার যুদ্ধোত্তর নতুন সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা পালনের জন্য।

এ ভূমিকার সাংস্কৃতিক দিকটি উপেক্ষণীয় নয় ১৯৫০ সালে যার বর্ণনা দিয়েছেন মরটিমার গ্রেভ। গ্রেভ যুক্তি দেখান যে, ওখানে তাদের ভূমিকা প্রয়োজন-'ওই সব শক্তিসমূহকে ভালোভাবে উপলব্ধির জন্য যেগুলো নিকট-প্রাচ্যের অনুমোদনের জন্য আমেরিকান মতাদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। অবশ্যই, এর মধ্যে প্রধান হলো কমিউনিজম ও ইসলাম।'[১১২] এ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে পিছিয়ে থাকা আমেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটির সহায়করূপে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে গবেষণার জন্য গড়ে ওঠে বিরাট এক মানবযন্ত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে না হলেও নজরদারিতে ১৯৪৬ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত মিডল ইস্ট স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন।[১১৩] এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রমে দেখা দেয় মিডল ইস্ট স্টাডিজ অ্যাসেসিয়েশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের ক্ষমতাধর সমর্থন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনে বিভিন্ন প্রকল্প, বিচিত্র কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রকল্প, প্রতিরক্ষা বিভাগ, র‍্যান্ড (RAND) হাডসন, ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপ; এ ছাড়া ব্যাংক, তেল কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানির যোগাযোগ।

প্রাচ্যে ইউরোপীয় ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায় সাদৃশ্য স্বাভাবিক। যা অনিবার্য নয় তা হলো (ক) যুদ্ধোত্তরকালে আমেরিকায় নিকট-প্রাচ্যসম্পর্কিত অধ্যয়নের প্রাবল্যে ইউরোপীয় ঐতিহ্য যতটা গৃহীত হয়, জনপ্রিয়তা পায় বা আত্তীকৃত হয়, কিংবা ইউরোপীয় ঐতিহ্য বা তা থেকে যতটা গ্রহণ করে (খ) সমকালীন পরিশোধন প্রবণতা ও সামাজিক বিজ্ঞানের মতো সূক্ষ্ম কৌশলের ব্যবহার সত্ত্বেও ইউরোপীয় ঐতিহ্য মার্কিন পণ্ডিতবর্গ, ইনস্টিটিউট, ডিসকোর্স নির্মাণ ও পরিচিতি অর্জনে এতটা ঐক্যবদ্ধতার যে বোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

আগে উল্লেখ করেছি ১৯৫০ সালে হার্ভার্ডের সেন্টার ফর মিডল ইস্ট স্টাডিজ-এর পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন গিব। যুক্তরাষ্ট্রে গিবের উপস্থিতি আর প্রিন্সটনে ফিলিপ হিট্টির উপস্থিতি এক জিনিস নয়। প্রিন্সটনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ তৈরি করে একদল গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিত যাদের মুখ্য আগ্রহ প্রাচ্য বিষয়ে মহান পণ্ডিতি গবেষণা। অন্যদিকে গিব প্রাচ্যতত্ত্বের রাষ্ট্রীয় নীতির দিকটি সম্পর্কে অনেক সচেতন। হার্ভার্ডে তার অবস্থান প্রাচ্যতত্ত্বকে স্নায়ু যুদ্ধকালীন অঞ্চল অধ্যয়নের মনোভঙ্গির প্রতি আকৃষ্ট করে।

রেনান, বেকার ও ম্যাসিগননের মতো গিব নিজের কাজে সাংস্কৃতিক ডিসকোর্সের ভাষা বিশেষ প্রয়োগ করেননি। এ সত্ত্বেও এই ডিসকোর্স এর বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলসমূহ

এর অন্ধ মতাদর্শ গুস্তাভ ভন গ্রুনেভমের কর্তৃত্বময় পাণ্ডিত্য ও রচনারাজিতে প্রবলভাবে উপস্থিত। ফ্যাসিজম থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে ইউরোপ থেকে পালিয়ে আসা বুদ্ধিজীবীদের মতোই গুস্তাভ যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।[১১৪] তিনি তার প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখালেখিতে এই মত তুলে ধরেন যে, ইসলাম হলো প্রতিশোধাত্মক এক সংস্কৃতি। এরপর থেকে আজীবন তিনি এই মতকেই লালন করেন, তার সমর্থনে অব্যাহত রাখেন সংকোচক ও নেতিবাচক সাধারণীকরণ। তিনি দেখান যে ইসলাম মানবতাবিরোধী, উন্নয়নে অক্ষম, আত্মজ্ঞানহীন, অ-সৃজনশীল, অ-বৈজ্ঞানিক, কঠোর নিয়ন্ত্রণমুখী। আমাদের মনে রাখতে হবে গ্রুনেভম যুক্তরাষ্ট্রে বসে লিখেন একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের কর্তৃত্বের সঙ্গে; শিক্ষা দেন, পণ্ডিতদের বড় একটি নেটওয়ার্কে অনুদান প্রদান করেন, তা পরিচালনাও করেন :

> আমাদের বুঝতে হবে যে মুসলিম সভ্যতা একটি সাংস্কৃতিক ব্যাপার, যা আমাদের প্রাথমিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তা নিজের একটি প্রান্ত হিসেবে কিংবা নিজের প্রকৃতি ও ইতিহাস পরিষ্কারভাবে উপলব্ধির উপায় হিসেবেও অন্য সংস্কৃতির কাঠামোভিত্তিক অধ্যয়নে আগ্রহী নয়। এই পর্যবেক্ষণ যদি সত্য হয় তাহলে কেউ হয়তো একে ইসলামের সবচেয়ে বিশৃঙ্খল পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইবে। কিন্তু ইসলাম কখনো তার বাইরে কাউকে তাকাতে দেয় না, যদি না তা করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু যেহেতু তা অতীতের জন্যও প্রযোজ্য, তাই কেউ হয়তো একে যুক্ত করতে চাইবে ইসলামের মানবতাবিরোধী সভ্যতার সঙ্গে অর্থাৎ বস্তুর বিচাররূপী মানুষকে সরাসরি অস্বীকার করার স্বভাব এবং মানসিক গঠন থেকে উদ্ভূত বর্ণনার সত্য অর্থাৎ মানসিক সত্যে সন্তুষ্ট থাকার প্রবণতার সঙ্গে।
>
> [আরব বা ইসলামি জাতীয়তাবাদে] একটি জাতির ঐশ্বরিক অধিকারের ধারণাটিই অনুপস্থিত। তাতে গঠনমূলক নৈতিকতার অভাব, উনিশ শতকের যান্ত্রিক উন্নতির ধারণাও নেই। সবচেয়ে বড় কথা এতে কোনো প্রাথমিক প্রপঞ্চের ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক তেজোদ্দীপ্ত নেই। ক্ষমতা এবং ক্ষমতার ইচ্ছা উভয়ই নিজেদের মধ্যেই সমাপ্ত। রাজনৈতিক তুচ্ছতার ক্ষোভ জন্ম দেয় অসহিষ্ণুতা, বাধাগ্রস্ত করে বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের বৃহত্তর বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা।[১১৫]

ভন গ্রুনেভম-এর রচনা প্রশ্ন ছাড়াই গৃহীত হয়, যদিও এখন চেষ্টা করলেও এই জ্ঞানক্ষেত্রটি এ রকম ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারবে না। কেবল একজন সমালোচক–মরোক্কান ঐতিহাসিক আবদুল্লাহ লারোই গ্রুনেভমের লেখা সম্পর্কে আপত্তি তোলেন। তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করেন যে, এমন বিস্তৃত পরিসর ও খুঁটিনাটি ধারণ করেও গ্রুনেভমের লেখা সংকোচক রীতি গ্রহণ করল কেন? লারোই বলেন যে গ্রুনেভম ইসলামের সঙ্গে যেসব বিশেষণ (আদি, মধ্যযুগীয়, আধুনিক) ব্যবহার করেছেন সেগুলো নিরপেক্ষ 'কারণ ধ্রুপদ ইসলাম ও মধ্যযুগীয় ইসলাম কিংবা সহজ

ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এখানে একটি মাত্র ইসলাম রয়েছে, যা নিজের মধ্যে পরিবর্তিত হয়।'[১১৬] লারোই উল্লেখ করেননি যে পশ্চিমের কাছে থেকে প্রাচ্যের শেখার প্রয়োজনীয়তার ধারণাটি, সম্ভবত, গ্রুনেভমের প্রভাবেই কথিত-সত্যে পরিণত হয়। (যেমন সেলফ ডিটারমিনিজম অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন দি থার্ড ওয়ার্ল্ড[১১৭]-এ ডেভিড গর্ডন যুক্তি দেখান যে আফ্রিকি, এশীয় ও আরবদের প্রয়োজনীয় পরিপক্বতা অর্জন করতে হবে পশ্চিমের জাগতিক মনোভাব থেকে।)

ভন গ্রুনেভম আসলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তার অন্তস্থ অন্ধ মতাদর্শ এবং ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য—এই উভয়ের শিকারে পরিণত হন। ইসলামের যে বৈশিষ্ট্যকে তিনি বলেন দুর্বলতা, তা হলো : ইসলামে উচ্চাঙ্গের ধর্মীয়তত্ত্ব আছে, কিন্তু ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনা স্বল্প; রাজনৈতিক তত্ত্ব আছে, কিন্তু প্রকৃত দলিল সামান্যই' সমাজকাঠামোর তত্ত্ব আছে, কিন্তু ব্যক্তিক ক্রিয়াশীলতার উদাহরণসুলভ নয়; ইতিহাসের তত্ত্ব আছে, কিন্তু সন-তারিখসহ ঘটনার বিবরণ অত্যল্প; অর্থনীতির বিরাট তত্ত্ব আছে কিন্তু প্রায়োগিক বিবরণ নেই এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।[১১৮] গ্রুনেভমের ইসলাম আসলে ইউরোপীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ইসলাম—মধ্যযুগীয়, সাধারণ মানবীয় অভিজ্ঞতার ঘৃণায় ভরপুর, স্থূল, সংকোচক, অপরিবর্তনীয়।

নতুন প্রজন্মের প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের কাছে এ-জাতীয় মতের প্রভাব বিস্তারের একটি কারণ এর প্রথাগত গুরুত্ব; অন্য আরেকটি কারণ হলো এমন বিশাল একটি অঞ্চলকে একত্রে অবধারণের জন্য হাতের কাছে প্রস্তুত একটি হাতিয়াররূপে এর ব্যবহার। লক্ষণীয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আরব জাতীয়তাবাদীরা প্রকাশ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামের নিন্দা করার এ-জাতীয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। আরেকজন পণ্ডিত ইসলামি সমাজকে অভিহিত করেন 'একটি আবদ্ধ সমাজের প্রত্নরূপ' হিসেবে। তিনিও 'আমাদের;, 'ওদের' মতাদর্শিক চিত্র ব্যবহার করেন :

> মধ্যপ্রাচ্যের সমাজকে সামগ্রিকভাবে বোঝার কাজটি আমাদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে থাকা উচিত। যে সমাজ বহুমাত্রিক স্থায়িত্ব অর্জন করেছে কেবল [আমাদের সমাজের মতো] এমন কোনো সমাজই অস্তিত্বের স্বায়ত্তশাসিত জগতের বিষয়াদিরূপে যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির চর্চা করতে পারে। প্রথাগত যে সমাজ শাসকের বিষয়সমূহকে ঈশ্বরের বিষয়গুলো থেকে আলাদা করতে পারে না, কিংবা রাজনীতির সঙ্গে জীবনের অন্য সব বিষয় গুলিয়ে ফেলে তা-ই আলোচনার মূল বিন্দু। এ মুহূর্তে একজন মানুষ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করবে, না একজন; খাবে, না উপোস করবে; জমি ত্যাগ করবে না ধরে রাখবে—এসবই মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত।...মুসলমান এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিককেও গুরুত্বের সঙ্গে নতুন করে ভেবে দেখতে হবে ইসলামি সমাজের বিশিষ্ট কাঠামো ও সম্পর্ক কী হতে পারে।[১১৯]

জীবনের সামগ্রিকতাকে ইসলামে অন্তর্ভুক্তকরণ ও দমনের প্রদত্ত উদাহরণগুলো নিঃসন্দেহে তুচ্ছ। তা ছাড়া কোথায় এগুলো ঘটছে, তা বলা হয়নি। তবে আমাদের এই অরাজনৈতিক ঘটনা মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, 'প্রাচ্যদেশিরা নিজেদের অতীত সম্পর্কে ভালো বলে, তার জন্য দায়ী প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরাই'।[১২০]

নব্য মার্কিন প্রাচ্যতত্ত্বের কঠোরপন্থীদের মত যখন এই, তখন 'নরমপন্থীরা' আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রথানুগ প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা আমাদের ইসলামের ইতিহাস, ধর্ম, সমাজের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা দেয়, তবে 'প্রায়শই কয়েকটি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে একটি সভ্যতাকে তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়'।[১২১] অতএব, প্রথানুগ প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের বিপরীতে নতুন অঞ্চল বিশেষজ্ঞরা দার্শনিক যুক্তি দেখান :

> গবেষণাপদ্ধতি ও বিষয়ভিত্তিক আদিকল্প অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করলে চলবে না; এগুলোর দ্বারা পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ হওয়াও উচিত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অঞ্চলবিদ্যা মনে করে যে প্রকৃত জ্ঞান কেবল অস্তিত্বশীল জিনিসের ক্ষেত্রেই সম্ভব–যখন পদ্ধতি ও তত্ত্ব বিমূর্ত, যেগুলো অভিজ্ঞতা-বিরহিত মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ সুশৃঙ্খল করে এবং তার ব্যাখ্যা প্রদান করে।[১২২]

ভালো! কিন্তু কেউ কীভাবে জানবে কোনটি 'অস্তিত্বশীল জিনিস' এবং যিনি জানবেন তিনি 'অস্তিত্বশীল জিনিসকে' কতটা প্রদর্শন করতে পারবেন? এর উত্তর ছেড়ে দেয়া হয়েছে বিতর্কের ওপর। বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী প্রবণতা ছাড়া ইসলাম কদাচিৎ অধীত ও গবেষিত হয়েছে, বা কদাচিৎ ইসলামকে জানা হয়েছে। উদ্ধৃতিটির অর্থ দাঁড়ায় যে, জ্ঞানের বস্তু ও প্রক্রিয়ায় মানুষের কোনো ভূমিকা নেই, সুতরাং প্রাচ্যদেশীয় বাস্তবতা সম্পূর্ণ স্থির ও 'অস্তিত্বশীল'।

চরম ও নরমপন্থীদের মাঝখানেও পুরোনো প্রাচ্যতত্ত্বের কিছু দূষিত সংস্করণ বিকশিত হয়েছে। তবে প্রাচ্যতত্ত্বের গোঁড়া ধারণাগুলো বিশুদ্ধরূপে টিকে আছে আরব ও ইসলামবিষয়ক অধ্যয়নে। একটি হলো পশ্চিম ও পুবের পার্থক্য : পশ্চিম যুক্তিবাদী, উন্নত, মানবিক, উৎকৃষ্ট; প্রাচ্য নিকৃষ্ট, অনুন্নত। আরেকটি হলো বিমূর্ত আখ্যা–বিশেষত 'ধ্রুপদ' প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তিতে সৃষ্ট বিমূর্ত আখ্যা আধুনিক প্রাচ্যদেশীয় বাস্তবতার প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির ক্ষেত্রে বেশি পছন্দনীয়। তৃতীয় আরেকটি এই যে, প্রাচ্য চিরন্তন, একক, অবিচল–নিজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না; তাই প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পশ্চিমের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয়, খুবই সাধারণীকৃত ও পদ্ধতিভিত্তিক শব্দভাণ্ডার ও বাক্যাবলি জরুরি এমনকি 'বৈজ্ঞানিকভাবে' অত্যাবশ্যক। চতুর্থ, গোঁড়া ধারণাটি হলো প্রাচ্য এমন কিছু যাকে ভয় পেতে হবে (হলুদভীতি, মোগল দস্যুদল, বাদামি উপনিবেশ) অথবা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে (গবেষণা, অধ্যয়ন কিংবা যখন সম্ভব সরাসরি দখলের মাধ্যমে)।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এসব ধারণা কোনো প্রতিষ্ঠানে বা সরকারের ভেতর কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়াই টিকে থাকে। আরব পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে কোনো সুশৃঙ্খল প্রতিরোধ

গড়ে তুলতে পারেননি। কিন্তু আফ্রিকা, এশিয়ার অন্যান্য এলাকায়, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ থেকে প্রতিরোধী স্রোত উত্থিত হয়। কেবল আরব ও ইসলামের তাত্ত্বিকরাই উদাসীন।

এদিকে মিডল ইস্ট স্টাডিজ প্রতিষ্ঠান একটি সংযোজক প্রস্তুত করে, যার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হয় করপোরেট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, তেল কোম্পানি, ধর্মীয় মিশন, সেনাবাহিনী, পররাষ্ট্র বিভাগ, গোয়েন্দা সংস্থা ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে অনুদান ও অন্যান্য পুরস্কার, পদবিন্যাস, ইনস্টিটিউট, সেন্টার, ফ্যাকাল্টিজ, ডিপার্টমেন্ট—যার সবই বিকশিত হয়েছে ইসলাম, প্রাচ্য ও আরবদের সম্পর্কে গুটিকয় মৌলিক, অপরিবর্তিত ধারণাকে বৈধতা প্রদানের ও প্রচলিত রাখার প্রয়োজনে। আমেরিকায় মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন কর্মসূচির একটি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ দেখায় যে, অধ্যয়ন ক্ষেত্রটি আদিম নয়, বরং জটিল যার মধ্যে 'পুরোনো ধারার প্রাচ্যতাত্ত্বিক, সংখ্যাল্প বিশেষজ্ঞ, বিদ্রোহী-বিশেষজ্ঞ, নীতি-নির্ধারক তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার দালালদের[১২৩] সংখ্যালঘু একটি দল' আছে। যাই হোক, মূল গোঁড়া-প্রাচ্যতাত্ত্বিক ধারণাগুলো যথারীতি টিকে থাকে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট সবচেয়ে সম্মানজনক কাজ দুই ভলিউমের ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম আলোচনা করা যায়। এটি প্রকাশিত ১৯৭০ সালে বহু প্রখ্যাত সমালোচকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যদি বলি গ্রন্থটি এক প্রাচ্যতত্ত্ব ছাড়া আর যেকোনো মানদণ্ডেই বিরাট এক ব্যর্থতা, তাহলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, এর সার্থকতা সম্ভাবনাও ছিল। আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিতও বলেছেন যে,[১২৪] এ ধরনের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনাতেই ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়ে যায়, তা আর কোনোক্রমেই উৎকৃষ্ট বা ভিন্নভাবে রচিত হতে পারে না। বহু মতাদর্শকে একসঙ্গে প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করেছেন সম্পাদকগণ, অস্পষ্ট ধারণায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং পদ্ধতিগত প্রশ্নটিকে মোটেও বিবেচনায় আনেননি। ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম ইসলামকে মৌলিক দিক থেকেই ভুলভাবে উপলব্ধি ও প্রতিনিধিত্ব করেছে। এর কোনো কেন্দ্রীয় আদর্শ নেই, পদ্ধতিগত বুদ্ধিমত্তাও প্রায় অনুপস্থিত।

প্রাক-ইসলামি আরবের ওপর এরফান শহীদ কর্তৃক রচিত অধ্যায়টিতে চমৎকারভাবে তৎকালীন আরবের ফলপ্রসূ পরিবেশ ও মানব-বিন্যাসের বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্যে থেকে ইসলামের আবির্ভাব। কিন্তু পিএম হল্ট-এর সূচনায় যখন ইসলামকে অভিহিত করা হয় 'সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণরূপে'[১২৫], তখন কি-ই বা বলার থাকে। তার সেই সূচনা প্রাক-ইসলামি আরব থেকে সোজা মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কিত আলোচনায়, অতঃপর চার উত্তরাধিকারী খলিফাগণ এবং উমাইয়া শাসনের প্রসঙ্গে প্রবেশ করে; ধর্মমত বা বিশ্বাস বা মতবাদ হিসেবে ইসলাম সম্পর্কে কোনো কথা নেই। প্রথম খণ্ডের শত শত পৃষ্ঠাজুড়ে ইসলামকে উপলব্ধি করা হয়েছে যুদ্ধ, শাসন, মৃত্যু আর উত্থান-পতনের একঘেয়ে কাহিনিরূপে।

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের সামান্যতম ধারণা আছে তারাই একমত হবেন যে, আট থেকে এগারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত আব্বাসীয় শাসনামল ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সবচেয়ে সমৃদ্ধ অধ্যায়। অথচ চল্লিশ পৃষ্ঠার বিবরণে আমরা কোথাও সেই সমৃদ্ধির চিহ্নমাত্র পাই না। তার বদলে পাই এ ধরনের মন্তব্য : 'খলিফা (আল-মামুন) তার বিশ্বস্ত লোক আল-ফজলের ভাই আল-হাসান বি. শাহলের ওপর বাগদাদের দায়িত্ব দিয়ে বাগদাদের সমাজ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে মারভ-এ স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শিয়া বিদ্রোহ দেখা দেয় বাগদাদে জুমাদা, ১৯ জানুয়ারি ৮১৫-এ। হাসানিদ ইবনে তবাতবাঈর সমর্থনে কুফা থেকে সশস্ত্র সেনাদল চাওয়া হয়।[১২৬]

অমুসলিম পাঠক বুঝতে পারবেন না দ্বিতীয় জুমাদা আসলে কী। তার কাছে মনে হবে হারুন-অর-রশিদসহ আব্বাসীয় খলিফারা নির্বোধ খুনি ছাড়া আর কিছু নয়।

ইসলামের মূলভূমির বর্ণনা থেকে উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়াকে বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রথম খণ্ডে ইসলাম আসলে নির্বাচিত সময়ক্রমে বর্ণিত ভৌগোলিক ব্যাপার মাত্র। আধুনিক আরবে বিপ্লবী পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে কিছুমাত্র ধারণা ছাড়াই, কেবল আরবদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ সম্বল করে রচনা করা হয়েছে আধুনিক আরব-সম্পর্কিত অধ্যায়টি। (উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ সময় আদর্শ ও আবেগে উদ্দীপ্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত আরব তরুণরা পরিণত হয় রাজনৈতিক শোষণের উর্বর ক্ষেত্রে এবং চরমপন্থী তৎপরতার বাহনে।[১২৭] ত্রিশের দশকে অল্পসংখ্যক আরব তরুণের মধ্যে ফ্যাসিজম আলোড়ন তোলার ঘটনা কথিত হলেও বলা হয়নি যে, এই ফ্যাসিজমে উদ্বুদ্ধ লেবানিজ মেরোনাইট খ্রিষ্টানরা ১৯৩৬ সালে মুসোলিনির ব্ল্যাক শার্টের আদলে ফেলাঞ্জিন লিবানাইজেস গঠন করে।) ১৯৩৬ সালের ওপর অস্থিতিশীলতা ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের অপবাদ ছাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু কোথাও ইহুদিবাদী তৎপরতার কথা উল্লেখ করা হয়নি; উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ধারণাও বর্ণনার শান্ত মসৃণতা ক্ষুণ্ন করেনি কোথাও। পরিবর্তন ও রূপান্তর আলোচিত হয়েছে আধুনিকতার সঙ্গে তুলনা করে এবং ব্যাখ্যাও দেয়া হয়নি কেন অন্য কোনো পরিবর্তন আলোচনায় আসার প্রয়োজন নেই। যেহেতু ধরে নেয়া হয় একমাত্র পশ্চিমের সঙ্গেই ইসলামের সম্পর্ক তাই বান্দুং সম্মেলন বা আফ্রিকা কিংবা সামগ্রিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্বও উপেক্ষিত। পার্থিব বাস্তবতার প্রায় তিন-চতুর্থাংশের প্রতি অবজ্ঞা এই মজার মন্তব্যটিকে চমৎকার ব্যাখ্যা করে : 'সমতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে...পশ্চিম ও ইসলামের মধ্যে নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য ঐতিহাসিক পটভূমি পরিষ্কার করা হয়ে গেছে [কার দ্বারা, কার জন্য, কীভাবে]।[১২৮]

প্রকৃত অর্থে ইসলাম কী তা জানতে গিয়ে আমরা যদিও প্রথম খণ্ড পাঠ শেষে বিভ্রান্ত, দ্বিতীয় খণ্ডেও কোনোরূপ সহায়তার আশা দেখি না। গ্রন্থের অর্ধেক ব্যয় হয়ে যায়

দশ থেকে বিশ শতকের ভারতে, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ায়, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলি সম্পর্কে; এভাবে বারো শ পৃষ্ঠার মতো শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায় ইসলাম আর সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ নয়–যুদ্ধ, শাসক-বংশ আর সম্রাটের নাম ডাকার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ অর্ধেকে 'ভৌগোলিক বিন্যাস' 'ইসলামি সভ্যতার উৎস' 'ধর্ম ও সংস্কৃতি' এবং 'যুদ্ধ' বিষয়ে নিবন্ধ নিয়ে মহাসংশ্লেষ নিজেই সমাপ্ত হয়।

এখানে একটি বৈধ প্রশ্ন ওঠে যে, ইসলামি যুদ্ধ বলে কিছু কি আছে, বা খ্রিষ্টীয় যুদ্ধ? না হলে এ বিষয়ে আলাদা অধ্যায় রচিত হয় কি করে? ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্ক থেকে উদ্ধৃতির প্রাসঙ্গিকতা কী?–কেবল ভন গ্রুনেভনেরম অবিবেচনাপ্রসূত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ছাড়া? দেখা যায়, গ্রুমের তত্ত্বই যেন ছদ্মবেশে উপস্থাপিত : অর্থাৎ ইসলামি সভ্যতা মুসলমানদের দ্বারা ইহুদি-খ্রিষ্টীয়, হেলেনিস্টিক ও অস্ট্রো-জার্মান সভ্যতা থেকে ধার করা জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মন্তব্য করা হয় 'তথাকথিত আরবি সাহিত্য' পারস্যবাদীদের দ্বারা লিখিত (কোনো তথ্য-প্রমাণের উল্লেখ নেই)। 'ধর্ম ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ের শুরুতে ব্যাখ্যা ছাড়াই জানানো হয় ইসলামি সভ্যতার প্রথম পাঁচ শ বছরই কেবল আলোচিত হয়েছে। এর অর্থ কি এই যে বারো শতকেই ইসলামি সভ্যতার বিকাশ সম্পন্ন ও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে? 'ইসলামি ভূগোল' বলে কিছু কি আসলে আছে? এসব কি তাহলে ভৌগোলিক-বর্ণনাভিত্তিক নির্ধারণবাদ নয়?

ইসলামি বিষয়সমূহ বিশ্লেষণে মতাদর্শের আধুনিক ইতিহাস, মার্কসীয় বিচারপদ্ধতি বা নব-ইতিহাসের কোনো পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়নি। কিছু লেখকের কাছে ইসলাম রাজনীতি ও ধর্ম, অন্যদের কাছে তা অস্তিত্বের একটি ধরন, অন্য কারও মতে এটি 'মুসলিম সমাজ থেকে চিহ্নিত করা যায়' আরেক দলের কাছে ইসলাম রহস্যময় উপায়ে জ্ঞাত কিছু। সবকিছুর ওপর আছে ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম-এর অপরীক্ষিত বিবৃতিতে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করার পুরোনো এই মতবাদ যে, ইসলাম কেবলই কেতাবি ব্যাপার, জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত কোনো কিছু নয়।

কিন্তু কথা হলো, জাতিগত উৎস ও ধর্মীয় পরিচয়ই কি মানবীয় অভিজ্ঞতার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা? 'এক্স' ও 'ওয়াই' কোন উপায়ে অসুবিধাজনক বা ওগুলো কি মুসলিম অথবা ইহুদি, এ তথ্য ইসলামে বোঝার ক্ষেত্রে খুব সহায়ক হবে কি?

তুচ্ছ ইসলাম : সেমেটিকদের সরলতা সম্পর্কিত তত্ত্বটি আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের অতটাই গভীরে প্রোথিত যে, এটি প্রায় একইভাবে প্রযুক্ত হয় টি প্রটোকলস অব দ্য এল্ডার্স অব জিয়ন-এর মতো গ্রন্থ বা চায়েম ভাইজম্যানের এ মন্তব্যেও :

> হাবভাবে চতুর আরবরা একটি জিনিস–কেবল একটি জিনিসের পূজারি। তা হলো ক্ষমতা ও সাফল্য...আরবদের বিশ্বাসঘাতক চরিত্র, তা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের

> জানা বিধায়...সতর্কতার সঙ্গে অবিরাম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ইংরেজ শাসন যত নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করে আরবরা ততই উদ্ধত হয়...ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকবে। কারণ, ফেলাহ [মিসরীয় কৃষক] যুগের তুলনায় অন্তত চার শ বছর পিছিয়ে এবং এফন্দি [সম্মানসূচক তুর্কি সম্বোধন] যেমন অসৎ অশিক্ষিত, লোভী, দেশপ্রেমহীন, তেমনি অযোগ্য।[১২৯]

ভাইজম্যান ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক শ্রেণিবিভাজক হলো প্রাচ্যতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত–প্রাচ্যদেশীয়দের এমনভাবে দেখা যে পশ্চিমের আকাঙ্ক্ষিত কোনো গুণ তাদের মধ্যে নেই। তবু রেনান ও ভাইজম্যানের পার্থক্য এখানে যে, দ্বিতীয়োক্তজন এরই মধ্যে তার বক্তব্যের সপক্ষে নিরেট প্রাতিষ্ঠানিক ভিত পেয়েছেন, রেনানের তা নেই। এর অর্থ কি এই নয় যে, রেনান সেমেটীয়দের মধ্যে যা দেখেছিলেন অর্থাৎ অপরিবর্তিত সত্তা, সেই অপরিবর্তনীয় 'দয়ার্দ্র শৈশবকাল'-এর ধারণাই কি এখন রাষ্ট্র ও সব প্রতিষ্ঠানসমেত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মিশে যায়নি?

তবু এসব মিথের বিশ শতকী সংস্করণ আরও বেশি ক্ষতিকর ক্রিয়াশীলতা বজায় রেখে চলেছে। সে অনুযায়ী, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ফিলিস্তিনিরা হয় নির্বোধ ও আদিম, নয়তো নৈতিক ও অস্তিত্বগতভাবে উপেক্ষণীয়। আরবদের অধিকার সামান্যই, ওরা ইসরাইলে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে পারবে না; ওদের যে সমান অধিকার নেই, তার কারণ ওরা অনুন্নত। আরবদের প্রতি ইসরাইলি নীতি শুরু থেকেই প্রাচ্যতত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়েছে; তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে সম্প্রতি প্রকাশিত কোয়েনিগ রিপোর্টে। আরবদের আবার ভালো আরব (যারা কথা শোনে) ও খারাপ আরব (যারা শোনে না, তাই সন্ত্রাসী) ভাগ করা হয়েছে। রবার্ট অল্টার কমেন্টারিতে[১৩০] চমৎকার ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, জেনারেল ইয়েহোশাফাত হারকাবি'র আরব অ্যাটিচুড টু-ইসরাইল-এর ওপর একবার চোখ বুলালেই বোঝা যাবে আরব মন দূষিত, মৌলিকভাবে সেমেটিকবিরোধী সন্ত্রাসী, ভারসাম্যহীন, কেবল জানে কথা বলতে। এভাবে একটি মিথ সৃষ্টি করে আরেকটি মিথ, তাকে সমর্থনও করে।

একরাশ বিশ্বাস হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ব তার নিজের থেকে এবং নিজের মধ্যে বিকশিত হতে পারে না। কারণ, এটি নিজেই উন্নয়নের মতাদর্শ বিরোধীতত্ত্ব। এর কেন্দ্রীয় বক্তব্য হলো সেমেটিয়দের উন্নয়ন-স্থবিরতা। ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রভাবে সেমেটিক মিথ ইহুদিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। একদল সেমেটিক মিশে যায় প্রাচ্যতত্ত্বের সঙ্গে, অন্যদল, অর্থাৎ আরবরা বাধ্য হয়ে যায় 'প্রাচ্যদেশীয়'তে। প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক সৃষ্ট মিথের স্বল্পায়ুর কারণে প্রত্যেক প্রাচ্যতাত্ত্বিকের থাকে অস্থিতিশীল ক্ষমতার এক বাড়তি সমর্থক পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি এখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এসে তুঙ্গীভূত হয়েছে। কাজেই আরব প্রাচ্যদেশীয়দের সম্পর্কে কিছু সৃষ্টির

অর্থ হলো একটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিলে লেখা; এবং রূঢ় ভাবাদর্শ নয়, এক পরম ক্ষমতার সমর্থনপুষ্ট হয়ে প্রশ্নহীন নিশ্চিত 'সত্য' নিয়ে লেখা।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারির সংখ্যার কমেন্টারিতে গিল কার্ল এলরয়ের প্রবন্ধ 'ডু দি আরবস ওয়ান্ট পিস' প্রকাশিত হয়। এলরয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক এবং অ্যাটিচুড টুওয়ার্ডস জুয়িশ স্টেটহুড ইন আরব এবং দি আরব ওয়ার্ল্ড ও ইমেজেস অব মিডল ইস্ট কনফ্লিক্ট গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। তার বক্তব্য আঁচ করা যায়। তা এই যে, আরবরা ইসরাইলকে ধ্বংস করতে চায়, আরবরা যা বলে প্রকৃতপক্ষে তা-ই নির্দেশ করে। এলরয়কে তা-ই প্রমাণ করতে হবে। কারণ, তার মতে আরবরা প্রথমত, প্রতিশোধপরায়ণ রক্তখেকো, দ্বিতীয়ত, শান্তি বজায় রাখতে অক্ষম, তৃতীয়ত, এমন ন্যায়বিচারের ধারণায় সম্পৃক্ত যা আসলে উলটো অর্থ নির্দেশ করে। তাই ওদের বিশ্বাস করা যাবে না; এভাবে মহামারির বিরুদ্ধে লড়তে হয় সেভাবেই ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। তিনি অলিম্পীয় নিশ্চয়তার সঙ্গে বলেন, আরবরা 'বুঝেশুনেই প্রকৃত শান্তি প্রত্যাখ্যান করে'–তার কথা অনুযায়ী, তিনি আরবদের মধ্য থেকেই তার প্রমাণ পেয়েছেন এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও তার মতের সমর্থক।[১৩১]

এ বিবৃতি থেকে উপলব্ধি করা যায় প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার ও প্রাচ্যজনের মধ্যে আরও স্পষ্ট ও শক্তিশালী আরেক পার্থক্য সূচিত করেন। এখানে প্রাচ্যতাত্ত্বিক লিখেন, আর প্রাচ্যজন লিখিত হয়। দ্বিতীয়োক্তজনের জন্য নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নির্ধারিত, প্রথমজনের থাকছে পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ইত্যাদির ক্ষমতা। রোঁলা বার্থ যেমন বলেন মিথ (ও তার সংরক্ষকরা) অবিরাম নিজেই (তারাই) উদ্ভাবন করতে পারে।[১৩২] দুজনের সম্পর্ক মূলত ক্ষমতার সম্পর্ক, যার অসংখ্য কল্পমূর্তি রয়েছে। এখানে রাফায়েল পেটাই-এর গোল্ডেন রিভার টু গোল্ডেন রোড থেকে দৃষ্টান্ত দেখা যায়–

> পশ্চিমের বিব্রতকরভাবে সমৃদ্ধ সভ্যতার ভান্ডার থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি স্বেচ্ছায় কি গ্রহণ করবে তা সঠিকভাবে হিসাব করতে হলে আগে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতিকে ভালোভাবে আয়ত্ত করা দরকার। প্রথানুসারি জনগোষ্ঠীর ওপর নতুন সংস্কৃতির প্রভাবের ফলাফল আন্দাজ করার জন্যও এই জ্ঞান প্রয়োজন। কোনো উপায়ে নতুন সংস্কৃতিকে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করা যায়, তার জন্যও প্রয়োজন আগের তুলনায় আরও গভীরতর অধ্যয়ন। মোটকথা, মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমায়নের প্রতি প্রতিরোধের গার্ডিয়ান নট মুক্ত করে দেয়ার একমাত্র উপায় হলো এর প্রথাগত সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র আয়ত্ত করা। ওখানে চলমান পরিবর্তনকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করা এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা। কাজটি দুরূহ তবে তার পুরস্কার–পশ্চিম ও তার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী জগতের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক–তেমনিই মূল্যবান।[১৩৩]

> ফ্লবেয়ারের আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমের সম্পর্কের যৌনগত রূপ আছে। এখানেও তা অব্যাহত। মধ্যপ্রাচ্য কুমারির মতো বাধা দেয়, আর তরুণ পুরুষ পণ্ডিত প্রবল পরিশ্রমের পর 'গার্ডিয়ান নট'–এর ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে পুরস্কার লাভ করে।

পেটাই-এর লেখার মতো লেখালেখিতে কণ্ঠ-নির্ভর ক্রিয়া বিশেষ এক ঘনীভবন ও সংকোচনের লক্ষ্যে ধাবিত (আগের চেয়ে তার বর্তমান রচনা দ্য আরব মাইন্ড-এ১৩৪ তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে)। তার অধিকাংশ কৌশলই নৃ-তাত্ত্বিক। মধ্যপ্রাচ্যকে তিনি বর্ণনা করেন 'সংস্কৃতি অঞ্চল' রূপে; মূল লক্ষ্য হলো আরবদের আন্তঃপার্থক্য দূর করা, যাতে আসল পার্থক্য অর্থাৎ আরবদের সঙ্গে আর সব মানুষের পার্থক্যকে স্পষ্ট করা সম্ভব হয়, যাতে ওদের গবেষণা ও বিশ্লেষণের বিষয়বস্তুরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। তা ছাড়া এর ফলে সাধারণ প্রলাপকেও ওদের দিয়ে নির্বোধের মতো বৈধতা ও গুরুত্ব দিতে বাধ্য করা সম্ভব হবে, যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে সানিয়া হামাদির টেম্পারামেন্ট অ্যান্ড ক্যারেক্টর অব দি আরবস-এ :

> এখন পর্যন্ত দেখা যায় আরবরা শৃঙ্খল ও সর্বজনমান্য ঐক্য অর্জনে অক্ষম। এরা আবেগের ক্ষেত্রে একসঙ্গে ফেটে পড়ে, কিন্তু ধৈর্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো উদ্যোগ পরিচালনা করতে পারে না; এরা তা করে আধখানা মনে। সংগঠন ও কাজকর্মে এরা সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব প্রদর্শন করে, সহযোগিতা করার ক্ষমতাও এরা দেখাতে পারে না। সবার জন্য বা পারস্পরিক স্বার্থের জন্য যৌথ কর্ম তৎপরতা এদের অজানা।[১৩৫]

হামাদি যা বলতে চেয়েছেন তার গদ্যের ভঙ্গি এর চেয়ে বেশি কিছু বলে 'প্রদর্শন, 'উন্মোচন' প্রভৃতি ক্রিয়া উদ্দেশ্য ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরা কার কাছে উন্মোচন করছে, কার সামনে প্রদর্শন করছে? বিশেষভাবে কারও নয়, সাধারণভাবে সবার সামনে। তার গদ্য যত এগোয়, নিশ্চয়তা যেন ততই বাড়ে, 'যৌথ কর্মতৎপরতা...ওদের অজানা'। আরবরা মানবীয় সত্তা থেকে রূপান্তরিত হয় হামাদির গদ্য ভঙ্গির সামান্য বিষয়ে। অন্যান্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকের লেখাও এ রকম কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে পূর্ণ–হতে পারে তা ম্যানফ্রেড হালফার্নের এই মন্তব্য যে, যদিও সব মানুষের চিন্তন-প্রক্রিয়ার আটটি ধরন রয়েছে, আরবরা তার মধ্যে কেবল চারটি ধরনে সক্ষম[১৩৬], কিংবা মূর বার্গার এর এ আন্দাজ যে, আরবরা বাগাড়ম্বরে অভ্যস্ত বলে কখনো সত্য চিন্তা করতে পারে না।[১৩৭] প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অনুকারক বর্ণনায় আরব চরিত্র, আরব পরিবার, আরব বাগ্মিতা বি-প্রাকৃত, বি-মানবীকৃত রূপ লাভ করে, যদিও এই বর্ণনাতেই জড়িয়ে থাকে বিষয়ের ওপর তাদের প্রবল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। হামাদি থেকেই উদাহরণ দেয়া যাক :

> এ কারণে আরবদের বাস কঠিন, হতাশ এক পরিবেশে। সমাজে তার নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করা বা তার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করার সুযোগ তার নেই। পরিবর্তন ও প্রগতিতে তার বিশ্বাস নিতান্ত সামান্য; উদ্ধারের আশ্রয় কেবল ভবিষ্যৎ।[১৩৮]

অর্থাৎ আরবরা যা অর্জন করতে পারে না, তাদের সম্পর্কিত লেখায় তা পাওয়া যায়। প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার নিজের এবং প্রাচ্যজনের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আরবদের ব্যাপারে দুটো দিক রয়েছে; সংখ্যা ও প্রজননক্ষমতা। উভয় গুণ পরস্পরে রূপান্তরযোগ্য। বার্জার যেদিকে নির্দেশ করেন–মানুষ তার যৌন-দক্ষতাকে মহত্তর মূল্য দিয়েছে[১৩৯]–তা পৃথিবীতে আরবদের অবস্থানের পেছনে সংগুপ্ত এক ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। যদি কেবল নেতিবাচক ও নিষ্ক্রিয়তার ধারণা দিয়ে আরব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করা হয়, তবে এ ধরনের প্রতিনিধিত্বকে মনে করতে হবে আরবদের বিচিত্র মাত্রাগত বিস্তার ও বিরাট পৌরুষত্বকে মোকাবিলার কৌশলমাত্র। আর এই পৌরুষত্বের উৎস যদিও সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, তবে যা যৌনবিষয়ক। অথচ প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্সের অলঙ্ঘনীয় ট্যাবু হলো এই যৌনতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যাবে না। হামাদি, বার্গার ও লার্নাররা আরব পরিবারের শক্তি চিহ্নিত করতে পারে, আরব মনের দুর্বলতা লক্ষ করে, পশ্চিমের কাছে আরবজগতের গুরুত্বও স্বীকার করে। তাদের আলোচনা ইঙ্গিত করে যে, আরবদের সম্পর্কে সবকিছু বলা হয়ে যাওয়ায় বাকি থাকে কেবল তাদের যৌন তাড়নার প্রসঙ্গ। কদাচিৎ যেমন লিয়ন মুগনিয়ারিরি রচনায় অস্পষ্টকে স্পষ্ট করা হয়; তা এই যে 'ওই সব গরম রক্তের দক্ষিণাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো... উদ্দাম যৌন তাড়না।'[১৪০]

প্রাচ্যতাত্ত্বিক এ সম্পর্কে কিছুই বলেন না, যদিও তার যুক্তি-বিন্যাস এর ওপর নির্ভরশীল; নিকট-প্রাচ্যে সহযোগিতা প্রধানত পারিবারিক ব্যাপার এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় দল বা গ্রাম-সমাজের বাইরে তা দেখা যায় না।১৪১ এর অর্থ হলো, আরবদের গণনা করা হয় কেবল জৈব-সত্তারূপে। প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে ওরা শূন্য বা শূন্যের কাছাকাছি। কেবল সংখ্যাগতভাবে এবং পরিবার প্রজননকারী হিসেবে ওরা প্রকৃত বাস্তব।

সাম্প্রতিককালে প্রাচ্যদেশীয় রাজনৈতিক আচরণ আলোচনায় আরবদের ওই প্রতিরূপ কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে বলে মনে হয়। এর সঙ্গে বিপ্লব ও আধুনিকতাও আলোচনায় আসে। পি জে ভ্যাটিকিয়োটিস কর্তৃক সম্পাদিত ১৯৭২ সালে প্রকাশিত রেভল্যুশন ইন দি মিডল ইস্ট অ্যান্ড আদার কেস স্টাডিজ-এর শিরোনামটা চিকিৎসাবিদ্যাসদৃশ। বিপ্লবের আধা চিকিৎসা বিদ্যাগত সংজ্ঞা দিয়ে ভ্যাটিকিয়োটিস সংকলনটির অভিমুখ সূচিত করেন। যেহেতু তা তার ও পাঠকদের মাথায় রয়েছে তাই বিপ্লবের সংজ্ঞার শত্রুতা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। ভ্যাটিকিয়োটিস বলেন :

> সব বিপ্লবী মতাদর্শ মানুষের যৌক্তিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সজ্জার ওপর সরাসরি (আসলে মুখোমুখি) আক্রমণ। বিপ্লবী মতাদর্শ তার অনুসারীদের কাছে থেকে অন্ধ গোঁড়ামি দাবি করে।...মানুষের প্রয়োজনে রাজনীতি একটি সূত্র, যা

> বিপ্লবের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষ বরং বেঁচে থাকে রাজনৈতিকভাবে পরিকল্পিত কিন্তু নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রদত্ত এক আদেশে কাজ করার জন্য।[১৪২]

অনুচ্ছেদটিতে আর যাই বলা হয়ে থাকুক, এটি অন্তত এই নির্দেশ করছে যে, বিপ্লব খারাপ প্রকৃতির যৌনতা এবং ক্যান্সারের মতো এক রোগ। এরপরই স্ববিরোধী হয়ে ওঠেন ভ্যাটিকিয়োটিস। তার কাছে মনে হয় আরবরা বিপ্লবের যোগ্য নয়। সুতরাং আরবদের যৌনতাকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। মোটকথা ভ্যাটিকিয়োটিস তার পাঠকদের এ কথা বিশ্বাস করতে বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লবের ভয় আছে, কারণ সেখানে বিপ্লব অর্জনের সম্ভাবনা নেই।[১৪৩]

ভ্যাটিকিয়োটিসের সংকলনের প্রধান রচনা বার্নার্ড লুইসের প্রবন্ধ 'ইসলামে বিপ্লবের ধারণা'। এখানে ব্যবহৃত কৌশল আরও পরিশোধিত। অনেক মুসলমানই বুঝবেন যে আরবি তওরা অর্থ বিপ্লব। ভ্যাটিকিয়োটিসের অভিমতও তাই। কিন্তু লুইস তার প্রবন্ধের একেবারে শেষ অংশে পৌঁছার আগ পর্যন্ত এ কথাটি কোথাও বলেননি। শেষ দিকে এ বর্ণনা পাওয়া যায় :

> আরবিভাষী দেশগুলোয় বিপ্লব নির্দেশের জন্য একটি ভিন্ন শব্দ আছে, তা হলো তওরা। প্রাচীন আরবি শব্দটির অর্থ উত্থান করা (যেমন উটের উত্থান), উত্তেজিত হওয়া এবং বিশেষ করে মাগরিবি ব্যবহারে, বিদ্রোহ করা। এটি সচরাচর ছোটখাটো সার্বভৌম এলাকা প্রতিষ্ঠা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।[১৪৪]

গোটা অনুচ্ছেদটি ঔদ্ধত্য ও অসততার ছড়াছড়ি। বিপ্লবকে বোঝানোর জন্য প্রাচীন আরবির সূত্রে উটের উত্থানের প্রসঙ্গে আনার কারণ কি, যদি এর আধুনিক অর্থকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্য না থাকবে? লুইসের উদ্দেশ্য বিপ্লবকে তার বর্তমান মহত্ত্বের বদলে শুয়ে থাকা উটের উঠে দাঁড়ানোর চেয়ে ভালো কোনো মূল্য না দেয়। বিপ্লব হলো উত্তেজনা, বিদ্রোহ, ক্ষুদ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা–এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

লুইসের মূল কথা এই যে, ইসলাম কখনো পরিবর্তিত হয় না। এখন তার প্রধান কর্তব্য হলো ইহুদিদের রক্ষণশীল অংশের পাঠককে ও আগ্রহী অন্য সবকে জানানো যে, মুসলমানদের সম্পর্কে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতি বিবরণের শুরু ও শেষ হওয়া উচিত এই সত্য দিয়ে যে, মুসলমান হলো মুসলমান।[১৪৫] তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইসরাইল ছাড়া আর কোথাও গণতন্ত্র পান না, যদিও আরবদের শাসনের জন্য ইসরাইলের গৃহীত ইমার্জেন্সি রেগুলেশন অ্যাক্টের কথা উল্লেখও করেননি। এমনকি লুইস পণ্ডিতি স্বাধীনতা নিয়ে মন্তব্য করেন সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদ খ্রিষ্টান খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের আধুনিক নামমাত্র।[১৪৬]

প্রাচ্যদেশীয়, প্রাচ্যদেশীয়, প্রাচ্যদেশীয় : প্রাচ্যতত্ত্ব শিরোনামে আমি যে ভাবাদর্শিক কল্পকাহিনির বর্ণনা দিলাম তার একটি অর্থ আছে। যুক্তরাষ্ট্রে এখন পৃথিবীর যেকোনো

অঞ্চলের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যে খুব বেশি নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারকদের উপদেষ্টারা আবার জড়িয়ে আছে প্রাচ্যতত্ত্বের সঙ্গে। প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা প্রাচ্যকে দেখেন পশ্চিমের নকলরূপে, যা বার্নার্ড লুইসের মতে, কেবল তখনই উন্নতি করতে পারবে যখন তার জাতীয়তাবাদ 'পশ্চিমের সঙ্গে আপসরফায় হবে'।[১৪৭] এর মধ্যে যদি আরব বা মুসলিম জনগোষ্ঠী অথবা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বিশ্ব অনাকাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হতে শুরু করে তা হলে অবাক হব না যদি প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ প্রাচ্যজনদের দুর্জ্ঞেয়তার দোষ দেন এবং তাদের বিশ্বাস না করার পরামর্শ দেন।

অথচ প্রাচ্যতত্ত্বের পদ্ধতিগত ভুলকে দায়ী করা যাবে না। বলা যাবে না যে, প্রাচ্যতত্ত্বের প্রাচ্য আর আসল প্রাচ্য এক জিনিস ছিল না। এমন বললেও গ্রহণযোগ্য হবে না যে, প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা মূলত পশ্চিমা বলে প্রাচ্যদেশীয়দের সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সঠিক নয়। উভয় ধারণাই ভুয়া। প্রকৃত বা আসল প্রাচ্য বলে কিছু প্রমাণ করাও এ গ্রন্থের লক্ষ্য নয়– কিংবা 'বহিরাগত'-এর পরিপ্রেক্ষিত ও 'অন্তর্গত'-এর পরিপ্রেক্ষিত বলে কিছুর দাবিও নয়, যে গুরুত্বপূর্ণ ও 'অন্তর্গত'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বলে কিছুর দাবিও নয়, যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন দেখান রবার্ট কে. মার্টন[১৪৮]। বরং আমার বক্তব্য হলো প্রাচ্য নিজেই প্রকাশিত একটি সত্তা। মৌলিকভাবে ভিন্ন প্রাচ্যবাসীদের তাদের ভৌগোলিক পরিসরের ধর্ম, সংস্কৃতি বা জাতিগত নির্যাসের আলোকে চিহ্নিত করা জরুরি কি না, তাও একটি বিতর্কিত ধারণা। আমি অবশ্য এমন সীমাবদ্ধ বক্তব্যে বিশ্বাস করি না যে, কেবল কালোরাই কালোদের সম্পর্কে লিখবে, মুসলমান মুসলমানদের সম্পর্কে।

ব্যর্থতা, প্রকাশ্য বর্ণ-বিদ্বেষ, এর কাগজসদৃশ পাতলা বুদ্ধিজীবী হাতিয়ার সত্ত্বেও আমার বর্ণিত রীতির প্রাচ্যতত্ত্ব সমৃদ্ধ হচ্ছে। সবচেয়ে সতর্কতামূলক বিষয় হলো 'প্রাচ্যে'ও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমান আরবজগৎ যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূ-উপগ্রহ। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথাই ধরা যাক। আরব অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসনসূত্রে বিকশিত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলে। কিন্তু নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচিসমূহ এরই মধ্যে উদ্ভট পাঠ্যসূচিতে পরিগণিত হয়েছে। শিক্ষকরা যৎসামান্য বেতন পান। রাজনৈতিক নিয়োগ সাধারণ ব্যাপারমাত্র। তাই ক্লাসগুলো ছাত্রছাত্রীতে ঠাসা থাকলেও যথার্থ শিক্ষা পায় না ওরা। উচ্চতর গবেষণার সুযোগ ও ইচ্ছা দুটোর অভাব। সবচেয়ে বড় কথা পুরো আরব অঞ্চলে একটিও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার নেই। অথচ এই অঞ্চলের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের নিয়ন্ত্রক যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় মেধাবীদের উৎসাহিত করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায় গবেষণা করার জন্য। কিন্তু ওখানে যে স্বল্পসংখ্যক ছাত্র পড়ার সুযোগ পায় তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য খুবই স্বাভাবিক।

দুটো উপাদান পরিস্থিতিতে প্রাচ্যতত্ত্বের বিজয়ের উপযোগী করেছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, নিকট-প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক প্রবণতা মার্কিন আদর্শে পরিচালিত। ১৯৩৬

সালে তাহা হুসাইন আধুনিক আরব সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি যে মিসরীয় সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়েছেন তা প্রাচ্যের নয়, ইউরোপের সংস্কৃতি। আজকের আরব এলিটদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। ১৯৫০-এর দশক থেকে এই অঞ্চলকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা তৃতীয়-বিশ্বের ধারণা মার্কিন সংস্কৃতির প্রভাবক ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া সংস্কৃতি, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বিকাশে আরব ও ইসলামি বিশ্ব এখনো দ্বিতীয় সারির শক্তি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের পত্রপত্রিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যা ঘটছে কোনো আরব পণ্ডিতের পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব; কিন্তু তার উলটোটা প্রযোজ্য নয়। যেমন সমকালীন আরব বিশ্বে কোনো উল্লেখযোগ্য সাময়িকী নেই, তেমনি হার্ভার্ড বা অক্সফোর্ডকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো প্রতিষ্ঠানও নেই। এই অবস্থার ফলাফল সম্পর্কে আগাম বলে দেয়া সম্ভব ছিল, আরব ছাত্র ও অধ্যাপকরা এখনো মার্কিন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের পায়ের কাছে বসলে পারলে ধন্য হয়ে যান এবং পরে প্রাচ্যতত্ত্বের অন্ধ মতবাদ ও জীর্ণ উক্তিগুলো নিজের দেশের মানুষদেরকে শুনিয়ে তৃপ্তিবোধ করেন। এ রকম পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবে ভিন্ন এক প্রবণতা। প্রাচ্যের পণ্ডিতরা তারা দেশবাসীর মর্যাদা ও খ্যাতি আকর্ষণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাকে ব্যবহার করেন।

সাংস্কৃতিক আধিপত্য যেভাবে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে তার আরও কিছু আলামত পাওয়া যায়। আরব ও ইসলামি প্রাচ্য সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ডজন ডজন প্রতিষ্ঠান সক্রিয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য আরব অঞ্চলে একটিও প্রতিষ্ঠান নেই। এমনকি প্রাচ্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এখনো গড়ে ওঠেনি। এ ছাড়া অর্থনৈতিক চাপ তো আছেই। তবে এসব কারণ আমার উল্লেখিত দ্বিতীয় নিয়ামক উপাদানটির তুলনায় নিতান্ত সামান্য; দ্বিতীয় উপাদানটিই এই অঞ্চলে প্রাচ্যতত্ত্বের বিজয় সম্ভব করে তুলেছে। তাহলো প্রাচ্যের সর্বত্র ভোগবাদের ব্যাপক বিস্তার। পশ্চিমের বাজারনীতির সঙ্গে গেঁথে আছে গোটা আরব ও মুসলিম বিশ্ব। অঞ্চলটির একমাত্র সম্পদ তেল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু সম্পর্কটা একেবারেই এক-পার্শ্বিক; যুক্তরাষ্ট্র কেবলই বাছাই করা দু-একটি পণ্যের আমদানিকারক (প্রধানত তেল ও সস্তা মানবসম্পদ)। অথচ আরবরা বিচিত্র মার্কিন পণ্য ও আদর্শের ক্রেতা।

এর বহুমুখী পরিণতি রয়েছে। এই অঞ্চলে রুচির আদর্শ বৈচিত্র্য নিয়ে সক্রিয়। তার প্রকাশ কেবল ট্রানজিস্টর ও ব্লু-জিনসে সীমাবদ্ধ নেই; আমেরিকার গণমাধ্যমগুলো প্রাচ্যদেশীয়র যে কল্পমূর্তি সরবরাহ করে বিচার-বিবেচনা ছাড়াই তা গোগ্রাসে গিলে এখানকার টিভি ও অন্যান্য গণমাধ্যম। আরেকটি সমস্যা হলো, পশ্চিমের বাজার অর্থনীতি ও ভোক্তাকেন্দ্রিক আবহ এখানে এমন এক দল বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করেছে যারা বাজারের চাহিদা মেটানোকেই পরম ধর্ম বলে মনে করে। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণিটি

পশ্চিমের প্রধান সাংস্কৃতিক প্রবণতাসমূহের সহায়ক শক্তিমাত্র। প্রগতি, আধুনিকায়ন ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত যেসব ধারণা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে তাকে বৈধতা দেয়াই এদের কাজ। অর্থশাস্ত্র, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিনিময়ও এই অবস্থাটি জোর প্রভাব খাটায়। এককথায় প্রাচ্য নিজেই এখন তার প্রাচ্যায়নে অংশগ্রহণকারী।

সবশেষে প্রাচ্যতত্ত্বের বিকল্প কোথায়? এ রচনা কি কেবল কোনো কিছুর বিরুদ্ধে যুক্তিবিন্যাস, ইতিবাচক কিছুর আবেদন নয়? আলোচনায় মাঝেমধ্যে বি-উপনিবেশনায়নের কথা বলেছি আমি। যা অঞ্চলবিদ্যার নতুন পথে বিদায়, যেমন আনওয়ার আবদেল মালেকের রচনা। মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নে হাল গ্রুপের সদস্যদের কাজ–ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও নিকট-প্রাচ্যের বিভিন্ন পণ্ডিতের বিশ্লেষণ ও প্রস্তাব।[১৮৯] তবে আমি কেবল ওগুলো উল্লেখ করেছি। এ ছাড়াও মানবীয় অভিজ্ঞতার সমস্যা আলোচনায় প্রাসঙ্গিক একগুচ্ছ প্রশ্ন উত্থাপন করেছি আমি। মানুষ কীভাবে অন্য সংস্কৃতিতে বিবৃত করে? অন্য সংস্কৃতি কী? নির্দিষ্ট কোনো সংস্কৃতির (জাতি, ধর্ম বা সভ্যতার) ধারণা কি কার্যোপযোগী, না কি তা কেবল আত্ম-প্রশংসা (নিজের সংস্কৃতির আলোচনায়) বা শত্রুতা ও আগ্রাসন (অন্যের সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনায়)? সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত পার্থক্য বেশি প্রভাবশালী নাকি আর্থসামাজিক, বা রাজনৈতিক–ঐতিহাসিক বর্গ? মতাদর্শ কীভাবে 'স্বাভাবিকতা' বা 'প্রাকৃতিক' সত্যের মর্যাদা অর্জন করে? বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা কী? তার অবস্থান কী আসলে নিজের সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রকে বৈধতা দেয়ার জন্য? মুক্ত সমালোচক চৈতন্য ও বিরুদ্ধবাদী সমালোচক চৈতন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আরোপ করবেন তিনি?

আশা করি কোনো কোনো প্রশ্নের পরোক্ষ জবাব এর মধ্যেই দেয়া হয়েছে। তবু এখানে আরও কিছু বিষয় স্পষ্ট আলোচনা করতে চাই। বর্তমান গ্রন্থে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, প্রাচ্যতত্ত্ব কেবল অরাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের সম্ভাবনাকেই নয়, রাষ্ট্র ও পণ্ডিতবর্গের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককেও সংশয়ান্বিত করেছে। এও পরিষ্কার যে, যে পরিস্থিতি প্রাচ্যতত্ত্বকে নিরবচ্ছিন্ন প্ররোচক চিন্তায় পরিণত করেছে তা অব্যাহত থাকবে, সব মিলিয়ে এক হতাশাজনক ব্যাপার। তবে আমার মনে কিছু যৌক্তিক প্রত্যাশা আছে, প্রাচ্যতত্ত্বকে সব সময় বুদ্ধিবৃত্তিক, মতাদর্শিক ও রাজনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ না করে ছাড়া উচিত নয়, যেমন এখন চলছে।

যে রকম বিনষ্ট, মানবীয় অভিজ্ঞতার প্রতি অন্ধ পাণ্ডিত্যের স্বরূপ বর্ণনা করেছি তার বাইরে মুক্ত পাণ্ডিত্য সক্রিয় রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাস না থাকলে আমি এ কাজটিতে হাতই দিতাম না। আজকাল ইসলামের ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা, সমাজতত্ত্ব ও নৃ-তত্ত্বে এমন পণ্ডিত রয়েছেন যাদের কাজ পণ্ডিতি মানদণ্ডেও মূল্যবান। সমস্যা হয় যখন প্রাচ্যতত্ত্বের সংঘ-স্বভাব সেই সব পণ্ডিতকে অধিগত করে নেন যারা সতর্ক নন, নিজের ওপর বিভিন্ন উৎসের সম্ভাব্য প্রভাবের বিরুদ্ধে জাগ্রত থাকেন

না। কাজেই যেসব পণ্ডিত প্রাচ্যতত্ত্বকে একটি ভৌগোলিক বা মতবাদগত কিংবা সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিতে বর্ণিত 'জ্ঞানক্ষেত্র' হিসেবে না দেখে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়রূপে দেখেন তাদের দ্বারাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা। চমৎকার এক সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো ক্লিফোর্ড গিরৎজ-এর নৃ-বিজ্ঞান। ইসলাম বিষয়ে তার আগ্রহ এতটা পরিষ্কার ও নিরেট যে, তা কয়েকটি সমাজ সম্পর্কে তার অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা কর্তৃক উদ্দীপ্ত হয়েছে–প্রথাচার, প্রাক-ধারণা ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক নীতিমালায় অনুপ্রাণিত হয়নি।

অন্যদিকে, প্রথাগত প্রাচ্যতত্ত্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত ও সমালোচকগণ নিজেদের পুরোনো জুব্বা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম। জ্যাক বারাক ও ম্যাক্সিম রডিনসনের প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশি, কিন্তু পদ্ধতিগত সচেতনতা তাদের অনুসন্ধানকে গভীরতর করেছে। সূচনা থেকেই প্রাচ্যতত্ত্ব খুব বেশি অহংকেন্দ্রিক, খুব বেশি সীমাবদ্ধ ও নিজের অভিমুখ সম্পর্কে এক শ ভাগ নিশ্চিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্য বা প্রাচ্যের অধীত বিষয়ে কোনো লেখক যদি নিজেকে খোলাসা করে দিতে চান তাহলে তাদের গৃহীত পদ্ধতিকে সমালোচনামূলক পরীক্ষণে রাখতে হবে। এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে বারাক ও রডিনসনে। ওদের কাজের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়বস্তুর প্রতি প্রত্যক্ষ আবেগ, অতঃপর পদ্ধতি ও চর্চার অবিরাম স্ব-পরীক্ষণ, যাতে তাদের রচনা বিষয়বস্তুর প্রতি নিবেদিত থাকে এবং কোনোমতেই প্রাক ধারণার শিকার না হয়। বারাক ও রডিনসন, আবদেল মালেক ও রজার ওয়েন একটা বিষয়ে সচেতন যে, প্রাচ্যদেশীয় বা অন্য যেকোনো মানুষ ও সমাজকে সবচেয়ে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায় সব মানব-বিজ্ঞানের বিস্তৃত পরিসরে। তাই এসব পণ্ডিত অন্যান্য জ্ঞান ক্ষেত্রের সমালোচনাধর্মী পাঠক এবং শিক্ষার্থীরাও। কাঠামোবাদী নৃ-বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের প্রতি বারাক-এর মনোযোগ, সমাজবিজ্ঞান ও রাজনৈতিকতত্ত্বের প্রতি রডিনসনের, অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রতি ওয়েনের–এসবই নির্দেশনামূলক সংশোধক-সমকালীন মানব-বিজ্ঞান থেকে গৃহীত হয়েছে তথাকথিত প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা অধ্যয়নে।

কিন্তু একটি সত্য এড়ানোর উপায় নেই : প্রাচ্যতাত্ত্বিকের 'আমরা' 'ওরা' বিভাজনকে যতই উপেক্ষা করা হোক না কেন, একরাশ শক্তিশালী রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শিক বাস্তবতা সাম্প্রতিক পাণ্ডিত্যকে অবিরাম প্রভাবিত করে চলেছে। পুব/পশ্চিম না হয় বাদ দিলাম, উত্তর/দক্ষিণ, আছে/ নেই, সাম্রাজ্যবাদী/সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সাদা/বর্ণ ইত্যাদি বিভাজন এড়ানো যায় অসম্ভব। এমন ভানও কার্যকর নয় যে, এগুলো আদৌ নেই বা ছিল না। বরং উলটো প্রাচ্যতত্ত্ব আমাদের এ ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক লুকোচুরির অসততা সম্পর্কে অনেক কিছু শেখাতে পারে, যার ফলাফল হলো বিভাজনের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও দূষণ। এ সত্ত্বেও প্রকাশ্যে সোচ্চার কণ্ঠের কোনো ডানপন্থী 'প্রগতিশীল'

পণ্ডিত সহজেই আক্রান্ত হয়ে ডুবে যেতে পারেন অন্ধ মতবাদের নিষ্ক্রিয়তায়। এমন এক আশঙ্কা যা পরিণতি ছাড়া অন্য কোনোভাবে শিক্ষা দেয় না।

সমস্যা সম্পর্কে আমার নিজের মতো উপযুক্ত প্রশ্নগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক চিন্তা আমাদের প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে জড়িত বিষয়সমূহের ব্যাপারে সতর্ক হতে শিখিয়েছে; অন্যকে সতর্কতার সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করা, বর্ণবাদী চিন্তা-ভাবনায় সংবেদনশীল হওয়া, কর্তৃত্ব ও কর্তৃত্ববাদী মতাদর্শকে নির্ভাবনায় ও সমালোচনাহীন গ্রহণ না করা এবং বুদ্ধিজীবীর আর্থ-সামাজিক ভূমিকা এবং তার সংশয়ী-সমালোচনামুখী চৈতন্যের বিরাট মূল্যের প্রতি সচেতন হওয়া শিখিয়েছে। আমরা যদি স্মরণ করি যে, মানবীয় অভিজ্ঞতা অধ্যয়নের একটি নৈতিক, যদিও অরাজনৈতিক, খারাপ/ভালো ক্রমপরিণতি রয়েছে, তাহলে আমরা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আমাদের কাজ সম্পর্কে আর অতটা উদাসীন থাকতে পারব না এবং একজন পণ্ডিত মানুষের জন্য আর কী থাকবে, মানবীয় স্বাধীনতা ও জ্ঞানের আদর্শ ছাড়া? আমাদের হয়তো এও মনে রাখা উচিত সামাজিক মানুষের অধ্যয়ন মানুষের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল–প্রাতিষ্ঠানিক বিমূর্তায়ন বা অস্পষ্ট আইন কিংবা স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতির ওপর নয়। অতএব, সমস্যাটি হলো অধ্যয়নকে যথাযোগ্য করা এবং কোনো উপায়ে অভিজ্ঞতার সাহায্যে কাঠামো দেয়া, যা হবে আলোকভাসিত এবং হয়তো গবেষণা-অধ্যয়নের দ্বারাই প্রয়োজনে পরিবর্তিত। যেকোনো মূল্যেই হোক, প্রাচ্যের বারবার প্রাচ্যায়ন ঠেকানো দরকার। ফলে জ্ঞান পরিশোধিত হবে, হ্রাস পাবে পণ্ডিতের অহং-এর বিস্তৃতি। 'প্রাচ্য' না থাকলেও পণ্ডিত, সমালোচক, বুদ্ধিজীবী প্রমুখ থাকবেন যাদের কাছে মানব সম্প্রদায়ের উন্নয়নের উদ্যোগের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে গোত্রীয়, জাতিগত ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য।

আমি বিশ্বাস করি এবং অন্যান্য লেখায় দেখিয়েছিও মানব বিজ্ঞানের সমকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে এমন সব অন্তর্দৃষ্টি, পদ্ধতি ও ধারণা সঞ্চারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে, যেগুলো প্রাচ্যতত্ত্বের ঐতিহাসিক উত্থানের যুগে সৃষ্ট জাতিগত, ভাবাদর্শিক ও সাম্রাজ্যবাদী ছাঁচসমূহ দূর করতে পারে। আমি মনে করি প্রাচ্যতত্ত্বের ব্যর্থতা মানবিক, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক। পৃথিবীর একটি অঞ্চলকে নিজের কাছে অচেনা মনে করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের কারণে প্রাচ্যতত্ত্ব মানবীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্ম হতে বা একে মানবীয় অভিজ্ঞতা বলে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাচ্যতত্ত্বের পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য এবং এর সমর্থিত সবকিছুকে এখন চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব, যদি আমরা বিশ শতকের পৃথিবীর এত এত মানুষের নবজাগ্রত রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক সচেতনতা থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারি। এ বইটি যদি ভবিষ্যতে কোনো কাজে লাগে তবে তা হবে ওই চ্যালেঞ্জের সামান্য এক অবদান, এবং সতর্ক-সংকেত যে : প্রাচ্যতত্ত্ব, ক্ষমতার ডিসকোর্স, ভাবাদর্শের কল্পকাহিনি প্রভৃতি

চিন্তন-প্রক্রিয়া খুব সহজে নির্মিত, প্রযুক্ত এবং রক্ষিত। সবচেয়ে বড় কথা আমি আমার পাঠকদের দেখাতে পেরেছি যে, প্রাচ্যতত্ত্বের ওপর পাশ্চাত্যবাদ নয়। কোনো প্রাক্তন প্রাচ্যজনই এমন চিন্তায় আনন্দ পাবেন না যে, তিনি নিজে 'প্রাচ্যজন' হয়েছিলেন বলে এখন তার নিজের গড়া নতুন 'প্রাচ্যজন' বা 'পশ্চিমা' নিয়ে অধ্যয়ন করবেন। প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের যদি কোনো অর্থ থেকে থাকে তাহলে তা জ্ঞানের যেকোনো সময়ে যেকোনো জ্ঞানের প্রলুব্ধকর অধঃপতনের স্মারকমাত্র; আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে হয়তো এখনই অধিক।

• ক •

১৯৯৫ সালের সংস্করণে সংযোজন

অরিয়েন্টালিজম লেখা হয় হয় ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে, মুদ্রিত হয় পরের বছর। একমাত্র এই বইটিই আমি অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ নিয়ে লিখেছি; গবেষণা, অতঃপর বিভিন্ন খসড়া থেকে চূড়ান্ত লিখন–বিরাট কোনো পরিবর্তন না এনে এর একটিকে অনুসরণ করে এসেছে আরেকটি। তখন স্ট্যানফোর্ড সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন দি বিহেভরাল সায়েন্সেস-এর ফেলো হিসেবে (১৯৭৫-৬) অন্যরকম সুশৃঙ্খল ও তুলনামূলকভাবে নির্ভার একটা বছর কেটেছে আমার, বাইরের পৃথিবীর ওপর নির্ভরশীলতা বা আগ্রহ ছাড়াই। দু-একজন বন্ধু আর নিজের পরিবার থেকে উৎসাহ পেয়েছি। তবে ইউরোপ ও আমেরিকায় দু শ বছরের ঐতিহ্যপুষ্ট ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও কল্পনা যে উপায়ে মধ্যপ্রাচ্য, আরব জনগোষ্ঠী ও ইসলামকে দেখেছে তা সাধারণ পাঠকের আগ্রহ জাগাবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। যেমন এখনো মনে পড়ে প্রথমদিকে কোনো প্রকাশক উৎসাহ দেখাননি বরং এ বিষয়ে ছোট আকারের একটি প্রবন্ধ নিয়ে চুক্তি করার পরামর্শ দেয় একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রেস; শুরুতে গোটা উদ্যোগটাই এমন অনুজ্জ্বল ও সম্ভাবনাহীন মনে হয়েছিল। ভাগ্য ভালো (অরিয়েন্টালিজমের প্রথম সংস্করণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পৃষ্ঠায় আমার প্রথম প্রকাশকের কথা উল্লেখ করেছি), বইটা শেষ হওয়ার পর বিষয়গুলো দ্রুত ইতিবাচক মোড় নেয়।

আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে (ওখানে আলাদা যুক্তরাজ্য সংস্করণ বেরোয় ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) বইটি অশেষ আগ্রহ জাগাতে সমর্থ হয়; এর অংশবিশেষ ছিল (পূর্ব-আন্দাজ অনুযায়ী) আক্রমণাত্মক, কিছু ছিল প্রকৃত উপলব্ধি থেকে দূরবর্তী, তবে বেশির ভাগই ইতিবাচক ও আগ্রহব্যাঞ্জক। উনিশ শ আশির দশকে ফরাসি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হতে থাকে, এখন পর্যন্ত তার সংখ্যা কেবল বাড়ছে। কোনো কোনো অনুবাদ বিতর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত করে, তবে এমন ভাষায় যা বুঝতে অক্ষম আমি। এ ছাড়া আছে সিরীয় কবি ও সমালোচক কামাল আবু দীবের গুরুত্বপূর্ণ এবং এখনো বিতর্কিত আরবি অনুবাদ।

একটু পরই এ সম্পর্কে আমি আরও আলোচনা করব। এরপর জাপানি, জার্মান, পর্তুগিজ, ইতালীয়, পোলিশ, স্প্যানিশ, ক্যাটেলান, তুর্কি, সার্বো- ক্রেট ও সুইডিশ ভাষায় অনূদিত হয় অরিয়েন্টালিজম (১৯৯৩ সালে সুইডেনে বেস্ট সেলার ছিল গ্রন্থটি; স্থানীয় প্রকাশক ও আমার কাছে ব্যাপারটি রহস্যময় বিস্ময়কর)। আরও অনেক সংস্করণ হয় অনূদিত হচ্ছে অথবা বেরোনোর অপেক্ষায় আছে। ইউরোপের আরও কয়েকটি ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলে গুজব আছে; একটি বা দুটো রিপোর্ট মারফত জানা যায় ইসরাইলেও নাকি একটি সংস্করণ বেরিয়েছে। পাকিস্তানে ও ইরানে প্রকাশিত হয়েছে অবৈধ আংশিক অনুবাদ। আমার জানামতে প্রকাশিত কয়েকটি অনুবাদের (যেমন জাপানি) একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর সংস্করণ এখনো বাজারে রয়েছে এবং এখনো স্থানীয়ভাবে মাঝেমধ্যে এমন গভীরতর আলোচনা-বিতর্কের সূত্রপাত করে, বইটি রচনার সময় আমি যা চিন্তাও করিনি।

এর ফলাফল হলো অরিয়েন্টালিজম-প্রায় বোর্হেসীয় কায়দায়–অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। এসব সংস্করণে অদ্ভুত, প্রায়ই উদ্বেগজনক ও অভাবিত স্তরের বিকাশ যতদূর অনুসরণ করেছি ও বুঝতে পেরেছি, এখানে তা-ই আমি আলোচনা করতে চাই : অর্থাৎ আমার লেখা গ্রন্থ সম্পর্কে মানুষ যা বলেছে, পেছনে ফিরে বয়নের মধ্যে তা পাঠ করা; এ ছাড়া অরিয়েন্টালিজমের পর আমি যা লিখেছি (আট-নটা বই ও অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ) তাও দেখে নেয়া। এখানে আমি অবশ্যই পাঠ-বিভ্রান্তি সংশোধনের চেষ্টা করব, দু-একটি ক্ষেত্রে, স্বেচ্ছাসৃষ্ট ভুল ভাষ্যও।

এখন কিছু যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের বিবেচনায় দেখা যায় অরিয়েন্টালিজম এমন কিছু উপায়ে কাজে লাগতে পারে যার অংশবিশেষ মাত্র আমি চিন্তা করতে পেরেছিলাম বইটি লেখার সময়। ওই সব যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাপারগুলোও ঝালিয়ে নেয়া দরকার। আমার কৃতিত্ব বিচার বা অর্জিত প্রশংসা একসঙ্গে তুপ দেয়ার জন্য তা করছি না; আমার উদ্দেশ্য হলো কোনো রচনায় হাত দেয়ার সময় নিজের সম্পর্কে যে আত্মমুখী নির্জন সত্তারবোধ অনুভব করি তা থেকে অনেক প্রসারিত লেখকসত্তার বোধ কীভাবে দানা বেঁধেছে তা চিহ্নিত ও লিপিবদ্ধ করা। কারণ, এখন অরিয়েন্টালিজমকে প্রায় সবদিক থেকেই একটি যৌথ রচনা বলে মনে হয়, যেন লেখার সময় যতটা আশা করেছিলাম এটি তার চেয়ে বেশি ছাড়িয়ে গেছে লেখকরূপী এই আমাকেই।

গ্রন্থটি যেভাবে গৃহীত হয় তার একটি দিক তুলে ধরি। যা আমার কাছে সবচেয়ে দুঃখদায়ক ব্যাপার এবং যা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমি এখনো (১৯৯৪) আপ্রাণ চেষ্টা করছি, তা হলো আক্রমণাত্মক ও সহানুভূতিশীল উভয় ধরনের ভাষ্যকারদের দ্বারা ভুলভাবে এবং উচ্চকিত স্বরে গ্রন্থটিকে পশ্চিম-বিরোধী বলে অভিহিত করা। এ

ধারণার দুটো অংশ আছে, কখনো একসঙ্গে উত্থাপিত, কখনো আলাদাভাবে। প্রথম অংশে আমাকে অভিযুক্ত করা হয় যে, প্রাচ্যতত্ত্বের প্রপঞ্চটি গোটা পশ্চিমের এক ক্ষুদ্র আদর্শ প্রতিমূর্তির প্রতীক; তাই এটি সমগ্র পশ্চিমের প্রতিনিধিত্ব করছে বলেই ধরে নেয়া উচিত। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে যুক্তি অব্যাহত থাকে, পশ্চিম আরব ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর শত্রু, এমনকি ইরানি, চীনা, ভারতীয়সহ আরও যেসব জনগোষ্ঠী পশ্চিমা উপনিবেশবাদ ও অহংবোধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরও শত্রু। তর্কের দ্বিতীয় অংশটি আমার ওপর যা আরোপ করে তাও কম প্রভাবশালী নয়। এতে বলা হয়, শিকারি পশ্চিম ও প্রাচ্যতত্ত্ব ইসলাম ও আরবাসীদের মর্যাদা নষ্ট করেছে (লক্ষণীয় যে, 'ইসলাম ও পশ্চিম' পরিভাষা দুটো একে অপরের ওপর আপতিত)। তা হলে প্রাচ্যতত্ত্ব ও প্রাচ্যতাত্ত্বিকের অস্তিত্ব ঠিক উল্টোটাও সত্যি বলার পরিসর তৈরি করে দেয় : অর্থাৎ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ, এটিই একমাত্র পথ (আল-হাল আল-ওয়াহিদ) ইত্যাদি। সুতরাং আমার গ্রন্থে যা করেছি, অর্থাৎ প্রাচ্যতত্ত্বের সমালোচনা করা ইসলামিস্ট বা মুসলিম মৌলবাদীদের সমর্থন।

যে গ্রন্থ স্পষ্টত অনিবার্যতা-বিরোধী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতীয় সব বর্গীয় আখ্যায় মৌলিকভাবে সন্দেহপ্রবণ এবং যাতে ইসলাম বা প্রাচ্য-এর 'পক্ষ' না নেয়া এমনকি প্রাচ্য ও ইসলাম সম্পর্কে কোনো আলোচনা না করা হয় সে ব্যাপারে খুবই সতর্ক, সে রচনা সম্পর্কে ওই জাতীয় মন্তব্যের কি অর্থ থাকতে পারে, তা বোঝা মুশকিল। তবে আরবজগতে ইসলাম ও আরব জনগোষ্ঠীর পদ্ধতিভিত্তিক আত্মরক্ষার উপায়রূপে অরিয়েন্টালিজম গঠিত ও লিখিত হয়েছে; যদিও আমি বলছি যে প্রকৃত প্রাচ্য ও ইসলাম কী তা দেখানোর কোনো আগ্রহ বা ক্ষমতা কোনোটাই আমার নেই। প্রকৃতপক্ষে, আমি আরও গভীরে প্রবেশ করি যখন বইটিতে খুব সহজেই বলি 'প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য' এমন কোনো বাস্তবতা বোঝায় না, যার স্থিতিশীল প্রাকৃতিক অস্তিত্ব আছে। তা ছাড়া এ ধরনের ভৌগোলিক আখ্যা সাম্রাজ্যবাদ ও কল্পনার বেখাপ্পা মিশাল। প্রাচ্যের ক্ষেত্রে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকায় প্রচলিত এ ধারণা কেবল বর্ণনার আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নেয়নি, আধিপত্য করার এবং এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার তাড়না তার সৃষ্টির পেছনে খুবই সক্রিয় ছিল। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি প্রাচ্যের বিপজ্জনক রূপ হিসেবে ইসলামকে চিত্রণের প্রক্রিয়ায় ওই ধারণার ভূমিকা প্রকট সত্য।

এসব কিছুর মূল বিষয় হলো, ভিকো যেমন আমাদের শিখিয়েছেন, মানুষের ইতিহাস মানুষেরই নির্মাণ। ভূমি দখলের সংগ্রাম যেহেতু এই ইতিহাসের অংশ, তাই ঐতিহাসিক ও সামাজিক অর্থবোধের সংঘাতও তার অন্তর্ভুক্ত। এ দুইয়ের মধ্যে প্রথমটির প্রবল বস্তুবাদী চরিত্রের সঙ্গে দ্বিতীয়টির নির্বস্তুক পরিশোধিতরূপের বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিতের কাজ হলো এ দুটোকে সম্পৃক্ত করা, এদের আলাদা

করা নয়। এ উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে আমি যে পদ্ধতি গ্রহণ করি তা হলো যেকোনো সংস্কৃতির বিকাশ ও টিকে থাকার জন্য একটি বিকল্প অহং-এর উপস্থিতির অনিবার্যতা প্রদর্শন করা। আত্মপরিচয়–প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, ব্রিটেন বা ফ্রান্স যেকোনো আত্মপরিচয় শেষ পর্যন্ত একরকম গঠন বা নির্মাণ। আত্মপরিচয় নির্মাণের জন্য প্রয়োজন বিপরীত বা 'অন্য'-এর প্রতিষ্ঠা, যাদের বাস্তবতা নির্ভর করবে 'আমাদের' থেকে তাদের পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের দেয়া অবিরাম ভাষ্য ও পুনর্ভাষ্যের ওপর। প্রতিটি যুগ ও সমাজ তার 'অন্য' সৃষ্টি করে নেয়। অতএব, নিজ/নিজেদের বা 'অন্য/অন্যরা'-এর পরিচয় অর্জন আসলে গড়েপিটে নেয়া ঐতিহাসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যাতে জড়িয়ে থাকে সমাজের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা। আজকের ব্রিটেন ও ফ্রান্সে 'ব্রিটিশ ও ফরাসি' পরিচয় নিয়ে বিতর্ক কিংবা ইসলাম নিয়ে মিসর বা পাকিস্তানে চলমান তর্ক-বিতর্ক একই ভাষ্যসৃজন প্রক্রিয়ার অংশ; এর সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে 'অন্য/অন্যরা'-এর ধারণা–তারা বহিরাগত বা উদ্বাস্তু, দলত্যাগী বা বিশ্বাসঘাতক যাই হোক। প্রতিটি দৃষ্টান্তেই এটি স্পষ্ট যে, এ প্রক্রিয়ায় মানসিক অনুশীলন নয়, জরুরি সামাজিক প্রতিযোগিতা যার সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিবাসী আইন, ব্যক্তিক আচরণের রীতিনীতি, রক্ষণশীলতার প্রকাশ, সন্ত্রাস/বিদ্রোহের বৈধতা, শিক্ষার প্রকৃতি ও পাঠ্যবিষয় এবং বৈদেশিক নীতির গতি-প্রকৃতির মতো বিরাট রাজনৈতিক ইস্যু, যা রাষ্ট্রীয়ভাবে শত্রুমিত্র চিহ্নিত করে। এককথায় আত্মপরিচয়ের নির্মাণকাজটি ক্ষমতা ও ক্ষমতাহীনতার প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে; তাই তা আর যা হোক, কেবল বসে বসে প্রাতিষ্ঠানিক চরকাকাটা নয়।

এসব তরল ও অসাধারণ সমৃদ্ধ বাস্তবতাসমূহ গ্রহণ করে নেয়ার বিষয়টিকে কঠিন করে তুলেছে অন্য একটি ধারণা। তা হলো আত্মপরিচয় যে প্রাকৃতিক কোনো ব্যাপার নয়–নির্মিত, এমনকি কখনো কখনো উদ্ভাসিত, সে অন্তঃবাহী সত্য মানতে অধিকাংশ মানুষের আপত্তি। অরিয়েন্টালিজম বা পরবর্তী সময়ের দি ইনভেনশন অব ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ব্ল্যাক এথেনা' প্রভৃতি গ্রন্থের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূল কারণ এই যে, এগুলো সংস্কৃতি, আত্মা ও জাতীয় পরিচয়ের নির্দিষ্ট ইতিবাচকতা ও অপরিবর্তনীয় ঐতিহাসিকতার সরল বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। আমার যুক্তিতর্কের অর্ধেক বাদ দিলেই তবে অরিয়েন্টালিজমকে ইসলামের পক্ষ সমর্থন বলে পাঠ করা যেতে পারে। আমি সেই অর্ধেকে (এবং পরবর্তী গ্রন্থ কভারিং ইসলামেও) বলেছি যে, এমনকি আমরা যে আদিম সমাজের অন্তর্গত তাও ভাষ্যের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত নয়; এবং পশ্চিমে যা ইসলামের পুনরুজ্জীবন, উত্থান বা প্রত্যাবর্তন বলে মনে হচ্ছে তা আসলে ইসলামের সংজ্ঞার্থ নিয়ে সেই সমাজের ভেতরে চলমান সংঘাত। এ সংজ্ঞা কোনো ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে নেই; এটিই সংঘাতের কারণ। মৌলবাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভুল হলো 'মৌল নীতিমালা'-কে

ঐতিহাসিক বর্গ বলে মনে করা এবং তাকে প্রকৃত বিশ্বাসীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় মনে না করা, যারা বিশ্বাসের ভিত্তিতে ওগুলো গ্রহণ করতে চায়। প্রথম যুগের ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বা পুনরুজ্জীবিত বিশ্বাসে অনুগতদের কাছে প্রাচ্যতাত্ত্বিকরাই (যেমন সালমান রুশদি) সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ, এরা ইসলামের সেই পুনরুজ্জীবিত রূপটিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করে ও সন্দেহ আরোপ করে, প্রতারণা ও অনৈশ্বরিক বলে দেখানোর চেষ্টা করে একে। তাদের কাছে আমার বইটির বিশেষ গুণ এই যে, এটি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের শত্রুতামূলক বিপজ্জনক দিকটি দেখিয়ে দিয়েছে এবং কোনোভাবে তাদের থাবা থেকে ইসলামকে ছাড়িয়ে এনেছে।

এখন, আমি যা দেখছি আমি ওসবের কিছুই করিনি; এ সত্ত্বেও তাদের মত অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এর কারণ দুটো। প্রথমত মানবীয় বাস্তবতা প্রতিনিয়ত নির্মিত ও বিনির্মিত হচ্ছে এবং স্থিতিশীল সত্তা বলে যা আছে তা এক অবিরাম হুমকির সম্মুখীন–এ ধরনের তত্ত্ব মানলে যে কারও পক্ষেই আশঙ্কাহীন ও অভিযোগবিহীন জীবনযাপন করা দুরূহ। এ রকম আশঙ্কার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হলো দেশপ্রেম, উগ্র, স্বাদেশিকতা, অস্বস্তিকর আঞ্চলিকতা। আমাদের সবার প্রয়োজন দাঁড়ানোর একটা ভিত। প্রশ্ন হচ্ছে এই ভিত্তির স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের বিন্যস্ত ধারণা কতটা পরম ও অপরিবর্তনীয়। আমি মনে করি, মৌলিক ইসলামের বেলায় এই চিত্রকল্পগুলো চিত্রকল্প ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এগুলোকেই ঊর্ধ্বে তুলে আনে বিশ্বাসী মুসলিম সম্প্রদায়ও (বিপরীত সম্পর্কটিও বিশেষত্বপূর্ণ যে) প্রাচ্যতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ও। প্রাচ্যতত্ত্ব বলে অভিহিত বিষয়টির প্রতি আমার অভিযোগ এই নয় যে তা প্রাচীন নিদর্শন বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিকোণ নিয়ে অধ্যয়ন করেছে প্রাচ্যের ভাষা, সমাজ ও জনগোষ্ঠীকে; প্রকৃত অভিযোগ হলো প্রাচ্যতত্ত্ব চিন্তা-প্রক্রিয়া হিসেবে বিচিত্র, গতিশীল ও জটিল মানবীয় বাস্তবতাকে বিচার করেছে এমন এক দৃষ্টিকোণ নিয়ে যা নিতান্ত সরলভাবে মৌলনীতিমুখী। এই অবস্থা নির্দেশ করে প্রাচ্যের দুর্মর এক বাস্তবতা এবং সমভাবে একগুঁয়ে পশ্চিমা সত্তার প্রতি, যা প্রাচ্যকে দেখে দূর থেকে এবং বলা যায়, ওপর থেকে। ভুয়া অবস্থান গোপন করে ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে। এমনকি আমার মতে, আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো যে তা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের আগ্রহ বা স্বার্থও আড়াল করে রাখে। নিষ্পাপ পণ্ডিতি প্রয়াস হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ব এবং সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তিস্বরূপ প্রাচ্যতত্ত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য চিহ্নিত করার প্রয়াস না থাকা সত্ত্বেও সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী ধারণা থেকে এগুলোকে আলাদা করা যাবে না। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়নের মিসর অভিযানের মধ্যে দিয়েই ওই সব সাধারণ ধারণা তার বিশ্বব্যাপী আধুনিক পর্যায়ে সূচিত করে।

ইউরোপের সঙ্গে প্রাচ্যের আধুনিককালের সংযোগের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠা একটি শক্তিশালী ও আরেকটি দুর্বল পক্ষের প্রবল বৈপরীত্য আমার মনের মধ্যে।

নেপোলিয়নের ডিসক্রিপজঁ দ্য লা'ইজিপ্ট-এর চর্চিত গাম্ভীর্য ও আত্মম্ভরি কথনভঙ্গি, উপনিবেশে বিজয়গর্ব এক সেনাবাহিনীর বলে বলীয়ান গোটা একদল পণ্ডিতের—এর সুশৃঙ্খল শ্রমের ফলস্বরূপ এ রচনার ঠাসবুননের বিরাট আকারের কাছে আবদ আল-রহমান আল-জাবারতির মতো ব্যক্তির বর্ণনা নিতান্ত বামনাকৃতির ব্যাপার বলে বোধ হয়। জাবারতি দখলীকৃত-এর দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রান্সের মিসর দখলের বর্ণনা লিখেন তিন খণ্ডের একটি গ্রন্থে। কেউ হয়তো বলবেন যে, ডিসক্রিপজঁ উনিশ শতকের প্রথমপাদের মিসরের বৈজ্ঞানিক ও বিষয়মুখী বিশ্লেষণ। কিন্তু (নেপোলিয়নের কাছে অজানা ও উপেক্ষিত) জাবারতির উপস্থিতি ভিন্ন কথা বলে। যে শক্তিধর ব্যক্তি মিসরকে ফরাসি উপনিবেশের বৃত্তে স্থায়ী করে রাখতে চায় তার দৃষ্টিকোণ থেকে নেপোলিয়নের রচনা বিষয়মুখী; অন্যদিকে জাবারতির রচনা এমন এক মানুষের আখ্যান যিনি মূল্য দিয়েছেন, পরাভূত হয়েছেন আর আলংকারিকভাবে বন্দী হয়েছেন।

অন্য কথায়, চিরস্থায়ীভাবে পরস্পরবিরোধী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাছে সাক্ষ্যস্বরূপ নিষ্ক্রিয় দলিলমাত্র না থেকে ডিসক্রিপজঁ ও জাবারতির রচনা মিলে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করে; আর সবই এ থেকে উদ্ভূত এবং এর উপস্থিতিতেই অস্তিত্ববান। 'পুব ও পশ্চিমের সংঘাত' জাতীয় বিষয়ের চেয়ে ওই অভিজ্ঞতারাশির ঐতিহাসিক গতিশীলতা অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। এই এক কারণেও অরিয়েন্টালিজমকে ভুল করে গোপন পাশ্চাত্যবিরোধী রচনা হিসেবে পাঠ করা হয়; ভিত্তিহীন ও এমনকি বেপরোয়া স্বেচ্ছাচারী ও অতীতমুখী ক্ষমতার তৎপরতায় এই পাঠ (এবং অনুমানকৃত স্থায়ী যুগ্ম-বৈপরীত্যভিত্তিক অন্য সব পাঠের মতোই) বিকশিত করেছে এবং সরলধর্মী, ক্ষত-বিক্ষত ইসলামের ছবি।

অপরিহার্যতার ধারণার প্রতি আমার যুক্তির বিরোধিতা গৃহীত না হওয়ার দ্বিতীয় কারণটি রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত। আমার পক্ষে কোনোমতেই জানা সম্ভব ছিল না যে, বইটি প্রকাশিত হওয়ার এক বছর পরই ইরান পরিণত হবে সুদূরপ্রসারী ইসলামি বিপ্লবের ভূমিতে, কিংবা ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধ ১৯৮২ সালে লেবানন অভিযান থেকে শুরু করে ১৯৮৭ সারে ইন্তিফাদার মধ্যবর্তী সময়ে এমন উন্মত্ত ও বিলম্বিতরূপ নেবে। ়ায়ুযুদ্ধের অবসান একদিকে আরব, অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের প্রতিনিধিত্বে পুব-পশ্চিমের অনিঃশেষ সংঘাত দূর করা পরের কথা, থামাতেও পারেনি। আরও সাম্প্রতিক ঘটনা, আফগানিস্তানে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলাভিযানও তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের মধ্যে আলজেরিয়া, জর্দান, লেবানন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দেশসমূহে এবং দখলকৃত অনেক এলাকায় বিদ্যমান পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংঘটিত চ্যালেঞ্জ এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় নানা প্রতিক্রিয়া; পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে আফগানিস্তানে

দখলদার সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইসলামি ব্রিগেড গঠন; উপসাগরীয় যুদ্ধ; ইসরাইলের প্রতি অব্যাহত সমর্থন; যদিও সব সময় যথাযথ ও তথ্যভিত্তিক নয়, তবে সতর্কতামূলক সাংবাদিক ও পণ্ডিতি বিষয় হিসেবে 'ইসলাম'-এর বিকাশ–এসব কিছুই মানুষের মধ্যে দমন-পীড়নের অনুভূতি সৃষ্টি করে, তাদের প্রায় দৈনিক ভিত্তিতে নিজেদের হয় পশ্চিম অথবা প্রাচ্যমুখী বলে ঘোষণা দিতে বাধ্য করে। কাউকেই 'আমরা' ও 'ওরা' বৈপরীত্য থেকে মুক্ত বলে মনে হয় না। এর পরিণতি হলো নতুন শক্তিকে বলীয়ান, কঠোর ও গভীরতর আত্মকেন্দ্রিক পরিচয় যা বিশেষ কোনো মানসিক উন্নতি বিধায়ক নয়।

এ রকম উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি প্রাচ্যতত্ত্বের জন্য সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যও। আরব ও ইসলামি বিশ্বের যেসব মানুষ উদ্বেগ ও মনোগত পীড়নের সঙ্গে দেখে যে পশ্চিম কেবলই তাদের ওপর চড়াও হচ্ছে, তাদের কাছে এটিই প্রথম গ্রন্থ যাতে একটি যথাযথ পালটা জবাব দেয়া হয়েছে, পশ্চিমকে যে পশ্চিম কখনো তাদের কথা শোনেনি কিংবা তাদের প্রাচ্যজন হওয়ার অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখেনি। গ্রন্থটি সম্পর্কে আরবি ভাষায় লেখা প্রথম দিকের একটি সমালোচনা মনে পড়ছে আমার যাতে গ্রন্থকারকে অভিহিত করা হয় আরবদের সেরা এবং নিপীড়িত ও পদদলিত জনগোষ্ঠীর সমর্থক বলে যে জনগোষ্ঠীর কাজ হলো পশ্চিমা কর্তৃপক্ষের মহাকাব্যিক ও রোমান্টিক মানো ও মানো খেলায় সঙ্গী হওয়া। অতিরঞ্জন সত্ত্বেও তা পশ্চিমের দীর্ঘকালীন শত্রুতা সম্পর্কে আরবদের বাস্তব অনুভূতি প্রকাশ করে, তেমনি ধারণা দেয় কি ধরনের জবাব পশ্চিমের প্রতি প্রযোজ্য বলে মনে করে সচেতন শিক্ষিত আরবরা।

অস্বীকার করব না যে এটি রচনার সময় আমি এতে উদ্ধৃত কার্ল মার্কসের ছোট একটি বাক্যে নির্দেশিত (ওরা নিজেদের উপস্থাপিত করতে পারে না, ওদের উপস্থাপন করা প্রয়োজন) আত্মগত সত্য-এর ব্যাপারে সচেতন ছিলাম। সে সত্য এই যে, কাউকে যদি তার কথা বলতে না দেয়া হয় তাহলে তার নিজের কথা বলার সুযোগ বের করে নিতে প্রবল চেষ্টা করবে সে। প্রকৃতপক্ষে নিম্নবর্গীয়রাও বলতে পারে; বিশ শতকের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস চমৎকার ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। তবে আমার কখনো মনে হয়নি যে, আমি আদিযুগ থেকে চলে আসা দুই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শত্রুতা বাড়াচ্ছি; যার গঠন বর্ণনা করেছি আমি এবং তার ভয়াবহ প্রভাব কমানোর চেষ্টা করেছি। বিপরীতক্রমে যেমন আমি আগেও বলেছি প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্যভিত্তিক বৈপরীত্য বিভ্রান্তিজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। প্রতিযোগিতা সৃষ্টিকারী স্বার্থ ও বিশ্লেষণ-ভাষ্যের মোহময় ইতিহাস ছাড়া একে আর কোনো কিছু হিসেবে যত কম গুরুত্ব দেয়া হয় ততই মঙ্গল। এই জেনে আমার ভালো লাগছে যে ব্রিটেন ও আমেরিকার অনেক পাঠক এবং আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও

ক্যারাবিয়ান অঞ্চলের ইংরেজিভাষী পাঠকগণ মনে করেন গ্রন্থটি আঞ্চলিকতা, আগ্রাসন ও নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বদলে একটি বিশেষ বিষয়ের বাস্তবতার ওপর জোর দেয়, পরে যাকে অভিহিত করা হয় 'মিশ্র সংস্কৃতিবাদ' নামে।

যা হোক, অরিয়েন্টালিজমকে যতটা না ভাবা হয় জ্ঞানের ব্যবহারের মাধ্যমে অগ্রসর ক্ষমতার মিশ্র সংস্কৃতিবাদভিত্তিক সমালোচনা, তার চেয়ে বেশি মনে করা হয় নিম্নবর্গীয় মর্যাদার ফিরে তাকিয়ে কথা কওয়া পৃথিবীর দুর্দশার প্রামাণিক সাক্ষ্যরূপ। এভাবে এর গ্রন্থকার হিসেবে আমি নিজেকে একটি দায়িত্বপ্রাপ্ত ভূমিকা পালন করতে দেখি; সে দায়িত্ব আত্মপ্রতিনিধিত্বকারী চৈতন্যের যা এত দিন একটি ডিসকোর্সের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থরাজিতে দমন বা বিকৃত করে রাখা হয়েছিল। এসব গ্রন্থরাজি আবার ঐতিহাসিকভাবেই কেবল পশ্চিমের জন্য পাঠযোগ্য ছিল, প্রাচ্যের জন্য নয়। এটি উল্লেখযোগ্য যুক্তি, তা যুক্ত হয় নির্ধারিত আত্মপরিচয়বোধের সঙ্গে। যা একটি স্থায়ী বিভাজনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। কিন্তু আমার গ্রন্থ বিরোধাত্মকভাবে এই বিভাজন ধরে নিয়ে এবং তার ওপর নির্ভর করে শেষে বিভাজনকে পরিত্যাগ করেছে। আমার আলোচিত কোনো প্রাচ্যতাত্ত্বিকই প্রাচ্যদেশীয়দের পাঠক হিসেবে ভেবেছিলেন মনে হয় না। প্রাচ্যতত্ত্বের ডিসকোর্স, তার আন্তরসংগতি ও কঠোর প্রক্রিয়া সবকিছুই মহানাগরিক পশ্চিমের জন্য পরিকল্পিত। আমি যাদের আন্তরিকভাবে পছন্দ করি তাদের বেলায়ও এ কথা সত্যি। যেমন মিসরে মোহমুগ্ধ এডওয়ার্ড লেইন ও গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, উদ্ধত ঔপনিবেশিক প্রশাসক লর্ড ক্রোমার, মেধাবী পণ্ডিত আর্নেস্ত রেনান এবং ব্যারন-সদৃশ অভিজাত আর্থার বেলফোর–এদের প্রত্যেকেই তাদের শাসিত বা অধীত প্রাচ্যজনদের ঘৃণা বা অপছন্দ করেছেন। তাদের বিচিত্র ঘোষণা ও দাবি এবং আন্তর-প্রাচ্যতাত্ত্বিক আলোচনা অনাহূত এই আমি পাঠ করতে গিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তা স্বীকার করা উচিত; তেমনি আনন্দ পেয়েছি ইউরোপীয় ও অ-ইউরোপীয় উভয় শ্রেণির পাঠককে আমার উপলব্ধি জ্ঞাত করতে পেরে। সন্দেহ নেই, তা সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে, আমি সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন পার হয়ে যেতে সক্ষম হই, পশ্চিমের জীবনে প্রবেশ করি এবং এ সত্ত্বেও, আমি মূলত যেখানে আমার জন্ম সে স্থানের সঙ্গে কিছু জৈবিক সম্পর্ক বজায় রাখি। আমি পুনরায় উল্লেখ করতে চাই যে, এটি বাধা ডিঙানোর ফল মেনে চলার পরিণাম নয়; আমি বিশ্বাস করি একটি গ্রন্থ হিসেবে অরিয়েন্টালিজম তা প্রদর্শন করে, বিশেষ করে যখন চিন্তায় জোর করে আরোপিত সীমাবদ্ধতার বাইরে আধিপত্যহীন ও অপরিহার্যতার বোধবিহীন জ্ঞানচর্চার খোঁজে মানবিক অধ্যয়নের কথা বলি আমি।

প্রকৃতপক্ষে এসব বিবেচনা গ্রন্থটির ওপর এমন চাপ আরও তীব্র করে যাতে গ্রন্থটি ক্ষত ও দুর্দশার একরকম গাঁথা হিসেবে উপস্থাপিত হয়, যার আবৃত্তিতে মনে হয় বুঝি পশ্চিমের ওপর বহুদিনের জমে ওঠা প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় আজ ফিরে আঘাত

করছে পশ্চিমকে। আমি দুঃখিত, আমার কাজটি এমন সাদামাটা মূল্যায়ন করায় যে এটি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, যুগ ও প্রাচ্যতত্ত্বের বিভিন্ন রীতি সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে খুবই সূক্ষ্ম পার্থক্য ও পক্ষপাতসম্পন্ন; এ নিয়ে এখানে বিনয়ী সাজার ইচ্ছা নেই। আমার প্রতিটি বিশ্লেষণই নাকি ভিন্ন ভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করে, পার্থক্য ও পক্ষপাতিত্ব বৃদ্ধি করে, লেখক ও তার কালকে আলাদা করে–যদিও সবাই প্রাচ্যতত্ত্বে বিশ্বস্ত। শ্যাতেব্রোঁ বা ফ্লবেয়ার, কিংবা বার্টন ও লেইন সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণ পাঠ করার সময়ও যে একই রকম জোর দেয়া হয় 'পশ্চিমা সভ্যতার ওপর আক্রমণ' জাতীয় একই রকম একঘেয়ে সূত্র থেকে আংশিক বক্তব্য ছেঁকে তোলা হয়–এসবই অতি সরলীকরণ ও ভুল বলে আমার বিশ্বাস। তবে এও আমার বিশ্বাস যে, হাস্যকরভাবে নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকা বার্নার্ড লুইসের মতো সাম্প্রতিক তাত্ত্বিকদের লেখা পাঠ করতে হবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও আক্রমণাত্মক সাক্ষ্যস্বরূপ কাজ হিসেবে; এ বৈশিষ্ট্য আড়াল করার চেষ্টা আছে শিল্পিত উচ্চারণ ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে।

আমরা আবার গ্রন্থটির ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ফিরে আসি। আমি ভান করব না যে, রাজনীতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিকতার একটি উদার, স্বচ্ছ দৃষ্টির বর্ণনা দেয়া হয় বাসিম মুসালামের লিখিত সমালোচনায় (এমইআরআইপি ১৯৭৯); অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ঘষামাজা করা সে বর্ণনা। প্রাচ্যতত্ত্বের রহস্য উন্মোচনের পূর্ববর্তী প্রয়াস লেবানিজ পণ্ডিত মিশেল রুস্তমের ১৮৯৫ সালের রচনার (কিতাব আল গারিব ফি আল গারব) সঙ্গে আমার গ্রন্থের তুলনা দিয়ে তিনি আলোচনা শুরু করেন এবং মন্তব্য করেন আমাদের দুজনের পার্থক্য হলো আমার কাজটি হারানো বা ক্ষতি সম্পর্কে, রুস্তমের রচনা তা নয়। তিনি বলেন :

> স্বাধীন সমাজের এক মুক্ত সদস্য হিসেবে লিখেছেন রুস্তম : সিরীয় বংশোদ্ভূত আরবি-ভাষী মানুষ, তখনো স্বাধীন অটোমান সাম্রাজ্যের নাগরিক...মিশেল রুস্তমের মতো কোনো সর্বজনগৃহীত আত্মপরিচয় নেই এডওয়ার্ড সাঈদের। তার জনগণই বিতর্কিত সত্তা। কাজেই এমন সম্ভব যে, এডওয়ার্ড সাঈদ ও তার প্রজন্মের কাছে কখনো কখনো মনে হতে পারে যে, তারা রুস্তমের সিরিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাজের ছড়ানো-ছিটানো অবশেষ আর স্মৃতির চেয়ে নিরেট কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে নেই। জাতীয় মুক্তির এই যুগে এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য জাতির নিজস্ব সফলতা আছে; কিন্তু বেদনাদায়ক বৈপরীত্য হলো সব অদম্য অস্বাভাবিকতা ও এখন পর্যন্ত, পরাজয়ের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিরোধ ওখানে। যেকোনো এক আরব এ গ্রন্থ লিখেননি, লিখেছেন এমন একজন যার রয়েছে নির্দিষ্ট মানবীয় পটভূমি ও অভিজ্ঞতা। (পৃ-২২)

মুসালাম ঠিকই বলেছেন। একজন আলজেরীয় এ রকম সাধারণ নৈরাশ্যবাদীগ্রন্থ লিখতেন না, বিশেষ করে আমার কাজটির মতো; আমার রচনায় উত্তর আফ্রিকা,

বিশেষত আলজেরিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে কিছু নেই। তাই আমি স্বীকার করি, অরিয়েন্টালিজম সামগ্রিকভাবে এমন বোধ সৃষ্টি করে যেন এটি ব্যক্তিগত ক্ষতি ও জাতি জুড়ে ভাঙনের যথার্থ ইতিহাস থেকে রচিত; অরিয়েন্টালিজম রচনার কয়েক বছর আগেই তো গোল্ডা মেয়ার সেই জঘন্য ও গভীরভাবে প্রাচ্যতাত্ত্বিক উক্তিটি করেন যে, ওখানে কোনো ফিলিস্তিনি নেই। এর সঙ্গে আমি যোগ করতে চাই অরিয়েন্টালিজম বা এর পরবর্তী দুটো গ্রন্থ–দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন (১৯৮০) এবং কভারিং ইসলাম (১৯৮১)-এর কোথাও আমি কেবল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত আত্মপরিচয় ও নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের কথাই বলতে চাইনি। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচ্যের অংশবিশেষ প্যালেস্টাইন ও ইসলামের বিকল্প চিত্রটি কেমন তা অরিয়েন্টালিজমে আসেনি। যথাক্রমে প্যালেস্টাইন ও ইসলাম সম্পর্কে এ ব্যাপারটি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি আমি পরবর্তী গ্রন্থ দ্বয়ে।

তবে আমার সব লেখালেখিই মূলত মোটা, তৃপ্তিকর জাতীয়বাদের বিরোধী। কর্তৃত্বপরায়ণ ডিসকোর্স ও অন্ধ মতবাদস্বরূপ ইসলামের চিত্র আমি তুলে ধরেনি। আমার ইসলাম-সম্পর্কিত বর্ণনার মূলে আছে এ ধারণা যে, ইসলামি বিশ্বের ভেতর ও বাইরে ক্রিয়াশীল রয়েছে একটি ভাষ্যকর বিশ্লেষক গোষ্ঠী, এরা সমতার ভিত্তিতে কথোপকথনে পরস্পরের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখে। কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন-এ বর্ণিত প্যালেস্টাইন সম্পর্কিত আমার মতামত এখনো ওই রকম রয়ে গেছে; বেপরোয়া স্থানিকতা এবং জাতীয়তাবাদী গণচিন্তার জঙ্গি সামরিক প্রবণতার বিরুদ্ধে সব রকম সংরক্ষণশীল মনোভাব প্রকাশ করেছি আমি। আমি বরং আরব পরিবেশ, ফিলিস্তিনি ইতিহাস ও ইসরাইলি বাস্তবতা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার কথা বলি। স্পষ্ট ভাষায় এই চূড়ান্ত মত প্রকাশ করি যে, কেবল বিস্তৃতভাবে আলোচিত সমাধানই দুর্ভোগের শিকার এই দুই জাতি–আরব ও ইহুদিদের অনিঃশেষ যুদ্ধের বদলে বিশ্রাম এনে দিতে পারে। (যেতে যেতে এখানে বলে রাখি প্যালেস্টাইন সম্পর্কিত আমার গ্রন্থটির একটি চমৎকার হিব্রু অনুবাদ ১৯৮০-এর দশকের প্রথমদিকে ক্ষুদ্র এক পাবলিশার্স মিফরাজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এখনো আরবিতে অনুবাদ হয়নি।) কারণ গ্রন্থের যেখানে যেখানে আমি বিভিন্ন আরব শাসন, এমনকি পিএলওর সমালোচনা করেছি সে অংশগুলো পুনর্লিখন বা মুছে ফেলার অনুরোধ করেন আগ্রহান্বিত প্রত্যেক প্রকাশক; আমি বরাবরই তা প্রত্যাখ্যান করি)।

বলতে দুঃখ হচ্ছে যে, আমার বইটি যে জাতীয়তাবাদী আবেগ হ্রাস করে সে সত্য আরব বিশ্ব এখনো উপেক্ষা করে যেতে সমর্থ হচ্ছে, এমনকি কামাল আবু দীবের অসাধারণ অনুবাদ সত্ত্বেও। ওই জাতীয় বোধকে আমি আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের তাড়নার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করি যা সাম্রাজ্যবাদেও সুলভ। আবু দীবের শ্রমসাধ্য অনুবাদের প্রধান অর্জন হলো তিনি বিভিন্ন পশ্চিমা অভিব্যক্তিসমূহকে আরবি ভাষায়

আত্মীকরণের প্রয়াস সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। তিনি বরং ডিসকোর্স, সিমুলেক্রাম, প্যারাডাইম বা কোড ইত্যাদি শব্দের কাজ চালাতে বাগ্মিধি আহরণ করেছেন ধ্রুপদ আরবি থেকে। তার পরিকল্পনা সম্ভবত অরিয়েন্টালিজমকে একটি সম্পূর্ণ বিকশিত ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে স্থাপন করা, যেন মনে হয় এটি সাংস্কৃতিক পূর্ণতা ও সমতার পরিপ্রেক্ষিত থেকে 'অন্যকে সম্বোধন করছে। এতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, কেউ যেমন পশ্চিমা ঐতিহ্যের মধ্যে থেকে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমালোচনা প্রস্তাব করতে পারেন, আরব ঐতিহ্য থেকেও তা করা সম্ভব।

তবু আবেগতাড়িতভাবে সংজ্ঞায়িত আরব বিশ্ব এবং আরও বেশি আবেগতাড়িতভাবে অভিজ্ঞ পশ্চিমা সমাজের সংঘাত এ সত্য বের করে আনে যে, অরিয়েন্টালিজমকে সমালোচনা সম্পর্কিত একটি অধ্যয়ন বোঝানো হয়েছে, যুদ্ধরত ও হতাশভাবে পরস্পরবিরোধী সত্তাসমূহের অস্তিত্বের ঘোষণা নয়। এ ছাড়া একটি শক্তিশালী পদ্ধতির ওপর আধিপত্যশীল আরেকটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতির যে বাস্তবতা আমি বর্ণনা করেছি বইয়ের শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠায়, তা বিতর্কের উদ্বোধনী আবেগবর্ষণ, যাতে আরব পাঠক ও সমালোচকগণ নিজেরাই প্রাচ্যতত্ত্বের পদ্ধতির সঙ্গে আরও দৃঢ়তর বিতর্ক-বিশ্লেষণে জড়িত হন। আমাকে হয় দোষারোপ করা হয়েছে এই বলে যে, আমি কার্ল মার্কস সম্পর্কে নিবিড় মনোযোগ দিইনি (গ্রন্থের যে প্যারাগুলো আরব ও ভারতীয় মতান্ধ সমালোচকরা সাক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন সেগুলো প্রকৃতপক্ষে মার্কসের প্রাচ্যতত্ত্বের ওপরই লিখিত)—যার চিন্তন প্রক্রিয়া তার সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল বলে দাবি করা হয়; নয়তো এ ত্রুটির জন্য সমালোচিত হয়েছি যে, আমি প্রাচ্যতত্ত্বের ও পশ্চিমের মহৎ অর্জনগুলো স্বীকার করিনি, ইত্যাদি। ইসলামকে রক্ষা করার জন্য কার্ল মার্কসের মতকে সংগতিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি মনে করে তার আশ্রয় নেয়ার প্রসঙ্গটি আমার কাছে মনে হয় এক রক্ষণশীলতা দিয়ে আরেক রক্ষণশীলতা অপসারণের মতো।

অরিয়েন্টালিজমের প্রতি আরবদের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য সঠিকভাবে ইঙ্গিত করে বহু যুগের ক্ষতি, টানাপোড়েন এবং গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আরব অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবাহকে। বুদ্ধিজীবীদের প্রাচ্যতত্ত্বের মতো পদ্ধতির শিকল থেকে মুক্ত করার জন্য আগে থেকে চলে আসা একটি ধারার অংশ হিসেবেই আমি গ্রন্থটি পরিকল্পনা ও রচনা করি; আমি চেয়েছিলাম পাঠকরা এ কাজটি ব্যবহার করে আরব বা অন্যদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আরও সমর্থ ও আলোকদায়ী অধ্যয়ন-বিশ্লেষণের সূচনা করুক। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ, ক্যারিবীয় অঞ্চল, আয়ারল্যান্ড, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার কোনো কোনো অংশে তা-ই ঘটেছে। আফ্রিকিপন্থী ও ভারততাত্ত্বিক বিভিন্ন ডিসকোর্স, নিম্নবর্গের ইতিহাস

বিশ্লেষণ, উত্তর-ঔপনিবেশিক, নৃ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিল্পের ইতিহাস, সাহিত্য সমালোচনা, সংগীততত্ত্বে পুনর্বিন্যাস এবং নারীবাদী ও সংখ্যালঘুবিষয়ক ডিসকোর্সে বিপুল নতুন নতুন ব্যাপ্তি ও বিকাশ–এসব কিছুতে অরিয়েন্টালিজম সচরাচর একটি ব্যতিক্রম নিয়ে এসেছে; এ জন্য আমি প্রশংসিত ও তৃপ্তবোধ করি। কিন্তু আরব অঞ্চলে ঠিক তা ঘটেনি। এর একটি কারণ আমার গ্রন্থের বয়ান যথার্থই ইউরোপকেন্দ্রিক বলে চিহ্নিত। দ্বিতীয়ত, মুসালাম যেমন বলেছেন–সাংস্কৃতিকভাবে টিকে থাকার সংগ্রাম ওখানে এত সর্বব্যাপী যে, আমার কাজটি অতটা ব্যবহার উপযোগী বলে ব্যাখ্যাত হয়নি; বরং গৃহীত হয় 'পশ্চিম'-এর জন্য অথবা পশ্চিমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধস্বরূপ।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিতদের মধ্যে দৃঢ়চিত্তের, জেদি, তীব্র আবেগপ্রবণ একটি দলে অরিয়েন্টালিজম–আমার অন্যান্য রচনার মতোই মতানৈক্যজনিত আক্রমণের শিকার হয়েছে এবং 'উদ্ধৃত্ত' মানবতা, তাত্ত্বিক সামঞ্জস্য, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুল ও আবেগপ্রসূত মূল্যায়নের কারণে। তবে আমি খুশি যে, এ রচনাটি সত্যিই তা-ই! অরিয়েন্টালিজম পক্ষভুক্ত একটি গ্রন্থ, তত্ত্বের কোনো যন্ত্র নয়। কেউ এমন প্রমাণ দিতে পারেননি যে ব্যক্তির কাজ পর্যাপ্ত রকম অশিক্ষণীয় একটি স্তরে আত্মকেন্দ্রিক নয় এবং জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্সের উপলব্ধি অনুযায়ী– নয় আসল বা প্রকৃত; চিন্তন-প্রক্রিয়া, ডিসকোর্স ও আধিপত্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও (যদিও কোনোটিই জোরহীন, নিখুঁত বা অবশ্যম্ভাবী নয়)। সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে আমার আগ্রহ (তেমনি এ ধারাক্রমে ১৯৯৩ সালের রচনা কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম-এ সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনা) উদ্ভূত হয় এর পরিবর্তনশীলতা এবং ভবিষ্যৎ আন্দাজ-অযোগ্য অবস্থা থেকে। এ দুটো বৈশিষ্ট্যই বার্টন ও ম্যাসিগননের লেখায় সঞ্চারিত করে এমন বিস্ময়কর তীব্র জোর, এমনকি আকর্ষণীয় ক্ষমতাও। প্রাচ্যতত্ত্বের যে বৈশিষ্ট্যটি আমার বিশ্লেষণে রক্ষা করেছি তাহলো এর সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের সমন্বয় এর ক্রীড়াময়তা। লেখক ও সমালোচক হিসেবে নিজের জন্য কিছু আবেগগত চালিকাশক্তি সংরক্ষণ, আবেগে তাড়িত হওয়া, ক্রোধ বা বিস্ময় বা আনন্দে উদ্বেল হওয়ার অধিকাররূপে এ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করলেই তা আবার পুনর্বিতরণ করা সম্ভব। এ কারণেই একদিকে জ্ঞান প্রকাশ এবং অন্যদিকে রোজান্ডি ও হ্যানলন ও ডেভিড ওয়াশব্রুকের বিতর্কে জ্ঞান প্রকাশের অধিক সচল উত্তর-কাঠামোবাদকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি দেয়া উচিত।[২] একই যুক্তিতে হোমি ভাভা, গায়ত্রি স্পিবাক, আশিষ নন্দীর যেসব কাজ উপনিবেশবাদ থেকে উদ্ধৃত, কখনো কখনো আকস্মিক ও তীব্র আত্মগত সম্পর্ক বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, প্রাচ্যতত্ত্বের মতো মানবিক তত্ত্বের পাতা ফাঁদের স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে সেগুলোর অবদান অস্বীকার করা যাবে না।

আমার কাজটির প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে উচ্চকিত খোদ প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের কথা বলেই অরিয়েন্টালিজমের এই সমালোচনামূলক রূপান্তর-চিহ্নের সমালোচনামূলক অনুসন্ধান শেষ করা যাক। এরা মোটেও আমার মূল পাঠক নন। তাদের প্রথা ও চর্চার ওপর কিছুটা আলোকপাত করার মধ্য দিয়ে অন্য একটি জ্ঞান ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া ও পরস্পর সম্পর্কে মানবতাবাদীদের সজাগ করতে চেয়েছি আমি। 'প্রাচ্যতত্ত্ব' শব্দটিই বহু যুগ ধরে পেশাগত বিশেষজ্ঞতার মধ্যে বন্দী। সাধারণ সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাবাদর্শ, সামাজিক ও রাজনৈতিক মনোভাবে পরিভাষাটির অস্তিত্ব ও ব্যবহার দেখানোর চেষ্টা করেছি। প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অনুসরণ করে কাউকে প্রাচ্যজন বলার উদ্দেশ্য কেবল এটুকু বোঝানো নয় যে, তিনি এমন এক মানুষ যার ভাষা, ভূগোল ও ইতিহাস পণ্ডিতি বর্ণনার বিষয়, এটি অধিকাংশ সময়ই অপমানজনক অভিব্যক্তি যা নিকৃষ্ট জাতের মানুষকে নির্দেশ করে। এতে কিন্তু অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, নেরভাল বা সেগ্যালিনের মতো শিল্পীদের কাছে 'প্রাচ্য' চমৎকারভাবে অদ্ভুত, জৌলুসময়, রহস্যময়তা, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে এটি তীব্র ঐতিহাসিক সাধারণীকরণও। প্রাচ্য, প্রাচ্যজন/প্রাচ্যদেশীয়, প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রভৃতি পরিভাষার ব্যবহার ছাড়াও প্রাচ্যতাত্ত্বিক শব্দটি প্রধানত প্রাচ্য ভাষা ও ইতিহাস বিষয়ে মুখ্যত প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিত ব্যক্তিত্বকে নির্দেশ করে। এ সত্ত্বেও অ্যালবার্ট হুরানি, তার অসময়োচিত ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে '১৯৯২ সালের মার্চে যেমন আমাকে লিখেন : আমার জোরদার যুক্তির প্রাবল্যের কারণে (যে কারণে তিনি নিজেও আম্যাকে সমালোচনা করতে পারেনি বলে উল্লেখ করেন) আমার গ্রন্থটির অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাবে 'প্রাচ্যতত্ত্ব' কে আর নিরপেক্ষ পরিভাষারূপে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, এটি এতটাই অপব্যবহৃত পরিভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বলে তিনি শেষ করেন যে, তিনি অবশ্য এখনো শব্দটি করতে চান– 'একটি সীমিত, তুলনামূলকভাবে স্বল্পমেধার, কিন্তু এখনো বলবৎ পণ্ডিতি বিষয় নির্দেশ করার জন্য।'

১৯৭৯ সালে অরিয়েন্টালিজমের সমালোচনায় হুরানি এই মর্মে তার একটি অভিযোগ দাঁড় করান যে, আমি বেশির ভাগ প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখা থেকে কেবল অতিরঞ্জন, বর্ণবাদ আর আক্রমণাত্মক দিকগুলো আলাদা করে চিহ্নিত করেছি, এ ধরনের লেখার অসংখ্য পণ্ডিতি ও মানবিক অর্জন উল্লেখও করিনি। তিনি প্রসঙ্গক্রমে মার্শাল হডসন, ক্লদে ক্যাহেন, আঁন্দ্রে রেমন্ডের (জার্মান লেখকদের সঙ্গে) কথা উল্লেখ করেন। অরিয়েন্টালিজমের আমি যা বলেছি তার সঙ্গে এর কোনো বিরোধ দেখি না; একমাত্র পার্থক্য এই যে, আমি বলেছি এই ডিসকোর্সটির মনোভাবে পূর্ব-আরোপিত একটি কাঠামো কার্যকর রয়েছে, যা দূর করা বা উপেক্ষা করা অসম্ভব। কোথাও আমি বলিনি যে, প্রাচ্যতত্ত্ব অশুভ কিছু কিংবা সব প্রাচ্যতাত্ত্বিকের লেখাতেই তার রূপ এক

ও অভিন্ন। তবে আমি বলেছি যে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থ-সম্পর্কের এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। একে অস্বীকার করা বোকামি।

তাই হুরানির অনুরোধের প্রতি সহানুভূতিবোধ করা সত্ত্বেও আমার খুব সন্দেহ হয় যে, সঠিকভাবে উপলব্ধ প্রাচ্যতত্ত্বের ধারণা আদৌ কখনো এর আরও জটিল পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব কি না। ধরা যাক, হুরানির বোধ অনুযায়ী অটোমান বা ফাতিমিদ আর্কাইভ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞও প্রাচ্যতাত্ত্বিক। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রশ্ন ওঠে যে, আজকাল কোথায়, কীভাবে, কোন প্রতিষ্ঠান ও প্রতিনিধির সমর্থনে এ ধরনের অধ্যয়ন সম্পন্ন হয়? আমার বইটি প্রকাশের পর যারা এ বিষয়ে লিখেছেন তাদের প্রত্যেকেই এ প্রশ্নগুলো তুলেছেন, এমনকি সবচেয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখকদের প্রসঙ্গেও; কখনো কখনো তার ফলাফলও হয়েছে বিস্ময়কর।

এর পরও আরেকটি তর্কের সুযোগ থেকে যায়। তা এই যে, প্রাচ্যতত্ত্বের সমালোচনা (বিশেষত আমার রচনা) অর্থহীন এবং নিরপেক্ষ পাণ্ডিত্যের রীতি-বিরুদ্ধ। এ চেষ্টা করেন বার্নার্ড লুইস যার সম্পর্কে এ বইয়ের কয়েকটি পৃষ্ঠা আমি ব্যয় করেছি। অরিয়েন্টালিজম বেরোবার পনেরো বছর পর লুইস ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেন; তার কয়েকটি নিয়ে 'ইসলাম অ্যান্ড দি ওয়েস্ট' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বইটির একটি প্রধান অংশ গঠিত আমাকে আক্রমণ করা রচনা নিয়ে। এর আগে-পরে বিভিন্ন প্রবন্ধ নিবন্ধ যুক্ত করেছেন লুইস যেগুলো সেই একঘেয়ে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ধারণাই প্রকাশ করে যে, মুসলমানরা আধুনিকতার ওপর ক্ষিপ্ত, ইসলাম কখনো চার্চ আর রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব বলা হয়েছে চরম সাধারণীকরণের ভিত্তিতে, একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, বিভিন্ন মুসলিম সমাজ বা ঐতিহ্য বা যুগসমূহের মধ্যেকার পার্থক্য উল্লেখিত হয়েছে কদাচিৎ। এক অর্থে লুইস নিজেকে প্রাচ্যতাত্ত্বিক সংঘের মুখপাত্র নিয়োগ করেছেন। আর সমালোচনার ভিত্তিও ওই সংঘ। তাই লুইসের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা সময় ব্যয় করা যেতে পারে। তার ধারণা তার সহযোগী ও অনুসারীদের মধ্যেও প্রচলিত। অনিবার্যভাবে অগণতান্ত্রিক ও উন্মত্ত ইসলামের হুমকি সম্পর্কে পশ্চিমকে সতর্ক করাই বুঝি এদের কাজ।

লুইসের গলাবাজি তার অবস্থানের দার্শনিক ভিত্তি বা অনবরত প্রায় সবকিছুতেই ভুল বলার অশেষ ক্ষমতাকে কদাচিৎ গোপন করে। এগুলো প্রাচ্যতাত্ত্বিক গোত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে এদের অনেকে অন্তত ইসলামি ও অন্যান্য অ-ইউরোপীয় মানুষদের বদনাম করার কাজে সৎ থাকার মতো সাহসী। লুইস তা নন। তিনি সত্য বিকৃতিকরণ, ভুয়া সাদৃশ্য ও প্রতিষ্ঠাকরণের মধ্য দিয়েই আলোচনা শুরু করেন এবং বানোয়াট পদ্ধতি নিয়ে তাতে স্রষ্টার শান্ত সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ও সুর ব্যবহার করেন; তার ধারণা পণ্ডিতরা এভাবেই কথা বলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ

করা যায়, যাতে তিনি প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে আমার সমালোচনার সঙ্গে তুলনা করেন প্রাচীন নির্দেশনাদির অধ্যয়নের ওপর কল্পিত কোনো সমালোচনার এবং মন্তব্য করেন ওই (অর্থাৎ কল্পিত সমালোচনার) ধরনের সমালোচনা হবে বোকার কর্ম। অবশ্যই, আমরাও তা মানি। কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্বের সঙ্গে হেলেনিজমের তুলনা মৌলিক কারণেই অসম্ভব। প্রাচ্যতত্ত্ব পৃথবীর গোটা একটা অঞ্চলে ঔপনিবেশিক দখলের সহযোগী ও সহগামী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। হেলেনিজম উনিশ ও বিশ শতকের গ্রিসের ঔপনিবেশিক বিজয় নিয়ে আলোচনা করে না। প্রথমোক্তটি ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, হেলেনিজম গ্রিকের প্রতি সহানুভূতিশীল।

এ ছাড়া, আরব ও মুসলিমবিরোধী আদর্শায়িত ধরন বর্তমান রাজনৈতিক মুহূর্ত (যা ধ্রুপদ গ্রিকের প্রতি আক্রমণাত্মক নয়) লুইসকে পণ্ডিতি বিতর্কের ছদ্মাবরণে ইচ্ছাকৃত রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপিত করার সুযোগ করে দিয়েছে। এ চর্চা প্রাচীনধারার প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের প্রাচ্যতত্ত্বের বিশ্বাসযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে প্রচলিত রয়েছে।[৩] তাই লুইসের কাজ বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ের নয়, রাজনৈতিক পরিপার্শ্বের অংশ।

তার দাবি প্রাচ্যত্যের যে শাখা আরব ও ইসলাম নিয়ে আলোচনা করে তা একটি জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিতি বিষয় এবং ধ্রুপদ ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে স্থাপন পাওয়ার যোগ্য। এটি তার পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ধারণা– যেসব ইসরাইলি আরবতাত্ত্বিক ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক উইলামোয়িৎজ বা মমসেনের মতো পণ্ডিতের সঙ্গে পশ্চিম তীর ও গাজার দখল অভিযানকারী কর্তৃপক্ষের জন্য কাজ করে তাদের সঙ্গে তুলনা করার মতোই যথোপযুক্ত। লুইস একদিকে ইসলামি প্রাচ্যতত্ত্বকে নিষ্পাপ ও উৎসাহী পণ্ডিতি বিষয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৎপর; অন্যদিকে, বলার চেষ্টা করেন যে, (আমার ও অন্য অনেক) অপ্রাচ্যতাত্ত্বিকদের জন্য প্রাচ্যতত্ত্ব খুবই জটিল, বিচিত্র ও টেকনিক্যাল বিষয় যে, এর যথাযথ সমালোচনা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এখানে লুইসের কৌশল হলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা চাপা দিয়ে যাওয়া। আমি আগেই বলেছি, ইসলামের প্রতি ইউরোপের আগ্রহ সাদামাটা কৌতূহল থেকে সৃষ্ট নয়, খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে আদি একেশ্বরবাদী এবং সাংস্কৃতিক ও সামরিকভাবে দুর্দম এক প্রতিদ্বন্দ্বীর ভীতি থেকে উদ্ভূত। বহু ঐতিহাসিকও দেখিয়েছেন, ইসলাম বিষয়ে ইউরোপের প্রথম যুগের পণ্ডিতগণ ছিলেন মধ্যযুগীয় তর্কবাগীশ। তারা লিখেছেন মুসলমানের সম্পদ-সামর্থ্য ও খ্রিষ্টানদের স্বধর্ম ত্যাগের ভীতি দূর করার জন্য। এ ভীতি ও শত্রুর সমন্বিত রূপ এখনো ইসলামবিষয়ক পণ্ডিতি ও অপণ্ডিতি লেখালেখিতে প্রবহমাণ; এই ইসলাম, যাকে মনে করা হয় পৃথিবীর 'প্রাচ্য' নামক অংশের অন্তর্গত কাল্পনিক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপ ও পশ্চিমের বিপরীতে দণ্ডায়মান।

ইসলামি বা আরবি প্রাচ্যতত্ত্বের প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সমস্যাটি হলো মধ্যযুগীয় অবশেষের ধরন, যা এখনো অদম্যভাবে টিকে আছে। দ্বিতীয়ত, প্রাচ্যতত্ত্ব ও এর উদ্ভাবক সমাজের সম্পর্কের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব। যেমন, প্রাচ্যতত্ত্ব ও সাহিত্যিক কল্পনার মধ্যে নিকট-সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী চৈতন্যের সঙ্গেও। ইউরোপের বহুযুগের ইতিহাসে যে বিষয়টি আমাদের বোধে ধাক্কা দেয়, তা হলো ইসলাম সম্পর্কে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের রচনার মতামত এবং কবি, ঔপন্যাসিক, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের বক্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান। এ ছাড়া লুইস যা আলোচনা করতে চাননি, তেমন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক প্রাচ্যে ব্যাপক সাম্রাজ্য বিস্তার।

লুইসের ধারণার চেয়ে ব্রিটিশ ধ্রুপদ শিক্ষা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্পর্কে লুইসের ধারণার অনেক বেশি জটিল, তবে প্রাচ্যতত্ত্বে বিদ্যমান ক্ষমতা ও জ্ঞানের এমন সমান্তরাল সম্পর্কের দৃষ্টান্ত আধুনিক ভাষাতত্ত্বের সমগ্র ইতিহাসে নেই। উপনিবেশবাদকে বৈধ প্রমাণের জন্য ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত প্রাচ্য ও ইসলামবিষয়ক তথ্যাদি ও জ্ঞানের বেশির ভাগটাই এসেছে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের পাণ্ডিত্য থেকে। অরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড দি পোস্ট-কলোনিয়াল প্রিডিকামেন্ট[৬] শিরোনামে বিভিন্ন লেখকের লেখা নিয়ে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ সংকলনে প্রচুর দলিল-প্রমাণাদিসহ দেখানো হয়েছে প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞান কীভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসন-পরিচালনায় ব্যবহার করা হয়। এখনো অঞ্চল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত যেমন–প্রাচ্যতাত্ত্বিক এবং সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের মধ্যে নিয়মিত লেনদেন অব্যাহত। তা ছাড়া জন বুকান থেকে ভিএস নেইপল পর্যন্ত লেখকদের লেখায় ইসলামি ও আর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, নিষ্ক্রিয় নির্ভরতা, নিষ্ঠুরতা, জাঁকজমক ও মর্যাদাহানি ইত্যাদি সম্পর্কে যা পাওয়া যায়, তাও সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যতত্ত্বের ভিত্তিরূপ প্রাক-ধারণা জাতীয় বিষয়। বিপরীতক্রমে, একদিকে ভারততত্ত্ব ও চীনতত্ত্বের মধ্যে এবং অন্যদিকে, সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে জনপ্রিয় জরাজীর্ণ ধারণার বিনিময় খুব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘটেনি, যদিও পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঋণ লক্ষণীয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক পেশাজীবী ইসলাম বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন তাদের বিষয় নিয়ে গবেষণা করে, এ সত্ত্বেও এ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কিছুমাত্র পছন্দ করতে পারেননি, ভালোবাসা তো দূরের কথা।

লুইস ও তার অনুকারদের মতো যদি বলা হয় যে, এসব পর্যবেক্ষণ আসলে 'ফ্যাশনেবল কারণসমূহকে' গ্রহণ করে নেয়া, তাতে মূল প্রশ্নটি আসে না। সে প্রশ্ন হলো কেন ইসলামি বিশ্বে অর্থনৈতিক শোষণ, আধিপত্য ও দখলের পরিকল্পনার হোতা ভিনদেশি সরকারগুলো নিয়মিতভাবে ইসলাম বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ

করেন; কিংবা লুইসের মতো এত সব ইসলাম বিশেষজ্ঞ কেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে মনে করেন যে, তাদের দায়িত্ব হলো আরব বা ইসলামি জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করা? এবং তা করার উদ্দেশ্যে কেনই বা এ রকম ভান করেন যে, কেবল ধ্রুপদ ইসলামই নিরপেক্ষ পণ্ডিতি গবেষণার বিষয় হতে পারে? মধ্যযুগীয় ইসলামে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অধিকারী বহু সংখ্যক পণ্ডিতকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়, যাতে তারা ওই সব দূতাবাসকে উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা স্বার্থ সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু তা সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় ভাষাতত্ত্বে আল হেল্লাজের প্রতি প্রেমবোধ নির্দেশ করে না, যা লাইস আরোপ করেন।

অতএব, বিস্ময়কর নয় যে, ইসলামি ও আরব প্রাচ্যতত্ত্ব রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তার যোগসাজশ অস্বীকার করার জন্য সর্বদা এক পায়ে খাড়া এবং এও আশ্চর্য নয় যে, এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমার বর্ণিত যোগসাজশের কোনো অভ্যন্তরীণ সমালোচনা হয়নি; তাই লুইসও এমন বিস্ময়কর মন্তব্য উচ্চারণ করতে পারেন যে প্রাচ্যতত্ত্বের সমালোচনা 'অর্থহীন'। এও বিস্ময়কর নয় যে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমার কাজ সম্পর্কে লুইসের মতো বিশেষজ্ঞ এর রচিত অধিকাংশ নেতিবাচক সমালোচনাই হয়ে উঠেছে কোনো অমার্জিত অনুপ্রবেশকারী কর্তৃক ব্যারনের পদমর্যাদা উপেক্ষা করার একঘেয়ে বর্ণনার মতো। আমার আলোচিত বিষয়বস্তু কেবল প্রাচ্যতত্ত্ব নয়, তার সম্পর্ক, অনুমোদন, রাজনৈতিক প্রবণতা, বিদেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও। যে কজন বিশেষজ্ঞ (আবার, দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে) এসব কিছু নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছেন তারা চীনতাত্ত্বিক, ভারততাত্ত্বিক এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ যারা নতুন প্রভাব ও প্রাচ্যতত্ত্বের সমালোচনার সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক যুক্তিতর্কের জন্য উন্মুক্ত।

প্রবীণ আরবতাত্ত্বিক ও ইসলাম বিশেষজ্ঞদের অনেকে এমন আঘাতজনিত ক্রুদ্ধতা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন যা তাদের আত্মপ্রতিফলনের বিকল্পস্বরূপ। প্রায় সবাই ব্যবহার করেছেন 'অপবাদ, অসম্মান, নিন্দাজ্ঞাপক রচনা' ইত্যাদি শব্দ যেন আমার সমালোচনার কাজটাই তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সংরক্ষণ রীতির মহাপবিত্রতার অননুমোদনযোগ্য ব্যত্যয়। লুইসের আত্মরক্ষামূলক সমালোচনা বৈরী বিশ্বাসের পরিচায়ক। কারণ, অন্যদের মতো লুইসও যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস, কমেন্টারি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ আরব (ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইস্যু) বিরোধী। তাই লুইসের কথার পূর্ণ জবাব দিতে হলে আগে বিবেচনা করতে হবে তিনি যখন তার জ্ঞান ক্ষেত্রের অমর্যাদা করা হয়েছে বলে ভান করেন তখন রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সব মিলিয়ে তিনি নিজে আসলে কী।

প্রত্যেক প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও তাদের রচনা এবং প্রতিটি প্রাচ্যতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে পচে যাওয়া, মুরোদহীন সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে এক গ্রাসে নিয়ে উপলব্ধি করার চেয়ে তাদের বিস্তারিত তালিকা তৈরি করেও ইসলামি বা আরব প্রাচ্যতত্ত্ব ও আধুনিক ইউরোপের সম্পর্ক অধ্যয়ন করা সম্ভব। যা হোক, আমি তা করিনি। তবে এমন বলা তড়িঘড়ি হয়ে যায় যে, প্রাচ্যতত্ত্ব একটি ষড়যন্ত্র, কিংবা এমন বলা যে 'পশ্চিম' এক দুষ্টচক্র : তা হবে লুইস ও তার এক ইরাকি প্রচারক অনুসারী কেনান মাকাইয়ার কর্তৃক আমার সম্পর্কে কত মন্তব্যের মতো নির্বোধসুলভ কর্ম। অন্যদিকে যে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে মানুষ প্রাচ্য সম্পর্কে চিন্তা করে, লিখে বা কথা বলে তা আড়াল করাও ভণ্ডামি, তিনি পণ্ডিত বা অন্য যে-ই হোন। আমি আগেও বলেছি, এটি বোঝা জরুরি যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ-পশ্চিমা চিন্তাবিদ কর্তৃক প্রাচ্যতত্ত্বের বিরোধিতা করার কারণ হলো তারা যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে প্রাচ্যতত্ত্বের আধুনিক ডিসকোর্স আসলে উপনিবেশবাদের যুগে উদ্ভূত ক্ষমতার ডিসকোর্স; এটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি চমৎকার সিম্পোজিয়াম কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড কালচারের বিষয়বস্তু ছিল।[৫] এই ডিসকোর্সের ভিত্তি হলো এই আন্দাজ যে, ইসলাম আদিম ও অপরিবর্তিত, তাই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থের প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক তা 'বাজারজাতকরণ'-এর যোগ্য; এতে মুসলিম বা আরব কিংবা বিমানবীকৃত অন্য কোনো নিম্নজনগোষ্ঠীর মানুষই নিজেদের মানুষ হিসেবে শনাক্ত করে না, তাদের পর্যবেক্ষকদেরও কেবল পণ্ডিত হিসেবে দেখে না। আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের ডিসকোর্স এবং অন্যপক্ষে, স্থানীয় আমেরিকান ও আফ্রিকানদের সম্পর্কে সৃষ্ট জ্ঞান শাখায় এরা কেবল দেখে এ ধরনের চিন্তন-পদ্ধতির পণ্ডিতি নিস্পৃহার কাহিনি আরও কিছুকাল টিকিয়ে রাখার জন্য তার সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত অস্বীকার, দমন ও বিকৃত করার অতি পুরোনো প্রবণতা।

• খ •

তবু লুইস প্রমুখের এ-জাতীয় মতামত সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও আমি বলব না যে, গত দেড় দশকে কেবল তাদেরই মধ্যেই এ-জাতীয় চিন্তা উদ্ভূত বা অতিরিক্ত বলশালী হয়ে উঠেছে। এও সত্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার পরপরই আমেরিকায় একদল পণ্ডিত তাড়াহুড়ো করে প্রাচ্যকৃত ইসলামকে শয়তানের নতুন সাম্রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। পরিণতিতে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ, আর ও সন্ত্রাস কিংবা ইসলাম ও স্বৈরাচারকে একদলা করে সৃষ্ট নমুনায় সয়লাব হয়ে যায় ইলেকট্রনিক ও মুদ্রিত প্রচারমাধ্যম উভয় ক্ষেত্র। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে স্থানীয় ধর্মীয় প্রভাব বা প্রাচীন জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যার

দুর্ভাগ্যজনক একটি দিক হলো সালমান রুশদির বিরুদ্ধে ইরানের জারিকৃত ফতোয়া। এ নিয়েই চিত্রটি পুরো হয় না। এ প্রবন্ধের বাকি অংশে আমি আলোচনা করতে চাই পাণ্ডিত্য, সমালোচনা ও ভাষ্যে সৃষ্ট নতুন প্রবণতা নিয়ে। যা আমার গ্রন্থের মৌল শর্তগুলো মেনেও বিভিন্ন দিক থেকে তাকে ছাড়িয়েও গেছে এমন সব উপায়ে যা সমৃদ্ধ করে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার জটিলতা সম্পর্কিত আমাদের বোধকে।

এসব প্রবণতার কোনোটিই আকাশ থেকে পড়েনি; তেমনি কোনো কারণ ছাড়াই ওগুলো সম্পূর্ণ জ্ঞান ও চর্চার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সন্দেহজনকভাবে উত্তেজিত এবং মতাদর্শগত দিক থেকে টগবগে ফুটন্ত, টানটান, পরিবর্তনমুখী এমনকি রক্তপিপাসু রয়ে গেছে এর পার্থিব পরিপ্রেক্ষিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়া এবং পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও ক্ষমতা ও আধিপত্য অস্থির দৃশ্যমান। পৃথিবীর দক্ষিণ অংশ একসময় রোমান্টিকতা ও আবেগের সঙ্গে যাকে বলা হতো তৃতীয় বিশ্ব জড়িয়ে যায় ঋণের জালে, ডজন খানেক ফেটে যাওয়া বা খণ্ডিত সত্তায় বিভক্ত হয়ে পড়ে; গত দশ বা পনেরো বছরে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অনুন্নয়নের তাড়ায় চরম বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। নির্জোট আন্দোলন ও তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ–যারা উপনিবেশের কবল থেকে মুক্তির সূচনাকারী, তারা আজ নেই। জাতিগত সংঘাত ও স্থানীয় সংঘর্ষে বিপজ্জনক একটি ধরন–বসনিয়ার বেদনায়ক দৃষ্টান্ত বলে– কেবল দক্ষিণে সীমাবদ্ধ নয়, আবার ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর সর্বত্র এবং মধ্য আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজও আধিপত্যশীল শক্তি, যখন তার পেছন পেছন ইতস্তত একদিকে থেকে আরেক দিকে ঘুরছে খণ্ডিত ও উদ্বিগ্ন ইউরোপ।

সাম্প্রতিক বিশ্ব-পরিস্থিতি ব্যাখ্যা এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে উপলব্ধি করার কয়েকটি নাটকীয় প্রচেষ্টা হয়েছে। মৌলবাদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এর ধর্ম-নিরপেক্ষ ও তুল্য-বিপরীত জাতীয়তাবাদও এমন সব তত্ত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, যা বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মৌলিক পার্থক্যে বিশ্বাসী; ধারণা করা হয় এসব পার্থক্য সবদিক অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান, তবে আমার মতে এ বিশ্বাসও প্রতারণাপূর্ণ। যেমন–হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল হান্টিংটন বিশ্বাসের একেবারে উলটোমুখী এক প্রস্তাবে বলেন যে, তার ভাষায়, 'সভ্যতার সংঘাত' .য়্লুযুদ্ধকালীন দ্বি মেরুবিন্যাসকে মাড়িয়ে এগিয়ে গেছে; এ তত্ত্বের ভিত্তি হলো যে, বহু সভ্যতার মতোই পশ্চিমা, কনফুসিয়ান এবং ইসলামি সভ্যতা পানি-নিরোধী কম্পার্টমেন্টের মতো, যার অনুগামীরা তলে তলে মূলত অন্য সবার সংস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষার্থেই আগ্রহী।[২]

এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ সংস্কৃতির তত্ত্বে সর্বজনমান্য একটি বড় অর্জন হলো এ উপলব্ধি যে, সংস্কৃতি সংকরজাতীয় বিভিন্ন উৎসজাত উপাদানের সমন্বয় এবং আমার কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম গ্রন্থে যেমন যৌক্তিক ব্যাখ্যা করেছি যে, সংস্কৃতি ও

সভ্যতা এত বেশি পরস্পরনির্ভর ও সম্পর্কিত যে এগুলোর একক বা সোজা ছককাটা বর্ণনা সম্ভব নয়। কেবল গুটি কয় মূল্যবোধের জন্য একরকম বিচ্ছিন্ন শ্রেষ্ঠত্বের ভাব নিয়ে আজকে কী করে কেউ 'পাশ্চাত্য সভ্যতা' সম্পর্কে কথা বলতে পারে কেবল মোটাদাগের মতাদর্শিক কল্পকাহিনি ছাড়া; যদিও যুদ্ধজয়, দেশান্তর, ভ্রমণ এবং আজকের পশ্চিমা জাতিগুলোর মিশ্র আত্মপরিচয় বিকাশের প্রক্রিয়া অর্থাৎ মানবগোষ্ঠীর মিশ্রণ-প্রক্রিয়ার বাইরে এসব মূল্যবোধের খুব একটা অর্থ নেই? যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে এ কথা বিশেষভাবেই সত্যি। এ দেশটিকে এখন বিভিন্ন মানবজাতি ও সংস্কৃতি কর্তৃক বারবার বদলে দেয়া বিশাল এক বিকৃত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বলে বর্ণনা করা যায়; এসব জাতির রয়েছে বিজয় ও ধ্বংসযজ্ঞ আর বড় মাপের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অর্জনের সমস্যাময় ইতিহাসের অংশীদারত্ব। এটি অরিয়েন্টালিজম-এর একটি বক্তব্য। তাই এই যে, কোনো জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতিকে জোরপূর্বক ভিন্ন বর্গ বা সত্তায় আলাদা করে রাখার চেষ্টার মধ্যে এর সহজাত প্রতারণা ও বিকৃত ভাষ্য রচনার বিষয়টি উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তেমনি এ ধরনের উপলব্ধি যে উপায়ে ক্ষমতার সহযোগী হিসেবে 'প্রাচ্য' বা 'পাশ্চাত্য' ধারণা সৃষ্টির পথে কাজ করে তাও পরিষ্কার করে দেখায়।

এমন নয় যে, হান্টিংটন ও তার পেছনের বিজয়গর্বিত পাশ্চাত্য রীতিনীতির সব তাত্ত্বিকবৃন্দ যেমন–ফ্রান্সিস ফুকোয়ামার তেমন কোনো প্রভাব জনগণের ওপর পড়ে না। আসলে পড়ে। যেমন পল জনসনের সাদৃশ্যপূর্ণ একটি রচনা। একসময়ের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী জনসন এখন ঠিক বিপরীত সুরের প্রথম সারির সামাজিক ও রাজনৈতিক তার্কিক। ১৯৯৩ সালের ১৮ এপ্রিলের নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকীতে তার লেখা 'কলোনিয়ালিজম'জ ব্যাক-অ্যান্ড নট এ মোমেন্ট টু সুন' প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য এ রকম যে, 'সভ্য জাতিসমূহ'-এর উচিত নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহকে পুনরায় উপনিবেশে ফিরিয়ে আনা 'যেখানে সভ্য জীবনের অতি মৌলিক শর্তসমূহও ভেঙে পড়েছে' তা করতে হবে আরোপিত অছি-পরিষদ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তার নমুনাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক আদর্শের অনুরূপ। তিনি বলেন লাভজনকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে হলে ইউরোপকে প্রথমেই আইনশৃঙ্খলা আরোপ করতে হবে।

জনসনের যুক্তির অসংখ্য গভীরতর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় মার্কিন নীতিনির্ধারকদের কাজকর্ম, প্রচার মাধ্যমের তৎপরতা এবং অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে–মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকা ও পূর্ব-ইউরোপে তাহলো হস্তক্ষেপের পররাষ্ট্রনীতি। তবে অন্যত্র তা খোলামেলা মিশনারি চরিত্রের, বিশেষ করে রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে,

একদিকে পাশ্চাত্যের আধিপত্যের পুরোনো ধারণা (প্রাচ্যতত্ত্ব এরই একটি অংশ), অন্যদিকে নিম্নবর্গীয় সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী ও বিপুলসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীদের মধ্যে জায়গা করে নেয়া নতুন ধারণার মধ্যে গণমানসে প্রধানত অরক্ষিত ও ভয়ংকর একটি ফাটলের সূচনা ও প্রসার। নিকৃষ্ট জনগোষ্ঠী অর্থাৎ আগে উপনিবেশিত, দাসে পরিণত, অবদমিত মানুষরা এখন আর নীরব নয়; কিংবা এমন নয় যে তাদের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না– কেবল প্রবীণ ইউরোপীয় ও মার্কিন পুরুষদের লেখালেখির জগৎ ছাড়া। নারী, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক মানুষদের চৈতন্যে ঘটে যাওয়া শক্তিশালী বিপ্লব প্রভাবিত করেছে পৃথিবীব্যাপী মূলধারার চিন্তা-ভাবনাকেও। যদিও ১৯৭০-এর দশকে অরিয়েন্টালিজম রচনার সময় আমার মনেও এই বিষয়গুলো উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে; কিন্তু এখন ওগুলো নাটকীয়ভাবে এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তা সংস্কৃতির পণ্ডিতি ও তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে জড়িত সবার মনোযোগ দাবি করে।

দুটো প্রধান প্রবাহ চিহ্নিত করা যায় : উত্তরাধুনিকতাবাদ ও উত্তর উপনিবেশবাদ। পরিভাষাগুলোর 'উত্তর' উপসর্গটির অর্থ যতটা না পার হয়ে যাওয়া বোঝায়, তার চেয়ে বেশি বোঝায় যেমন এলা সুহাট উত্তর-উপনিবেশবাদের অর্থগত দিক সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে বলেছেন–'ধারাক্রম ও ধারাক্রমহীনতা; কিন্তু এখন এর ঝোঁক পড়ছে পুরোনো ঔপনিবেশিক অভ্যাসের নতুন মানসিকতা ও রীতির ওপর, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ওপর নয়।'[৭] উত্তর-ঔপনিবেশিকতা ও উত্তর-আধুনিকতা দুটোই ১৯৮০-এর দশকের অনুসন্ধান ও তর্ক-বিতর্কের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরিভাষা হিসেবে উদ্ভূত। অনেক ক্ষেত্রে প্রাক-উদ্দীপনারূপে গৃহীত হয়েছে অরিয়েন্টালিজমের মতো কাজ। এখানে পরিভাষা নিয়ে বিস্তৃত বিতর্কে যাওয়া সম্ভব নয়, যার কোনো কোনোটি এমনকি অত দূর গড়িয়েছে যে শব্দবন্ধটির মাঝখানে হাইফেন বসবে কি না, তাও আলোচনায় এসেছে। তাই, পরিভাষাগত অতিরঞ্জন বা এ বিষয়ক কোনো আলোচনা এখানে মুখ্য নয়, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিত থেকে ওই সব প্রবাহ ও প্রয়াস অবস্থানসমেত চিহ্নিত করা, যা ১৯৯৪ সালেও সেই একই গ্রন্থের সঙ্গে আংশিক জড়িয়ে আছে।

নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাস সম্পর্কে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে আরেকটি বিষয় কেন্দ্র করে; হ্যারি ম্যাগডফ একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে একে বলেছেন বিশ্বায়ন–একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সেবা ও পণ্যের দর বাড়িয়ে এবং (সচরাচর অ-পশ্চিমা দেশগুলোর) স্বল্প আয়ের মানুষের কাছ থেকে সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে অধিক আয়ের মানুষের কাছে সঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক এলিট শ্রেণি তাদের ক্ষমতা বিস্তৃত করেছে পৃথিবীজুড়ে।[৮] সেই সঙ্গে উদ্ভূত একটি নতুন অন্তর্বর্তীকালীন বিন্যাস অনুযায়ী রাষ্ট্রের সীমানা গৌণ হয়ে পড়েছে, কেবল শ্রম ও

উপার্জন পরিণত হয়েছে বিশ্ব-ব্যবস্থাপকদের বিষয়ে এবং ঔপনিবেশিকতা আবার আবির্ভূত হয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী উপযোগিতার মধ্য দিয়ে।[৯] মিয়োশি ও দিরলিক একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বিষয়টির সুন্দর আলোচনা করেছেন। এরা দেখিয়েছেন যে মিশ্র সংস্কৃতিবাদ ও 'উত্তর-ঔপনিবেশিকতা'র প্রতি পশ্চিমের প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিতদের আগ্রহ মূলত বিশ্বায়িত ক্ষমতার নতুন বাস্তবতা থেকে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাদপসরণের প্রয়াস। 'আমাদের দরকার', মিয়োশি বলেন, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন ও মিশ্রসংস্কৃতিবাদের মধ্যে ধরে থাকা 'উদার আত্ম-বঞ্চনা'র দৃষ্টান্তস্বরূপ নীতি শিক্ষামূলক খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টার চেয়ে একটি কঠোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাছাইকরণ (৭৫১)।'

এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলেও (অবশ্যই তাই করব) এখন উত্তরাধুনিকতা ও তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিসঙ্গ উত্তর ঔপনিবেশিকতার আবির্ভাবের পেছনে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার একটি নিরেট পটভূমি থেকে যায়। প্রথমত উত্তরাধুনিকতায় ইউরোপের প্রতি প্রবল পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, তেমনি আছে তাত্ত্বিক ও সৌন্দর্যতাত্ত্বিকভাবে স্থানিক ও ঘটনাক্রমের ওপর অতিরিক্ত জোর দেয়ার তীব্র ঝোঁক, আছে ইতিহাসের কৃত্রিম ভারশূন্যতা, সর্বোপরি ভোক্তাকেন্দ্রিকতা। উত্তর-উপনিবেশবাদ সম্পর্কে প্রথম চিন্তাভাবনা শুরু করেন আনওয়ার আবদেল মালেক, সামির আমিন, সিএলআর জেমসের মতো গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ। এদের সবারই ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অসম্পূর্ণ উদারীকরণ কর্মসূচির দৃষ্টিকোণ থেকে আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অধ্যয়ন। অথচ উত্তরাধুনিকতা (লিওতার্দ কর্তৃক) বিবৃত এক বিখ্যাত কর্মসূচিতে মুক্তি ও আলোকায়ন সম্পর্কিত মহাবয়ন পরিত্যাজ্য হওয়ার ওপর জোর দেয়। অন্যদিকে প্রথম প্রজন্মের উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখক-শিল্পীদের অধিকাংশ কাজে ঠিক বিপরীত বিষয়ের ওপর ঝোঁক লক্ষণীয়। মহাবয়ন অক্ষুণ্ন থাকে, যদিও বর্তমানে এর বাস্তবতা ও প্রয়োগ স্থগিত, বিলম্বিত বা খণ্ডিত। উত্তরাধুনিকতা ও উত্তর-উপনিবেশবাদের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতার জরুরি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নির্দেশনার এই অনিবার্য পার্থক্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ ও ফলাফল নিয়ে আসে। অবশ্য এই দুইয়ের মধ্যে কিছু পারস্পরিক বিস্তার আছে (যেমন ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা)।

আমি মনে করি, এমন বললে ভুল হবে যে ১৯৮০-এর দশক থেকে নাটকীয়ভাবে দ্রুত বিস্তৃত উত্তর-উপনিবেশবাদী সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রচনাসমূহেও স্থানিক, আঞ্চলিক বা সম্ভাব্যের ওপর অত জোর ছিল না। আসলে ছিল কিন্তু আমার কাছে মনে হয় তা ছিল একগুচ্ছ সর্বজনীন বিষয়ের সাধারণ বিশ্লেষণের সঙ্গে জড়িত। ওই সব বিষয় মূলত মুক্তি, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি পুনর্মূল্যায়নমুখী মনোভাব, পুনরাবৃত্তিমূলক তাত্ত্বিক আদর্শ ও রীতির ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর

মধ্যে ইউরোপকেন্দ্রিকতা ও পিতৃতন্ত্রের ধারাবাহিক সমালোচনা ছিল অন্যতম মুখ্য বিষয়। ১৯৮০-এর দশকে ইউরোপ ও আমেরিকার ক্যাম্পাসগুলোয় ছাত্রছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট অনুষদসমূহ মৌলিক পাঠ্যসূচিতে নারী, অ-ইউরোপীয় শিল্পী ও চিন্তাবিদদের লেখা এবং নিম্নবর্গের (সাব-অল্টার্ন) রচনা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে যান। এর সঙ্গে অঞ্চলবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে, যা এত দিন ছিল প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও অন্যান্য বিষয়ে তাদের সমমনাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে। উৎস নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা, নতুন নতুন তত্ত্বের প্রয়োগ এবং ইউরোপকেন্দ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের বদলের মধ্যে দিয়ে তীব্র প্রভাব ছাপ ফেলে নৃ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, সর্বোপরি ইতিহাসে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে নয়, সবচেয়ে মেধাদীপ্ত পুনর্মূল্যায়ন সম্পন্ন হয় ভারততত্ত্বে–রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে একদল প্রতিভাবান পণ্ডিত-গবেষক কর্তৃক নিম্নবর্গের অধ্যয়নের উত্থানের মধ্যে দিয়ে। ইতিহাসবিদ্যায় বিপ্লব সংঘটিত করার চেয়ে কম কিছু লক্ষ ছিল না তাদের; অব্যবহিত উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী এলিটদের কবল থেকে ভারতের ইতিহাসকে মুক্ত করা এবং এতে নাগরিক দরিদ্র সমাজ ও গ্রামাঞ্চলের বিপুলসংখ্যক গরিব জনগোষ্ঠীর কৃত ভূমিকা বিবৃত করা। যদি বলা হয় এ ধরনের মুখ্যত-প্রাতিষ্ঠানিক কাজকে বহুজাতিক নব্য উপনিবেশবাদ সহজেই তার কুকর্মে সঙ্গী করে নিতে পারে, তাহলে তা ভুল হবে বরং আমাদের উচিত অর্জন স্বীকার করা ও তার তথ্য সংরক্ষণ করা, পাশাপাশি সম্ভাব্য ফাঁদের ব্যাপারে সতর্ক করা।

আমার কাছে যা আগ্রহের বিষয় তা হলো উত্তর-উপনিবেশবাদী বিষয়টির ভৌগোলিক অবস্থান পর্যন্ত বিস্তৃতি। বহু শতক ধরে যে বিষয়টিকে বিশ্বাস করা হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিচ্ছিন্নতাকারী অনপনেয় খাত বলে, অরিয়েন্টালিজম তো সে বিশ্বাসেরই পুনর্বিবেচনার ওপর দাঁড়ানো বিস্তৃত এক অধ্যয়ন। সেই বিচ্ছিন্নতা বা পার্থক্য দূরীকরণ আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কারণ, মানবীয় সম্পর্ক নির্মাণে জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কে-ই বা অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু এই পার্থক্যের অর্থ যে শত্রুতা–পরস্পরবিরোধী একগুচ্ছ পরিশোধিত ও জমাট সত্তা, সেই ধারণা এবং এর ওপর নির্ভর করে সৃষ্ট শত্রুতামূলক জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে চেয়েছি আমি। আমার কথিত সেই পার্থক্য ও সংঘাত যে প্রজন্মক্রমিক শত্রুতা, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য সৃষ্টি করেছে তাকে উপলব্ধি করার নতুন উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছি অরিয়েন্টালিজম-এ। প্রকৃতপক্ষে উত্তর উপনিবেশবাদী অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হলো আদর্শস্থানীয় সাংস্কৃতিক রচনার পুনঃপাঠ; ওগুলোকে অপবাদ দেয়া বা কলঙ্কিত করার জন্য বরং ওগুলোর অনুমিত সত্যসমূহকে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা, ওই সব সৃষ্টিতে এঁটে বসা প্রভু-ভৃত্যের দ্বৈত সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বাইরে বিস্তারণ। এ পরিবর্তনে অবশ্যই তুলনামূলক প্রভাব আছে

রুশদির বিস্ময়কর সমৃদ্ধ উপন্যাস দি মিডনাইট চিলড্রেনস, সিএলআর জেমসের বয়ান, এমি সিজার ও ডেরিক ওয়ালকটের কবিতা প্রভৃতির; এসব কাজের দুঃসাহসিক নতুন কৃতিত্ব আসলে উপনিবেশকালীন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুনর্যোজন, তাতে প্রাণশক্তির সঞ্চার, একে অংশীদারত্বের নতুন সৌন্দর্যতত্ত্বে রূপান্তরিতকরণ–সচরাচর উৎকৃষ্ট রূপায়ণ।

১৯৮০ সালে ফিল্ড ডে নামে ঐক্যবদ্ধ একদল গুরুত্বপূর্ণ আইরিশ লেখকের কাজেও এ ধরনের বিকাশ লক্ষণীয়। তাদের রচনা নিয়ে প্রকাশিত একটি সংকলনে এই লেখকগোষ্ঠী সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় :

> (এই লেখকগণ) বিশ্বাস করেন ফিল্ড ডে প্রচারিত মতামত, মিথ ও সত্য বলে গৃহীত আদর্শসমূহ বিশ্লেষণ করে বর্তমান সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে এবং তা তাদের করা উচিত; এসব মতামত, মিথ, আদর্শ কথিত নমুনাসমূহ (আয়ারল্যান্ড ও উত্তরের মধ্যে) বিদ্যমান সংকটের কারণ ও লক্ষণ উভয়ই। সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক আয়োজনের ভাঙন, দমন করার উদ্দেশ্যে উত্তর কর্তৃক পরিচালিত সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি কারণে ওই উদ্যোগ আয়ারল্যান্ডের চেয়ে খোদ উত্তরেই আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। অতএব, এ সংঘের কর্মসূচি হলো প্রথমে একগুচ্ছ পুস্তিকা দিয়ে শুরু করে (সীমাস হীনির কবিতা, সীমাস ডিনের প্রবন্ধ, ব্রায়ন ফ্রায়েল ও টম পওলিন-এর নাটক ছাড়াও) ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু নির্বাচিত রচনা প্রকাশ করা।[১০]

একসময় মানুষ ও জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির ভিত্তি ছিল যে, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, তা পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যস্ত করার ধারণাটি বিশাল একরাশ পণ্ডিতি ও সাংস্কৃতিক কাজের প্রাণকেন্দ্রে স্থান করে নেয়। উদাহরণ হিসেবে আমিল আলক্যালির বিয়োন্ড অ্যারাবস অ্যান্ড জুইস : রিমেকিং ল্যাভেন্টাইন কালচার, পল গিলোরির দি ব্ল্যাক আটলান্টিক; মডার্নিটি অ্যান্ড ডাবল কনশাসনেস এবং ময়রা ফারগুসনের সাবজেক্ট টু আদারস : ব্রিটিশ উইমেন রাইটারস অ্যান্ড কলোনিয়াল স্লেভরি–এ তিনটি রচনা উল্লেখ করলাম[১১] একদা যে জ্ঞানক্ষেত্রটি একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী, লিঙ্গ গোত্র বা শ্রেণির মানুষের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত বলে মনে করা হতো, এসব রচনা তা পরীক্ষা করে দেখে এবং দেখায় যে, অন্যরাও এতে যুক্ত। দীর্ঘ ইতিহাসজুড়ে আরব ও ইহুদিদের যুদ্ধক্ষেত্ররূপে পরিচিত লেভান্ত অ্যালক্যালির রচনায় আবির্ভূত হয় দুই জনগোষ্ঠীরই সাধারণ ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতিরূপে। একইভাবে গিলোরির মতো আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে দেয়, আসলে সম্পূর্ণ উলটেই দেয়–আগে মনে করা হতো এটি কেবল ইউরোপীয় যাতায়াতপথ। ইংরেজ দাসত্বপ্রথা ও আফ্রিকান দাসদের মধ্যে শত্রুতামূলক সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে গিয়ে ফারগুসন সাদা পুরুষ ও সাদা নারীদের মধ্যে বিভাজক

রেখারূপে আরও জটিল এক বিন্যাস উন্মোচিত করেন; আরও অবনতি ও স্থানচ্যুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে আফ্রিকায়।

এমন আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। আমি বরং এই বলে সংক্ষেপে শেষ করব যে, যদিও বৈষম্য ও শত্রুতা এখনো বিদ্যমান–যা থেকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রপঞ্চরূপী প্রাচ্যতত্ত্বে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়–এখন একটি সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে যে, এ পরিস্থিতি কোনো চিরন্তন বিন্যাস নয়, বরং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে যার সমাপ্তি, কিংবা অন্তত আংশিক হ্রাস করা সম্ভব। মানবীয় চিন্তা ও সম্পর্কের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শিকলের প্রভাব কাটানোর প্রয়াসস্বরূপ বিপুল পরিমাণ বিশ্লেষণাত্মক রচনা ও পণ্ডিতি উদ্যোগের সহজলভ্যতা আর পনেরোটি ঘটনাবহুল বছরের দূরত্ব থেকে গ্রন্থটির দিকে ফিরে তাকাই আজ : যে সংগ্রাম এখনো পুব ও পশ্চিমে একত্রে চলমান তাতে প্রাচ্যতত্ত্ব অন্তত প্রকাশ্যে অঙ্কিত করে দিয়েছে তার নাম।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ
নিউইয়র্ক : মার্চ, ১৯৯৪

তথ্যসূত্র

ভূমিকা

1. Thierry Desjardins, *Le Martyre du Liban* (Paris: Plon, 1976), p. 14.
2. K. M. Panikkar, *Asia and Western Dominance* (London: George Alien & Unwin, 1959).
3. Denys Hay, *Europe: The Emergence of an Idea*, 2nd ed. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968).
4. Steven Marcus, *The Other Victorians: A Study of Sexuality and Pornography in Mid-Nineteenth Century England* (1966; reprint ed., New York: Bantam Books, 1967), pp. 200-19.
5. দেখুন আমার লেখা *Criticism Between Culture and System* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, প্রকাশিতব্য।)
6. বিশেষত তার *American Power and the New Mandarins: Historical and Political Essays* (New York; Pantheon Books, 1969) এবং *For Reasons of State* (New York: Pantheon Books, 1973).
7. Walter Benjamin, *Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism*, trans. Harry Zohn (London: New Left Books, 1973), p. 71.
8. Harry Bracken, "Essence, Accident and Race," *Hermathena* 116 (Winter 1973): 81-96.
9. *Diacritics* 6, no. 3 (Fall 1 976) : 38-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকার।
10. Raymond Williams, *The Long Revolution* (London: Chatto & Windus, 1961), pp. 66-7.
11. আমার লেখা *Beginnings: Intention and Method* (New York: Basic Books, 1 975).
12. Louis Althusser, *For Marx*, trans. Ben Brewster (New York : Pantheon Books, 1969), pp. 65-7.
13. Raymond Schwab, *La Renaissance orientale* (Paris: Payot, 1950); Johann W. Fuck, *Die Arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts* (Leipzig : Otto Harrassowitz, 1955); Dorothee Metlitzki, *The Matter of Araby in Medieval England* (*New* Haven, Conn.: Yale University Press, 1977).
14. E. S. Shaffer, *"Kubla Khan " and The Fall of Jerusalem: The Mythological School in Biblical Criticism and Secular Literature, 1770-1880* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).

15. George Eliot, *Middlemarch: A Study of Provincial Life* (1872; reprint, ed., Boston: Houghton Mifflin Co., 1956), p. 164.
16. Antonio Gramsci, *The Prison Notebooks: Selections,* trans. and ed. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), p. 324. হোয়ের ও স্মিথের অনুবাদে বাদ যাওয়া পুরো অনুচ্ছেদটির জন্য: Gramsci, *Quaderni del Carcere,* ed. Valentino Gerratana (Turin : Einaudi Editore, 1975), 2: 1363.
17. Raymond Williams, *Culture and Society, 1780-1950* (London : Chatto & Windus, 1958), p. 376.

প্রাচ্যতত্ত্বের সীমানা

1. আর্থার জেমস্ বেলফোরের বক্তৃতা থেকে প্রদত্ত পূর্ববর্তী ও এই উদ্ধৃতিটির জন্য দেখুন, *Parliamentary Debates* (Commons), 5th sec., 17 (1910): 1 140-46. এবং A. P. Thomton, *The Imperial Idea and Its Enemies: a Study in British Power* (London: MacMillan & Co., 1959), pp. 357-60. বেলফোরের বক্তৃতা ছিলো এলডন পোর্স্ট-এর মিশর-নীতির বিরুদ্ধে; এ বিষয়ক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Peter John Dreyfus Mellini, "Sir Eldon Gorst and British Imperial Policy in Egypt." unpublished Ph. D. dissertation, Stanford University, 1971,
2. Denis Judd, *Balfour and the British Empire: A Study in Imperial Evolution,* 1 874- 1 932 (London : MacMillan & Co., 1968), p. 286. ও p. 292। ১৯২৬ সালের দিকে বেলফোর বিস্ময়করভাবে কোনো শ্লেষার্থ ছাড়াই মিশরকে উল্লেখ করেন 'স্বাধীন জাতি' বলে।
3. Evelyn Baring, Lord Cromer, *Political and Literary Essays, 1908-1913* (1913; reprint. ed., Freeport, N.Y. Books for Libraries Press, 1969), pp. 40, 53, 12-14.
4. পূর্বোক্ত p. 171.
5. Roger Owen, "The Influence of Lord Cromer's Indian Experience on British Policy in Egypt 1883-1907," in *Middle Eastern Affairs, Number Four: St. Antony's Papers Number 17,* ed. Albert Hourani (London: Oxford University Press, 1965), pp. 109-39.
6. Evelyn Baring, Lord Cromer, *Modem Egypt* (New York : MacMillan Co., 1908), 2: 146-67. মিশরে ক্রোমারের নীতির বিপরীতমুখী ব্রিটিশ নীতির জন্যে দ্রষ্টব্য: Wilfrid Scawen Blunt, Secret *History of the English Occupation of Egypt: Being a personal Narrative of Events* (New York: Alfred A. Knopf, 1922). ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মিশরীয়দের প্রতিবাদের মূল্যবান আলোচনার জন্য: Mounah A. Khouri, *Poetry and the Making of Modern Egypt,* 1882-1 922 (Leiden: E.J. Brill, 1971).

7. Cromer, *Modem Egypt,* 2: 164.
8. Cited in John Marlowe, *Cromer in Egypt* (London: Elek Books, 1970), p. 271.
9. Harry Magdoff, "Colonialism (1763-c. 1970)," *Encyclopaedia Britannica,* 15th ed. (1974), pp. 893-4. দ্রষ্টব্য D. K. Fieldhouse, *The Colonial Empires: A Comparative Survey from the Eighteenth Century* (New york: Delacorte Press, 1967), p. 178.
10. Afaf Lutfi al-Sayyid, *Egypt and Cromer: A Study in Anglo-Egyptian Relations* (New York: Frederick A. Praeger. 1969), p. 3. এই উদ্ধৃতি
11. দ্রষ্টব্যঃ lan Hacking, *The Emergence of Probability: A Philosophical Study of Early Ideas About Probability, Induction and Statistical Inference* (London: Cambridge University Press, 1975), p. 17.
1 2. V. G. Kieman, *The Lords of Human Kind: Black Man, Yellow Man, and White Man* in *an Age of Empire* (Boston: Little, Brown & Co., 1969), p. 55.
13. Edgar Quinet, *Le Genie des religions, in Oeuvres completes* (Paris: Paguerre, 1857), pp. 55-74.
14. Cromer, *Political and Literary Essays,* p. 35.
15. দ্রষ্টব্যঃ Jonah Raskin, *The Mythology of Imperialism* (New York: Random House, 1971), p. 40.
16. Henry A. Kissinger, *American Foreign Policy* (New York: W. W. Norton &' Co., 1974), pp. 48-9.
17. Harold W. Glidden, "The Arab World," *American Journal of Psychiatry 128, no. 8* (February 1972) : 984-8.
18. R. W. Southem, *Western Views of Islam in the Middle Ages* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962), p. 72. এবং দ্রষ্টব্য, Francis Dvomik, *Tlte Ecumenical Councils* (New York: Hawthom Books, 1961), pp. 65-6: "বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো এগারো নম্বর আইনটি, যাতে প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হিব্রু, গ্রীক, আরবি ও ক্যালডিয়ান শিক্ষা দেয়ার জন্যে একটি করে চেয়ার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়। পরামর্শদাতা হলেন রেমন্ড লুল, যিনি মনে করতেন আরবদেরকে খ্রিস্টান বানানোর সর্বোত্তম উপায় হলো আরবি শিক্ষা করা। শিক্ষকদের স্বল্পতার কারণে নির্দেশটি যদিও প্রায় অকার্যকরই থেকে যায়, তবু এ আইনের অনুমোদন থেকে আন্দাজ করা যায় পশ্চিমে তখন মিশনারি মনোভাব কেমন প্রবল হয়ে উঠেছিলো। এরই মধ্যে মোঙ্গলদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন গ্রেগরি এবং ফ্রান্সিসকান মিশনারিগণ, পৌছে গিয়েছিলেন এশিয়ার গভীরে। যদিও তাদের আশা পূর্ণ হয়নি, তবু মিশনারী উদ্দীপনা তখন থেকে বাড়তেই থাকে।" আরো তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Johann W. Fuck, *Die Arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts* (Leipzig: Otto Harassowitz, 1955).

19. Raymond Schwab, *La Renaissance orientate* (Paris: Payot, 1950). এবং দেখুন V.V Barthold, *La Decouverte de I'Asie: Histoire de iorientalisme en Europe et en Russie,* trans. B. Nikitine (Paris: Payot, 1947), এবং Theodor Benfey, *Geschirhte der Spachwissenschafiund Orientalischen Philologie in Deutschland* (Munich : Gottafschen, 1869). জ্ঞানপ্রদ বিপরীত মতের জন্য দ্রষ্টব্য, James T. Monroe, *Islam and the Arabs in Spanish Scholarship* (Leiden: E. J. Brill, 1970).

20. Victor Hugo, *Oeuvres poetiques,* ed. Pierre Albouy (Paris: Gallimard, 1964), 1:580.

21. Jules Mohl, *Vingt-sept Ans d'histoire des etudes orientates: Rapports fails a la Societe asiatique de Paris de 1840 a 1867,* 2 vols. (Paris: Reinwald, 1879-80).

22. Gustave Dugat, *Histoire des orientalistes de l'Europe du XII au XIX siecle, 2* vols. (Paris: Adrien Maisonneuve, 1868-70).

23. দেখুন Rene Gerard, *L'Orient et lapensee romantique allemande* (Paris: Didier, 1963), p. 112.

24. Kiernan, *Lords of Human Kind,* p. 131.

25. University Grants Committee, *Report of the Sub-Committee on Oriental, Slavonic, East European and African Studies* (London: Her Majesty's Stationery Office, 1961).

26. H. A. R. Gibb, *Area Studies Reconsidered* (London: School of Oriental and African Studies, 1964).

27. দেখুন Claude Levi-Strauss, *The Savage Mind* (Chicago: University of Chicago Press, 1967), chaps. 1-7.

28. Gaston Bachelard, *The Poetics of Space,* trans. Maria Jolas (New York: Orion Press, 1964).

29. Southern, *Western Views of Islam,* p. 14.

30. Aeschylus, *The Persians,* trans. Anthony J. Podleck (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1970), pp. 73-4.

31. Euripides, *The Bacchae,* trans. Geoffrey S. Kirk (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1970), p. 3. ইউরোপ-প্রাচ্য কেন্দ্রিক ভিন্নতা বিষয়ক আরো আলোচনার জন্য দেখুন : Santo Mazzarino, *Fra oriente e occidente: Ricerche di storia greca arcaica* (Florence: La Nuova Italia, 1947), এবং Denys Hay, *Europe: Tlie Emergence of an Idea* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968).

32. Eripides, *Bacchae,* p. 52.

33. Rene Grousset, *L'Empire du Levant: Histoire de la question d'Orient* (Paris: Payot, 1946). '

34. Edward Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (Boston: Little, Brown & Co., 1855), 6 : 399.
35. Norman Daniel, *The Arabs and Medieval Europe* (London: Longmans, Green & Co., 1975), p. 56.
36. Samuel C. Chew, *The Crescent and the Rose: Islam and England During' the Renaissance* (New York: Oxford University Press, 1937), p. 103.
37. Norman Daniel, *Islam and the West: The Making of an Image* (Edinburgh : University Press, I960), p. 33. এবং দেখুন : James Kritzeck, *Peter the Venerable and Islam* (Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1964).
38. Daniel, *Islam and the West,* p. 252.
39. পূর্বোক্ত pp. 259-60.
40. উদাহরণের জন্য দেখুন William Wistar Comfort, "The Literary Role of the Saracens in the French Epic," *PMLA 55* (1940): 628-59.
41. Southern, *Western Views of Islam,* pp. 91-2, 108-9.
42. Daniel, *Islam and the West, pp. 246,* 96, and passim.
43. পূর্বোক্ত p. 84.
44. Duncan Black Macdonald, "Whither Islam?" *Muslim World* 23 (January 1933): 2.
45. P. M. Holt, Introduction to The *Cambridge History of Islam,* ed. P. M. Holt, Anne K. S. Lambton, and Bernard Lewis (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), p. xvi.
46. Antoine Galland, prefatory "Discours" to Barthelemy d'Herbelot, *Bibliotheque orientate, ou Dictionnaire universe! contenant tout ce aui fait connaitre les peuples de I'Orient* (The Hague: Neaulme & van Daalen, 1777), 1 : vii. গ্যালান্ডের বক্তব্য হলো marvels of the East-এর মত কিংবদন্তী বা পুরাণ কথা নয়, প্রকৃত জ্ঞান উপস্থাপন করেছেন ডি হারবেলট। দ্রষ্টব্য: R. Wettkower, "Marvels of the East: A Study in the History of Monsters," *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 5 (1942): 159-97.
47. Galland, prefatory "Discours" to d'Herbelot, *Bibliotheque orientale,* pp. xvi, xxxiii. ডি হারবেলটের পূর্বে প্রাচ্য বিষয়ক জ্ঞান চর্চার পরিচয় নেয়ার জন্য দেখুন V. J. Parry, "Renaissance Historical Literature in Relation to the New and Middle East (with Special Reference to Paolo Giovio)," in *Historians of the Middle East,* ed. Bernard Lewis and P. M. Holt (London : Oxford University Press, 1962), pp. 277-89.

48. Barthold, *La Decouverte de l'Asie,* pp. 137-8.
49. D'Herbelot, *Bibliotheque orientale,* 2: 648.
50. এবং দ্রষ্টব্য, Montgomery Watt, "Muhammad in the Eyes of the West," *Boston University Journal 22,* no. 3 (Fall 1974) : 61-9.
51. Isaiah Berlin, *Historical Inevitability* (London: Oxford University Press, 1955), pp. 13-14.
52. Henri Pirenne, *Mohammed and charlemagne,* trans. Bernard Miall (New York: W. W. Norton & Co., 1939), pp. 234,283.
53. Henri Baudet, *Paradise on Earth: Some Thoughts on European Images of Non-European Man,* trans. Elizabeth Wentholt (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1965), p. xiii-এ উদ্ধৃত
54. Gibbon, *Decline and Fall of the Roman Empire,* 6: 289.
55. Baudet, *Paradise on Earth,* p. 4.
56. দ্রষ্টব্য Fieldhouse, *Colonial Empires, pp.* 138-61.
57. Schwab, *La Renaissance orientale,* p. 30.
58. A. J. Arberry, *Oriental Essays: Portraits of Seven Scholars* (New York: Macmillan Co., 1960), pp. 30, 31.
59. Raymond Schwab, *Vie d'Anquetil-Duperron suivie des Usages civils et religieux des Perses par Anquetil-Duperron* (Paris : Ernest Leroux, 1934), pp. 10, 96, 4, 6.
60. Arberry, *Oriental Essays,* pp. 62-6.
61. Frederick Eden Pargiter, ed., *Centenary Volume of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1823-1923* (London: Royal Asiatic Society, 1923), p. viii.
62. Quinet, *Le Genie des religions,* p. 47.
63. Jean Thiry, *Bonaparte en Egypte decembre 1797-98 aout* 1799 (Paris: Berger-Levrault, 1973), p. 9.
64. Constantin-Francois Volney, *Voyage en Egypte el en Syrie* (Paris: Bossange, 1821), 2: 241 and passim.
65. Napoleon, *Campagnes d'Egypte et de Syrie,* 1798-1799: *Memoire spour servir a l'histoire de Napoleon* (Paris: Comou, 1843), 1 : 211.
66. Thiry, *Bonaparte en Egypte,* p. 126. এবং দ্রষ্টব্য Ibrahim Abu-Lughod, *Arab Rediscovery of Europe: A Study in Cultural Encounters* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963), pp. 12-20.
67. Abu-Lughod, *Arab Rediscovery of Europe,* p. 22.
68. উদ্ধৃত Arthur Helps, *The Spanish Conquest of America* (London, 1900), p. 196, by Stephen J. Greenblatt, "Learning to Curse: Aspects

of Linguistic Colonialism in the Sixteenth Century," in *First images of America.' The Impact of the New World on the Old,* ed. Fredi Chiapelli (Berkeley: University of California Press, 1976), p. 573.

69. Thiry, *Bonaparte en Egypte,* p. 200. নেপোলিয়ান রক্ষণশীল ছিলেন না। শোনা যায় ভলতেয়ারের 'মাহোমেত' বিষয়ে গ্যোতের সাথে এক আলোচনায় নেপোলিয়ান ইসলামকে সমর্থন করেন। দেখুন : Christian Cherfils, *Bonaparte et I 'Islam d'apres les documents francais arabes* (Paris: A. Pedone, 1914), p. 249 and passim.

70. Thiry, *Bonaparte en Egypte,* p. 434.

71. Hugo, *Les Orientates,* in *Oeuvres poetiques,* 1 : 684.

72. Henri Deherain, *Silvestre de Sacy, ses contemporains et ses disciples* (Paris: Paul Geuthner, 1938), p. v.

73. *Description de I'Egypte.ou Recueil des observations et des recherches qui out ete faites in Egypte pendant I 'expedition de I 'armee francaise, public par les ordres de sa majeste I'empereur Napoleon le grand,* 23 vols. (Paris: Imprimerie imperiale, 1309-28).

74. Fourier, *Preface historique,* vol. 1 of *Descreption de I' Egypte,* p. 1.

75. পূর্বোক্ত p. iii.

76. পূর্বোক্ত p. xcii.

77. Etienne Geoffrey Saint-Hilaire, *Histoire naturelle des poissons du Nil,* vol. 17 of *Description de VEgypte,* p. 2.

78. M. de Chabrol, *Essai sur les moeurs des liabitants modemes de VEgypte,* vol. 14 of *Description de VEgypte,* p. 376.

79. দ্রষ্টব্য: Baron Larrey, *Notice sur la conformation physique des egyptiens et des differ-entes races qui habitent en Egypte, suivie de quelques reflexions sur I'embaumement destnomies,* vol. 13 of *Description de I' Egvpte.*

80. John Marlowe, *The Making of the Suez Canal* (London: Cresset Press, 1964), p. 31-এ উদ্ধৃত

81. John Pudney, *Suez: De Lesseps Canal* (New York: Frederick A. Praeger, 1969), pp. 141-2- এ উদ্ধৃত.

82. Marlowe, *Making of the Suez Canal,* p. 62.

83. Ferdinand de Lesseps, *Lettres, journal et documents pour servir a I 'histoire du Canal de Suez* (Paris: Didier, 1881), 5: 310. ডি লেসেপস ও সিমিল রদকে অতীন্দ্রিয় চরিত্র করে তোলার নমুনার জন্য দেখুন : Baudet, *Paradise on Earth,* p. 68.

84. Charles Beatty, *De lesseps of Suez: The Man and His Times* (New York: Harper & Brothers, 1956), p. 220-এ উদ্ধৃত.

85. De Lesseps, *Lettres, journal et documents, 5:* 17.

86. পূর্বোক্ত pp. 324-33.
87. Hayden White, *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973), p. 12.
88. Anwar Abdel Malek, "Orientalism in Crisis," *Diogenes* 44 (Winter 1963) : 107-8.
89. Friedrich Schlegel, *Uber die Sprache und Weisheit der Indier: Ein Bietrag zur Bigrundung der Altenumstunde* (Heidelberg: Mohr & Zimmer, 1 808), pp. 44-59; Schlegel, *Philosophic der Geschichte: In achtzehn Vorlesungen gelialten zu Wien im Jahre 1828,* ed. Jean-Jacques Anstett, vol. 9 of *Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe,* ed. Ernest Behler (Munich: Ferdinand Schoningh, 1971), p.. 275.
90. Leon Poliakov, *The Aryan Myth: A History of Racist and Nationalist Ideas in Europe,* trans Edmund Howard (New York: Basic Books, 1974).
91. See Derek Hop wood, *The Russian Presence in Syria and Palestine, 1'843- 1943: Church and Politics in the Near East* (Oxford: Clarendon Press, 1969).
92. A. L. Tibawi, *British Interests in Palestine, 1800-1901* (London: Oxford University Press, 1961), p. 5.
93. Gerard de Nerval, *Oeuvres,* ed. Albert Beguin and Jean Richet (Paris: Gallimard, 1960), 1: 933.
94. Hugo, *Oeuvres poetiques,* 1: 580.
95. Sir Walter Scott, *The Talisman* (1825; reprint ed., London: J. M. Dent, 1914), pp.38-9.
96. দ্রষ্টব্য: Albert Hourani, "Sir Hamilton Gibb, 1895-1971," *Proceedings of the British Academy 58 (1972): 495.*
97. দ্রষ্টব্য: B. R. Jerman, *The Young disraeli* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1960), p. 126. এবং দেখুন, Robert Blake, *Disraeli* (London: Eyre & Spottiswoode, 1966), pp. 59-70.
98. *Flaubert in Egypt: A Sensibility on Tour,* trans. and ed. Francis Steegmuller (Boston: Little, brown & Co., 1973), pp. 44-5. এবং Gustave Flaubert, *Correspondance,* ed. Jean Bruneau (Paris: Gallimard, 1973), 1: 542.
99. Carl H. Beeker, *Das Erbe der Antike im Orient und Okzident* (Leipzig: Quelle and Meyer, 1931)-এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়।
100. দ্রষ্টব্য : Louis Massignon, *La Passion d'al-hosayn-ibn-Mansour al-Hallaj* (Paris: Paul Geuthner, 1922).

101. Abdel Malek, "Orientalism in Crisis," p. 112.

102. H. A. R. Gibb, *Modern Trends in Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1947), p. 7.

103. Gibb, *Area Studies Reconsidered,* pp. 12, 13.

104. Bernard Lewis, "The Return of Islam," *Commentary,* January 1976, pp. 39-49.

105. দ্রষ্টব্য: Daniel Lerner and Harold Lasswell, eds., *The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1951).

106. Morroe Berger, *The Arab World Today* (Garden City, N. Y.: Doubleday & Co., 1962), p. 158.

107. দ্রষ্টব্য Maxime Rodinson, *Islam and Capitalism,* trans. brian Pearce (New York: Pantheon Books, 1973).

108. Ibrahim Abu-Lughod, "Retreat from the Secular Path? Islamic Dilemmas of Arab Politics," *Review of Politics* 28, no. 4 (October 1966) : 475.

প্রাচ্যতাত্ত্বিক কাঠামো ও কাঠামো পুনর্গঠন

1. Gustave Flaubert, *Bouvard et Pecuchet,* vol. 2 of *Oeuvres, ed.* A. Thibaudet and R. Dumesnil (Paris : Gallimard, 1952), p. 985.

2. এ জাতীয় কল্পদৃষ্টি ও দিবাস্বপ্নের চমৎকার বর্ণনার জন্য: Donald G. Charlton, *SecularReligions in France, 1815-1870* (London: Oxford University Press, 1963).

3. M. H. Abrams, *Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature* (New York: W. W. Norton & Co., 1971), p. 66.

4. এ বিষয়ে আলোকদায়ী তথ্যাদির জন্য দেখুন : John P. Nash, "The Connection of Oriental Studies with Commerce, Art, and Literature During the 18th-19th Centuries," *Manchester Egyptian and Oriental Society Journal* 15 (1930): 33-9; এবং Jhon F. Laffey, "Roots of French Imperialism in the Nineteenth Century: The Case of Lyon." *French Historical Studies* 6, no. 1 (Spring 1969) : 78-92, এবং R. Leportier, *L'Orient Porte des Indes* (Paris: Editions France-Empire, 1970). এছাড়া বিস্তৃত তথ্যের জন্যে দেখুন: Henri Omont, *Missions archeologiques francaises en Orient aux XVII et XVIII siecles, 2* vols. (Paris: Imprimerie nationale, 1902), এবং Margaret T. Hodgen, *Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1964), ও Norman

Daniel, *Islam, Europe and Empire* (Edinburgh: University Press, 1966). আরো দুটো অত্যাবশ্যক সংক্ষিপ্ত কাজ হলো: Albert Hourani, "Islam and the Philosophers of History," *Middle Eastern Studies* 3, no. 3 (April 1967) : 206-68, ^^Maxime Rodinson, "The Western Image and Western Studies of Islam," *The Legacy of Islam*, ed. Joseph Schacht and C. E. Bosworth (Oxford: Clarendon Press, 1974), pp. 9-62.

5. P. M. Holt, "The Treatment of Arab History by Prideaux, Ockley, and Sale, "*Historians of the Middle East*, ed. Bernard Lewis and P. M. Holt (London : Oxford University Press, 1962), p. 302. এছাড়া দেখুন: P. M. Holt *The Study of Modern ArabHistory* (London: School of Oriental and African Studies, 1965).

6. ঈসায়াহ্ বার্লিন হার্ডারকে গণমুখী ও বহুত্ববাদী মনে করে। দ্রষ্টব্য: Isaiah Berlin, *Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas* (New York: Viking Press, 1976).

7. এ ধরনের উদ্দেশ্যে ও প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Jean Starobinski, *TheInvention of Liberty, 1700-1789*, trans. Bernard C. Smith (Geneva: Skira, 1964).

8. এ বিষয়ে তেমন গবেষণা হয়নি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কাজ হলো : Martha P. Conant, *The Oriental Tale in England in the Eighteenth Century* (1908; reprint ed., New York: Octagon Books, 1967); Marie E. de Meester, *Oriental Influences in the English Literature of the Nineteenth Century, Anglistische Forschungen*, no. 46 (Heidelberg, 1915); Byron Porter Smith, *Islam in English Literature* (Beirut: American Press, 1939). এবং Jean-Luc Doutrelant, "L'Orient tragique au XVIII[e] siecle," *Revue des Sciences Humaines* 146 (April-June 1972) : 255-82.

9. Michel Foucault, *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences* (New York: Pantheon Books, 1970), pp. 138, 144, Francois Jacob, *The Logic of Life: A History of Heredity*, trans. Betty E. Spillmann (New York: Pantheon Books, 1973), p. 50 and passim, এবং Georges Canguilhem, *La Connaissance de la vie* (Paris : Gustave-Joseph Vrin, 1969), pp. 44-63.

10. দ্রষ্টব্য: John G. Burke, "The Wild Man's Pedigree: Scientific Method and Racial Anthropology,", *The Wild Man Within: An image in Western Thought from the Renaissance to Romanticism*, ed. Edward Dudley and Maximillian E. Novak (Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 1972), pp. 262-8. এবং Jean Biou, "Lumieres et anthropophagie," *Revue das Sciences Humaines* 146 (April- June 1972) : 223-34.

11. Henri Deherain, *Silvestre de Sacy: Ses Contemporains et ses disciples* (Paris: Paul Geuthner, 1938), p. 111.

12. দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত pp. i-xxxiii.

13. Due de Broglie, "Eloge de Silvestre de Sacy,", Sacy, *Melanges de litterature orien-ale* (Paris: E. Ducrocq, 1833), p. xii.

14. Bon Joseph Dacier, *Tableau historique de I'erudition francaise, ou Rapport sur les progres de l'histoire et de la litterature ancienne depuis 1789* (Paris: Imprimerie imperiale, 1810), pp. 23, 35, 31.

15. Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan (New York: Pantheon Books, 1977), pp. 193-4.

16. Broglie, "Eloge de Silvestre de Sacy,' p. 107.

17. Sacy, *Melanges de litterature orientale*, pp. 107, 110, 111-12.

18. Silvestre de Sacy, *Chrestomathie arabe, ou Extraits de divers ecrivains arabes, tant en prose qu 'en vers, avec une traductionfrancaise et des notes, a I 'usage des cleves de I 'Ecole wale et speciale des langues orientales vivantes* (vol. 1, 1826; reprint ed., Osnabruck : Biblio Verlag, 1973), p. viii.

19. "Supplementarity," "supply," ও "supplication," সম্পর্কিত ধারণার জন্যে দেখুন: Jacques Derrida, *De la grammatologie* (Paris: Editions de Minuit, 1967), p. 203 and passim.

20. সেসির প্রভাব ও ছাত্রদের তালিকার জন্যে দেখুন: Johann W. Fuck, *Die Arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts* (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1955), pp. 156-7.

21. 'আর্কাইভ'-এর ব্যাখ্যার জন্যে দ্রষ্টব্য Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge and the Discourse on language*, trans. A. M. Sheridan Smith and Rupert Sawyer (New York: Pantheon Books, 1972), pp. 79-131. রেনানের বয়ঃকনিষ্ঠ ও তীক্ষ্ণধী সমকালীন পণ্ডিত গাবরিয়েল মনদ মন্তব্য করেছেন যে, রেনান ভাষাতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব বা বাইবেল-ব্যাখ্যায় বিপ্লবী বলে বিবেচিত হতে পারেন না। এ সত্ত্বেও তার সময়ে তিনি সবচেয়ে বিস্তৃত ও যথাযথ জ্ঞানার্জনের কারণে এমন খ্যাতি পান *(Return, Taine, Michelet* [Paris: Calmann-Levy, 1894], pp. 40-1). 4 এছাড়া দেখুন : Jean-Louis Dumas, "La Philosophic de I'histoire de Renan," *Revue de Meta-physique el de Morale* 77, no. 1 (January-March 1972): 100-28.

22. Honore de Balzac, *Louis lambert* (Paris: Calmann-Levy, n.d.), p. 4.

23. ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে নিটশের মন্তব্য তার রচনার সর্বত্রই পাওয়া যায়। বিশেষ করে দেখুন তার নোট বইয়ের অংশ বিশেষ "Wir Philologen", period January- July 1875, translated by William Arrowsmith as "notes for 'We Philologists," *Arion*, N. S. (1 974): 279-380; এবং *The Will to Power*, trans. Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale (New York: Vintage Books, 1968).

24. Ernest Renan, *L'Avenir de la science: Pensees de 1848,* 4th ed. (Paris: Calmann-Levy, 1890), pp. 141, 142-5, 146, 148, 149.
25. পূর্বোক্ত, p. xiv and passim.
26. *Histoire generate et sysleme compare des langues semitiques,* in *Oeuvres completes,* ed. Henriette Psichari (Paris: Calmann-Levy, 1947-61), 8: 143-63, -এর বুক-১-এ রয়েছে সেমেটীয়দের বিরুদ্ধে পরিচালিত বর্ণবাদী অহংবোধের চমৎকার বিস্তৃত 'বর্ণনা'। L'Avenir de la science এবং বিশেষ করে রেনানের নোট থেকে শুরু করে অন্যান্য রচনায় যেমন, এ গ্রন্থেরও এখানে সেখানে তার বর্ণবাদী ধারণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে।
27. Ernest Renan, *Correspondance;* 1846-1871 (Paris: Calmann-Levy, 1926), 1: 7-12.
28. Ernest Renan, *Souvenirs d'enfance et dejeunesse, in Oeuvres completes,* 2: 892. *জ্যাঁ পমিয়েরের দুটো কাজ:* Renan, *d'apres des documents inedits* (Paris; Perrin, 1923), pp. 48-68, এবং La *Jeunesse dericake d'Ernest Renan* (Paris: Les Belles Lettres, 1933) -এ ধর্ম ও ভাষাতত্ত্বের পারস্পর্যে রেনানের চিন্তার খুঁটিনাটি আলোচনা আছে; এ সম্পর্কে আরেকটি সাম্প্রতিক কাজ J. Chaix-Ruy, £r/iei7 fena;i (Paris: Emmanuel Vitte, 1956), pp. 89-111. রেনানের ধর্মচিন্তা নিয়ে রচিত কিছু রচনা ও ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ যেমন: Pierre Lasserre, *La jeunesse d'Ernest Renan: Histoire de la crise religieuse au XlXe siecle,* 3 vols. (Paris: Carnier Freres, 1925). In vol. 2, pp. 50-166 and 265-98.
29. Enest Renan, "Des services rendus aux sciences historiques par la philologie," in *Oeuvres completes* 8: 1228.
30. Renan, *Souvenirs,* p. 892.
31. Foucault, *The Order of Things,* pp. 290-300. *এতে ভাষার উৎসের সাথে এডেনের সম্পর্ক, মহাপ্লাবন, বাবেলের টাওয়ার ইত্যাদি ঘটনাকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। ভাষার উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্বের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রচনা* : Arno Borst, Dtr *Turmbau von babel: Geschichte der Meinungen uber Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Volker,* 6 vols. (Stuttgart: Anton Hiersimann, 1957-63).
32. Raymond Schwab, *La Renaissance orientate* (Paris: Payot, 1950), p. 69-এ উদ্ধৃত প্রাচ্যবিষয়ক আবিষ্কারসমূহের সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্যের সাথে অতি দ্রুত একাত্ম হয়ে পড়ার বিপদ সম্পর্কে জানার জন্যে দেখুন : Abel Remusat, *Melanges postumes d'histoire et littterature orientates* (Paris: imprimerie royale, 1843), p. 226 and passim.
33. Samuel Taylor Coleridge, *Biographia Literaria,* chap. 16, in *Selected Poetry and Prose of Coleridge,* ed. Donald A. Stauffer (New York: Randon House, 1951), pp. 276-7.

34. Benjamin Constant, *Oeuvres*, ed. Alfred Roulin (Paris: Gallimard, 1957), p. 78.

35. Abrams, *Natural Supernaturalism*, p. 29.

36. Renan, *De l 'origine du langage*, in *Oeuvres completes*, 8: 1 22.

37. Renan, ODe la part des peuples semitiques dans l'histoire de la civilisation," *Oeuvres completes*, *2*: 320.

38. পূর্বোক্ত p. 333.

39. Renan, "Trois Professeurs au College de France: Etienne Quatremere," in *Oeuvres completes*, 1: 129.আকর্ষণীয় সব বিষয় অধ্যয়নের জন্যে খুঁজে বের করে অতঃপর সেগুলোকে আকর্ষণহীন করে তোলার ব্যাপারে কোয়ার্টার মেয়ার যে এক জিনিয়াস–রেনানের তেমন মন্তব্য ভুল ছিলো না। দেখুন তার প্রবন্ধ, "Le Gout des livres chez les orientaux" 4?l "Des sciences chez les arabes," *Melanges d'histoire et de philolgie orientates* (Paris: E. Ducrocq, 1861), pp. 1-57.

40. Honore de Balzac, *La peau de chagrin*, vol. 9 *(Etudes philosophiques* I) of La *Comedie humaine*, ed. Marcel Bouteron (Paris: Gallimard, 1950), p. 39; Renan, *Histoire generate des langues semitiques*, p. 134.

41. যেমন দেখুন, *De l'origine du langage*, p. 102, এবং *Histoire generate*, p. 180.

42. Renan, *L'Avenirde la science*, p. 23. সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি এরকম: "Pour moi, je ne con-nais qu'un seol resultat a la science, c'est de resoudre l'enigme, c'est de dire delin-itivement a Phommi le mol des choses, c'est de l'expliquer a lui-meme, c'est de lui donner, au nom de la seule autorite legitime qui est la nature humaine toute entiere, le symbole que les religions lui donnaient tout fait et qu'ils ne peut plus accepter."

43. দ্রষ্টব্য: Madeleine V. David, *Le Debat xur les ecritures et l'hieroglyp/ie auxXVII^e et XVIII^e siecles et l' application de la notion de dechiffiement awe ecritures mortes* (Paris: S. E. V. P. *E*. N., 1965), p. 130.

44. Schwab -এর *La Renaissance orientate* -এ রেনানকে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র, Foucault's *Tlie Order of Things* - এ রেনানের নামগন্ধও নেই। এবং Holger Pederson -iiW *Tlie Discovery of Language.- Linguistic Science in the Nineteenth Century*, trans. John Webster Spargo (1931; reprint ed., Bloomington: Indiana University Press, 1972)-এ কেবল অবজ্ঞাক্রমে রেনানের নাম নেয়া হয়েছে। Max Muller, *Lectures on the Science of Language* (1861-64; reprint ed., New York: Scribner, Armstrong & Co., 1875) এবং Gustave Dugat, *Histoire des orientalistes de l' Europe du XII^e au XIX^s siecle*. *2* vols. (Paris:

Adrien Maisonneuve, 1868-70)-এ রেনানের নামও নেননি। James Darmesteter -&S *Essais Orientaux* (Paris: A, Levy, 1883) রেনানকে উৎসর্গীকৃত, কিন্তু তার অবদান সম্পর্কে কোনো কথা নেই। জুল্‌স মোহলের এনসাইক্লোপিডিয়া কাম লগ বুক *Vingtsept ans d'histoire des etudes orientates: Rapports fails a la Societe asiatique de Paris de 1840 a 1867,* 2 vols. (Paris: Reinwald, 1879-80)-এ রেনানের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে অন্ততঃ আধা ডজন সংক্ষিপ্ত নোটিশ পাওয়া যায়।

45. বর্ণবিভাজন ও বর্ণবাদ সম্পর্কিত রচনাসমূহে রেনান গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল রচনায় তার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে : Ernest Seilliere, ia *Philosophie de I'imperialisme,* 4 vols. (Paris: Plon, 1903-8); Theophike Simar, *Etude critique sur la formation de la doctrine des races au XVIlf siecle et son expansion au XIXᵉ siecle* (Brussels: Hayez, 1922); Erich Voegelin, *Rasse und Stoat* (Tubingen: J. C. B. Mohr, 1933)। এছাড়াও অবশ্য উল্লেখ্য তার *Die Rassenidee in der Geistesgeschichte van Ray bis Caus* (Berlkin: Junker und Dunnhaupt, 1933); এতে যদিও রেনানের যুগ সম্পর্কে আলোচনা নেই। তবে *Rasse und staat* সম্পর্কে আলোচনা আছে; Jacques Barzun, race *: a Study in Modem Superstition* (New York: Harcourt, Brace & Co., 1937)।

46. *La Renaissance orientale-* এ শ্বোয়াব যাদুঘর, জীববিদ্যা ও ভাষাতত্ত্বের সমান্তরালবাদ, এবং কুভিয়ের, বালজাক ও অন্যদের সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন। দেখুন পৃ-৩২৩ ও অন্যত্র। গ্রন্থাগার এবং উনিশ শতকীয় সংস্কৃতিতে তার গুরুত্বের জন্যে দ্রষ্টব্য : Foucault, "La Bibliotheque fantastique," *Preface to Flaubert's La Tentation de Saint Antoin* (Paris: Galimfrd, 1971), p. 7-33। এ বিষয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে আমি অধ্যাপক ইউজিনো ডোনাটোর নিকট ঋনী। দেখুন তার "A mere Labyrinth of letters : Flaubert and the Quest for Fiction," *Modern Language Notes* 89, no. 6 (December 1974): 885-910.

47. Renan, *Histoire generate,* pp. 145-6.

48. দ্রষ্টব্য: *L'Avenir de la science,* p. 508 and passim.

49. Renan, *Histoire generate,* p. 214.

50. পূর্বোক্ত, p. 527. এ ধারণার মূলে আছে শ্লেগেল কর্তৃক জৈব ও যৌগিক-এ দু'রকম ভাষা শ্রেণির বিভাজন। দ্বিতীয় শ্রেণির উদাহরণ হলো সেমেটিক ভাষা। রেনানের পর থেকে সকল প্রাচ্যতাত্ত্বিকের মতো হামবল্টও এমন বিভাজন টেনেছেন।

51. পূর্বোক্ত, pp. 531-2.

52. পূর্বোক্ত, p. 515 and passim.

53. দ্রষ্টব্য: Jean Seznec, *Nouvelles Etudes sur "La Tentation de Saint Antoine"* (London: Warburg Institute, 1949), p. 80.

54. দ্রষ্টব্য: Etienne geoffroy Saint-Hilaire, *Philosophic anatomique: Des monstruousites humane* (Paris, publish by the Author, 1822). ইসিডর জিওফ্রে সেইন্ট হিলেইর-এর রচনার পুরো শিরোনাম হলো : *Histoire generate et partiruliere des anomalies de I 'organisation rhez I 'homme et les animaux, ouvrage comprenante des recherches sur les caracteres, la classification, l'influence physioloique et patliologique, les rapports generaux, les lois et les causes des inonstruosites, des varietes et vices de conformation, ou traits de teratologie,* 3 vols. (Paris: J. B. Bailliere, 1832-36). গ্যোতের জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণার জন্যে দ্রষ্টব্য : Erich Heller, *The Disinherited Mind* (New York: Meridian Books, 1959), pp. 3-34. Jacob, *The Logic of Life,* and Canguilhem, *La Connaissance de la vie,* pp. 174-84-এ পাওয়া যাবে জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞানের উন্নয়নে সেইন্ট-হিলেইরের অবদানের আকর্ষণীয় বর্ণনা।

55. E. Saint-Hilaire, *Philosophic anatomique,* pp. xxii-xxiii.

56. Renan, *Histoire generale,* p. 156.

57. Renan, *Oeuvres completes,* 1: 621-2 and passim. রেনানের পারিবারিক জীবনের সূক্ষ্ম বর্ণনার জন্যে দ্রষ্টব্য : H. W. Wardman, *Ernest Renan: A Critical Biography* (London: Athlone Press, 1964), p. 66 and passim; অন্য কেউ হয়তো রেনানের পুরুষকেন্দ্রিক জগৎ ও তার পারিবারিক জীবনের মধ্যে সমরূপতা খুঁজবেন না। কিন্তু আমার কাছে ওয়ার্ডম্যানের বিবরণ অর্থপূর্ণ মনে হয়।

58. Renan, "Des services rendus au sciences historiques par la philologie," in *Oeuvres completes,* 8: 1228, 1232.

59. Ernst Cassirer, *The Problem of Knowledge: Philosophy, Science, and History since Hegel,* trans. Willian H. Woglom and Charles W. Hendel (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1950), p. 307.

60. Renan, "Reponse au discours de reception de M. de Lesseps (23 avril 1885)," *Oeuvres completes,* 1: 817. তবে রেনানের সমকালীন হওয়ার সবচেয়ে ভালো চিহ্ন রয়েছে সেইন্ট বোভের ১৮৬২ সালের জুনে প্রকাশিত নিবন্ধে, রেনানের উল্লেখের মধ্যে। আরো দেখুন : Donald G. Charlton, *Positivist Thought in France During the Second Empire* (Oxford: Clarendon Press, 1959) এবং তার *Secular Religions in France.* এছাড়া দেখুন Richard M. Chadbourne, "Renan and Sainte-Beuve," *Romanic Review* 44, no. 2 (April 1953): 126-35.

61. Renan, *Oeuvres completes,* 8: 156.

62. জুন ২৬, ১৮৫৬ সালে গোবিনো'র নিকট লেখা চিঠি, *Oeuvres completes.* 10: 203-4. গোবিনোর দ্রষ্টব্যের জন্যে দ্রষ্টব্য তার লেখা *inegalite des races humaines* (1853-55).

63. আলবার্ট হুরানির চমৎকার নিবন্ধ "Islam and the Philosophers of History," p. 222-এ উদ্ধৃত।

64. Caussin de Perceval, *Essai sur I'histoirt des Arabes avant ITslamisme, pendant I'e-poque de Mahomet etjusqu 'a la reduction de toutes les tribus sous la hi musulmane* (1847-48; reprint ed., Graz, Austria: Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1967), 3: 332-9.

65. Thomas Carlyle, *On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History* (1841; reprint ed., New York: Longmans, Green & Co., 1 906), p. 63.

66. ভারত সম্পর্কে মেকলের অভিজ্ঞতার জন্যে দ্রষ্টব্য : G. Otto Trevelyan, 77!« *Life and Letters of Lord Macaulay (New* York: Harper & Brothers, 1875), I : 344-71. মেকলের 'মিনিট'-এর মূল টেক্সটের জন্যে : Philip D. Curtin, ed., *Imperialism: The Docummentary History of Western Civilization* (New York: Walker & Co., 1971), pp. 178-91 . ব্রিটিশ প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে মেকলের মতামতের ফলাফল উপলব্ধির জন্যে দেখুন : A. J. Arberry, *British Orientalists* (London: William Collins, 1943).

67. Jhon Henry Newman, *The Turks in Their Relation to Europe,* vol. 1 of *Historical Sketches* (1853; reprint ed., London: Longmans, Green & Co., 1920).

68. দেখুন Marguerite-Louise Ancelot, *Salons de Paris, foyers eteints* (Paris: Jutes Tardieu, 1858).

69. Karl Marx, *Surveys from Exile,* ed. David Fembach (London: Pelican Books, 1973), pp. 306-7.

70. পূর্বোক্ত, p. 320.

71. Edward William Lane, Author's Preface to *An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians* (1836; reprint ed., London: J. M. Dent, 1936), pp. xx, xxi.

72. পূর্বোক্ত, p. 1.

73. পূর্বোক্ত, pp. 160-1. লেইনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য জীবনীগ্রন্থটি রচনা করেন তার ভাগ্নে স্ট্যানলি লেইনপুল। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। লেইনের প্রতি সদয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এ. জে. আরবেরির এ রচনায় : *Oriental Essays: Portraits of Seven Scholars* (New York: Macmillan Co., 1960), pp. 87-121.

74. Frederick Eden Pargiter, ed., *Centenary. Volume of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1823-1923* (London: Royal Asiatic Society, 1923); p. x.

75. *Societe asiatique: Livre du centenaire, 1822-1922* (Paris: Paul Geuthner, 1922), pp. 5-6.

76. Johann Wolfgang Von Goethe, *Westostlicher Diwan* (1819; reprint ed., Munich: Wilhelm Golmann, 1958), pp. 8-9, 12. ওখানে সেসির সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে।

77. Victor Hugo, *Les Orientates,* in *Oeuvres poetiaues,* ed. Pierre Albouy (Paris: Gallimard, 1964), 1: 616-18.

78. Francois-Rene de Chateaubriand, *Oeuvres romanesques et voyages,* ed. Maurice Regard (Paris: Gallimard, 1969), 2: 702.

79. See Henri Bordeaux, *Voyageurs d'Orient: Des pelerins awe meharisles de Palmyre* (Paris: Plon, 1926). Victor Turner, *Dramas, Fields, and Metaplwrs: Symbolic Action in Human Society* (Ithaca, N. Y: Cornell University Press, 1974), pp. 166-230- এ তীর্থযাত্রা ও তীর্থযাত্রী সম্পর্কে অভিব্যক্ত তাত্ত্বিক ধারণা আমার নিকট বেশ কার্যোপযোগী মনে হয়।

80. Hassan al-Nouty, *Le Proche-Orient dans la litlerature francaise de Nerval a Barres* (Paris: Nizet, 1958), pp. 47-8, 277, 272.

81. Chateaubriand, *Oeuvres, 2:* 702 «‹‹? CTlB 1684, 769-70, 769, 701, 808, 908.

82. পূর্বোক্ত, pp. 1011, 979, 990, 1052.

83. পূর্বোক্ত, p. 1069.

84. পূর্বোক্ত, p. 1031.

85. পূর্বোক্ত, p. 999.

86. পূর্বোক্ত, pp. 1126-27, 1049.

87. পূর্বোক্ত, p. 1137.

88. পূর্বোক্ত, pp. 1148, 1214.

89. Alphonse de Lamartine, *Voyage en Orient* (1835; reprint ed., Paris: Hachette, 1887), 1: 10,48-9, 179, 178, 148, 189, 118,245-6,251.

90. পূর্বোক্ত, 1: 263; 2: 74-5; 1: 475.

91. পূর্বোক্ত, 2: 92-3.

92. পূর্বোক্ত, *2:* 526-7, 533. প্রাচ্য বিষয়ক ফরাসি লেখকদের সম্পর্কে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো : Jean-Marie Carre, Voygeurset et *ecrivains francais en Egypte, 2* vols. (Cairo: Institut francais d'archeologie orientale, 1932), এবং Moenis Taha-Hussein, *Le Romanticisme francais et l'Islam* (Beirut: Dar-el-Maeref, 1962).

93. Gerard de Nerval, *Les Filles dufeu,* in *Oeuvres,* ed. Albert Beguin and Jean Richet (Paris: Gallimard, 1960), 1: 297-8.

94. Mario Praz, *The Romantic Agony,* trans. Angus Davison (Cleveland, Ohio: World Publishing Co., 1967).

95. Jean Bruneau, *Le "Conte Orientale" de Flaubert* (Paris: Denoel, 1973), p. 79.

96. পূর্বোক্তগ্রন্থে ব্রুনো এগুলো আলোচনায় এনেছেন।

97. Nerval, *Voyage en Orient*, in *Oeuvres, 2:* 68, 194, 96, 342.

98. পূর্বোক্ত, p. 181.

99. Michel Butor, "Travel and Writing," trans. John Powers and K. Lisker, *Mosaic* 8, no. 1 (Fall 1974): 13.

100. Nerval, *Voyage en Orient*, p. 628.

101. পূর্বোক্ত, pp. 706, 718.

102. *Flaubert in Egypt-' A Sensibility on Tour*, trans. and ed. Francis Steegmuller (Boston: Little, Brown & Co., 1973), p. 200. প্রাচ্য বিষয়ে ফ্লবেয়ারের লেখাজোখা পাওয়া যায় এমন কয়েকটি রাচনাও আমি পাঠ করেছি। ওগুলো হলো : *Oeuvres completes de Gustave Flaubert* (Paris: Club de 1'Honnete homme, 1973), vols. 10, 11; *Les Lettres d'Egypte, de Gustave Flaubert*, ed. A. Youssef Naaman (Paris: Nizet, 1965); Flaubert, *Correspondance*, ed. Jean Bruneau (Paris, Gallimard, 1973), 1: 518 ff.

103. Harry Levin, *The Gates of Horn: A Study of Five French Realists* (New York: Oxford University Press, 1963), p. 285.

104. *Flaubert in Egypt*, pp. 173, 75.

105. Levin, *Gates of Horn*, p. 271.

106. Flaubert, *Catalogue des opinions chic*, in *Oeuvres, 2:* 1019.

107. *Flaubert in Egypt*, p. 65.

108. পূর্বোক্ত, pp. 220, 130.

109. Flaubert, *La Tentation de Saint Antoine*, in *Oeuvres*, 1:85.

110. দ্রষ্টব্য: Flaubert, *Salammbo*, in *Oeuvres*, 1: 809 ff. এছাড়াও দেখুন : Maurice Z. Shroder, "On Reading *Salammbo,*" *L'Esprit createur* 10, no. 1 (Spring 1970): 24-35.

111. *Flaubert in Egypt*, pp. 198-9.

112. Foucault, "La Bibliotheque fantastique," in Flaubert, *La Tentation de Saint Antoine*, pp. 7-33.

113. *Flaubert in Egypt*, p. 79.

114. পূর্বোক্ত, pp. 211-2.

115. এ সম্পর্কিত আলোচনার জন্যে দেখুন : Foucault, *Archaeology of Knowledge;* Joseph Ben-David, *The Scientist's Role in Society* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1971). এবং Edward W. Said, "An Ethics of Language," *Diacritics* 4, no. 2 (Summer 1974): 28-37.

116. বিস্তৃত তালিকার জন্যে দেখুন : Richard Bevis, *Bibliotheca Cisorientalia: An Annotated Checklist of Early English Travel Books on the Near and Middle East* (Boston: G. K. Hall & Co., 1973).

117. আমেরিকার পর্যটকদের সম্পর্কে আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Dorothee Metlitski Finkelstein, *Melville's Orienda* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1961), এবং Franklin Walker, *Irreverent Pilgrims: Melville, Browne, and Mark Twain in the Holy Land (Seattle;* University of Washington Press, 1974).

118. Alexander William Kinglake, *Eothen, or Traces of Travel Brought Home from the East,* ed. D. G. Hogarth (1844; reprint ed., London: Henry Frowde, 1906), pp. 25, 68,241,220.

119. *Flaubert in Egypt,* p. 81 .

120. Thomas *3.* Assad, *Three Victorian Travellers: Burton, Blunt and Doughty* (London: Routledge & Kegan Paul, 1964), p. 5.

121. Richard Burton, *Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Madinah and Mecrah,* ed. Isabel Burton (London: Tylston & Edwards, 1893), 1: 9, 108-10.

122. Richard Burton, "Terminal Essay," in *The Book of the Thousand and One Nights* (London: Burton Club, 1886), 10: 63-302.

123. *Burton, Pilgrimage,* 1: 112, 114.

বর্তমান প্রাচ্যতত্ত্ব

1. Friedrich Nietzsche, "On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense," *The Portable Nietzsche,* ed. and trans. Walter Kaufmann (New York: Viking Press, 1 954), pp. 46-7.

2. পশ্চিমে আরব পর্যটকদের একটি হিসেব পাওয়া যায় এ গ্রন্থে Ibrahim Abu-Lughod, *Arab Rediscovery of Europe: A Study in Cultural Encounters* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963), pp. 75-6 and passim.

3. দ্রষ্টব্য: Philip D. Curtin, ed.. *Imperialism: The Documentary History of Western Civilization* (New York: Walker & Co., 1972), pp. 73-105.

4. দ্রষ্টব্য: Johann W. Fuck, "Islam as an Historical Problem in European Historiography since 1800," *Historians of the Middle East,* ed. Bernard Lewis and P. M. Holt (London: Oxford University Press, 1962), p. 307.

5. পূর্বোক্ত, p. 309.

6. দ্রষ্টব্য : Jacques Waardenburg, *L 'Islam dans le miroir de I 'Occident* (The Hague: Mouton & Co., 1963).

7. পূর্বোক্ত, p. 311.

8. P. Masson-Oursel, "La Connaissance scientifique de l'Asie en France depuis 1900 et les varietes de POrientalisme," *Revue Philosophique* 143, nos. 7-9 (July-September 1953): 345.

9. Evelyn Baring, Lord Cromer, *Modern Egypt* (New York: Macmillan Co., 1908), 2: 237-8.

10. Evelyn Baring, Lord Cromer, *Ancient and Modern Imperialism* (London: John Murray, 1910), pp. 118, 120.

11. George Nathaniel Curzon, *Subjects of the Day: Being a Selection of Speeches and Writings* (London: George Alien & Unwin, 1915), pp. 4-5, 10, 28.

12. পূর্বোক্ত pp. 184, 191-2. এ সম্পর্কিত ইতিহাসের জন্যে দেখুন : C. H. Phillips, *The School of Oriental and African Studies, University of London, 1917-1967: An Introduction* (London: Design for Print, 1967).

13. Eric Stokes, *The English Utilitarians and India* (Oxford: Clarendon Press, 1959).

14. Michael Edwardes, *High Noon of Empire: India Under Curzon* (London: Eyre & Spottiswoode, 1965), pp. 38-9-এ উদ্ধৃত।

15. Curzon, *Subjects of the Day,* pp. 155-6.

16. Joseph Conrad, *Heart of Darkness, Youth and Two Other Stories* (Garden City, N.. Y: Doubleday, Page, 1925), p. 52.

17. ভ্যাটেল-এর কাজের সার-আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Curtin, ed., *Imperialism,* pp. 42-5,

18. M. de Caix, *La Syrie* in Gabriel Hanotaux, *Histoire des colonies francaises,* 6 vols. (Paris: Societe de l'histoire nationale, 1929-33), 3: 481-এ উদ্ধৃত।

19. খুটিনাটি বর্ণনার জন্যে দেখুন: Vernon McKay, "Colonialism in the French Geographical Movement," *Geographical Review* 33, no. 2 (April 1943):214-32.

20. Agnes Murphy, *The Ideology of French Imperialism, 1817-1881* (Washington: Catholic University of America Press, 1948), pp. 46, 54, 36, 45.

21. পূর্বোক্ত, pp. 189, 110, 136.

22. Jukka Nevakivi, *Britain, France, and the Arab Middle East,* 1914-1920 (London: Athlone Press, 1969), p. 13.

23. পূর্বোক্ত, p. 24.

24. D. G. Hogarth, *The Penetration of Arabia: A Record of the Development of Western Knowledge Concerning The Arabian Peninsula* (New York: Frederick A. Stokes, 1904). এ বিষয়ের চমৎকার একটি সাম্প্রতিক কাজ : Robin Bidwell, *Travellers in Arabia* (London: Paul Hamlyn, 1976).

25. Edmond Bremond, *Le Hedjaz dans la guerre mondiale* (Paris: Payot, 1931), pp. 242 ff.

26. Le Comte de Cressaty, *Les Interets de la France en Syrie* (Paris: Floury, 1913).

27. Rudyard Kipling, *Verse* (Garden City, N. Y: Doubleday & Co., 1954), p. 280.

28. উনিশ শতকের বিচ্ছিন্নকরণ ও অবরুদ্ধকরণের সংস্কৃতি ফুকোর রচনায় গুরুত্বপূর্ণ; এ বিষয়ে তার অতি সাম্প্রতিক কাজ *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Pantheon Books, 1977), এবং *The History of Sexuality, Volume I: An Introduction* (New York: Pantheon Books, 1978).

29. *The Letters of T. E. Lawrence of Arabia,* ed. David Garnett (1938; reprint ed., London: Spring Books, 1964), p. 244.

30. Gertrude Bell, *The Desert and the Sown* (London: William Heinemann, 1907), p.244.

31. Gertrude Bell, *From Her Personal Papers, 1889-1914,* ed. Elizabeth Burgoyne (London: Ernest Benn, 1958), p. 204.

32. William Butler Yeats, "Byzantium," *The Collected Poems* (New York: Macmillan Co., 1959), p. 244.

33. Stanley Diamond, *In search of the Primitive: A Critique of Civilization* (New Brunswick, N. J.: Transaction Books, 1974), p. 119.

34. দ্রষ্টব্য : Harry Bracken, "Essence, Accident and Race," *Hermathena* 116 (Winter 1973): pp. 81-96.

35. George Eliot, *Middlemarch: A Study of Provincial Life* (1872; reprint ed., Boston: Houghton Mifflin Co., 1956), p. 13.

36. Lionel Trilling, *Matthew Arnold* (1939; reprint ed., New York: Meridian Books 1955), p. 214.

37. দ্রষ্টব্য : Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973), p. 180, note 55.

38. W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia,* ed.

Stanley Cook (1907; reprint ed., Oesterhout, N. B.: Anthropological Publications, 1966), pp. xiii, 241.

39. W. Robertson Smith, *lectures and Essays,* ed. John Sutherland Black and George Chrystal (London: Adam & Charles Black, 1912), pp. 492-3.

40. পূর্বোক্ত, pp. 492, 493, 511, 500, 498-9.

41 . Charles M. Doughty, *Travels in Arabia Deserta,* 2nd ed, 2 vols. (New York: Random House, n.d.), 1: 95. এছাড়া দেখুন রিচার্ড বেভিসের চমৎকার প্রবন্ধ : "Spiritual Geology: C. M. Doughty and the Land of the Arabs", *Victorian Studies* 16 (December 1972),163-81.

42. T. E. Lawrence, *The Seven Pillars of Wisdom: A Triumph* (1926; reprint ed., Garden City, N. Y.: Doubleday, Doran & Co., 1935), p. 28.

43. এ সম্পর্কিত আলোচনা দেখুন : Talal Asad, "Two European Images of Non-European Rule," *Anthropology and the Colonial Encounter,* ed. Talal Asad (London: Ithaca Press, 1975), pp. 103-18.

44. Arendt, *Origins of Totalitarianism,* p. 218.

45. T. E. Lawrence, *Oriental Assembly,* ed. A. W. Lawrence (New York: E. P. Dutton & Co., 1940), p. 95.

46. Stephen Ely Tabachnick, "The Two Veils of T. *E.* Lawrence," *Studies in the Twentieth Century* 16 (Fall 1975): 96-7-এ উদ্ধৃত।

47. Lawrence, *Seven Pillars of Wisdom,* pp. 42-3, 661.

48. পূর্বোক্ত, pp. 549, 550-2.

49. E. M. Forster, *A Passage to India* (1924; reprint ed., New York: Harcourt, Brace & Co., 1952), p. 322.

50. Maurice Barres, *Une Enquete aux pays du Levant* (Paris: Plon, 1 923), 1 : 20; 2: 181, 192, 193, 197.

51. D. G. Hogarth, *The Wandering Scholar* (London: Oxford University Press, 1924). হোগার্থ তার স্টাইল সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন, "প্রথমত: অভিযানকারী, দ্বিতীয়ত: পণ্ডিতের" । (p. 4).

52. H. A. R. Gibb, "Structure of Religious Thought in Islam," *Studies on the Civilization of Islam,* ed. Stanford J. Shaw and William R. Polk (Boston: Beacon Press, 1962), p. 180-উদ্ধৃত।

53. Frederic Lefevre, "Une Heure avec Sylvain Levi," *Memorial Sylvain Levi,* ed. Jacques Bacot (Paris: Paul Hartmann, 1937), pp. 123-4.

54. Paul Valery, *Oeuvres,* ed. Jean Hytier (Paris: Gallimard, 1960), 2: 1556-7.

55. Christopher Sykes, *Crossroads to Israel* (1965; reprint ed., Bloomington: Indiana University Press, 1973), p.5-এ উদ্ধৃত।

56. Alan Sandison, *The Wheel of Empire; A Study of the Imperial Idea in Some Late Nineteenth and Early Twentieth Century Fiction* (New York: St. Martin's Press, 1967), p. *158-তে উদ্ধৃত। ফরাসিতে এমন একটি চমৎকার কাজ :* Martine Astier Loutfi, *Litterature et colonialisms: L'Expansion coloniale vue dans la litterature romanesque francaise, 1871-1914* (The Hague: Mouton & Co., 1971).

57. Paul Valery, *Variete* (Paris: Gallimard, 1924), p. 43.

58. George Orwell, "Marrakech," *A Collection of Essays* (New York: Doubleday Anchor Books, 1954), p. 187.

59. Valentine Chirol, *The Occident and the Orient* (Chicago: University of Chicago press, 1924), p. 6.

60. Elie Faure, "Orient et Occident," *Mercure de France* 229 (July I-August 1, 1931): 263, 264, 269, 270, 272.

61. Fernand Baldensperger, "Ou s'affrontent 1'Orient et I'Occident intellectuels," in *Etudes d'histoire litteraire,* 3rd ser. (Paris: Droz, 1939), p. 230.

62. I- A. Richards, *Mencius on the Mind: Experiments in Multiple Definitions* (London: Routledge & Kegan Paul, 1932), p. xiv.

63. *Selected Works of C. Snouck Ilurgronje,* ed. G, H. Bousquet and J. Schacht (Leiden: E. *J.* Brill, 1957), p. 267.

64. H. A. R. Gibb, "Literature," *The Legacy of Islam,* ed. Thomas Arnold and Alfred Guillaume (Oxford: Clarendon Press, 1931), p. 209.

65. এ কালের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্যে দ্রষ্টব্য : Jacques Berque, *Egypt: Imperialism and Revolution,* trans. Jean Stewart (New York: Praeger Publishers, 1972).

66. এই বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচির বিবরণের জন্যে দেখুন : Arthur R. Evans, Jr., ed., *On four Modern Humanists: Hofinannsthal, Gundolf, Curtius, Kantorowicz* (Princeton N. J.: Princeton University Press, 1970).

67. Erich Auerbach, *Mimesis: The Repersentation of Reality in Western Literature,* trans. Willard R. Trask (1946; reprint ed., Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1968); এবং তার *Literary Language and Its Public in Late Latin Antiquity and in the Middle Ages,* trans. Ralph Manheim (New York: Bollingen Books, 1965).

68. Erich Auerbach, "Philology and *Weltliteratur,*" trans. M. and E. W, Said, *Centennial Review* 13, no. 1 (Winter 1969): 11.

69. পূর্বোক্ত, p. 17.

70. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন : H. Stuart Hughes, *Consciousness and Society: The Reconstruction of European Social Thought,* 1890-1930 (1958; reprint ed., New York: Vintage Books, 1961).

71. দ্রষ্টব্য : Anwar Abdel Malek, "Orientalism in Crisis," *Diogenes* 44 (Winter 1963), 103-40.

72. R. N. Cust, "The International Congresses of Orientalists," *Hellas 6,* no. 4 (1897): 349.

73. দ্রষ্টব্য: W. F. Wertheim, "Counter-insurgency Research at the Turn of the Century—Snouck Hurgronje and the Acheh War," *Sociologische Gids* 19 (September-December 1972).

74. Sylvain Levi, "Les Parts respectives des nations occidentales dans les progres de l'indianisme," *Memorial Sylvain Levi,* p. 116.

75. H. A. R. Gibb, "Louis Massignon (1882-1962)," *Journalof the Royal Asiatic Society* (1962), pp. 120, 121.

76. Louis Massignon, *Opera Minora,* ed. Y. Moubarc (Beirut: Dar-el-Maaref, 1963). 3:114. এবং *L'Oeuvre de Louis Massignon* (Beirut: Editions du Cenacle libanais, 1972-73).

77. Massignon, "L'Occident devant l'Orient: Primaute d'une solution culturelle," *Opera Minora,* 1:208-23.

78. পূর্বোক্ত, p. 169.

79. দেখুন Waardenburg, *L'Islam dans le miroir de l'Occident,* pp. 147, 183, 186, 192, 211,213.

80. Massignon, *Opera Minora,* 1: 227.

81. পূর্বোক্ত, p. 355.

82. Waardenburg, *L'Islam dans le miroir de l'Occident*-এ ম্যাসিনগানের প্রবন্ধে উদ্ধৃত। p. 225.

83. Massignon, *Opera Minora,* 3: 526.

84. পূর্বোক্ত, pp. 610-11.

85. পূর্বোক্ত, p. 212. ব্রিটিশদের ওপর আরেকটি আক্রমণের জন্যে দ্রষ্টব্য p-211. p-423-7-4

86. Waard.enburg, *L'Islam dans le miroir de l'Occident,* p. 219-এ উদ্ধৃত।

87. পূর্বোক্ত, pp. 218-19.

88. দ্রষ্টব্য : A. L. Tibawi, "English-Speaking Orientalists: A Critique of Their Approach to Islam and Arab Nationalism, Part I," *Islamic*

Quarterly 8, nos. 1, 2 (January-June 1964): 25-44; "Part II," *Islamic Quarterly* 8, nos. 3, 4 (July-December 1964): 73-88.

89. "Une figure domine tous les genres [of Orientalist work], celle de Louis Massignon": Claude Cahen and Charles Pellat, "Les Etudes arabes et islamiques," *Journal asiatique 26\, nos.* 1,4(1973): 104. ইসলামী প্রাচ্যতত্ত্বের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্যে দ্রষ্টব্য : Jean Sauvaget, *Introduction a I'histoire de I' Orient tnusuhnan: Elements de bibliographic,* ed. Claude Cahen (Paris: Adrien Maisonneuve, 1961).

90. William Polk, "Sir Hamilton Gibb Between Orientalism and History," *International Journal of Middle East Studies 6, no. 2* (Aprill 1 975): 1 3 1 -9. গিবের গ্রন্থ-তালিকার জন্যে দেখুন : *Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A. R. Gibb,* ed. George Makdisi (Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1965), pp. 1-20.

91. H. A. R. Gibb, "Oriental Studies in the United Kingdom," *The Near East and the Great Powers,* ed. Richard N. Frye (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1951), pp 86-7.

92. Albert Hourani, "Sir Hamilton Gibb, 1895-1971," *Proceedings of the British Academy* 58 (1972): p. 504.

93. Duncan Black Macdonald, *The Religious Attitude and Life in Islam* (1909; reprint ed., Beirut: Khayats Publishers, 1965), pp. 2-11.

94. H. A. R. Gibb, "Whither Islam?" in *Whither Islam? A Survey of Modem Movements in the Moslem World,* ed. H. A. R. Gibb (London: Victor Gollancz, 1932), pp. 328, 387.

95. পূর্বোক্ত, p. 335.

96. পূর্বোক্ত, p. 377.

97. H. A. R. Gibb, "The Influence of Islamic Culture on Medieval Europe," *John Rylands Library Bulletin* 38, no. 1 (September 1955): 98.

98. H. A. R. *Gibb, 'Mohammedanism: An Historical Survey* (London: Oxford University Press, 1949), pp. 2, 9, 84.

99. পূর্বোক্ত, pp. III, 88, 189.

100. H. A. R. Gibb, *Modern Trends in Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1947), pp. 108, 113, 123.

101. প্রবন্ধ দুটো পাওয়া যাবে গিবের *Studies on the Civilization of Islam,* pp. 176-208 <W 3-33-এ।

102. R. Emmett Tyrell, Jr., 'Chimera in the Middle East," *Harper's,* November 1976, pp. 35-8.

103. Ayad al-Qazzaz, Ruth Afiyo, et al., *The Arabs in American Textbooks,* California State Board of Education, June 1975, pp. 10, 15-এ উদ্ধৃত

104. "Statement of Purpose," *MESA Bulletin* 1, no. 1 (May 1967): 33.

105. Morroe Berger, "Middle Eastern and North African Studies: Developments and Needs," *MESA Bulletin* 1, no. 2 (November 1967): 16.

106. Menachem Mansoor, "Present State of Arabic Studies in the United States," *Report on Current Research 1958,* ed. Kathleen H. Brown (Washington: Middle East Institute, 1958), pp. 55-6.

107. Harold Lasswell, "Propaganda," *Encyclopedia of the Social Sciences* (1934), 12: 527. এ তথ্যের জন্যে আমি অধ্যাপক নোয়াম চমস্কির নিকট কৃতজ্ঞ।

108. Marcel Proust, *The Guermantes Way,* trans. C. K. Scott Moncrieff(1925; reprint ed., New York: Vintage Books, 1970), p. 135.

109. Nathaniel Schmidt, "Early Oriental Studies in Europe and the Work of the American Oriental Society, 1842-1922," *Journal of the American Oriental Society* 43 (1923): 11. এছাড়াও দেখুন : E. A. Speiser, "Near Eastern Studies in America, 1939-45," *Archiv Orientalni* 16 (1948): 76-88.

110. উদাহরণস্বরূপ : Henry Jessup, *Fifty-Three Years in Syria, 2* vols. (New York; Fleming H. Revell, 1910).

111. বেলফোরের ঘোষণা ও আমেরিকার যুদ্ধনীতির সম্পর্ক বোঝার জন্যে দ্রষ্টব্য : Doreen Ingrams, *Palestine Papers 1917-1922: Seeds of Conflict* (London: Cox & Syman, 1972), pp. lOff.

112. Mortimer Graves, "A Cultural Relations Policy in the Near East," *The Near East and the Great Powers,* ed. Frye, pp. 76, 78.

113. George Camp Keiser, "The Middle East Institute: Its Inception and Its Place in American International Studies," *The Near East and the Great Powers,* ed. Frye, pp. 80, 84.

114. এ পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের দেশত্যাগের বিবরণের জন্যে : *The Intellectual Migration: Europe and America, 1930-1960,* ed. Donald Fleming and Bernard Bailyn (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969).

115. Gustave von Grunebaum, *Modern Islam: The Search for Cultural Identity* (New York: Vintage Books, 1964), pp. 55, 261.

116. Abdullah Laroui, "Pour une methodologie des etudes islamiques: L' Islam au miroir de Gustave von Grunebaum," *Diogene* 38 (July-

September 1973): 30. পরে এই প্রবন্ধটি লা'রুই-এর *The Crisis of the Arab Intellectuals: Traditionalism or Historicism?* trans. Diarmid Cammell (Berkeley: University of California Press, 1976)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

117. David Gordon, *Self-Detennination and History in the Tltird World* (Princeton, N. J.:Princeton University Press, 1971).

118. Laroui, "Pour une methodologie des etudes islamiques," p. 41.

119. Manfred Halpern, "Middle Eastem Studies: A Review of the State of the Field with a Few Examples," *World Politics* 15 (October 1962): 121-2.

120. পূর্বোক্ত, p. 117.

121. Leonard Binder, "1974 Presidential Address," *MESA Bulletin 9,* no. 1 (February 1975): 2.

122. পূর্বোক্ত, p. 5.

123. "Middle East Studies Network in the United States," *MERIP Reports* 38 (June 1975):5.

124. *Cambridge History* সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো দুটো সমালোচনা হলো : Albert Hourani, *The English Historical Review* 87, no. 343 (April 1972): 348-57, -W Roger Owen, *Journal of Interdisciplinary History* 4, no. 2 (Autumn 1973): 287-98.

125. P. M. Holt, Introduction, *The Cambridge History of Islam,* ed. P. M. Holt, Anne K. S. Lambton, and Bemard Lewis, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 1: xi.

126. D. Sourdel, "The Abbasid Caliphate," *Cambridge History of Islam,* ed. Holt et al., 1: 121.

127. Z. N. Zeine, "The Arab Lands," *Cambridge History of Islam,* ed. Holt et al., I: 575.

128. Dankwart A. Rustow, :The Political Impact of the West," *Cambridge History of Islam,* ed. Holt et al., 1: 697.

129. Ingrams, *Palestine Papers,* 1917-1922, pp. 31-2-এ উদ্ধৃত।

130. Robert Alter,"Rhetoric and the Arab Mind," *Commentary,* October 1968, pp. 61-85. অল্টারের নিবন্ধটি আসলে জেনারেল ইহোশাফাত হারকাবির *Arab Attitudes to Israel* (Jerusalem: Keter Press, 1972) গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক আলোচনা মাত্র।

131. Gil carl Alroy, "Do The Arabs Want Peace?" *Commentary,* February 1974, pp. 56-61.

132. Roland Barthes, *Mythologies,* trans. Annette Lavers (New York: Hill & Wang, 1972), pp. 109-59.

133. Raphael Patai, *Golden River to Golden Road: Society, Culture, and Cliange in the Middle East* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1962; 3rd rev. ed., 1969), p. 406.

134. Raphael Patai, *The Arab Mind (New* york: Charles Scribner's Sons, 1973). এর চেয়ে প্রবল বর্ণবাদী কাজ : John Laffm, *The Arab Mind Considered: A Need for Understanding* (New York :Taplinger Publishing Co., 1976).

135. Sania Hamady, *Temperament and Character of the Arabs* (New York: Twayne Publishers, 1960), p. 100. হামাদির বইটি ইসরাইলি ও ইসরাইলি-সমর্থকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। এলরয় তাকে উল্লেখ করেছেন। তেমনি অ্যামোস এলন তার *Tlie Israelis: Founders and sons* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1971) গ্রন্থেও হামাদির প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মরো বার্জারও হামাদিকে প্রায়ই উল্লেখ করেছেন। হামাদি তার মডেল হিসেবে নিয়েছেন *Manners and Customs of the Modem Egypvians,* গ্রন্থটিকে; লেইনের জ্ঞানগত সমৃদ্ধির সামান্যতমও তার মধ্যে নেই যদিও।

136. Manfred Halpem "Four Contrasting Repertories of Human Relations in Islam: Two Pre-Modem and Two Modem Ways of Dealing with Continuity and Change, Collaboration and Conflict and the Achieving of Justice, নিবন্ধটি 22nd Near East Conference at Princeton University on Psychology and Near Eastern Srudies.May 8, 1973-এ পাঠ করা হয়। এটি হালপার্নের "A Redefinition of the Revolutionary Situation." *Journal of International Affairs* 23, no. I (1 969); 54-75-এর অংশবিশেষ।

137. Morroe Berger, *The Arab World Today* (New York: Doubleday Anchor Books, 1964), p. 140. জুয়েল কারমাইকেল এ ক্ষেত্রে আরো সূক্ষ্ম মাত্র। Gabriel Baer's *Population and Society in the Arab East,* trans. Hanna Szoke (New York: Frederick A. Praeger, 1964), এবং Alfred Bonne *State and Economics in the Middle East: A Society in Transition* (London: Routledge & Kegan Paul, 1955) প্রভৃতি প্রচুর-পঠিত রচনাতেও এর প্রকাশ দেখা যায়। তাদের ভাবখানা এমন যে, আরবরা যদি আদৌ চিন্তা করতে পারেও তবু সে চিন্তাধারা অন্যরকম কিছু–যুক্তিহীন। এ বিষয়ে আরো দেখুন : Adel Daher's RAND study, *Current Trends in Arab Intellectual Thought* (RM-5979-FF, December 1969) এবং তার উপসংহার–যথার্থ সমাধানমুখী মনোভাব আরবদের মধ্যে নেই প্রায় (p. 29) i *Journal of Interdisciplinary History* (see note 124 above), রজার ওয়েন ইতিহাসের অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে 'ইসলাম' ধারণাটিকেই গুরুত্বহীন মনে করেন। তার মডেল হলো *Cambridge History of Islam*, যা তার মতে ইসলাম সম্পর্কিত ধারণার জন্ম দিয়েছে : "একে (ইসলামকে) বর্ণনা করেছে ধর্মীয়, সামন্ততান্ত্রিক, যুক্তি-বিরহিত পদ্ধতিরূপে; যে সব কারণে ইউরোপে প্রগতি সম্ভব হয়েছে ওতে সেগুলো নেই।" সমজাতীয় ধারণার প্রকাশ আছে কার্ল বেকার ও ম্যাক্স ওয়েবারের রচনায়। ওয়েবারের বিভ্রান্তির প্রমাণের জন্যে দেখুন : Maxime Rodinson' *Islam and Capitalism,* trans. Brian Pearce (New York: Pantheon Books, 1974), pp. 76-117.

138. Hamady, *Character and Temperament*, p. 197.

139. Berger, *Arab World*, p. 102.

140. Irene Gendzier *Frantz Fanon: A Critical Study* (New York: Pantheon Books, 1973), p. 94-উদ্ধৃত।

141. Berger, *Arab World*, p. 151.

142. P. J. Vatikiotis, ed., *Revolution in the Middle East, and Other case Studies; Proceeding's of a seminar* (London: George Alien & Unwin, 1972), pp. 8-9.

143. পূর্বোক্ত, pp. 12, 13.

144. Bernard Lewis, "Islamic Concepts of Revolution," ibid. pp. 33, 38-9. লুইসের রচনা *Race and Color in Islam* (New York: Harper & Row, 1971)-তেও ফাঁকা পাণ্ডিত্য আর ঘৃণাবোধের প্রকাশ। তার *Islam in History: Ideas, Men and Events in the Middle East* (London: Alcove Press, 1973) গ্রন্থটিও রাজনৈতিক, কিন্তু কম বিদ্বেষপূর্ণ নয়।

145. Bernard Lewis, "The Revolt of Islam," *The Middle East and The West* (bloomington: Indiana University Press, 1964), p. 95.

146. Bernard Lewis, "The Return of Islam," *Commentary*, January 1976, p. 44.

147. পূর্বোক্ত, p. 40.

148. Bernard Lewis, *History - Remembered, Recovered, Invented* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975), p. 68.

149. Lewis, *Islam in History*, p. 65.

150. Lewis, *The Middle East and the West*, pp. 60, 87.

151. Lewis, *Islam in History*, pp. 65-6.

152. *Middle East Journal 5* (1951)-এ প্রকাশিত। *Readings in Arab Middle Eastern Societies and Cultures*, ed. Abdulla Lutfiyye and Charles W. Churchill (The Hague: Mouton & Co., 1970), pp. 688-703-এ অন্তর্ভুক্ত।

153. Lewis, *The Middle East and the West*, p. 140.

154. Robert K. Merton, "The Perspectives of Insiders and Outsiders," *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*, ed. Norman W. Storer (Chicago: University of Chicago Press, 1973), pp. 99-136.

155. উদাহরণস্বরূপ দেখুন : Anwar Abdel Malek, Yves Lacoste, and the authors of essays published in *Review of Middle East Studies J and 2* (London: Ithaca Press, 1975, 1976), মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি সম্পর্কে নোয়াম চমস্কির বিশ্লেষণ এবং Middle East Research and Information

Project (MERIP)-এর রচনা দেখুন। আরো বিশ্লেষণের জন্যে দেখুন : Gabriel Ardant, Kostas Axelos, Jacques Berque, et al., *De l'imperialisme a la decolonisation* (Paris: Editions de Minuit, 1965).

১৯৯৫ সালের সংস্করণে সংযোজন

1. Martin Bernal, *Black Athena* (New Brunswick: Rutgers University Press, Volume I. 1 987, Volume II, 1 99 1); Eric J. Hobsbawm and Terence Rangers, eds., *The invention of Tradition* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).
2. O'Hanlon and Washbrook, "After Orientalism: Culture, Criticism, and Politics in the Third World"; Prakash, "Can the Subaltern Ride? A Reply to O'Hanlon and Washbrook," *Comparative Studies in Society and History*, IV, 9 (January 1992), 141-84.
3. পক্ষপাতমূলক অনুমান-নির্ভর কথাবার্তার জন্যে লুইস এখন আইনের প্যাঁচে পড়েছেন (Liberation, 1 March 1994, Guardian, 8 March 1994)। আর্মেনীয়রা এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো তার বিরুদ্ধে সিভিল ও ক্রিমিনাল স্যুট ফাইল করেছে। ফ্রান্সে নাজী গণহত্যা অস্বীকার করা যে আইনে অপরাধ সেই একই আইনে তিনি অভিযুক্ত। কারণ লুইস (ফরাসি পত্রিকায়) মন্তব্য করেন যে অটোমান শাসনামলে আর্মেনীয় গণহত্যা বলে কিছু ঘটেনি।
4. Carol Breckenridge and Peter van der Veer, eds., *Orientalism and the Postcolonial Predicament* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993).
5. Nicholas B. Dirks, ed., *Colonialism and Culture* (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1992).
6. "The clash of Civilizations," *Foreign Affairs* 71,3 (Summer 1 993), 22-49.
7. "Notes on the 'Post-Colonial," *Social Text*, 31/32 (1992), 106.
8. Magdoff, "Globalisation — To What End?," *Socialist Register 1992: New World Order?*, ed. Ralph Milliband and Leo Panitch (New York: Monthly Review Press, 1992), 1-32.
9. Miyoshi, "A borderless World? From Colonialism to Transnationalism and the Decline of the Nation-State," *Critical Inquiry*, 19, 4 (Summer 1993), 726-51; Dirlik, "The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism," *Critical Inquiry*, 20, 2 (Winter 1994), 328-56.
10. *Ireland's Field Day* (London: Hutchinson, 1985), pp. vii-viii.
11. Alcalay (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993); Gilroy (Cambridge: Harvard University Press, 1993): Ferguson (London: Routledge, 1992).

